নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি অনুশীলনে উৎসাহী হইয়াছে দেখিয়া ভরসা হয় দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের অধুনালব্ধ স্বাধীনতা দেশ ও জাতির কল্যাণপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইবে।

অগণিত নরনারী তাহাদের অতৃপ্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া অধীর আগ্রহে ভবিষ্যৎ কালের প্রতীক্ষায় আছে। বর্তমান কালের ছাত্রছাত্রীরাই সকল দেশে সেই ভবিষ্যৎ রচনা করিবে। এই গ্রন্থে সাধারণ ও মেধাবী ছাত্রদের উপযোগী বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে।

পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে সাধারণ পাঠকপাঠিকাদের সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ নাগরিক জীবনের সহায়ক হইলে সুখী হইব।

বিনীত

মিহিরকুমার সেন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতের শাসনপদ্ধতি

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

সংজ্ঞা—নাগরিক হিসাবে আমাদের জীবন সম্পর্কে আলোচনাকে সংক্ষেপে পৌরবিজ্ঞান* বলা যাইতে পারে।

আলোচনার সীমা—নাগরিকদের পৌর জীবন ও জাতীয় জীবন এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইলেও বর্তমানে ইহার আলোচনাক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং বিশ্ব নাগরিকত্বও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে।

নাগরিকত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে হইলে নাগরিককে শুধু ভোটদাতা, করদাতা এবং পৌরসভা বা আইনসভার সদস্য মনে করা ঠিক নয়। তাহার জীবন বহুমুখী, সেই জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা দিক আছে। পৌরবিজ্ঞান নাগরিক জীবনের এই সমস্ত দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করে।

বহুমুখী নাগরিক জীবনকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে শুধু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিলে চলিবে না, সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমাদের এই সমাজের জন্মকথা জানিতে হইবে। কিন্তু কেবল বর্তমান ও অতীত লইয়া আলোচনা করিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সমাজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের কথা অর্থাৎ ভাবী সমাজ সম্পর্কিত কথা আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া চলিবে না। সুতরাং নাগরিক জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৌর-বিজ্ঞানের আলোচনার সীমার অন্তর্গত।

কিন্তু এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে প্রধানতঃ রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক হইতে স্থানীয় ও জাতীয় নাগরিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

'নাগরিক' শব্দটি আজকাল ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে নাগরিক বলিতে একজন পুরবাসীকে বুঝাইত। এই অর্থে নাগরিকত্ব বলিতে প্রধানতঃ স্বায়ত্ত-শাসনবিশিষ্ট পৌর-ব্যবস্থায় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বুঝাইত।

---

* ল্যাটিন Civitas (City-State—পৌররাষ্ট্র) শব্দটি হইতে Civics শব্দের উৎপত্তি। ল্যাটিন ভাষায় Civis বলিতে নাগরিক বুঝায়। সুতরাং নাগরিক হিসাবে মানুষের জীবন Civics-এর আলোচ্য বিষয়।

পৌরবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান—বিজ্ঞান আমাদের সমাজজীবনে বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছে। তাহার ফলে আমাদের জীবনযাত্রা ও চরিত্রের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়াছে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা প্রচার করেন যে সমাজ-সেবাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। নিজ সমাজের সেবা যে তরুণ নাগরিকের আদর্শ তাহার পক্ষে বৈজ্ঞানিকদের জীবন ও কীর্তি, তাঁহাদের সংগ্রাম ও দুঃখবরণ, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রভৃতির সহিত পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। বিজ্ঞানের প্রয়োগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুখময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করিবার জন্য যাঁহাদের চেষ্টার অন্ত নাই সেই সব বিখ্যাত বিজ্ঞানী, যেমন এডিসন, মার্কনি, কুরী-দম্পতি, আইনষ্টাইন, ওয়েল্‌স্‌, হলডেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের নাগরিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পৌরবিজ্ঞান ও সাহিত্য—সাহিত্য জাতীয় ভাব ও চিন্তাধারার অভিব্যক্তি—সাহিত্য পাঠ করিলে নাগরিক তাহার স্বদেশের ভাবধারা ও আদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারে। ইহার ফলে উন্নততর নাগরিকের আবির্ভাব সম্ভব। সুতরাং পৌরবিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। সুসাহিত্য সমাজবিজ্ঞানের ও নাগরিক জীবনের উন্নতির ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রুশো, টলষ্টয়, গোর্কি, বার্ণার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পৌরবিজ্ঞান ও শিল্পকলা—যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য ও চরিত্রের মধ্যে আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেইগুলিকে চিত্ররূপ দিয়া শিল্পকলা স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি আমাদের মমত্ববোধকে দৃঢ়তর করে। প্রাচীন গ্রীসের শিল্পিগণ বিভিন্ন কলা-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মধ্য দিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন। সংগীত এবং ভাস্কর্যেও জাতীয় সত্ত্বা এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পকলার এই বিভিন্ন বিভাগের যথাযথ অনুশীলন হইলে আমাদের নাগরিক জীবনের আদর্শ আরও উদার হইবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জাতীয় সংগীতও একটি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ আমাদের দেশের "বন্দে মাতরম্‌," "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা," "জনগণ-মন-অধিনায়ক" প্রভৃতি বিখ্যাত জাতীয় সংগীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—প্রত্যেক মানুষ রাজনৈতিক দিক হইতে সংঘবদ্ধ কোনও না কোনও সমাজের অন্তর্ভূত। এইরূপ সমাজভুক্ত মানুষই পৌরবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বস্তু। সুতরাং প্রথমেই আমাদিগকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে হইবে, আমাদিগকে জানিতে হইবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্রীয়

ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ অর্থাৎ তাহার গঠনরীতি ও কার্যক্রম কি? রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলি আলোচনার পর আমরা যে শাসনব্যবস্থার অধীনে আছি তাহার বিচার-বিশ্লেষণ করিব এবং নাগরিক হিসাবে আমাদের অধিকার ও কর্তব্য-সমূহের আলোচনা করিব।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গেই পৌর-বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাস্তবিকপক্ষে এক অর্থে পৌরবিজ্ঞানকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের একটি বিভাগ বলা যাইতে পারে। পৌরবিজ্ঞান অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ও নৈতিক দিকগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তত্ত্ব ও ধারণার পরিবর্তে তথ্য ও অভিজ্ঞতাই পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু।

রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব আলোচনায় জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের উত্থানের প্রকৃত রহস্যই এই শাস্ত্রে প্রাধান্য পাইয়া থাকে। ইহা পাঠ করিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যাইবে। স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় পৌরবিজ্ঞানে মুখ্যতঃ বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পরিণতির বিবরণ দেওয়া হয়।

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি—রাজনীতি হইতে অর্থনীতিকে কখনই পৃথক করা যায় না। বর্তমান জগতে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ রাজনৈতিক বিষয়াবলীর সহিত এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে অর্থনীতির মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে ধারণা না থাকিলে কোনও নাগরিক যথাযথভাবে তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে পারিবেন না, কেননা অর্থনীতিতে ধন ও ধনোৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে অর্থনৈতিক এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কল্যাণ সাধিত হইবে অনুমান করিয়া বর্তমান কালে নাগরিকবৃন্দ রাজনীতিকে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যৎ নির্মাণের চেষ্টা করে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র ও অনশনক্লিষ্ট নরনারীর সাক্ষাৎ পাই। নাগরিককে এই ব্যাপক ও ভয়াবহ দারিদ্র্য-সমস্যা এবং জনসাধারণের আর্থিক অবনতির মূল কারণ কি তাহা অবশ্যই জানিতে হইবে। সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে পৌরবিজ্ঞানে অর্থনীতির আলোচনাও করা হইবে। এক্ষেত্রেও অর্থ-নীতির মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইলে আমরা বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ধারাসমূহ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিব।

পৌরবিজ্ঞান পাঠের উপকারিতা—জীবনযুদ্ধের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হওয়াই আমাদের শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। বর্তমান যুগের ছাত্রবৃন্দ ভবিষ্যৎ কালের নাগরিক। বিশেষভাবে যুবকদিগকে আজ উপযুক্ত নাগরিক হইবার শিক্ষা

গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে ইহার অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। চতুর্দিকেই সমস্যার যেন অন্ত নাই। ক্রমশঃ এই সকল সমস্যা জটিল ও অপ্রতিরোধনীয় হইয়া উঠিতেছে। এই সব সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে এক্ষণে আদর্শবান নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইবে।

"আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।"

—(রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় বিদ্যালয়)।

আমাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে না পারিলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাইবে। যদি আমরা নাগরিক জীবনে যথোপযোগী আচরণে অভ্যস্ত হইবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলেই এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভবপর হইবে।

আজ অজ্ঞতা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যা ভারতীয় ছাত্র-নাগরিকদের সমক্ষে উপস্থিত। এই সব সমস্যা দূর করিতে না পারিলে আমরা সুষ্ঠু জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিব না। জাতীয় উন্নতি বিধানের এই মহান্ ব্রতে ছাত্রদিগকে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে জাপান, রাশিয়া, জার্মানী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের ছাত্রবৃন্দ যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, ভারতীয় ছাত্রদিগকে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। এই বৃহত্তর নাগরিকতার জন্য তাহাদিগকে নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের মধ্যে সর্বপ্রথমে কর্তব্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। পৌরবিজ্ঞানচর্চা হইতেই এই দায়িত্ববোধ উদ্ভূত হইবে। পৌরশাস্ত্র পাঠের ফলে প্রকৃত দেশসেবী হইবার জন্য যে জ্ঞান, শিক্ষা ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজন তাহাও অর্জিত হইবে। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আমাদের দেশ যাহাতে গৌরবোজ্জ্বল আসন গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য দেশকর্মীদিগকে ভারতের নবজাগরণে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে হইবে।

পৌরবিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য—পৌরবিজ্ঞানকে কেবলমাত্র তত্ত্বালোচনা মনে করা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন যাহাতে মহত্তর ও স্বচ্ছন্দতর হইয়া উঠিতে পারে সেজন্য বাস্তবক্ষেত্রে আমাদিগকে সাহায্য করাই এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

ব্যবহারিক জীবনে পৌরবিজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। আজ যে ছাত্ররূপে শিক্ষালাভ করিতেছে এবং অদূরভবিষ্যতে যে নাগরিকের পদমর্যাদা লাভ করিবে, সে যদি জীবনের কোন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্যে ব্রতী হইবার শিক্ষা না পাইয়া থাকে তবে তাহার জ্ঞান, আগ্রহ, শাস্ত্রালোচনা ও উপলব্ধি সমস্তই বৃথা হইল।

সকলেই যাহাতে বৃহত্তর, মহনীয় জীবন যাপন করিতে পারে তদুপযোগী সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে। নাগরিকশাস্ত্র আলোচনা আমাদিগকে গঠনমূলক কর্ম ও সক্রিয় নাগরিকতার শিক্ষা দিয়া থাকে। দেশের যুবক সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট চিন্তাধারায়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এবং সুষ্ঠু আচরণে সাহায্য করাই নাগরিকশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ছাত্রছাত্রীদিগকে হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইবে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে যাহাতে তাহারা যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে শিক্ষার মাধ্যমে উৎসাহিত করা এবং সাহায্য করা প্রয়োজন।

সুতরাং বাস্তবজীবনের সহিত পৌরবিজ্ঞানের সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত অপরিহার্য। পৌরবিজ্ঞান পাঠের সময় ছাত্রছাত্রীবৃন্দের মনে এইরূপ ভাবধারা জাগাইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে তাহারা নিজেদেরই অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহাদের আবেষ্টনী বা পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া দেশ ও সমাজসেবার আগ্রহকে সঞ্জীবিত ও অব্যাহত রাখিতে হইবে। "আঞ্চলিক পদ্ধতি" (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা) এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক। ক্রমশঃ এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া সমগ্র বিশ্বকেই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত করিতে হইবে। ছাত্র বা ছাত্রী প্রথমে তাহার নিজগৃহকে কেন্দ্র করিয়া এই অনুসন্ধান-কার্যে ব্রতী হইতে পারে। অতঃপর যে পল্লীতে তাহার বাস সে পল্লীর নাগরিক জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। পল্লী হইতে তাহার গ্রাম অথবা শহর এবং ক্রমে জেলা বা প্রদেশ তাহার অনুসন্ধানের বিষয় হইবে। পরিশেষে সমগ্র দেশ এবং জগতের সমস্যাসমূহই তাহার পাঠ ও গবেষণার বিষয়রূপে গণ্য হইবে। দেশনেত্রী স্বর্গতা সরোজিনী নাইডু মহাশয়া বলিয়াছেন, "ছাত্রছাত্রীদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে তাহারা উন্মত্ত জনতা নহে। ভারতের অগণিত নিরক্ষর নরনারীর মধ্যে মুষ্টিমেয়ের ভাগ্যেই উচ্চশিক্ষা লাভ ঘটিয়া থাকে। আমাদিগকে স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে এই শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।"

প্রথম খণ্ড

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি?—সরকার বা গভর্নমেণ্টের গঠন ও পরিচালন সম্পর্কিত আলোচনাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান* বলা হইয়া থাকে। ইহাতে রাষ্ট্র ও গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্পর্কও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও গভর্নমেণ্টের অধীনে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যাদি সম্পর্কেও প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উপকারিতা—রাষ্ট্রবিজ্ঞানচর্চা আমাদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই শাসনব্যবস্থার মূলনীতির সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। সরকারের প্রতি নাগরিকের যে সমস্ত কর্তব্য রহিয়াছে সে সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। আমরা সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইয়া থাকি। কিন্তু সরকার ঐগুলি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তাহাকে ঐ অধিকারসমূহ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। আমরা যেমন সরকারের নিকট অধিকার দাবী করিয়া থাকি, সেরূপ সরকারও আমাদিগকে ঐ অধিকারের বিনিময়ে কয়েকটি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়া থাকে। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত উভয় পক্ষের এই পারস্পরিক দাবী সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ভারতবাসীর পক্ষে এই জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। কারণ, ভারতবর্ষ এক্ষণে স্বাধীন হইলেও পূর্বের বহুবর্ষব্যাপী বৈদেশিক শাসনের ফলে নবলব্ধ স্বাধীনতার সহিত নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সুতরাং কি কি নীতি অনুসরণ করিয়া এবং কি অবস্থায় স্বাধীন ভারতে সুশাসন সম্ভবপর হইবে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারতবাসীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দেশহিতৈষী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই অপরিহার্যরূপে সরকার ও শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে; এ বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা করিলে চলিবে না।

যুবসম্প্রদায় ও রাজনীতি—যে যুগে আমরা বাস করি আমাদের নিকট তাহাই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। ভয়াবহ মহাসমরের ফলে আমাদের মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিশ্বে সর্বত্রই এইজন্য আজ মানুষ শ্রেষ্ঠ

* গ্রীক শব্দ—Polis (নগর) হইতে পলিটিক্স শব্দের উৎপত্তি।

শাসনব্যবস্থার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ও সচেষ্ট। যে সরকার জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানে এবং নাগরিকদের মনীষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করিবে তাহাকেই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার বলিব। এখন যাহারা ছাত্র, আনুমানিক ৫ বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে এই বিরাট বিশ্বের কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তখন তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অগণিত নরনারীর মঙ্গল চিন্তাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিবে। তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বকল্যাণ একটি সার্বজনীন সমস্যা। আমরা পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আবন্ধ যে অন্যান্য অঞ্চলের কল্যাণ সাধিত না হইলে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের যথাযথ হিতসাধন সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ সাধনের গুরুদায়িত্ব ছাত্রসমাজের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। তোমরা নিশ্চয়ই এই মানবকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্যে ব্রতী হইবে। ইহা ব্যতীত তোমাদিগকে নাগরিকতা ও সরকার সম্বন্ধেও আগ্রহশীল হইতে হইবে। তোমার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিবার ইচ্ছা না থাকিতে পারে; কিন্তু সরকার সকল সময়ে তোমার এবং রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন এমনভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে যে, তোমার চারিদিকে কি ঘটিতেছে তাহা না জানিয়া তোমার উপায় নাই। উদাসীন থাকিলে জীবনের প্রতিপদে তুমি বাধা পাইবে। তোমাকে তোমার মন স্থির করিতে হইবে, বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় তুমি নিজেকে ও তোমার পরিজনদিগকে বিচারবুদ্ধিহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। বিন্দু বিন্দু বারিকণাই একত্রিত হইয়া মহাসমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও অগণিত অধিবাসীদিগকে লইয়া তোমার মাতৃভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। তুমি তোমার দেশের একটি অংশ—ইহার বিপুল জনসমষ্টির একজন। পরিজন প্রতিবেশীর জীবনে তোমার প্রভাব পড়িবেই—তোমার প্রভাব ভাল হইবে বা মন্দ হইবে তাহা তোমার উপর নির্ভর করিবে। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তোমাকে দেশের স্বাধীনতা ও দেশবাসীর অধিকারসমূহ রক্ষা করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ বিপদ সম্পর্কেও তোমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের নেতা; দেশজননী আজ তোমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা প্রদর্শনপূর্বক জনসাধারণের চরিত্রগঠন ও তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাইবার জন্য তোমাদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে। গত মহাযুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপর সর্বত্র ব্যাপক ও প্রচণ্ড আঘাত হানা হইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, মানুষ আবার অন্ধকারময় বর্বরযুগে ফিরিয়া যাইতেছে।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি আদর্শগুলি কতিপয় বিবেক-বিবেচনাহীন স্বেচ্ছাচারীর মুখের বুলিতে পর্যবসিত হইলেও আমাদের নিকট এই শব্দগুলির যথেষ্ট তাৎপর্য রহিয়াছে।

স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসকবৃন্দ যাহাতে শক্তিসঞ্চয় করিয়া অতি শীঘ্র পৃথিবীর এই দুঃসময়ের অবসান ঘটাইতে পারে তজ্জন্য সংঘবদ্ধভাবে আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, আমাদিগকে মুক্তি শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহসমস্যা, বেকারসমস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, তোমাদের গ্রামের ও শহরের শাসনব্যবস্থা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা, তোমার দেশের প্রগতির ধারা ও জাতীয় পার্লামেণ্ট বা গণপরিষদ প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর বিষয় সম্পর্কে তোমার আগ্রহ ও অনুরাগ থাকা উচিত।

সকল সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই যুবকবৃন্দকে দেশের রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম অধ্যায়

সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

কোন্ সময় হইতে কি ভাবে মানুষ সমাজে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ সমাজের উদ্ভব কি ভাবে হইল—পৌরবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর মনে সর্বপ্রথম এই প্রশ্নই উদিত হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নির্জনে বা নিঃসঙ্গভাবে বাস করা মানুষের স্বভাব নয়। সে অপরের সঙ্গ কামনা করে, তাহার সহিত ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে চায়, দল বাঁধিয়া বাস করিবার ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন—ইহার ফলেই সে অপরজনের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন সমাজ গঠন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক সাহায্য ব্যতীত মানুষের পক্ষে একলা জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। এই পারস্পরিক সাহায্যলাভের আশায় মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষ প্রথমতঃ তাহার প্রকৃতিগত ধর্ম অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়তঃ প্রযোজনবশতঃ সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। প্রকৃতি মানুষকে সমাজে বাস করিবার প্রেরণা দেয়; কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করিতে বাধ্য হয়।

ইতিহাসের কোন্ যুগ হইতে মানুষ সর্বপ্রথম সামাজিক জীবনযাপন আবম্ভ করিয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মানবজাতির ইতিহাসের আদিযুগ হইতেই মানুষ সমাজে বাস কবিলেও প্রাচীন সমাজের রূপ আধুনিক সমাজের মত ছিল না। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারা অতিক্রম করিয়া মানবসমাজ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ক্রমবিকাশের পথে মানবসমাজ* বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

আর এই ক্রমবিকাশ সব দেশে সমানভাবে ঘটে নাই। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সমাজগুলির উৎপত্তি ও ক্রম-

---

* "সমাজ বলিতে একই প্রকাবের সম্পর্ক রক্ষা ও স্বার্থসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ ও একত্রে বসবাসকাবী জনসমষ্টি বুঝায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতরজীবেব সমাজের সহিত মানবসমাজের পার্থক্য এই যে, সামাজিক মানুষ তাহাদের পারস্পবিক স্বার্থ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন।" (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "সামাজিক প্রবন্ধ")

বিকাশের ইতিহাসও বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। বহুবর্ষব্যাপী ক্রমবিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজ-জীবনের উদ্ভব হইয়াছে এবং পরিবারের* মধ্যেই এই সমাজের মূল নিহিত। পরিবারই ক্রমশঃ আয়তন বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীতে (clan)† পরিণত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই এই

---

* **পরিবার** (family)—সাধারণতঃ একই গৃহে এক বা একাধিক পুরুষ, এক বা একাধিক মহিলা সন্তানাদিসহ বাস করিলে তাহাদের সমষ্টিকে পরিবার বলা হয়। পরিবার সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। পরিবার দুই ভাগে বিভক্ত—পিতৃপ্রধান (patriarchal) ও মাতৃপ্রধান (matriarchal)। পিতৃপ্রধান পরিবারে পিতৃকুল অনুযায়ী বংশ নির্ণীত হইত। পরিবারভুক্ত লোকজন একই পিতা বা তাহার পুরুষ বংশধরগণ হইতে উদ্ভূত। জীবিত পুরুষদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই পরিবারের সর্বময় কর্তা ছিলেন। পরিবারভুক্ত সকলের ধনসম্পত্তি এমন কি তাহাদের জীবনের উপরও তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। মাতৃপ্রধান পরিবারে মাতৃকুল অনুযায়ী বংশ নির্ধারিত হইত। মিশর, তিব্বত, দক্ষিণ ভারত এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে এইরূপ পরিবারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মাতৃপূজার মূলেও রহিয়াছে এই মাতৃপ্রধান পরিবার। কিন্তু পিতৃপ্রধান পবিবারের কর্তার ন্যায় শেষোক্ত পরিবারে মাতার কর্তৃত্ব ঐরূপ সর্বাত্মক ছিল না। অধিকাংশ দেশেই পিতৃপ্রধান পরিবার ছিল। পরিবারের ইহাই সাধারণ রূপ। এইজন্যই স্যার হেনরী মেইন তাঁহার Ancient Law শীর্ষক গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্বপ্রথমে পিতৃপ্রধান পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীন রোমীয় পরিবার পিতৃপ্রধান পরিবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ পরিবারে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ-কর্তা পরিবারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

আধুনিক যুগের পরিবার—বর্তমান যুগের সাধারণ পরিবারগুলি স্বামী-স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া গঠিত। ভারতের একান্নবর্তী ভারতীয় পরিবারে অনেক সময়ে নিজ নিজ স্ত্রীপুত্র লইয়া কয়েকজন ভাই একত্রে বাস করে, আইনতঃ পিতাই পরিবারের কর্তা। পিতা কর্তা হইলেও মাতাকেই বর্তমান যুগে পরিবারের প্রাণকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। পারিবারিক মঙ্গলামঙ্গল তাঁহার উপরই নির্ভর করে।

পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির এবং সাধারণভাবে সমগ্র পরিবারের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই "পরিবার" নামক প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব হইয়াছে। কিশোর-কিশোরী পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই সমাজের উদ্দেশ্য এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের মূল্য বুঝিতে পারে, জনস্বার্থের প্রয়োজনে নিজস্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা লাভ করে। এইজন্য পরিবারকে 'সমাজ-জীবনের আদর্শ বিদ্যালয়' অর্থাৎ সমাজ-জীবন সম্পর্কিত প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষ সামাজিক জীব—এইজন্য যেমন তার সামাজিক নীতি আছে, তেমনি সামাজিক রীতিও আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুসহ হয়।"

† **গোষ্ঠী** (clan)—যে সমস্ত পরিবার একই পিতৃপুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলা হয়। আদিম যুগের গোষ্ঠীসমূহ তাহাদের পরিচয়জ্ঞাপক

পরিবারের কর্তা ছিলেন। গোষ্ঠীর ক্রমবিস্তারের ফলে উপজাতির* (tribe) সৃষ্টি হইয়াছে। পরিশেষে উপজাতিসমূহের মিলন হইতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমবায়ের আকারে আঞ্চলিক সমাজের উৎপত্তি হয়। সুতরাং পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি ও রাষ্ট্রকে ক্রমশঃ বৃহত্তর ব্যাস লইয়া অঙ্কিত এক-কেন্দ্রিক বৃত্তসমূহ বলা যাইতে পারে।

সমাজের প্রধান অঙ্গস্বরূপ পরিবার গঠিত হইবার পরেও বহুদিন যাবৎ পারিবারিক জীবনের বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তির নিজস্ব কোনও সত্তা ছিল না। বহুকাল পরে সমাজে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির বিশিষ্ট মর্যাদা স্বীকৃত হইল। মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় দিন। অকস্মাৎ এই মর্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। মন্থরগতিতে হইলেও প্রাচীনকাল হইতে প্রায় বর্তমান যুগ পর্যন্ত বহু বর্ষব্যাপী এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন চলে; অবশেষে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। মাত্র অল্প কিছুদিন আগে সমাজে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টি এবং ব্যষ্টির মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই বর্তমান সমাজে ব্যক্তিকে উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছে।

এইজন্য পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সমাজে ব্যক্তির স্থান, সমাজের উদ্দেশ্য এবং সমাজের দুইটি প্রধান আদর্শ---শৃঙ্খলা ও প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বিভিন্ন চিহ্ন (যথা—সর্প, ক্যাঙ্গারু) ও উল্কি ব্যবহার করিত। পরিবার অপেক্ষা ইহার আয়তন বৃহত্তর হইলেও গোষ্ঠী একটি সুসংবদ্ধ জনসমষ্টি নহে, কিন্তু পুরাকালে বহু ব্যক্তির সমাবেশ ঘটাইতে গোষ্ঠী বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে এবং গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়াই মানুষ সামাজিক মনোভাব ও আদর্শে দীক্ষিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে জাতীয়তাবোধের উদ্ভবের পর গোষ্ঠীজীবন ব্যাহত ও দুর্বল হইয়াছে। গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ঐক্যবোধ, গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির গোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধ প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে পারে। অনেক সময় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একই গোষ্ঠীভুক্ত লোকজনের মধ্যে ঐক্যবোধ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

* **উপজাতি** (tribe)—সর্ববাদিসম্মত এক বা একাধিক অধিনায়ক বা দলপতির অধীন কয়েকটি গোষ্ঠীর সমবায়কে উপজাতি বলা হইয়া থাকে। এই দলপতির নেতৃত্ব ও একাধিপত্য দলভুক্ত সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। উপজাতিকে সাধারণত আধুনিক রাষ্ট্রের প্রথমাবস্থা মনে করা হইয়া থাকে। উপজাতির সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে ডাঃ রিভার্স বলিয়াছেন যে, উপজাতি একতন্ত্রের অধীন একই উপভাষাভাষী জনসংখ্যার সমষ্টি। সর্বসাধারণের মঙ্গল প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা একযোগে কাজ করিয়া থাকে। উপজাতির লোকজনের সামান্য মাত্রায় রাজনৈতিক ঐক্যবোধ থাকিলেও তাহাদের কোন সুপরিকল্পিত ও সুব্যবস্থিত শাসনপদ্ধতি ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ ও ব্যক্তি

সমাজে ব্যক্তির স্থানঃ—পৌরবিজ্ঞানে সাধারণতঃ সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত নাগরিকতা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। নাগরিক বলিতে ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইলেও সে একক অর্থাৎ লোকজনের সংস্পর্শহীন কোনও পৃথক মানুষ নহে। একমাত্র সমাজের মধ্যে বাস করিয়া সামাজিক আবেষ্টনীতে তাহার পক্ষে সভ্যতা ও জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। অতএব সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কার্যকলাপের আলোচনা পৌরবিজ্ঞানে করিতে হইবে।

সমাজের প্রয়োজনীয়তা—আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাহার প্রকৃতিগত ধর্ম অনুযায়ী সমাজে বাস করে। তাহার সহজাত প্রবৃত্তিই তাহাকে সামাজিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল (Aristotle) তাই বলিয়াছেন যে মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অন্য মানুষের সান্নিধ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। প্রয়োজন বলিতে এখানে দৈনন্দিন প্রধানতঃ ঐহিক বা পার্থিব প্রয়োজন বুঝাইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে আমাদের নৈতিক প্রয়োজনও আছে। এই উভয় প্রকার প্রয়োজন সাধনের জন্যই মানুষকে সমাজে বাস করিতে হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজন বলিতে খাদ্যান্বেষণ ও বর্বরযুগে প্রকৃতি, বন্যজন্তু ও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন প্রভৃতি বুঝায়। ইহাদিগকে আত্মরক্ষামূলক প্রয়োজন বলা হইয়া থাকে।

নৈতিক প্রয়োজন বলিতে সুষ্ঠু ও সদ্ভাবে কল্যাণের পথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা বুঝায়। মানুষ অনুক্ষণ অন্তরের মধ্যে এই নৈতিক প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের এইখানেই পার্থক্য। ইতর প্রাণীদের মধ্যে নৈতিক বোধের উন্মেষ হয় নাই। আমাদিগকে অভ্যাস, আচরণ, রীতিনীতি, জনমত এবং আইনানুযায়ী নির্দিষ্ট পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বসমূহ স্বীকার করিয়া চলিতে হয়। এইগুলি স্বীকার করিয়া সমাজে বাস করিলেই আমাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও নৈতিক জীবনযাপন সম্ভবপর হইবে, অন্যথায় নহে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মৈত্রী এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের মধ্যেই সুন্দর

জীবনের প্রকাশ। কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে থাকিলে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যেই এই সকল কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। সমাজই মানুষের লীলাভূমি। সমাজকে কেন্দ্র করিয়া এবং সমাজকে বেষ্টন করিয়াই তাহার জীবন আবর্তিত হয়।

পৌরবিজ্ঞান ও সভ্যতা—সভ্যতা বলিতে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক কার্য-কলাপ ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝায়। ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও চরমোৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করাই সভ্যতার আদর্শ। যে সমাজে এইরূপ ঘটিয়া থাকে তাহাকে আমরা সর্বাধিক সভ্য সমাজ বলিয়া থাকি। সেইরূপ যে ব্যক্তির মধ্যে সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট গুণসমূহ বিকশিত হইয়াছে তাঁহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ নাগরিক বলিব। মানব-ইতিহাসের সূচনায়, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও, মানুষ সমাজে বাস করিত। প্রাচীন যুগের সমাজ-ব্যবস্থা নিতান্ত সাধারণ ধরণের ছিল। সমাজের সৃষ্টি হইবার পূর্বে মানুষ অন্য কোন অবস্থায় সামাজিক নিয়মকানুন না মানিয়া যথেচ্ছভাবে বাস করিয়াছিল কিনা, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তি ব্যতীত সমাজ হইতে পারে না এবং সমাজের বাহিরে ব্যক্তির কোনও স্থান নাই।

সমাজ থাকিলেই সভ্যতা থাকিবে। এমন কি নরমাংসভোজী এবং আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও একপ্রকার স্থূল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। বর্তমান সভ্যতা বিশেষ সমৃদ্ধ হইলেও মানবসভ্যতার প্রারম্ভ এরূপ উজ্জ্বল বা সমৃদ্ধ ছিল না। এক্ষণে সভ্যতার যথেষ্ট প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং ইহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে এরূপ ধারণা করা ঠিক নহে। সভ্যতা ক্রমশঃ জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং উচ্চতর আদর্শাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের এই ধারার সহিত সম্পূর্ণ একাত্মতা স্থাপন করিয়া আদর্শ নাগরিককে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

নাগরিকতা সর্বত্র একরূপ নহে—পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের সভ্যতা রহিয়াছে। আমাদের সভ্যতা এতাবৎকাল একই ধারায় বহিয়া চলে নাই। বিভিন্ন সমাজের আচার-ব্যবহার, আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন ধরণের। বর্তমানে প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রহিয়াছে। সাধারণভাবে সমাজের সকলের কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাধীন সমাজের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আদর্শের সহিত সমগ্র মানবজাতির অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজের অন্তর্ভূত প্রত্যেক নাগরিকের কল্যাণ সাধনের আদর্শের কোন বিরোধ নাই।

সমাজের লক্ষ্য—মানুষের সকল সাধনার লক্ষ্য হইল পূর্ণ বিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বৃত্তিসমূহ ও গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্য লইয়া সমাজ গঠন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মবিকাশের সহিত স্বার্থপরতার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। উভয়কে এক করিয়া দেখিলে ভুল করা হইবে। সমাজের মধ্যে কাহাকেও অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজের উন্নতি সাধন করিতে দেওয়া হইবে না। সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেককেই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে হইবে। আত্মত্যাগের পথে অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের জন্য স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও ব্যক্তি চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। সেবাই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং আত্মত্যাগের পথে আত্মবিকাশেই এই আদর্শ জয়যুক্ত হইবে।

সমাজের মধ্যে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পরিপূর্ণ সম্প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করা প্রয়োজন, সেইরূপ বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকেও পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যেক জাতিকেই তাহার আদর্শ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সমষ্টিগত জীবনের বিকাশ সাধনের পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য জাতির অনিষ্ট করিয়া কোন জাতিকে আত্মোন্নতি করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। ব্যক্তির ন্যায় জাতিকেও সেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। নাগরিককে এই শিক্ষাই দিতে হইবে যে সে তাহার নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রাষ্ট্রের স্বার্থ সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না; উপরন্তু প্রয়োজন হইলে সে যেন স্বজাতির স্বার্থের উপরে সমগ্র বিশ্বের স্বার্থকে স্থান দিতে পারে।

অতএব সমাজের লক্ষ্য বলিতে (ক) রাষ্ট্রীয় কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তির আত্মোৎকর্ষ সাধন এবং (খ) বিশ্বের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জাতীয় জীবন, সংস্কৃতি এবং আদর্শসমূহের বিকাশ সাধনই বুঝাইবে।

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমোৎকর্ষ সাধন করাই সমাজের প্রধান কর্তব্য। ইহা সত্য যে, সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া এবং সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কেহ তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাইতে পারে না। ব্যক্তি সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ এবং সমাজের অগ্রগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহাকে অবশ্যই সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা মানিতে হইবে। এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, "সামাজিক আবেষ্টনীতে ও সমাজের প্রভাবে যে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ জীব; কিন্তু সে যখন আইনকানুন উপেক্ষা করিয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার

আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া জীবনযাপন করিয়া থাকে, তখনই সে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর জীব হইয়া উঠে।"

পক্ষান্তরে, সমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সমাজ চূড়ান্ত আদর্শে উপনীত হইয়াছে এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। যে জনসমষ্টিকে লইয়া সমাজ গঠিত তাহাদের প্রত্যেকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ব্যতীত সমাজের নিজস্ব বা কোনরূপ স্বতন্ত্র সুখসুবিধার আদর্শ থাকিতে পারে না। সর্বশেষে, সামাজিক উন্নতি বলিতে সমাজের অন্তর্গত নরনারীর উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বুঝায়। নিজের স্বার্থের খাতিরেও সমাজকে ব্যক্তি সম্বন্ধে যত্নবান হইতে হইবে। সর্বত্র মানুষের জীবনকে মধুর ও আনন্দময় করিয়া তোলাই ব্যক্তি তথা সমাজের উদ্দেশ্য।

শৃংখলা ও প্রগতির আদর্শ—সাধারণতঃ পৌরবিজ্ঞানে নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকারসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কিন্তু পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সমগ্র সমাজ।

পৌরবিজ্ঞানে অবশ্য নিছক সামাজিক তত্ত্বের পরিবর্তে সমাজের বাস্তবরূপ সম্পর্কিত আলোচনাই প্রাধান্য পাইয়াছে। যথার্থ সামাজিক কার্যক্রম ও যথার্থ সামাজিক আচরণ কি তৎপ্রতিই নাগরিকশাস্ত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যুগোপযোগী সামাজিক আদর্শ স্থির করিয়া ও জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করিয়া তদনুসারে নাগরিকদের জীবন গঠন করিতে হইবে। এই সব আদর্শকে মোটামুটি-ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শৃংখলাবোধ, (২) উন্নতি বা প্রগতি। বিশ্বসভ্যতা বা জাতীয় সাংস্কৃতিক অধিকারকে রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে শৃংখলাবোধ প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতি বা বিশ্বসংস্কৃতি কোনটিই নিখুঁত নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের সংস্কার সাধনের প্রয়োজন। সুতরাং শৃংখলাবোধই যথেষ্ট নয়—ইহার সঙ্গে উন্নতিবিধানের ইচ্ছা থাকাও বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী উত্তরাধিকারসূত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল মহান্ অতীত, সুসমৃদ্ধ বর্তমান এবং এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের অধিকারী। উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নাগরিককে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। অতীতের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় আমরা বর্তমানে নির্ভয়ে কর্তব্য করিয়া যাইব। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনপূর্বক আমরা যাহাতে উন্নততর ও মহত্তর জীবন যাপন করিতে পারি সে উদ্দেশ্যে যাহা কিছু সত্য, শিব এবং সুন্দর সমাজে তাহার প্রবর্তন করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ—মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রারম্ভে রাষ্ট্রের রূপ ছিল অত্যন্ত সাধারণ। এই স্থূল রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। কিন্তু ক্রমোন্নতির ফলে ইহা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং অবশেষে বর্তমানের এই সুন্দর, কল্যাণময়, সার্বজনীন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে।

সমাজের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ অংশ হইল পরিবার। এই পরিবার গঠনের মধ্যে সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। পরিবার ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইয়া গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর ক্রমবিস্তারের ফলে গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমবায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ নির্ধারণ করা হইয়াছে; কিন্তু সর্বত্রই এক পথ অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে নাই। ঠিক কোন্ সময়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। কেননা প্রাক্-রাষ্ট্রীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে, পরবর্তী যুগের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, উপজাতীয় রাষ্ট্রে এবং আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ক্রমশঃ একটি অপরটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মত রাষ্ট্রও অনেকটা আমাদের অগোচরে উদ্ভূত হইয়াছে। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ধারা আমরা ঠিকমত লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

এক জাতির সহিত অপর জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ "আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই"। ইহাদের মধ্যে বহুবিধ দোষ আছে। এইজন্য নিখিল মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি ত্রুটিহীন সর্বব্যাপী ও সার্বজনীন রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে অনেকেই গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের মতে একমাত্র বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই জগতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনসাধারণের উন্নতি বিধান করা যাইবে।

রাষ্ট্রগঠনের উপাদান—গেটেলের মতানুসারে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যতীত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করিয়াছে—

(১) **আত্মীয়তা** (kinship)

(২) ধর্ম

(৩) শৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা। ইহার সহিত রাষ্ট্রের ক্রম-বিকাশের অপরিহার্য অংগস্বরূপ আসুরিক শক্তির (force) **নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই আসুরিক শক্তি বর্তমান সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।**

এই উপাদানের প্রত্যেকটিই রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সংগঠন ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকে। ঐক্য এবং সংগঠন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই বাঁচিতে পারে না।

(১) আত্মীয়তা (kinship) **—**প্রাচীন সমাজে এই আত্মীয়তাবোধে মানুষ নিবিড়ভাবে একত্র হইয়াছিল। মানুষ যখন পরস্পরকে পরস্পরের আত্মীয় মনে করিল তখনই তাহারা একত্রে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। প্রধানতঃ এই আত্মীয়তা-বোধ হইতেই পরিবার ও গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উপজাতির মধ্যে ঐক্য ও সংগঠনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে।

(২) ধর্ম—কোন এক দলের লোকজনের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস তাহাদের মনে সংহতি ও নিয়মানুবর্তিতার প্রেরণা জাগ্রত করিয়াছিল। প্রাচীন যুগে ধর্ম মানুষেব সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিত। যাজক, পুরোহিত এবং দলপতিগণ ধর্মের অনুশাসন-সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে করা হইত। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের দূত মনে করিত। সেই বর্বরতা ও অরাজকতার যুগে একমাত্র ধর্মই আমাদিগকে বন্য, দুর্দান্তস্বভাব নমস্য পূর্বপুরুষগণকে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ও তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। এই ধর্মশিক্ষা ব্যতিরেকে আমরা জীবনে কখনই নিয়মানুবর্তী বা গুরুজনদের অনুগত হইতে পারিতাম না। ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্র ও সরকার গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে ধর্মের সাহায্যে শাসনকর্তা আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পরিবারবর্গ ও উপদলসমূহের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেন। তাঁহাকে সকলেই ভয়, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিত; কেননা মনে করা হইত যে ঈশ্বর-আদিষ্ট হইয়াই তিনি ধর্মবিধানসমূহ জারি করিয়া থাকেন।

প্রাচীন যুগে সমস্ত রাষ্ট্রই ছিল ধর্মরাষ্ট্র। স্বৈরতন্ত্র এই যুগে প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মই ছিল এই সকল রাষ্ট্রের ভিত্তি। রাজাকে ঈশ্বরের যাজক বা ঈশ্বর-আদিষ্ট দূত বলিয়া মনে করা হইত। রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া গণ্য হইত।

আত্মীয়তাবোধ লুপ্ত হইবার পর সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে মানুষ যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল তখন এই ধর্মবিশ্বাসই তাহাদের মধ্যে ঐক্য-বোধ বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, বিভিন্ন বংশধারাকে রক্ষা করিয়াছিল এবং রাষ্ট্রগঠন

করিয়াছিল। রাজন্যবর্গের ভগবৎদত্ত শাসনাধিকার তত্ত্বটি ভুল প্রতিপন্ন হওয়ায় বহুদিন হইল ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখনও তিব্বতে, নেপালে এবং কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডে রাজন্যবর্গের অধিকার সম্পর্কিত এই নীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এমন কি ইংল্যাণ্ডেও এই নীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বরের বহু উপাধির মধ্যে "ধর্মরক্ষক" (Defender of the Faith) উপাধিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩) শৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা—সাদৃশ্যবোধ এবং ধর্ম ব্যতীত কয়েকটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ রাষ্ট্রগঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন কোন একটি ভূখণ্ডে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য বাস করিতে আরম্ভ করিল তখন তাহারা নিয়মশৃঙ্খলা ও আত্মরক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিল। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। মানুষ বন্যস্বভাব ত্যাগ করিয়া গৃহে বসবাস আরম্ভ করিল অর্থাৎ সংসারী হইয়া উঠিল। ফলে উপজাতিগুলির যাযাবরবৃত্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। ভ্রাম্যমান বেদুইনের জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা কোনও একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিল। স্থায়ী বসবাসের পর তাহাদের মধ্যে সম্পত্তিবোধ জাগ্রত হইল।

কোনও একটি স্থানের জনসংখ্যা ও ধনসম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজ জীবন ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য মানুষ উদ্যোগী হইল। উপজাতিগুলি আবার একে অন্যের বিরোধী ছিল। শত্রুপক্ষীয় দলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্রুত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল।

যুদ্ধের ফলেই রাজন্যবৃন্দের উদ্ভব হইয়াছে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজন সেনানায়কের প্রয়োজন। আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধভাবে কোন দলপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিতে হয়। এইভাবে যুদ্ধজনিত অবস্থার মধ্য দিয়া সমাজে দলপতির কর্তৃত্ব ও দলগত ঐক্য সুদৃঢ় হইল। সুদক্ষ চতুর সেনানায়কগণ নৃপতিপদে উন্নীত হইলেন (ভারতীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ প্রধানতঃ দলপতি ছিলেন) এবং যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

দলপতিগণ নিজ নিজ দলের লোকজনকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত দলের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূর্বে মানুষের জীবন ও তাহার ধনসম্পত্তি বিপদসঙ্কুল ছিল—এক্ষণে সে বিপদ বিদূরিত হইল। একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার এইরূপ সমাধানে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় এবং রাষ্ট্ররক্ষা ও সমাজ সংগঠন ব্যাপারে মানুষ দৈহিক বলের* বা আসুরিক শক্তির প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। বর্তমান যুগেও দৈহিক বলের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে ইহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছে।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক সংজ্ঞা—রাষ্ট্রের প্রাথমিক সংজ্ঞা নিম্নোক্তরূপ দেওয়া যাইতে পারেঃ—**যখন কোন মানবসমাজে সমস্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উপর কোন ব্যক্তি আপন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন এবং এই সংগে তিনি নিজে ঐ সমাজের সমস্ত আইনকানুনের ঊর্ধ্বে থাকেন (অর্থাৎ ঐ সমাজের কাহারও নিকট নতি স্বীকার বা কার্যের জন্য জবাবদিহি না করেন) তখন ঐ সমাজে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।**

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ—রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদগুলি জানা উচিত। ইহাদের সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা নিম্নলিখিত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিবঃ—**(১) সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব (২) ঐশ্বরিক উৎপত্তিতত্ত্ব (৩) শক্তিবাদ (৪) দেহবাদ (৫) ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা বিবর্তনবাদ।**

(১) সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব (Social Contract Theory) —সামাজিক চুক্তি-তত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাধিক। ইহা একটি প্রাচীন মতবাদ। প্লেটোর বিখ্যাত রিপাবলিক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। প্রখ্যাতনামা ফরাসী দার্শনিক রুশো এই মতবাদের অন্যতম প্রধান সমর্থক। এই মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ মুক্ত প্রকৃতি-রাষ্ট্রে (State of Nature) বাস করিত। প্রকৃতি-রাষ্ট্রে মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন প্রকার আইনকানুন প্রচলিত ছিল না। এই মতবাদের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ রাষ্ট্রে মানুষের জীবন আদৌ উন্নত ধরণের ছিল না। যেমন হব্‌সের মতে এই অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল "নিঃসংগ, দরিদ্র, বিশ্রী, পশুসুলভ এবং স্বল্পস্থায়ী।" অপরদিকে রুশো (Rousseau) প্রভৃতি অন্য সমর্থকগণ প্রকৃতি-রাষ্ট্রের মানবজীবনকে মানুষের আদিম স্বর্গরূপে

* **দৈহিক বল** (force)—ইহেরিং (Ihering) স্বীকার করিযাছেন যে রাষ্ট্রের ভিত্তিই হইতেছে দৈহিক বল বা আসুরিক শক্তি। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসংগে তিনি বলিয়াছেন যে, যেখানে সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে আসুরিক শক্তির প্রয়োগ করে তাহাই রাষ্ট্র।

বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বিরাজ করিত। এখানে সকলেরই ছিল সমানাধিকার। মানুষ তখন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। মানুষের রচিত আইন তখন মানুষকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলে নাই। রাষ্ট্রের গুরুভার তখনও মানুষকে বহন করিতে হয় নাই। এ রাজ্যে রাজা বা প্রজা বলিয়া কেহ ছিল না -- মানুষের মধ্যে শাসক-শাসিতের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না। তাই রুশো বলিয়াছেন, মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও সর্বত্রই সে আজ নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

এইরূপ রাজ্যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল না। কারণ, যাহারা এই স্বাধীনতা ভোগে বাধা সৃষ্টি করিত তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কোন শক্তি রাজ্যমধ্যে ছিল না। প্রকৃতি-রাষ্ট্রে জীবনযাত্রা সহজই হউক বা জটিল হউক, একথা ঠিক যে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমে রাষ্ট্রগঠনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিল। সুসংহত সমাজের আত্মরক্ষাবিষয়ক ও আনুষঙ্গিক সুখসুবিধা ভোগের আশায় মানুষ নিজের স্বাভাবিক বা যথেচ্ছস্বাধীনতা ভোগাধিকারের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল। সামাজিক মানুষ পরস্পর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। ইহার মূল ভিত্তি হইতেছে একটি চুক্তি যাহা সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হইয়াছিল। হবস্ (Hobbes) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানুষ এই চুক্তি দ্বারা এক কর্তা বা রাজার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিতে স্থির করে। স্বেচ্ছায় যে ক্ষমতা তাহারা ত্যাগ করিয়াছিল তাহা রাজার করতলগত হয়। রাজাকে তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কাজেই তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। লকের (Locke) মতে প্রাকৃতিক জীবনের অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য মানুষ রাষ্ট্র স্থাপন করে এবং রাষ্ট্রের আশ্রয়ে নিজেদের ধনসম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে চুক্তির একটি সর্ত ছিল যে যদি রাজা চুক্তি অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্য না করেন, তবে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা প্রজাদের আছে। লকের মতে জনসাধারণের হাতেই শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে রুশো রাজা বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেন নাই। তিনি জনসাধারণের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে এই মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বহু বিপ্লবের মূলে ছিল এই মতবাদ। সমস্ত অধিকার জনসাধারণের—চুক্তিতত্ত্বের এই মূল কথা ফরাসী ও আমেরিকার অধিবাসীদের মনে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। "মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; জনসাধারণের সম্মতিক্রমে শাসনাধিকারের

উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকার সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন"—চুক্তিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই মূল আদর্শই ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

শাসিতের সম্মতির উপরই শাসকের অস্তিত্ব নির্ভর করে—চুক্তিতত্ত্বে এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে শাসকের অত্যাচার নিবারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদের সারবত্তা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না—এই মতবাদ অভ্রান্ত নহে। সভ্যসমাজ হইতে পৃথক করিয়া একটি প্রকৃতি-রাষ্ট্রের কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতবাদে ভ্রান্ত ধারণার অবতারণা করা হইয়াছে। তথাকথিত প্রকৃতি-রাষ্ট্রে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একমাত্র সভ্যসমাজে অর্থাৎ রাষ্ট্রে প্রকৃত স্বাধীনতা বিরাজ করিতে পারে। সাম্য ও স্বাধীনতার ভাব এবং রাজনৈতিক চেতনা মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে আসিয়াছে, রাষ্ট্র গঠনের পর ইহা বিকাশ লাভ করিয়াছে, রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে প্রকৃতি-রাষ্ট্রে তাহা থাকিতে পারে না। কাজেই এই মতবাদ একেবারেই যুক্তিগ্রাহ্য নহে। উপরন্তু এই মতবাদের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক যুক্তি নাই। আজ পর্যন্ত চুক্তির দ্বারা পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে একটি বিপজ্জনক মতবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা মানুষকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ দেয়। এই মতবাদের যুক্তি হইল এই যে, প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সহিত কোন প্রজার মতবিরোধ হইলে প্রজার নিজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার আছে।

এ সম্পর্কে গার্নার (Garner) বলিয়াছেন—ইহা মানুষের কল্পনাপ্রসূত নিছক একটি মতবাদ মাত্র। স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতেছে—এই মতবাদে মূলতঃ ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(২) রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির মতবাদ (Theory of Divine Origin)—ঐশ্বরিক মতবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজারা ঈশ্বরের মনোনীত প্রতিনিধি, তাঁহারা ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রজাসাধারণের প্রশ্ন করিবার কোনই অধিকার নাই। অধুনা এই মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি অথবা রাজার শাসনাধিকার ঈশ্বরপ্রদত্ত—এ কথা বিশ্বের কোন সভ্যসমাজের অধিবাসী বিশ্বাস করেন না।

(৩) **শক্তিবাদ** (Theory of Force) —শক্তিবাদ অনুসারে রাষ্ট্র শারীরিক শক্তি বা আসুরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শারীরিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। চলতি কথায় যাহাকে আমরা বলি, "জোর যার মুল্লুক তার"। যখন কোন শক্তিমান আপনার বুদ্ধি ও শক্তিবলে দুর্বল লোকজনকে আপন অধিকারে আনিয়া নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করে, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

এই মতবাদ একেবারে ভ্রান্ত নহে—কিছু সত্য ইহাতে আছে। রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য আসুরিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র পশুশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রাখা যায় না। জনসাধারণ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে বলিয়াই রাষ্ট্র তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে।

জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি, আসুরিক শক্তি নহে (Will, not force, is the basis of the state).

রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে সকলের নৈতিক সমর্থনের উপরই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। তাই খ্যাতনামা ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক টমাস গ্রীণ বলিয়াছেন, "জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি, শারীরিক শক্তি নহে"।

গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে প্রত্যেক সুসভ্য সরকারকেই জন-সাধারণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মাণী ও ইটালীতে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান হইয়াছিল—তাহাকে গণতন্ত্রবাদ ও জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ (challenge) বলা যাইতে পারে। একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে আহ্বান করিয়াছিল; শেষ পর্যন্ত তাহাকে পরাভূত করিয়া গণতন্ত্র আপনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(৪) **দেহবাদ** (Organic Theory) —দেহবাদে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় রাষ্ট্রকেও একটি জীবন্ত প্রাণিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই মতবাদে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ পর্যন্ত সমুদয় মতবাদকেই সমর্থন করা হইয়াছে।

এই মতবাদে প্রাণিদেহের বিভিন্ন জীবকোষের সহিত ব্যক্তির তুলনা করা হইয়াছে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ বা প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় রাষ্ট্রেরও বিভিন্ন অংশ যাহার যাহার নির্দিষ্ট কার্য করিয়া থাকে। সব দেহ যেমন সমান পুষ্ট নয়, সব রাষ্ট্রও তেমনি একই রকমের নয়—কেহ বড়, কেহ ছোট; কেহ বা বেশী উন্নত

আবার কেহ বা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। প্রাণিদেহের ন্যায় রাষ্ট্রেরও জন্ম আছে, বিকাশ আছে আবার ধ্বংসও আছে।

এই মতবাদের মূল বক্তব্য হইল এই যে, রাষ্ট্রের অধীন জনগণের মধ্যে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের অনেক দিক হইতে সাদৃশ্য থাকিলেও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে দেহী বলা যায় না। উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কি কম? সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়াও মানুষ তাহার স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখিতে পারে ও স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে; কিন্তু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন কাজ করিবার শক্তি থাকে না। রাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ও কার্যকলাপের মধ্যে কত পার্থক্য! জীবদেহে ইহা সম্ভব নহে। বিভিন্ন ব্যক্তির সজ্ঞান চেষ্টা এবং ইচ্ছার ফলেই সকলের জ্ঞাতসারে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে—কিন্তু জীবদেহের নির্মাণপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের।

(৫) ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory).—রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নহে, অথবা শুধু শারীরিক শক্তিবলেই ইহা গঠিত হয় নাই; পরন্তু ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ইহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদই হইল সর্বজনস্বীকৃত আধুনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে কোন একটি বিশেষ কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই, ইহা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে জন্ম ও উন্নতি লাভ করিয়াছে।

যে সকল শক্তির প্রক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—**(১) রক্ত সম্পর্কের বন্ধন,** (kinship by blood) (২) **ধর্মের বন্ধন** (religion) ও (৩) **রাজনৈতিক চেতনা** (political consciousness)। অর্থনৈতিক প্রভাবেও কত রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে আবার ইহার প্রভাবে কত রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(১) আদি মানবসমাজে রক্ত সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে সহজে একত্রিত করিয়াছে। যখন মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে একই রক্ত সম্পর্ক বর্তমান, তখন তাহারা পরস্পর একত্র হইয়া পরিবার বা গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে। পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রথম আমরা একজন প্রভু বা কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই।

(২) ধর্মবিশ্বাসও রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ধর্ম সমাজের প্রথম অবস্থায় সমগ্র মানবজীবন এবং পরে বহুকালব্যাপী মানুষের কেবলমাত্র পারলৌকিক

জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। মাত্র অল্প কিছুদিন হইল ধর্ম রাষ্ট্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

(৩) রাষ্ট্রগঠনে রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করিয়াছে। রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের সংগে সংগে মানুষ আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও শান্তি রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠে। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। জনসাধারণের অশেষ ত্যাগ ও দুঃখ বরণের ফলে বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি গড়িয়া উঠিল—কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাজা বা অভিজাত ব্যক্তিগণের করায়ত্ত রহিল।

রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনৈতিক স্বরূপ অনুভব করা যাইত না। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং বিকাশ লাভের সংগে সংগে অন্যান্য উপাদানগুলি গৌণ হইয়া পড়িল। পরিশেষে রাষ্ট্র অঞ্চলবিশেষের ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্র

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা সমাজের উদ্ভব ও স্বরূপ এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং রাষ্ট্রগঠনের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করিব। ইহা করিবার পূর্বে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের প্রভেদ কোথায় তাহা জানিতে হইবে।

রাষ্ট্র এবং সমাজ*—সাধারণতঃ একই উদ্দেশ্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে আমরা সমাজ বলিয়া থাকি, যেমন—সাহিত্য-পরিষদ, ব্যায়াম-সমিতি, হরিসভা, শ্রমিকসংঘ ইত্যাদি। প্রত্যেক সংঘেরই এক একটি বিশেষ এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রহিয়াছে।

রাষ্ট্রও একপ্রকার সংঘ—অন্যান্য সংঘের সহিত ইহার পার্থক্য—রাষ্ট্রও এক-প্রকার সমাজ। সাধারণ স্বার্থজড়িত কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একদল মানুষ একত্র হইয়া রাষ্ট্র গঠন করে। অন্যান্য জনসংঘের সহিত রাষ্ট্রের মূলগত পার্থক্য হইল এই যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সকল প্রজার সর্ববিধ মঙ্গলসাধন করা, কিন্তু কয়েকজনের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অন্যান্য সংঘ গঠিত হয়।

---

* অধ্যাপক লাস্কির মতে পরস্পরের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য মানুষ মিলিত হইয়া একসঙ্গে বসবাস করে। এইভাবে সমাজ গঠিত হয়। মানুষের প্রধান অভাবগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক—তাহার প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়। সর্বাগ্রে বাঁচিতে হইবে—সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের প্রশ্ন পরের ব্যাপার। সাংস্কৃতিক, ধর্মসংক্রান্ত, গার্হস্থ্য ইত্যাদি অন্যান্য অভাবসমূহও পরে পূরণ হইতে পারে। একমাত্র সমাজবন্ধনের দ্বারাই এই সব অভাব-অভিযোগ পূরণ করা সম্ভব। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যই সমাজ গঠিত হইয়াছে—অতএব সমগ্র মানবজাতিই এইরূপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে ইহা সম্ভবপর হয় নাই। বিভিন্ন জনসমবায় বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ সমাজ গঠন করিয়াছে। ফলে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার স্বার্থরক্ষা ও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যক্তি, জনসংঘ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে জাতীয় সমাজগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থসাধনের জন্য মানুষ একত্র হইয়া জনসংঘ গঠন করে—অবশেষে এইরূপ জনসংঘগুলি মিলিত হইয়া রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

The State in Theory and Practice—Laski

আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে শুধু ঐ বিশেষ কার্যক্রম অনুসরণ করিলেই চলিবে না। সমাজের সর্বসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

কোন সংঘের সভ্য হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। সে নিজের ইচ্ছামত আজ কোন সংঘে যোগ দিতে পারে; আবার কাল মত পরিবর্তন করিয়া উহা ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে থাকা বা না থাকা কাহারও আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক নাগরিকই কোন না কোন রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ সভ্যগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মানিয়া চলার উপরেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। কাহাকেও বলপ্রয়োগ করিয়া নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের নিয়মকানুন ও নির্দেশাদি মানিয়া চলিতে হয়। অন্যথায় রাষ্ট্র নাগরিকের উপর শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারে। তাঁহাকে আইন মানিতে বাধ্য করে। এই বলপ্রয়োগ-অধিকারেই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য।

পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের অধিবাসী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। অপরপক্ষে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকেই যাহার যাহার নিজস্ব রাষ্ট্রের নাগরিক। একদেশের নাগরিক কখনই অপর একদেশের নাগরিকরূপে গণ্য হইতে পারে না।

আরও একটি বিষয়ে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের পার্থক্য রহিয়াছে। একই ব্যক্তি একই সময়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে। যুগপৎ ফুটবল ক্লাব, শিল্পসংঘ, হরিসভা, শ্রমিকসংঘ, সমাজ-সেবকসংঘ ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় কোনও বাধা নাই, কিন্তু কোনও ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না। কোন নাগরিক একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে না—ঐ ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক কেবলমাত্র সেই রাষ্ট্রের প্রতি সে আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে। উপরন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী।* নাগরিকের জীবনের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার রহিয়াছে।

---

* আইনতঃ রাষ্ট্রের ক্ষমতা অসীম। তবে রাষ্ট্র নিজের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়া স্বীয় ক্ষমতা খর্ব করিতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন, বিশ্বের জনমত ইত্যাদি

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, রাষ্ট্র একটি জনসমবায় (জনসংঘ)—সর্বতোভাবে মানবজীবনের উন্নতিসাধনই রাষ্ট্রের কাম্য। জনসাধারণের সর্বাংগীন কল্যাণসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। এই বিশাল ও ব্যাপক উদ্দেশ্য রাষ্ট্রকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে। আমাদের সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি হইল রাষ্ট্র। অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের অধীন। এই প্রাধান্যই রাষ্ট্রের বিশেষত্ব।*

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রগঠনের ফলেই সমাজ-জীবন সম্ভব হইয়াছে। মানুষের অভাব-অভিযোগসমূহ পূরণ করিয়া রাষ্ট্র সমাজ-জীবনকে ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে।†

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা—সমাজের সকল মানুষের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য যদি কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং ঐ সমাজের লোকজন যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে ধীরে ধীরে মানুষ এইরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সহজেই লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে এই সবগুলি বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের উল্লেখ রহিয়াছে। অধ্যাপক

গঠিত হওয়ায় এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বহুলাংশে সংকুচিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

* এ্যারিস্টটল বলিয়াছেন,—সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। হেগেল বলিয়াছেন,—মর্ত্তে রাষ্ট্র স্বর্গীয় আদর্শের প্রতিরূপ বিশেষ।

† প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এ্যারিস্টটল বলিয়া গিয়াছেন যে, রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার অবিসম্বাদী আধিপত্য রহিয়াছে। সমাজের মধ্যে মানুষের জীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতার দাবী আদৌ অযৌক্তিক নহে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র রাষ্ট্রই অত্যাচার ও অরাজকতার হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে। অরাজকতার ফলে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বাধীনতা রক্ষা ও সুষ্ঠু জীবনযাপন করিতে হইলে সরকার গঠন করিতেই হইবে—
Nationality and Government—Zimmern

শক্তিমানেরাই নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারে—প্লেটো এই যুক্তি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহার পর হইতে নিছক শক্তির উপর রাষ্ট্রের ভিত্তি বলিয়া পূর্বে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাহা পরিবর্তিত হয় এবং উচ্চ আদর্শকে কার্যে পরিণত করাই যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তাহা স্বীকৃত হয়—লাস্কি।

গার্নার বলিয়াছেন,—**"রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের বিচারে রাষ্ট্র এমন বহু লোকের সমষ্টিবিশেষ যাহারা স্থায়ীভাবে কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে, যাহারা বাহিরের যে কোন শাসনপাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের নিজ গঠিত একটি নির্দিষ্ট গভর্ণমেণ্ট বা সরকার রহিয়াছে, যে সরকারের প্রতি অধিকাংশ নাগরিকই আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে।"**

Elements of State

রাষ্ট্রের আবশ্যক উপাদানসমূহ—গার্নার-প্রদত্ত এবং অন্যান্য বহু সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের উপাদানরূপে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখিতে পাই—

(১) জনসংখ্যা বা প্রজা (population) **(২) নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড** (territory) **(৩) গভর্নমেণ্ট বা সরকার এবং (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা** (sovereignty)

(১) রাষ্ট্রের আবশ্যক উপাদানগুলির মধ্যে প্রজা বা জনসংখ্যার স্থান সর্বাগ্রে। জনসংখ্যা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। অধিবাসিগণ যখন রাজনৈতিক কারণে একত্রিত হয় তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তাহার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা যায় না।* বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংখ্যক অধিবাসী আছে। আলবেনিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ, আবার ৪৫ কোটীরও অধিক লোক চীনদেশে বাস করে। অধিবাসিগণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রজা বা নাগরিক এবং বিদেশী।

(২) রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান হইল নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড। অধিবাসিগণকে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে বাস করিতে হইবে, নতুবা রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। একদল যাযাবর জাতি যদি নিয়তই একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে তাহাদিগকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। যাযাবর দলের নিজস্ব নেতা থাকিতে পারে, নিজেদের আইনকানুন, শৃঙ্খলা ও সংঘ থাকিতে পারে, তথাপি যতদিন তাহারা দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ততদিন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে না। যাযাবর সম্প্রদায় যখন ভ্রমণের নেশা ত্যাগ করিয়া একটি নির্দিষ্ট

---

* এ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যার একটি সীমা থাকা চাই। তাঁহার মতে লোকসংখ্যা খুব বেশীও হইবে না, খুব কমও হইবে না; এমন হওয়া উচিত যেন রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশাসিত হইতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনসংখ্যার সীমা নির্ধারণ অভিপ্রেত হইলেও সাধারণতঃ এইরূপ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

স্থানে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়া রাষ্ট্রগঠনের সূত্রপাত হয়। জনসংখ্যার ন্যায় দেশেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করা যায় না। কতকগুলি রাষ্ট্রের আয়তন মাত্র কয়েক বর্গ মাইল, যেমন—মোনাকো; আবার কোন কোন রাষ্ট্রের আয়তন লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল, যেমন—রাশিয়া।

আয়তন দেখিয়া সব সময় রাষ্ট্রের উন্নতি বিচার করিতে পারা যায় না। চীন ও জাপানের পার্থক্য হইতে এই কথার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য রাষ্ট্রের আয়তন ও অবস্থানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষভাবে সামরিক শক্তি প্রধানতঃ দেশের আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

(৩) রাষ্ট্রের তৃতীয় বিশেষত্ব হইল সরকার বা গভর্নমেণ্ট*। "বহুসংখ্যক লোক একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করিলেই সেখানে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে এমন কথা বলা যায় না।" তাহাদিগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে; কেননা মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মোট কথা, আদেশ করিবার অধিকারী ও ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সকলের আনুগত্য গ্রহণ করিবার উপযুক্ত গভর্নমেণ্ট বা সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রও থাকিতে পারে না। সরকার রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র; ইহা এমন একটি যন্ত্র যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের অভিপ্রায় নির্ণীত ও প্রকাশিত হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(৪) পরিশেষে রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা—রাষ্ট্রের ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইহার দ্বারাই অপরাপর সংঘ হইতে রাষ্ট্রের পার্থক্য ধরা পড়ে। মানুষের কার্যকলাপ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং নিজ এলাকায় সকল মানুষ, বস্তু ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের সীমাহীন, নিরঙ্কুশ ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকার আছে—প্রয়োজন হইলে ইহা সকলের উপর নিজের ইচ্ছা ও আদেশ বলবৎ করিতে পারে। আইনতঃ কেহ তাহা অমান্য করিতে পারে না। রাষ্ট্রের এই সীমাহীন চূড়ান্ত কর্তৃত্বাধিকারকেই ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হইয়া থাকে। বোদ্যাঁ (Bodin) বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র সকলের

---

* "যে প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নির্ধারিত ও কার্যে পরিণত হয় তাহাকেই সরকার বলা হয়"—উইলোবি ও রজার্স।

"সরকার মানুষের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য মানুষেরই উদ্ভাবিত একটি ব্যবস্থা বা যন্ত্রবিশেষ"—বার্ক।

উপর আদেশ জারি করে এবং কাহারও হুকুম তামিল করে না বলিয়াই ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এই দুই ব্যাপারেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষে এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার অপরিহার্য; অন্যথায় ইহার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। একদল লোক যদি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং তাহাদের যদি একটি নিজস্ব সরকার থাকে তথাপি তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্র হইবে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন। অর্থাৎ ইহা বহির্বিষয়ক সার্বভৌম ক্ষমতারও অধিকারী হইবে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান থাকিবে।

সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের ব্যাপারে* রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত ক্ষমতা বা সর্বময় কর্তৃত্বকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হইয়া থাকে। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারেই রাষ্ট্রের নিজ সত্তা বা প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আইনগত ও রাজনীতিগত সার্বভৌমত্ব†—আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মধ্যে যাহার হাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্বাধিকার থাকিবে অর্থাৎ যিনি আইনতঃ রাষ্ট্রের আদেশ দিবার অধিকারী হইবেন, তিনি আইনতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আদালত শুধু এই সার্বভৌমত্বকেই স্বীকার করে। বৃটেনের বিধান অনুসারে

---

* কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আর কি বৈদেশিক ব্যাপারে—এই উভয় ব্যাপারেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে। আইনতঃ এই ক্ষমতা সীমাহীন। কিন্তু কার্যতঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জনসাধারণের মতানুসারে রাষ্ট্র এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে। সভ্য এবং উন্নত রাষ্ট্রে কদাচিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়। নিছক দমননীতির সাহায্যে লোককে কাজ করিতে বাধ্য করান যায় না। অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের আদেশসমূহ পালন করিয়া থাকে বলিয়াই আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ টিকিয়া আছে। বলপ্রয়োগের যুগ অতীত হইয়াছে। জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য স্বীকারই রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। রাষ্ট্রকে প্রজাগণের নীতিবোধ অনুসারে আপন কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হয়। বহির্ব্যাপারেও রাষ্ট্রের আপন ইচ্ছামত কার্য করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে চীনে জাপানের কার্যকলাপের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিবোধ অনুসারে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস বা ভ্রান্ত পথ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা পররাজ্যলিপ্সু ক্ষমতাগর্বী রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ হইতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করিতে পারে নাই। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ এই ব্যাপারে কতদূর সাফল্য লাভ করিবে তাহাও বিচারসাপেক্ষ।

† অনেক সময় আইনগত ও রাজনীতিগত সার্বভৌমত্বের (legal and political sovereignty) মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

সপার্লামেণ্ট রাজা এই আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইন অনুসারে একমাত্র রাজাই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতে পারেন।

এই আইনগত সার্বভৌমত্বের পশ্চাতে রহিয়াছে রাজনীতিগত সার্বভৌম ক্ষমতা—প্রকৃতপক্ষে ইহাই আসল সার্বভৌম ক্ষমতা। ইহার নির্দেশানুসারে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয়। "রাষ্ট্রের জনগণ যে শক্তির নির্দেশকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করে সেই শক্তিকেই রাজনীতিগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়"—ডাইসি (Dicey)। বৃটেনে সপার্লামেণ্ট রাজা আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও বৃটিশ নির্বাচকমণ্ডলীই বা বৃটিশ নাগরিকরাই রাজনীতিগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কেননা রাজা এবং পার্লামেণ্টকে সমস্ত ভোটদাতার তথা সমস্ত অধিবাসীর কথা ও ইচ্ছা মানিয়া চলিতে হয়। রাজা পার্লামেণ্টের শাসন মানিয়া লইয়াছেন—পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচন করেন বৃটিশ নির্বাচকমণ্ডলী।

Popular Sovereignty

সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব—রাজনীতিগত সার্বভৌম ক্ষমতার পরিণতি হইল সার্বজনীন সার্বভৌম ক্ষমতা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেনের নির্বাচক-মণ্ডলী তথাকার রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বৃটেনের প্রায় সমস্ত অধিবাসীকে লইয়াই এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত। সুতরাং বৃটেনের জন-সাধারণই রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতা বা চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ফরাসী দার্শনিক রুশো ঘোষণা করেন যে, জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

রুশোর এই আহ্বান ফরাসী ও মার্কিনবাসীদের মধ্যে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিল। সার্বজনীন সার্বভৌমশক্তি বা জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা সংগ্রাম সুরু করিল। পৃথিবীর ইতিহাসে দুইটি যুগান্তকারী বিপ্লবের পর উভয় দেশেই বিরাট পরিবর্তনের ফলে বর্তমান শতাব্দীর দুইটি বৃহত্তম সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সার্বজনীন সার্বভৌমশক্তিই বর্তমান রাষ্ট্রের **প্রাণবিশেষ**। "ইহাই গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র।"—ব্রাইস

সুতরাং রাষ্ট্র বলিতে (১) জনসংখ্যা, (২) নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড, (৩) শাসন-পরিচালন যন্ত্র বা সরকার এবং (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা—এই চারিটি উপাদানের সমবায় বুঝাইবে। উড্রো উইলসন অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—তাহার মধ্যে উপরোক্ত চারিটি উপাদানেরই উল্লেখ

রহিয়াছেঃ—**"একটি নির্দিষ্ট সীমাবন্ধ ভূখণ্ডের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত জনসমাজকে রাষ্ট্র বলা হইয়া থাকে।"**

State and Government

রাষ্ট্র এবং সরকার—সাধারণতঃ আমরা রাষ্ট্র ও সরকার এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্র এবং সরকার একই জিনিষ নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে যত্ন-পূর্বক রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করিতে হইবে। রাষ্ট্র বলিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবন্ধ এবং সচেতন জনসমাজ বুঝাইয়া থাকে; পক্ষান্তরে সরকার হইল এই রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের অভিব্যক্তি মাত্র। সরকার একটি যন্ত্রবিশেষ—ইহার মধ্য দিয়া রাষ্ট্র আপন উদ্দেশ্য কার্যকরী করিয়া থাকে। গার্নারের ভাষায় বলা যাইতে পারে—"সরকার বলিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠান বুঝায়। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের অভিপ্রায় নির্ণীত, অভিব্যক্ত এবং কার্যকরী হইয়া উঠে।" সরকার রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশ, কিন্তু ইহাই রাষ্ট্র নহে। কোনও প্রাণীর সহিত তাহার মস্তিষ্কের যে সম্বন্ধ বা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার পরিচালকবর্গের যে সম্বন্ধ রাষ্ট্রের সহিত সরকারের সম্বন্ধ তদনুরূপ। সরকারের সহিত রাষ্ট্রকে এক করিয়া দেখিলে ভুল করা হইবে—রাষ্ট্র অধিকতর ব্যাপক।

Points of distinction between state and government

রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য—(১) দেশের সমস্ত অধিবাসীই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এই জনসংখ্যার একাংশ লইয়াই সরকার গঠিত হইয়া থাকে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ব্যক্তি দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরকার গঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থ অতি ব্যাপক; রাষ্ট্র বলিতে কেবলমাত্র শাসকবর্গই নয়, ইহার অধীনস্থ সকল নাগরিকের (শাসক ও শাসিত উভয়ের) সমষ্টি—এক অতি বৃহৎ জনসমষ্টি বুঝায়।*

---

* যে সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া সরকার গঠিত হয় অন্যান্য লোকজনের মত তাহাদের ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু দুর্নীতিপরায়ণ, অজ্ঞ, অক্ষম ব্যক্তিগণ সরকার করায়ত্ত করিতে পারেন; এইরূপ সরকার যাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারে তজ্জন্য সরকারের ক্ষমতা সীমাবন্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন। অভিজ্ঞতার

(২) সরকার অল্পস্থায়ী—নিয়তই ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে; কিন্তু রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।*

আজ একদল সরকার গঠন করিতেছে, কিছুদিন বাদে আবার এক নূতন দল আসিয়া সরকার গঠন করিতেছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। সরকারের গঠন ও প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যেও রাষ্ট্র সর্বদা স্থির রহিয়াছে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে যেরূপ ঘটিয়াছিল); এক রাজবংশ উচ্ছেদ হইলে তৎপরিবর্তে অপর রাজবংশ সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারে (যেমন আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব রাজা আমানুল্লা পরলোকগত রাজা নাদির খাঁ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন); কিন্তু রাষ্ট্র সর্বসময় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

সরকারের রূপ পরিবর্তনে রাষ্ট্রের কোনও রূপান্তর বা অংগহানি হইতে পারে না—রাষ্ট্র একটি অপরিবর্তনশীল সত্তা।

(৩) সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের নানা প্রকার অভাব-অভিযোগ থাকিতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এইরূপ কোন অভিযোগ করিবার অধিকার তাহার নাই।

রাষ্ট্রই সর্বপ্রকার অধিকারের মূলে উৎস। ইহা যেমন সরকারকে শাসনক্ষমতার অধিকার দিয়াছে তেমনই আবার নাগরিকেরাও নানা অধিকার রাষ্ট্রের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছে। সরকার যদি এই সকল অধিকার হইতে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে অথবা তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে (যথা. সরকার যদি বেআইনীভাবে কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করে অথবা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে) তাহা হইলে আইনানুযায়ী ঐ ব্যক্তি সরকারী অনাচারের প্রতিকার করিয়া আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

কিন্তু কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট কোনও অধিকার দাবী করিতে পারে না। কেননা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করা অর্থ নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রাষ্ট্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যক্তির যে অধিকার রহিয়াছে তাহা নিছক নৈতিক অধিকার; ইহার কোন আইনগত মর্যাদা নাই।

ফলে দেখা গিয়াছে যে, কতকগুলি রক্ষাকবচের (safeguards) ব্যবস্থা করিলে এই সরকারী ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

* বর্তমানে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্যের সার্থকতা এই যে সরকার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনে অকৃতকার্য হইলে বা অক্ষমতা প্রদর্শন করিলে যথাযথভাবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমান সরকারের পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে এক সরকার গঠন করা যাইতে পারে।

(৪) রাষ্ট্র মূলতঃ একটি বস্তু-নিরপেক্ষ ধারণা* বিশেষ (abstraction), কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ সাকার ও একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর গ্রেট বৃটেন (Great Britain) জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় রাষ্ট্রের যথাক্রমে চেম্বারলেন ও হিটলার পরিচালিত দুইটি সরকার এই সংগ্রামের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনই কোন কার্যে লিপ্ত হইতে পারে না; ইহার কোন সুস্পষ্ট রূপ নাই, অথচ ইহা সর্বদা বিরাজমান। ইহার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ গভর্নমেণ্ট বা সরকার। সরকারই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা ও তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

জনগণ, জাতি এবং রাষ্ট্র (people, nation and state)—এইবার রাষ্ট্রের সহিত জনগণ ও জাতির প্রভেদ নির্ণয় করিতে হইবে। রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক ধারণার মূর্ত রূপ। ইহা মূলতঃ রাজনৈতিক ঐক্যবোধে সংহত একদল মানুষের একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু জনগণ বা জাতির মধ্যে এই ঐক্যবোধ আরও গভীর।

আপাতত আমরা জনসমাজ ও জাতির† মধ্যে প্রভেদ সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত রাখিলাম। ইংরাজীতে বর্তমানে এই দুইটি শব্দ নিম্নোক্তরূপে ব্যবহৃত

---

* রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত একদল মানুষের একটি প্রতিষ্ঠান। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা ইংরেজ ও মার্কিনদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র বলিতে গ্রেট বৃটেনের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করিয়া থাকি।

সমগ্রভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র আইনবিদ্ বা দার্শনিকদের কল্পনাপ্রসূত একটি ধারণা বা মতবাদ মাত্র।

আইনজ্ঞগণ রাষ্ট্রকে একটি ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। অবশ্য এই ব্যক্তিত্ব একটি অলীক এবং আরোপিত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র একটি জীবন্ত ব্যক্তি নহে। রাষ্ট্রকে অবাধ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রকে নানা ক্ষমতার অধিকারী করিবার জন্য, এক রাষ্ট্র যে অন্য রাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে উচ্চনীচ ভেদাভেদ অর্থাৎ একের কর্তৃত্ব ও অন্যের অধীনতা, শাসনক্ষমতার অধিকারী সরকার এবং শাসিত জনগণ প্রভৃতি নানাবিধ আইনগত ধারণা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জনাই রাষ্ট্রের এই ব্যক্তিত্ব রূপ দেওয়া হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক আইনবিদ্‌গণ রাষ্ট্রের এইপ্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন—ইহা একটি নিছক বস্তু-নিরপেক্ষ কাল্পনিক ব্যাপার।

† রাজনৈতিক পরিভাষায় 'জাতি' ও 'জনসমাজ' (people) —এই শব্দ দুইটি ব্যবহারের সময় বিশেষ পার্থক্য করা হয় না।

হয়ঃ—**জনসমাজ** (people) **বলিতে** একটি জাতি বা কুল (race) বা বৃহত্তর মানবজাতির একটি অংশ বুঝায়। কিন্তু শুধু জনসমষ্টি লইয়া জাতি গঠিত হয় না—তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং একটি রাষ্ট্রীয় সংঘ থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু জাতির সহিত রাষ্ট্রের* প্রভেদ দেখাইবার সময় আমরা জাতির এই রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিব না। যে সমস্ত বিষয় ও ভাবধারা কোন জনসমষ্টিকে নিবিড় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একজাতিতে পরিণত করিয়াছে অর্থাৎ **জাতীয়তাবোধই যে জাতির মূলভিত্তি** সেই সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

Nation

জাতি†—আদর্শ জাতির সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়—**"আদর্শ জাতি বলিতে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র, স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ মানবসমাজের একটি বিশেষ অংশ বুঝাইবে। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীরা একই ভাষাভাষী এবং একই বংশ হইতে উদ্ভূত। তাহারা একই সভ্যতার ধারক ও বাহক; তাহাদের আচারব্যবহার, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-সমূহও অভিন্ন।"**

মধ্যযুগে একই ধর্মমত জাতিগঠনে সাহায্য করিয়াছে। এইজন্য ধর্মমতকে পূর্বে জাতিগঠনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও পরধর্মমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য জাতিগঠনের ব্যাপ্যারে ধর্মবিশ্বাসের উপর এক্ষণে আর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

Nation—its tests

জাতির স্বরূপ বিচার—প্রকৃতপক্ষে জাতির যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে সচরাচর কোন জাতির মধ্যে একসঙ্গে ঐগুলি দেখা যায় না। জাতির

---

* স্কটল্যান্ড একটি জাতির দেশ—রাষ্ট্র নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র—জাতি নহে। বৃটিশ কমনওয়েলথও তদনুরূপ একটি রাষ্ট্র।

"সুনির্দিষ্টরূপে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য। জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ আরও দুষ্কর। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা সহজে অনুমেয়।"
Nationality and Government.—জিমার্ন।

† জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ও স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী জনসমষ্টি ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি রাজনৈতিক সংঘ গড়িয়া তুলিলে তাহাকে জাতি বলা হয়।—ব্রাইস।

বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে রাজনীতিজ্ঞ ও মনীষীদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। জনৈক সুধী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে "জনসমষ্টির সমজাতীয়তা" (community of race) অর্থাৎ একই বংশ হইতে উদ্ভূত এই উপাদান জাতিত্ব বিচারে শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি (standard) বা মানদণ্ড। কাহারও কাহারও মতে সভ্যতাগত ঐক্য ও সাদৃশ্যই (community of civilisation) জাতিত্ব নির্ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু ইতিহাসের ধারার সঙ্গে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টির মধ্যে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার উপর ইঁহারা তেমন গুরুত্ব দেন নাই। রাশিয়া, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি জাতির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সমজাতীয়তা অর্থাৎ জনসমষ্টির উৎপত্তিগত সাদৃশ্য, এমন কি ভাষার ঐক্য না থাকিলেও জাতিগঠন সম্ভবপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপরিউল্লিখিত সব কয়টি উপাদানের সমন্বয় একান্ত দুর্লভ। কিন্তু একই সময়ে সব কয়টি উপাদান না থাকিলেও জাতীয় মনোভাব সহজেই সৃষ্টি হইতে পারে, কেননা জাতিগঠনের পক্ষে উপরোক্ত কোন একটি উপাদানই একান্ত অপরিহার্য নহে, কয়েকটি উপাদান থাকিলেই যথেষ্ট। ধর্মমতের পার্থক্য অথবা জনসমষ্টির মধ্যে উৎপত্তিগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও শুধু রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক স্বার্থের ঐক্য থাকায় বহু জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কোন মানবসমাজ (people) যখন উপলব্ধি করে যে তাহারা একটি জাতি অর্থাৎ যখন তাহাদের জাতীয়তাবোধ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে তখনই তাহারা জাতিতে পরিণত হয়। জার্মান চিন্তানায়ক স্পেঙ্গলার (Spengler) বলিয়াছেন--"অধিবাসীদের ভাষাগত, রাজনীতিগত এমন কি জৈবধর্মসম্পর্কিত (biological) ঐক্যই বিভিন্ন জাতির ভিত্তি নহে। তাহাদের মানসিক মিলন বা আধ্যাত্মিক শক্তির (spiritual entities) বিকাশের ফলেই জাতির উদ্ভব হইয়াছে।" উপরোক্ত উপাদানসমূহ অধিবাসীদের মধ্যে প্রবল জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে—তাহাদের স্বদেশানুরাগ এবং দেশের অতীত গৌরব সম্পর্কে গর্ববোধ জাগ্রত ও বর্ধিত করে। রেনাঁ (Renan) বলিয়াছেন, "একই ভাষাভাষী বা একই বংশ হইতে উদ্ভূত হইলেই জাতি গড়িয়া উঠে না। সমবেত প্রচেষ্টায় অতীতে যাহারা মহান কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যাহারা অনুরূপভাবে মহত্তর কীর্তি সম্পাদনের জন্য আগ্রহান্বিত তাহারাই যথার্থ জাতি গঠন করিয়াছে বলিতে হইবে।" কালক্রমে একই প্রকার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত

হইবে, তখনই এই ঐক্যবোধ বদ্ধমূল হইবে। এই ভাবেই জাতির বিশেষ ঐতিহ্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ গড়িয়া উঠিবে।

Is India a nation?

ভারতীয়গণ কি এক জাতি?—একদল পাশ্চাত্য সমালোচক ভারতীয়গণকে এক জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহুজাতির সমষ্টি। এই বাহ্যিক পার্থক্য ও বিভেদের অন্তরালে ভারতীয়গণের মধ্যে মূলগত যে নিবিড় ঐক্য বর্তমান রহিয়াছে তাহা এই সব লেখকেরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই ঐক্যই ভারতীয়গণকে এক নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একই ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে।

এই সব অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারতীয়গণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইয়াছে। তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত ভারতবাসীই আজ উপলব্ধি করে তাহারা এক জাতি। সাম্প্রদায়িক কলহ, মুসলিম লীগের দুই-জাতি তত্ত্ব এবং পরিশেষে ভারত-বিভাগের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি ভারত-বাসিগণকে এক জাতি বলিতে কাহারও কুণ্ঠা থাকা উচিত নহে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের একই রাজনৈতিক আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয়গণ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমাজচেতনা বর্তমান; ভারতীয়গণ একই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক এবং বাহক—রাজনীতিক্ষেত্রে একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। অতীতে সংস্কৃত ও পারসী ভাষার মাধ্যমে এবং বর্তমানে ইংরাজী এবং হিন্দুস্থানী ভাষার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাববিনিময় চলিতেছে; হিন্দু, মুসলমান এবং বৃটিশ আমলে প্রায় একই প্রকার আইনকানুন প্রবর্তিত হইয়াছে: ফলে সুদূর অতীতে মহাভারতের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অধিবাসীদের মধ্যে এক সর্বভারতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। ইউরোপীয় দেশগুলির মত এই জাতীয়তাবোধ এখনও সুতীব্র হইয়া উঠে নাই, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইবে—ক্রমশঃ ভারতীয়গণ এক সুগভীর জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জাতিগঠনের জন্য জাতির সমস্ত উপাদান না থাকিলেও চলিবে; কয়েকটি উপাদানই যথেষ্ট হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও ধর্মমতের পার্থক্যের উপর অনেকে গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু বৃহৎ জাতিগঠনে ধর্মের ব্যবধান বেশী দিন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই আপাত-বিরোধ সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে ক্রমশঃ সংহতি গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ একটি বিরাট ও বর্ধিষ্ণু জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক আদর্শই প্রধানতঃ ভারবাসীদের মধ্যে এই ঐক্যবন্ধনে সাহায্য করিয়াছে। জাতিগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নৈতিক শক্তি ভারতবর্ষে এক্ষণে বিকশিত হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত। অতি শীঘ্রই ইহা স্বাধীন, সার্বভৌম, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে জগতে আপন মর্যাদা ঘোষণা করিবে। এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধের জন্য জাতি হিসাবে ভারতের মর্যাদা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে (U. N. O.) ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে—ইহার মর্যাদা বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু এই বিভাগ আন্তরিক নহে। তৃতীয় পক্ষের চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়াই ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে এই দেশ-বিভাগ পরিকল্পনা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ভারতবাসিগণের মধ্যে বহুযুগের অচ্ছেদ্য বন্ধন এইভাবে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সম্ভবতঃ হিন্দু, মুসলমান কোন পক্ষই সুখী হইতে পারে নাই।

জাতীয়তাবোধ (nationality) —দার্শনিকপ্রবর জিমার্ন বলিয়াছেন, "জাতীয়তা একরূপ সমষ্টিগত চেতনা। নিবিড় যোগাযোগের ফলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নিজ দেশের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত হয় তাহাই জাতীয়তার ভিত্তি।"

জাতীয়তাবোধের মূলে রহিয়াছে একটি সুমহান্ ভাব। যে আধ্যাত্মিক শক্তি বা ভাবধারা জনগণের মধ্যে নিবিড় ঐক্যের বন্ধন রচনা করে তাহা জাতীয়তাবোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিভিন্ন অবস্থার সমবায়ে ইহার উৎপত্তি হয়। একই বংশ হইতে উদ্ভূত, একই ভাষাভাষী ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, একই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক আদর্শগত সাদৃশ্য থাকিলে, তাহাদের ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থসমূহ অনুরূপ হইলে এবং তাহাদের ধর্মগত ঐক্য থাকিলে যে ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে তাহাই জাতীয়তাবোধ।

জাতি ও জাতীয়তা*—ইতিপূর্বে 'জাতি' ও 'জাতীয়তা' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। এখন অনেক বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করা হইতেছে।

অধুনা জাতি বলিতে প্রধানতঃ একটি রাজনৈতিক সংহতিকেই বুঝাইয়া থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী হইতে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টিকেই জাতি বলা হয়। পক্ষান্তরে জাতীয়তা বলিতে রাজনৈতিক বন্ধন ছাড়া উৎপত্তি, ভাষা, ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং স্বার্থসংক্রান্ত সাদৃশ্য বিশিষ্ট এক জনসমষ্টি বুঝাইয়া থাকে।

উপরন্তু জাতি বলিতে আমরা মানবসমাজের একটি নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট অংশ বুঝিয়া থাকি; কিন্তু জাতীয়তা মূলতঃ একটি আধ্যাত্মিক বা মানসিক ধারণা—ইহাই জাতিত্বের সারাংশ।

---

* রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ জাতিকে কেবলমাত্র কোনও একটি নৃ-গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত মানবসমাজের একটি অংশরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'জাতি' (nation) এবং শাখাজাতির (nationality) মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য। কেননা এই অবস্থায় তাহাদের পার্থক্য গুণাত্মক না হইয়া সংখ্যাত্মক হইয়া থাকে।

এইজন্য গার্নার বলিয়াছেন—"**সাধারণতঃ জনসংখ্যার এক বৃহত্তর অংশ যদি একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং একই ভাষাভাষী হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি বর্ণগত অর্থাৎ উৎপত্তিগত সাদৃশ্য থাকে তাহব হইলে তাহারা এক জাতি বলিয়া অভিহিত হইবে; পক্ষান্তরে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত একই বর্ণসম্ভূত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টি শাখা-জাতি** (nationality) **বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রাষ্ট্রের মোট জনসমষ্টির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি অংশকে লইয়া এই শাখাজাতির সৃষ্টি।**"

এই অর্থে মারাঠাদিগকে একটি শাখা জাতি বলা যাইতে পারে। অনুরূপ কারণে বাঙ্গালীরা একটি শাখাজাতি। ভারতীয়গণ একটি জাতি। ইংরেজ, স্কচ ও ওয়েলশ—এই তিনটি শাখা জাতিকে লইয়াই বৃটিশ জাতির সৃষ্টি। এইভাবে কয়েকটি শাখা জাতি মিলিয়া একটি জাতি গঠন করিতে পারে। ইহুদীরা একটি জাতি। তাহাদের নিজস্ব জাতীয়তাবোধ আছে। নিজ রাষ্ট্র ইস্রাইলে আজ বিশ্বের দরবারে ইহুদীদের জাতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এতদিন তাহারা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছিল। আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইহুদীরা মার্কিন নাগরিক, জার্মানীতে তাহারা জার্মান নাগরিক; এইভাবে ইংরেজ ইহুদী, রুশ ইহুদী, ভারতীয় ইহুদী অধিবাসীর উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা অন্যান্য জাতির অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছে। ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের অভাবে একটি স্বতন্ত্র ইহুদী জাতি এতদিন গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মানবসমাজের কোনও একটি অংশ যদি (ক) জাতীয়চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয় এবং (খ) রাজনৈতিক সংঘ বা রাষ্ট্র গঠন করে বা রাষ্ট্রগঠনের আগ্রহ ও যোগ্যতা প্রদর্শন করে তাহা হইলেই জাতির সৃষ্টি হয়।

One nation—one state

জাতীয়তা নীতি—এক জাতি, এক রাষ্ট্র (the principle of nationality) জাতীয়তাবোধই* আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। এক জাতি, এক রাষ্ট্র—এই নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলির সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জাতিই একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবে—একটি মাত্র জাতিকে লইয়াই একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে ইহাই সমীচীন। একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি বাস করিবে অথবা একই জাতির লোকজন বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাস করিবে ইহা বর্তমানে অনেকেরই অভিপ্রেত নহে।

জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলি পুনর্গঠন এবং তাহাদের সীমা পুনর্নির্ধারণের দাবী ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলি দুর্বল শাখাজাতিসমূহকে এযাবৎ শোষণ করিয়াছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের উপর এইভাবে যে অবিচার চলিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্যই আজ সর্বত্র এই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উত্থিত হইতেছে। এই মতবাদের সমর্থকগণ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন।

এই নীতিই যুগযুগব্যাপী পরাধীন জাতিগুলিকে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রেরণা দিয়াছে—বিদ্রোহবহ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। এই ক্ষোভের মূলে রহিয়াছে প্রেসিডেন্ট উইলসনের বহু-বিঘোষিত জাতিসমূহের "আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার নীতি"† (self-determination of nations)। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও (১৯৩২-৪৫) বিশেষভাবে এই নীতির পোষকতা করিয়াছিলেন। এই অধিকার স্বীকৃত না হইলে গণতন্ত্র যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি এবং বিশ্বব্যাপী শান্তিও সম্ভবপর হইবে না।

---

* এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জাতীয়তা বলিতে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক নীতি বা ভাবধারাকে বুঝাইবে, কিন্তু জাতীয়তাবোধই জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে। তাহাদের এই স্বাধীনতাস্পৃহা ও উদ্দাম কার্যক্ষেত্রে যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহাই জাতীয়তাবাদ।

† "প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ অভাব দূর করিবার জন্য ইচ্ছামত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। ইহাই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার।"—প্রেসিডেন্ট উইলসন।

বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্র—এক জাতি, এক রাষ্ট্র (mono-national state)—বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। অনেক সময় একজাতির লোকজন প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে না। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ইহুদীগণ এই ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য কোন রাজনৈতিক সংঘ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে পারে নাই (সম্প্রতি প্যালেস্টাইনে 'ইস্রাইল' নামে তাহাদের একটি রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে)। প্রত্যেক জাতির জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের এই নীতিকে কার্যকরী করিতে হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হইলে আন্তর্জাতিক সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিবে, অধিকন্তু বিভিন্ন জাতিগুলি আবার এমনভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া মিশিয়া আছে যে, তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করা অনেক স্থলে অসম্ভব।

শাখাজাতির ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রগঠন সমীচীন কি না?—জিমার্ন (Zimmern) শাখাজাতির (nationality) রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন—"ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রভৃতি মানবতার সুমহান্ আদর্শ ও সার্বজনীন নীতির উপরেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শাখাজাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইলে এই নীতিকে অস্বীকার করা এবং একদেশদর্শিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করা হইবে—রাষ্ট্রগঠন একটি আকস্মিক ব্যাপারে (accidental) পরিণত হইবে।" এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শকে অনুসরণ করিলে কেবলমাত্র এক জাতির লোকজনকে লইয়া আধুনিক রাষ্ট্রগুলি গঠিত হওয়ায় বর্তমানে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা যাইতেছে।

এইজন্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (U. N. O.) ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংঘ (Communist International) প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহা বিশ্বরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্রের (one world) পূর্বাভাস এরূপ মনে করা অসংগত হইবে না। সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি নানা জাতির সমবায়ে গঠিত মিশ্র রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক সংঘ হিসাবে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছে। এইজন্য এক জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে। সুতরাং এই নীতি আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে সন্তোষজনক ভিত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব

স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়?—স্বাধীনতার ইংরাজী প্রতিশব্দ (liberty) ল্যাটিন (Liber) মুক্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত। শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা বলিতে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা বুঝায়; যে ব্যক্তি নিজের খুশীমত যাহা ইচ্ছা করিতে পারে এবং যাহার কার্যকলাপে কেহ কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না, সেই স্বাধীন।

সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলিতে আমরা বন্ধনমুক্ত অবস্থাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু স্বাধীনতা শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র নৈতিবাচক ধারণা সূচিত হয় না। বাহিরের কোন শক্তি যদি বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বাধীনতায় আত্মবিকাশের সুযোগ হয়। বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ মতামত অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনযাত্রা প্রণালী নির্ধারণের ক্ষমতাও আসে।

কোনরূপ বাধানিষেধ না থাকিলেই মানুষ সুখী হইবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুতঃ বহুক্ষেত্রেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এই সমস্ত বাধানিষেধ ও নিয়মকানুনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। কোন বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা থাকার অর্থ এই যে তাহার সে সম্পর্কে অবাধে কাজ করিবার অধিকার আছে। তোমার গতিবিধির স্বাধীনতা যদি থাকে তাহা হইলে তুমি অবাধে যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত করিতে পার; এই অবস্থায় কেহই তোমার গতিবিধির উপর কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে না। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনতা অর্থে সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থা বুঝাইলেও এই স্বাধীনতা কখনই নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। প্রত্যেকেই যদি যাহার যাহার খুশীমত মারামারি কাটাকাটি করিতে থাকে তাহা হইলে স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না। যেমন, কাহারও যদি যাতায়াত সম্পর্কে নিরঙ্কুশ অধিকার থাকে তাহা হইলে তাহার প্রতিবেশীর অবাধে ও স্বচ্ছন্দে নিজগৃহে বাসের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা সে ক্ষেত্রে সে দিবাভাগে বা রাত্রিতে যে কোন সময় তাহার প্রতিবেশীর বাসভবনে

প্রবেশ করিয়া শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে। সুতরাং স্বাধীনতার সহিত বাধাবন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার পার্থক্য বিচার করিতে হইবে। এইজন্য স্বাধীনতাকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) অলীক স্বাধীনতা (false liberty)—যে কোন ব্যক্তির যাহা খুশী করিবার অধিকার; (২) প্রকৃত স্বাধীনতা (true liberty)—মানুষের যথাবিধি ও নীতিসম্মত কর্তব্যাদি পালনের অবাধ অধিকার। শেষোক্তরূপ স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; অপরটি প্রকৃতপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র।

সমাজে বাস করিতে হইলে আমাদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। পরস্পর একত্রে বাস করিতে হইলে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য একই প্রকার নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে। তোমার কাহাকেও হত্যা করিবার অধিকার নাই—ইহার অর্থ এই নয় যে, তোমার স্বাধীনতা খর্ব করা হইল। সর্বসাধারণের কল্যাণকল্পে আইনানুযায়ী তোমাকে যদি তোমার পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলেও তুমি নিশ্চয়ই মনে করিবে না যে তোমার স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতা বলিতে কেবলমাত্র একটি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থাই বুঝায় না, ইহার একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবরূপও আছে। অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন—"যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইবে, সর্বপ্রযত্নে সেই পরিবেশকে রক্ষা করিয়া চলাই স্বাধীনতা*"। অতএব স্বাধীনতা বলিতে মানুষের সেই সকল অধিকাব ও সুযোগ বুঝায় যাহার সাহায্যে তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা

(১) **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (natural liberty)—সভ্যসমাজের সৃষ্টির পূর্বে যখন সমাজ বলিয়া কিছুই ছিল না, সেই সময় অর্থাৎ প্রকৃতি-রাষ্ট্রে মানুষ যে স্বাধীনতা উপভোগ করিত তাহাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমাজে মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং এই স্বাধীনতা অবাধ ছিল এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু

* "স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্রের শাসকগণকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য না করিতে পারিলে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই বুঝিতে হইবে।" এইজন্যই প্রাচীন গ্রীক মনীষী পেরিক্লিস্ বলিয়াছেন—"সাহসই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র" (The secret of liberty is courage)।

কার্যতঃ প্রকৃতি-রাষ্ট্রের লোকজন যে স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহাকে আদৌ স্বাধীনতা বলা যায় না। কেননা এই রাষ্ট্রে মানুষের যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার ছিল। এই অবস্থায় শুধু দুর্বলের উপর প্রবলের শাসন ও অত্যাচার চলিত; স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না; শক্তিশালী ব্যক্তিরা অনুগ্রহ করিয়া দুর্বলকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করিত, দুর্বল লোকজন মাত্র ততটুকু স্বাধীনতাই ভোগ করিত। ইহা সম্পূর্ণভাবে অরাজক অবস্থা এবং অরাজকতার সময় প্রকৃত স্বাধীনতা কখনই থাকিতে পারে না।

(২) **ব্যক্তিস্বাধীনতা** (civil liberty)—ল্যাটিন Civis শব্দের অর্থ নাগরিক। এই শব্দ থেকেই ইংরাজী civil শব্দটির উৎপত্তি। রাষ্ট্রে বা সভ্য সমাজে কোনও ব্যক্তি যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাই ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মত পোষণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কার্য-কলাপ ও গতিবিধির স্বাধীনতা এবং আইনের চক্ষে সকলের সমানাধিকার—প্রধানতঃ এই কয়েকটি অধিকারকেই ব্যক্তিস্বাধীনতা বলা হয়। রুশো বলিয়াছেন যে, 'প্রকৃতি-রাষ্ট্রে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার যে অবাধ অধিকার ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত সমাজে মানুষকে তাহা হারাইতে হয়; কিন্তু এই সমাজে তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়; ইহাই তাহার লাভ। আইনের* সাহায্যে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করে এবং 'জোর

---

* **আইন কি?**—আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত রাষ্ট্রানুমোদিত নিয়মকানুনকেই আইন বলা হয়। প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র বল প্রয়োগ করিয়া আইন মানিতে বাধ্য করে। ইহাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ বলা যাইতে পারে এবং সর্বসাধারণের স্বার্থের খাতিরে সমাজের সকল লোককে এই আদেশসমূহ পালন করিতে হয়।

আইনের উৎস—রাষ্ট্রই সর্বপ্রকার স্বাধীনতার আধারস্বরূপ এবং রাষ্ট্রে প্রচলিত আইনকানুনের সাহায্যেই আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। এইজন্য আইনকে ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ (safeguard) স্বরূপ বলা যাইতে পারে। যদি কোন আইন বা রাষ্ট্র না থাকিত তাহা হইলে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা শ্রেণী এই স্বাধীনতা ভোগ করিত। অপরাপর সকলকে তাহাদের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় বসবাস করিতে হইত। প্রাচীন সমাজে মানুষ সাধারণতঃ আইনের ধার ধারিত না। বর্তমান যুগেও আইনের প্রভাবমুক্ত আদিম জাতির সমাজে সমাজপতিরা প্রজাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। এই অবস্থায় আদিম সমাজের প্রধান ব্যক্তিকেই (সমাজপতি) একমাত্র স্বাধীন বলা যায়; অন্যান্য সকলে কার্যতঃ তাহার ক্রীতদাস। "কারখানা-আইন" প্রণয়নের পূর্বে মালিকেরাও এইরূপ 'স্বাধীন' ছিল। কোন কোন দেশে মালিকেরা সামান্যতম মজুরীর বিনিময়ে নারী ও শিশুদিগকে অবিরাম ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করাইত।

৪

যার মুল্লুক তার' এই অবস্থার পরিবর্তে নিজেকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। গতিবিধির স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনানুযায়ী প্রদত্ত অধিকারসমূহই ব্যক্তিস্বাধীনতা। সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি তাহার এই

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেকেই যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে (কেবলমাত্র অনুগৃহীত ও শক্তিশালী মুষ্টিমেয় লোকজন এই স্বাধীনতার অধিকারী না হইতে পারে) তজ্জন্য আইনের সাহায্যে স্বাধীনতার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রই হইবে এই স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ। সমাজের সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতার পক্ষে ইহা অপরিহার্য।

মানুষই আইন প্রণয়ন করে। এইজন্য আমাদের প্রণীত এই আইনের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা খুবই সম্ভব। অন্যের ক্ষতি করিয়া সমাজের শ্রেণীবিশেষের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ আইনের অভাব নাই। এইরূপ শ্রেণীস্বার্থান্বেষী আইনের দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

প্রকৃত স্বাধীনতার দ্বারা সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদার দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচক্ষণতার সহিত আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

"কোন দেশের স্বাধীনতার পরিমাপ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ঐ দেশের আইনকানুন নাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী বিকাশের পথে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে।"

আইনের বিভিন্ন উৎস (sources of law) :—

(ক) আইনসভায় প্রণীত আইনই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

(খ) মামলা-মোকদ্দমায় বিচারকের রায় বা সিদ্ধান্তসমূহ এবং নজির।

(গ) আইনের মর্যাদাপ্রাপ্ত রীতিনীতি ও প্রচলিত প্রথা।

(ঘ) ধর্মশাস্ত্র হইতে হিন্দু আইন উদ্ভূত এবং কোরাণের ভিত্তিতে মুসলিম আইন রচিত হইয়াছে।

(ঙ) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ন্যায় ও বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে বিচারকের সিদ্ধান্ত (equity)।

(চ) আইনসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

আইনের সহিত নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক কিরূপ?—রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্য হইল নিখুঁতভাবে নাগরিককে গড়িয়া তোলা। সুস্পষ্ট নৈতিক উদ্দেশ্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে রাষ্ট্র উৎকৃষ্ট এবং সুনীতিসম্মত আইন প্রণয়ন করে। এইজন্য পূর্বপ্রচলিত কোন আইন মন্দ বিবেচিত হইলে তাহা বাতিল করা হয়। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত নৈতিক জীবনযাপন সম্ভবপর নহে। সমাজের লোকজনের জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রকে নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের সহিত নীতিশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। প্লেটো বলিয়াছেন, "ব্যক্তির নৈতিক আদর্শের সহিত যে রাষ্ট্রের সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশী তাহাই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র।"

অধিকারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনের বিধান এই অধিকারসমূহ রক্ষা করে।

স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব—রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সহিত (authority of the state) ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনরূপ বিরোধ আছে কি? রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নানারূপ আদেশ জারি করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলিতে আমরা নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থা বুঝি। এইজন্য আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে সত্যই বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে।

অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব পাশাপাশি বিরাজ করিতে পারে; উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী নহে—উভয়রে মধ্যে অংগাংগি-সম্পর্ক বর্তমান।

রাষ্ট্র-উৎপত্তির পূর্বে ব্যক্তিস্বাধীনতা অনিশ্চিত ছিল, তখন পদে পদে ইহা বিপন্ন হইত। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে এবং মানুষের আচরণ সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই রাষ্ট্র এবং শাসনকর্তৃপক্ষেব উদ্ভব হইল।

ব্যক্তিস্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই, বরং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করাই রাষ্ট্রেব অন্যতম কর্তব্য। বস্তুতঃ রাষ্ট্র আছে বলিয়াই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভবপর হইয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা না থাকিলে প্রত্যেক নাগরিক নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত না। অরাজকতা নিবারণ করিয়া রাষ্ট্র সকলকে স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করিয়াছে। ফলে হয়ত কিছুসংখ্যক শক্তিশালী লোক প্রকৃতি-রাষ্ট্রের স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতার অধিকার লাভ করিয়াছে। নানারূপ বিধি-নিষেধ* আরোপ করিয়া রাষ্ট্র স্বাধীনতাকে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে। স্বেচ্ছাচার

---

* রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আইনানুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করিবেন তাহার প্রত্যেকটিই যে সমর্থনযোগ্য এমন নাও হইতে পারে। আপন স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারও সময়ে সময়ে জনসাধারণেব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কবিতে পারে। স্বাধীনতা রক্ষা কবিতে হইলে জনসাধাবণের সমর্থিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ জাবি কবিতে হইবে।

ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকাবে হস্তক্ষেপ করিলে বিক্ষোভ, এমন কি সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ হইবে শাসনকর্তৃপক্ষের এইরূপ ধারণা বা আশংকা থাকিলেই স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে। বস্তুতঃ, গণবিদ্রোহেব ভয়েই শাসনকর্তৃপক্ষ ক্ষমতাব অপব্যবহার করিতে সাহসী হয় না।—লাস্কি

করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা* খর্ব করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় না। প্রত্যেক নাগরিককে যথাসম্ভব ব্যাপক স্বাধীনতাভোগের সুযোগ দেওয়াই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রানুমোদিত আইনের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই আইনকানুন-অপরিহার্য (Law is the condition of liberty)। আইনের উপরেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে।

একমাত্র আইনানুযায়ী কার্য সম্পাদন করিয়া পরস্পরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া আমরা আমাদের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারি। আইনই স্বাধীনতার প্রকৃত অভিভাবক বা রক্ষক (Law is the real guardian of liberty)।

অনেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে পরস্পরবিরোধীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান না। কিন্তু একটু স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ এই নহে যে সে আপন ইচ্ছামত কাজ করিবে। তাহা হইলে তো অরাজকতার সৃষ্টি হইবে এবং স্বাধীনতা লোপ পাইবে। রাষ্ট্র এমনভাবে আইন প্রণয়ন করিবে যাহাতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মঙ্গলের জন্য যে সব কাজ করা উচিত সেই সব কাজ প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দে করিতে পারে—কেহ যেন কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যত নিখুঁত হইবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধ সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আদর্শ রাষ্ট্রে আইনকানুনসমূহ ত্রুটিহীন হইবে। এইরূপ রাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-প্রিয় নাগরিকদের কোন অভাব-অভিযোগ থাকিতে পারে না, উভয়ের মধ্যে সকল পার্থক্যের অবসান ঘটে এবং ব্যক্তি রাষ্ট্রের সহিত তাহার আদর্শকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আদৌ স্বাধীনতা হরণ করে না; ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বরং ব্যক্তি যাহাতে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে সেইমত ব্যবস্থা করিয়া

---

* রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা যদি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং কর্তৃপক্ষ যদি শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার সময় নাগরিকদের কঠোরভাবে উৎপীড়ন করে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ হয়ত অরাজকতাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিবে। কিন্তু সাধারণভাবে এরূপ মন্তব্য করা যাইতে পারে যে, সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা অপেক্ষা যে কোন রকম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণপ্রদ।—উইলোবি ও রজার্স

থাকেন। অতএব ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার উৎস সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলবৎ আছে বলিয়াই ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহার স্বাধীনতার অধিকারসমূহ ভোগ করিতে পারে। অন্যথায় ব্যক্তিস্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হইত। সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রগত সর্বপ্রকার উন্নতি ও উৎকর্ষের মূল ভিত্তি।

(৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political liberty)—রাজনৈতিক অধিকার বলিতে কোনও দেশের অধিবাসীদের নিজেদের অভিপ্রায়মত শাসনকার্য পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে সরকার (government) গঠন করিবার ক্ষমতা বুঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই এই স্বাধীনতা ভোগ করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে প্রধানতঃ ভোটদানের অধিকার এবং সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার অধিকার বুঝাইয়া থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী না হইয়াও কোন কোন দেশের জনগণ যথেষ্ট ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। স্বাধীন হইবার পূর্বে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না বলিলেই হয়; কিন্তু আমাদের তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার ছিল।

অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতার নামই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

যথার্থভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন—(১) জনশিক্ষা এবং (২) দুর্নীতিমুক্ত স্বাধীনমতাবলম্বী সংবাদপত্রসমূহ। —(লাস্কি)

(৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (economic liberty)—আরও একটি ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকি। আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কথাই বলিতেছি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবী উত্তরোত্তর স্বীকৃত হইতেছে। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

প্রত্যেক নাগরিক তাহার দৈনন্দিন আহার্য পাইবে এবং ইহা সংগ্রহের জন্য সে জীবিকা অর্জনের যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে মোটামুটিভাবে আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি। রাষ্ট্রে যাহাতে কেহ বেকার না থাকে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ—এমন কি তাহার পরের দিনের আহার্যের পর্যন্ত সংস্থান নাই—তাহার কোনরূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই বলিতে হইবে।

নাগরিককে যাহাতে তাহার সকল অভাব মোচনের চিন্তাতেই কাল কাটাইতে না হয় তজ্জন্য রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতি-মুহূর্তেই যদি এরূপ আশংকা থাকে যে, আমার কার্যে মালিক অসন্তুষ্ট হইলে আমার জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে আমার আদৌ স্বাধীনতা নাই বুঝিতে হইবে। আমার যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রকৃত স্বাধীনতা নাই। একের অধিকার যদি অপরের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করে, একের পক্ষে যাহা জীবনমরণ-সমস্যা অপরের পক্ষে যদি তাহা পরিহাসের বস্তু হয় তাহা হইলে কি স্বাধীনতা থাকিতে পারে?

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

কাজ করিবার অধিকার, জীবনধারণোপযোগী বেতন পাইবার অধিকার, কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় এবং খনিতে কাজের সময় বাঁধিয়া দিবার যে নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে তদনুযায়ী অবসর বিনোদন বা অবকাশ ভোগের অধিকার, ইউনিয়ন বা শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার, আকস্মিক দুর্ঘটনা, পীড়া বা বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধবয়সের জন্য সংস্থানের দাবী, প্রসূতিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি অধিকারসমূহকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। জাতীয় কংগ্রেস জনসাধারণের মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় আইন সভায় গৃহীত শ্রমিক-বিলেও উপরোক্ত অধিকারসূচক ধারাসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেননা, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় উদ্ব্যস্ত থাকিতে হইলে জীবনধারণের সার্থকতা কোথায়?

(৫) **জাতীয় স্বাধীনতা** (national liberty)—স্বাধীনতা শব্দটি জাতি এবং ব্যক্তি—উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোন জনসমষ্টি বা জাতি যদি তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী সরকার গঠন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহারা স্বাধীন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কোনও জাতির বৈদেশিক শাসনমুক্ত স্বাধীন অবস্থার নামই জাতীয় স্বাধীনতা। জাতীয় রাষ্ট্রে অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীন সমাজে এইরূপ জাতীয় স্বাধীনতা বিরাজ করে। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত কোনরূপ স্বাধীনতা থাকাও সম্ভব নহে।

স্বাধীনতা রক্ষা—আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—"সমাজে কেহ কেহ যদি বিশেষ কতকগুলি সুখসুবিধা ভোগ করিতে থাকে তাহা হইলে

স্বাধীনতা পদে পদে বিপন্ন হইবে।" জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্যই স্বাধীনতার কল্পনা করা হইয়াছে। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত না হইলে সমাজে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সহিত স্বাধীনতার যে কোন বিরোধ নাই এই সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। রাষ্ট্র বরং স্বাধীনতার স্রষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এই স্বাধীনতার রক্ষক। মানুষই রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিচালনা করিয়া থাকে; সুতরাং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য জনসাধারণকে তাহাদের অধিকারসমূহ পরিষ্কারভাবে জানিতে হইবে। এমন কি সরকার যাহাতে তাহাদের অধিকারে* অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি অধিকাংশ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (constitution) কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সমস্ত লিখিত শাসন-তন্ত্রের মধ্যে একস্থানে মৌলিক অধিকারসমূহ (fundamental rights) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু যে সব দেশে এইরূপ লিখিত শাসনতন্ত্র নাই, সেই সব দেশে আইনসভা কর্তৃক রচিত বিভিন্ন আইনের মধ্যে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্বীকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুবিজ্ঞ বিচারপতিবৃন্দ মামলার রায় দিবার সময় যে সমস্ত অভিমত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, ঐগুলিও লিপিবদ্ধ আইনের সমান মর্যাদা লাভ করে এবং এই দ্বিতীয় প্রকার আইনের মধ্যেও মৌলিক অধিকারসমূহ স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়। প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের ভোটাধিকার, সাধারণের সমান পদমর্যাদা এবং সরকারী চাকুরীসমূহে সকলেরই সমানাধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থা স্বাধীনতা রক্ষার নির্ভরযোগ্য উপায় বলা যাইতে পারে। কোনও একটি প্রশ্ন সম্পর্কে নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত বা গণভোট (referendum) গ্রহণ, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিকে আইনসভা হইতে সদস্যপদ ত্যাগের দাবীর (recall) অধিকার, মণ্ডলীর নিজ উদ্যমে (initiative) প্রস্তাব উত্থাপন বা বিল প্রবর্তনের অধিকার প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির দ্বারাও স্বাধীনতাহরণের চেষ্টার প্রতিরোধ করা হইয়াছে।

---

* সরকার কি কি অধিকার নির্দিষ্ট করিযা দিয়া থাকে একমাত্র তাহাই আমাদের বিচার্য বিষয় নহে; কি কি অধিকার সবকাব কর্তৃক নির্দিষ্ট হওয়া উচিত তাহাই আসল সমস্যা। মানুষের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করিলে তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।—Lord Acton—History of Freedom.

কিন্তু কেবলমাত্র শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করিলেই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বেআইনীভাবে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ কখনই তাহা বরদাস্ত করিবে না। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জন করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। একমাত্র এইভাবেই স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইতে পারে। ('Eternal vigilance is the price of liberty').

অধিকার রক্ষার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং নির্ভীক ও সুচিন্তিত জনমতেরও অপরিহার্য প্রয়োজন রহিয়াছে।

স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এবং প্রকৃত স্বাধীনতা আস্বাদন ও ভোগ করিতে হইলে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—কোনও ব্যাপারে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে সাহসই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। এই প্রসঙ্গে মিঃ এইচ, ডব্লু, নেভিনসনের (H. W. Nevinson) উক্তিটি উল্লেখযোগ্য—**"স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, স্বাধীনতার যুদ্ধক্ষেত্র কখনই নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না"।**

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্য ও স্বাধীনতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সকল মানুষের জীবন সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা, সুতরাং সাম্য ইহার অপরিহার্য অংগ। কিন্তু সাম্য ও স্বাধীনতা এক বস্তু নহে। স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে প্রত্যেক মানুষ দাসজীবন যাপন করে। এ ক্ষেত্রে সকলে একই অবস্থায় বাস করিলেও অর্থাৎ সাম্য থাকিলেও স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

স্বাধীনতা এবং সাম্য পরস্পর অংগাঙ্গিভাবে জড়িত।

সাম্য ও স্বাধীনতা—"সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী"—গণতন্ত্রের এই তিনটি পবিত্র মন্ত্রের মধ্যে ইতিপূর্বে স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এক্ষণে সাম্য ও মৈত্রী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার মানবত্বের বিকাশে যথাসম্ভব সুযোগ প্রদান করাই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য। প্রত্যেকেই যাহাতে তাহার সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে পারে সেইজন্য প্রত্যেককেই সমানাধিকার দিতে হইবে। কিন্তু এই অধিকার সমভাবে প্রদান করিলেও কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, তাহারা বিভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন কোন নাগরিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া হয়ত কৃতী পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ নাগরিকই এইরূপ বড় হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ তাহারা সমান সুযোগ ভোগ করিলেও তাহাদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিমাপ এক নহে। এইরূপ পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, কোন দুইটি ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিতে পারে; কিন্তু যোগ্যতার বিচারে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য থাকা স্বাভাবিক। যোগ্যতা ব্যতীত আমাদের মধ্যে রুচি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যও রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীনতা ও সাম্য থাকিলেও আমাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এইজন্য বলা হয় যে, সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে পুরামাত্রায় সংগতি রক্ষা করা যায় না। এই দুইটি অবস্থা সমধর্মী নহে। স্বাধীনতা বলিতে প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সৌহার্দ্য

ও মৈত্রী বুঝাইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মৈত্রীর সংগে সাম্য ও স্বাধীনতার কোন বিরোধ নাই।

সাম্য* বলিতে কাহারও প্রতি কোন পক্ষপাতমূলক ব্যবহার বুঝায় না। ইহার অর্থ সমাজে কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ বাধানিষেধ থাকিবে না।

সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, সমাজে যে বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বুঝি স্বাভাবিক, অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে এই অসাম্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সমাজে আমরা ধনী ও দরিদ্র এই উভয় শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই যোগ্যতার তারতম্য হেতু তাহাদের মধ্যে এই ধন-বৈষম্য দেখা দেয় নাই। প্রধানতঃ তাহারা ধনার্জনের সমান সুযোগ পায় নাই; এইজন্যই সমাজে এই অসাম্য দেখা দিয়াছে।

ধনীর সন্তান কেবলমাত্র যে তাহার পৈতৃক সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হয় তাহা নহে, ধনের সংগে সে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। জীবনে সাফল্যলাভের সমস্ত পথই তাহার নিকট উন্মুক্ত। সুতরাং অতি সহজেই সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, দরিদ্রের সন্তানকে যে শুধু অর্থাভাবজনিত অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হয় তাহা নহে, তাহাকে নানাবিধ সামাজিক বাধাবিপত্তির সম্মুখীনও হইতে হয়। তাহার নিকট সকল দুয়ারই বন্ধ। তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

সুতরাং, সাম্য শব্দের অর্থ ইহা নয় যে, সকলকে এক ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে। সাম্য বলিতে রাষ্ট্রের অধীন প্রত্যেকের সমানভাবে রাজনৈতিক ও নাগরিক (civil) অধিকারাদি† ভোগের ক্ষমতা বুঝায়। কিন্তু প্রধানতঃ সমাজে প্রত্যেকের সমপরিমাণে সুযোগ-সুবিধা ভোগের নামই সাম্য। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একটি ব্যতীত অন্যটির কল্পনা করা যায় না।

সাম্যের প্রকারভেদ—ব্রাইসের মতে সাম্য চারি প্রকারেরঃ—(১) পৌর সাম্য (civil equality)। (২) রাজনৈতিক (political) সাম্য। (৩) সামাজিক

---

* মূলতঃ যে সমস্ত উপায়ে বৈষম্য দূর করা হয় তাহাকেই সাম্য বলা হয়। সুতরাং সাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রথমতঃ কাহাকেও বিশেষ সুবিধা প্রদান করা চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেককে যথাযোগ্য সুবিধা দিতে হইবে।—লাস্কি

† ১৯১৯ সালের জার্মান শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "আইনের চক্ষে প্রত্যেক জার্মানেরই মর্যাদা সমান।"

(social) সাম্য এবং (৪) প্রাকৃতিক (natural) সাম্য। ইহার সহিত (৫) অর্থ-নৈতিক (economic) সাম্য যোগ করিতে হইবে।

(১) পৌর সাম্য—প্রত্যেক নাগরিক যদি সমানভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারাদি ভোগ করিতে পারে তাহা হইলে রাষ্ট্রে পৌর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি বা সরকারের অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য প্রকার সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়া পর্যন্ত পৌর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

(২) রাজনৈতিক সাম্য—রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সরকার-পরিচালনা ব্যাপারে প্রত্যেকেরই সমপরিমাণ ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকৃত হইবে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকেরই সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার না পাওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অর্থনৈতিক সাম্য না থাকিলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন।

(৩) সামাজিক সাম্য—সমাজে যদি জাতি, বর্ণ, পদমর্যাদা, শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করিতে থাকে এবং কাহারও কোনরূপ বিশেষ সুবিধাভোগের দাবী স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে ঐ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। জাতি বা বর্ণ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সাম্য উপভোগের পথে বাধা হইলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইবে না। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অতীব কষ্টসাধ্য; সম্ভবতঃ একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোন দেশে এই সাম্য নাই। অভিজাত, ধনিক, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। এই বিভাগই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। রাতারাতি আইন পাশ করিয়া এই সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জনমত, প্রচলিত রীতিনীতি এবং পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই সাম্য সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৪) প্রাকৃতিক সাম্য—প্রাকৃতিক সাম্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর নবজাতকদের মধ্যে ছোট বড় বলিয়া কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকৃতিদত্ত গুণাবলীর পার্থক্য, যাহা এতকাল দৃষ্টিগোচর ছিল না, সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমরা এই প্রকৃতিদত্ত বৈষম্য স্বীকার করিব, কিন্তু মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম সামাজিক অসাম্যকে কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না।

(৫) **অর্থনৈতিক সাম্য**—সমাজে যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই সমপরিমাণ ধনের মালিক হয় এবং অর্থোপার্জনের ব্যাপারে সমানভাবে সুযোগ লাভ করে তাহা হইলে ঐ সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ।

অধ্যাপক লাস্কির মতে আরও সংকীর্ণ অর্থে প্রত্যেককে তাহার সহজাত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক সাম্য। ব্রাইস বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রের আদর্শ হওয়া উচিত নহে; গণতন্ত্র একরূপ শাসনব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি নড়িতে পারে এমন কিছু করা গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। তথাপি অত্যধিক অর্থনৈতিক বৈষম্য যাহাতে হ্রাস পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করা হইয়াছে এবং সেখানকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক সাম্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজের কতিপয় ব্যক্তির হস্তে যদি সমস্ত ধন সঞ্চিত হয় বা ধনের উপরে তাহাদের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ অকল্যাণকর অবস্থার উদ্ভব হইবে। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, ধনের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধনই রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করিবে। রাষ্ট্র ধনের দাসে পরিণত হইবে। এই উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য অন্যান্য রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শ অনুসরণ করিবে কিনা তাহা বর্তমান অবস্থায় বলা সম্ভবপর নহে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রই ধন-বণ্টনের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বৈষম্য রহিয়াছে তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছে।

আদর্শের ক্ষেত্রে এবং আচরণে স্বাধীনতা এবং সাম্যের নীতি অনুসরণ করিয়া চলাই বর্তমান যুগের নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য।

বিচক্ষণ মনীষী এ্যারিস্টটল তাঁহার দূরদর্শিতার থেকে বহু পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন, "সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই বিপ্লবের মূল প্রেরণা জোগাইয়া থাকে।"

প্রধানতঃ এই অবস্থা হইতেই বিপ্লবের উৎপত্তি হয়।

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকত্ব

মানুষের নাগরিক জীবন-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাকেই পৌরবিজ্ঞান বলা হইয়াছে। সুতরাং নাগরিকত্বই এই বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সংজ্ঞা—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ সমাজের রাষ্ট্রীয় অধিকারসম্পন্ন সভ্যকে নাগরিক বলা হয়।

রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে নাগরিকের স্থান—নাগরিক রাষ্ট্রের অধিবাসী। রাষ্ট্রেব উদ্দেশ্য সমষ্টিগত সমাজের কল্যাণ সাধন করা। সুতরাং নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই কল্যাণ প্রচেষ্টার অংশভাগী হইতে হইবে—সে নিজেও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় উপকৃত হইবে। ইহা তাহার মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র-রক্ষা কার্যেও তাহাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য তাহাকে কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

ভ্যাটেল বলিয়াছেন—"সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনগণই নাগরিক। তাহাদিগকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিতে হইবে এবং সমাজের প্রভুত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। সমাজের সহিত তাহারা এই কর্তব্যপালনের বাধ্যবাধকতাসূত্রে আবদ্ধ। পরিবর্তে তাহারা সামাজিক সুখসুবিধাগুলি সমানভাবে ভোগ করিতে পারিবে।

নাগরিকত্বের শ্রেণীবিভাগ—প্রত্যেক নাগরিক সমানভাবে সর্বপ্রকার পৌর অধিকার ভোগ করিলেও প্রত্যেকের নাগরিক অধিকার একরূপ নাও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, নাগরিক না হইয়াও কোন কোন ব্যক্তি ভোট প্রদানের অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে—বর্তমানে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে কাহাকেও কাহাকেও এরূপ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে।

মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—(১) যাহারা সর্বপ্রকার পৌর এবং রাজনৈতিক এই উভয়বিধ অধিকারই ভোগ করিয়া থাকে; (২) যাহারা কেবলমাত্র পৌর অধিকারসমূহ ভোগ করে অথচ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার পায় নাই। কোনও কোনও দেশে এই প্রভেদটি

দেখাইবার জন্য এবং দুই প্রকার নাগরিকত্বকে বুঝাইবার জন্য দুইটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন, ফ্রান্সে যাহারা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করে, তাহাদিগকে নাগরিক (citoyen) বলা হয়; পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক যাহারা রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করে তাহাদিগকে জাতিভুক্ত (nationals) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সমাজে সকলের রাজনৈতিক অধিকার যদি সমান না হয় তাহা হইলে যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, কেবলমাত্র তাহাদিগের প্রতিই নাগরিক আখ্যাটি প্রযুক্ত হইবে।

স্বাভাবিক নাগরিক এবং নাগরিকের পর্যায়ে উন্নীত নাগরিক (natural citizens and naturalised citizens)—শাসনতান্ত্রিক আইনানুযায়ী অন্যভাবেও নাগরিকত্বের শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ—(১) যাহারা স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং (২) যাহারা কোনও বিধানবলে নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত বা পরিগণিত হইয়াছে।

যাহারা জন্মসূত্রে কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করে, তাহাদিগকে স্বাভাবিক নাগরিক (natural citizen) বলা হয়। পক্ষান্তরে, যাহারা কয়েকটি সর্ত পালন করিয়া নাগরিকত্ব অর্জন করে তাহাদিগকে গৃহীত নাগরিক (naturalised citizen) বলা হয়। আজন্ম নাগরিক ও গৃহীত নাগরিক সমগোত্রীয় নহে—তাহাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও এক নহে। কেননা, আজন্ম নাগরিক রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করিয়া থাকে; গৃহীত বা উন্নীত নাগরিক ঐ সমস্ত অধিকার নাও পাইতে পারে। আবার কয়েকটি রাষ্ট্রে গৃহীত নাগরিককে আজন্ম নাগরিকের সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। যে কোনও সরকারী চাকুরী বা পদগ্রহণে তাহাদের পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই।

বিদেশী—যে ব্যক্তি কোনও রাষ্ট্রে কেবলমাত্র বাস করে, কিন্তু ঐ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে না অর্থাৎ অপর একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, সে বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে, বিদেশী ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্য নহে। এইজন্য পররাষ্ট্রে সে পৌর অধিকারসমূহ ভোগ করিলেও তাহাকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করিতে দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রের কোনও অংশে বাস করিবার সময় বিদেশীকে ঐ দেশের প্রচলিত আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়। তাহাকে নিয়মিতভাবে কর দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যদেশে বাস করিবার সময় তাহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ আসিলে ঐ দেশের দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতে তাহার বিচার হইবে। কেবলমাত্র অন্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দ

ও দূতাবাসের অধিবাসিগণের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। এই ব্যাপারে তাঁহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোনও বিদেশীই অব্যাহতি পাইবেন না। কিন্তু অন্য রাষ্ট্রে বাস করিবার সময় পূর্বে বিদেশীদিগকে যে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত অধুনা ক্রমশঃ ঐগুলি প্রদান করিবার চেষ্টা হইতেছে; অধিকারভোগে তাহাদের অক্ষমতা দূর করা হইতেছে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বহু বিষয়ে বিদেশীয়দের মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করা হইত না। কিন্তু ঐ বৎসর বৃটিশ নাগরিক অনুমোদন আইন (British Naturalisation Act) গৃহীত হয়। ফলে, জন্মসূত্রে বৃটিশ প্রজাদের ন্যায় এক্ষণে বিদেশীয়গণও স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত প্রকার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারেন বা সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন। কেবলমাত্র নাগরিক অধিকার পাইবার পরও বিদেশীরা কোনও বৃটিশ জাহাজের মালিক হইতে পারেন না। বর্তমানে সর্বত্রই সম্পূর্ণভাবে নাগরিকের ন্যায় বিদেশীদিগকে পৌর ব্যাপারে সমান মর্যাদা প্রদানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে এখনও ব্যবধান রক্ষিত হয়।

নাগরিক ও বিদেশী—নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে যে মর্যাদাগত পার্থক্য তাহা সংক্ষেপে এইভাবে দেখান যাইতে পারেঃ—

(১) নাগরিক যথার্থই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম অংগ; কিন্তু বিদেশী ব্যক্তি ঐ রাষ্ট্রে বাস করে মাত্র।

(২) নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়; পক্ষান্তরে, অন্য রাষ্ট্রে বাসকালীন বিদেশীকে যদিও ঐ রাষ্ট্রের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয় (অন্যথায় ঐ রাষ্ট্রের আদালতে বিচারে শাস্তি পাইবে) এবং সে বিভিন্ন রূপ কর প্রদানে বাধ্য, তথাপি সে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে।

(৩) সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারে সামান্য কিছু বাধানিষেধ থাকিলেও বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিদেশী ও প্রকৃত নাগরিকের পৌর মর্যাদা সমান এবং অভিন্ন।

(৪) নাগরিক সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে; কিন্তু বিদেশী যৎসামান্য রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে; কোনও কোনও রাষ্ট্রে তাহার আদৌ কোন রাজনৈতিক অধিকার নাই।

নাগরিক অধিকার লাভের উপায়—সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মসূত্রে (birth) কোন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিয়া থাকে। আবার রাষ্ট্র বাহিরের

লোককে নাগরিকত্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে স্বীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে। এইভাবে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির নাম (naturalisation), এবং যে এইভাবে নাগরিকত্ব অর্জন করে তাহাকে গৃহীত নাগরিক বা (naturalised citizen) বলা হয়।

জন্মগত অধিকার (birthright) —জন্মসূত্রে নাগরিক অধিকার লাভ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়মকানুন প্রচলিত আছে। প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত নিয়ম দুইটির যে কোন একটি অনুসৃত হয়ঃ—

(১) সন্তান তাহার পিতামাতার নাগরিকত্ব লাভ করিবে (*jus sanguinis*) ; অথবা (২) তাহারা যে রাষ্ট্রের ভূমিখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করিবে (*jure soli*) ।

কয়েকটি রাষ্ট্র উপরোক্ত দুইটি প্রথার মাঝামাঝি একটি মিশ্র নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুগপৎ উপরোক্ত দুইটি নিয়মই প্রচলিত আছে।

বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে যে কেহ জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার পিতামাতা বিদেশী হইলেও সে বৃটিশ নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। আবার বৃটিশ অধিকারের বাহিরে কেহ জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার পিতামাতা যদি বৃটিশ প্রজা হয় তাহা হইলে সে জন্মসূত্রে বৃটিশ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। বৃটিশের প্রত্যেকটি জাহাজকেও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অংশ বলিয়া মনে করা হয়। সুতরাং যদি কেহ বৃটিশ জাহাজে জন্মগ্রহণ করে তবে, উহা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে থাকুক না কেন, ঐ নবজাতক জন্মসূত্রে বৃটিশ নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। সর্বত্র নাগরিক অধিকারলাভ সম্পর্কে একই নীতি অনুসৃত না হওয়ায়, কোন কোন সময় একই ব্যক্তি যুগপৎ একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সব ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সাবালক হইবার পর নিজের ইচ্ছামত যে কোনও একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বাছিয়া লইতে পারে।

বিদেশী বাসিন্দার নাগরিক অধিকার বা নাগরিকত্ব লাভের উপায় (naturalisation)—আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিদেশীকে রাষ্ট্রের অংশ বলিয়া স্বীকার এবং রাষ্ট্রের বাসিন্দার ন্যায় তাহাকে সমস্ত প্রকার অধিকার প্রদান করিয়া নাগরিক মর্যাদায় উন্নীত করার নামই (naturalisation) । কয়েকটি সর্ত পালন করিলেই যে কোনও ব্যক্তি নাগরিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন সর্ত প্রচলিত আছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র শ্বেতকায় ব্যক্তিরা এবং বাসিন্দা কাফ্রি অধিবাসীরাই নাগরিক অধিকার

লাভ করিতে পারে। সুসংবদ্ধ সরকার বা গভর্নমেণ্ট বিদেশী শত্রু, নাস্তিক বা অবিশ্বাসী এবং বহুবিবাহিত ব্যক্তিকে নাগরিক বলিয়া গ্রহণ না করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্পর্কে বাধানিষেধ আরোপ করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিয়ম আছে যে, নাগরিক অধিকারপ্রার্থীদিগকে অন্ততঃ কিছুকাল ঐ দেশে বাস করিতে হইবে। কিন্তু কতদিন বাস করিতে হইবে তাহার মেয়াদ সব দেশে সমান নহে।

বৃটিশ শাসনতান্ত্রিক আইনানুযায়ী নাগরিক অধিকার লাভের পূর্বে বিদেশীকে বৃটিশ রাজ্যে অন্ততঃ ৫ বৎসর বাস করিতে হইবে। ঐ সময়ের জন্য বৃটিশ সরকারের চাকুরী করিলেও চলিবে। এতদ্ব্যতীত তাহার নৈতিক চরিত্র উন্নত হওয়া এবং ইংরেজী ভাষার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যাহারা জন্মসূত্রে বৃটিশ নাগরিক তাহারা কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া আজন্ম বৃটিশ নাগরিক ও 'নাগরিক মর্যাদায় উন্নীত' বৃটিশ নাগরিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাহাদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারাদি একই রূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র আজন্ম নাগরিকেরাই রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের পদে নির্বাচিত হইতে পারেন।

নাগরিকের মর্যাদা লাভ করিতে হইলে বিদেশীদিগকে প্রথমে উপরোক্ত নির্দিষ্ট সর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে এবং তৎপরে উক্ত অধিকার প্রার্থনা করিয়া তাহাকে একটি আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে। ঐ আবেদন মঞ্জুর হইলে সে নাগরিক বলিয়া রাষ্ট্রে গণ্য হইবে।

Other modes of naturalisation

অন্যান্য উপায়ে নাগরিকত্ব অনুমোদনবিধি—নিম্নলিখিত উপায়েও এক রাষ্ট্রের লোক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারেঃ—

(১) বিবাহ—বিবাহের ফলে স্ত্রী স্বামীর নাগরিকত্ব অর্জন করে। এই নিয়মানুসারে কোনও ইংরেজ মহিলা একজন জার্মানকে বিবাহ করিলে তিনি জার্মান-নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) বৈধকরণ (legitimation)—পিতা রাষ্ট্রের নাগরিক, মাতা বিদেশীনী —এই অবস্থায় বিবাহের পূর্বে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা যদি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক ঐ সন্তানও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) **জমি ক্রয়** (purchase of land)—মেক্সিকো প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে ভূমি ক্রয় করিয়া উহার মালিক হইলেই সে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারে।

(৪) রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী—কোন কোন রাষ্ট্রে বিদেশীরা রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে।

(৫) দীর্ঘকাল বাস—ব্রেজিল প্রভৃতি কোন কোনও রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিলেই ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারে।

Loss of citizenship

নাগরিক অধিকার লোপ—(১) বিবাহ, (২) পররাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ, (৩) স্বেচ্ছায় নাগরিক অধিকার ত্যাগ, (৪) দীর্ঘকাল যাবৎ স্বদেশ হইতে অনুপস্থিতির ফলে এবং (৫) অন্য দেশের (ঐ দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-ক্রমে) নাগরিক বলিয়া গণ্য হইলে নাগরিক অধিকার লোপ পাইতে পারে।

(১) অনেক দেশে এরূপ নিয়ম আছে যে যদি কোনও মহিলা একজন বিদেশীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বদেশের নাগরিক অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার স্বামীর দেশের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কতকগুলি রাষ্ট্রে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কোনও নাগরিক যদি বিদেশী কোন সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে তাহা হইলে সে আর নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারিবে না।

(৩) সৈন্যদল বা নৌ-বাহিনী ত্যাগ করিলেও কোন কোনও রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার লোপ পায়।

(৪) নাগরিক যদি দীর্ঘকাল স্বদেশে না থাকে তাহা হইলে সে তাহার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

(৫) যদি কোনও ব্যক্তি নৃশংস অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয় তাহা হইলে তাহার নাগরিক অধিকার লোপ পাইতে পারে।

(৬) সাধারণতঃ যদি কোনও নাগরিক তাহার আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বসবাস করে এবং ঐ দেশের গৃহীত নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তাহার আর স্বদেশ-রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিবার অধিকার থাকিবে না। পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও সহজে রাষ্ট্রানুগত্য অস্বীকার করিতে দেওয়া হইত না। বর্তমানে নাগরিককে এইরূপ অধিকার দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কয়েকটি রাষ্ট্রে এখনও নাগরিককে তাহার জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে দেওয়া হয় না। আনুগত্য পরিত্যাগের ব্যাপারে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

Rights and Duties of Citizenship

অধিকার*—সমাজ যে সমস্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকেই অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র-স্বীকৃত দাবীসমূহকেও অধিকার বলা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকার সম্বন্ধে উপরোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট নহে। কিছুদিন পূর্বেও দাসপ্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল না। মালিকেরা ক্রীতদাসদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্দী করিয়া রাখিত। মালিকদের এই অধিকার আইনের সমর্থন লাভ করিয়াছিল এবং রাষ্ট্রও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ একটি দাবীকে অধিকারের মর্যাদা দেওয়া ঠিক নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের ফলে মানুষের চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে এবং দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

প্রকৃত অধিকার বলিতে কি বুঝায়?—সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি প্রদান ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া থাকে তাহাকেই অধিকার বলা হয়।

ব্যক্তিকে শুধু নিজের জন্য নহে, উপরন্তু সমাজের মঙ্গলের জন্যও সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। আদর্শানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইলে তদুপযোগী অবস্থা ও পরিবেশের প্রয়োজন। সে ন্যায়তঃ এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের নিকট দাবী জানাইতে পারে। সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এই অধিকার তাহার প্রাপ্য।

Legal and moral rights

আইনগত ও নৈতিক অধিকার—রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অধিকার বলিতে আইনগত অধিকার বুঝায়। রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করিয়া থাকে। "রাষ্ট্রের সাহায্য ও সম্মতিক্রমে কোনও

---

* লাস্কি বলিয়াছেন—সমাজ-জীবনে যে সমস্ত সুবিধা না পাইলে কোন ব্যক্তিই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না তাহাই প্রকৃতপক্ষে অধিকার। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সুষ্ঠু জীবনযাপনোপযোগী পরিবেশ না থাকিতে পারে। যথোপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য, অর্থাৎ রাষ্ট্র যাহাতে ন্যায্য অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয় তজ্জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন হইতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই যেমন কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তেমনি কতকগুলি অধিকার আবার রাষ্ট্রানুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

ব্যক্তির পক্ষে অন্যের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে আইনগত অধিকার বলা যাইতে পারে।"

অপরদিকে মানুষের নীতিজ্ঞানের উপর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত তাহাকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। সমাজের নৈতিক সমর্থনই এই অধিকারের ভিত্তি। যদি কেহ এই অধিকার-বিরোধী কাজ করে তবে সমাজ তাহার নিন্দা করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র অপরাধীকে শাস্তি দেয় না।

Legal rights—civil and political

আইনগত অধিকার : পৌর এবং রাজনৈতিক—আইনগত অধিকারসমূহকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—পৌর অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার। পৌর অধিকার বলিতে বুঝায় সেই সব অধিকার যাহা ব্যতীত সভ্য জীবনযাত্রা অসম্ভব। যেমন, জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্ম আচরণের অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় সেই সব অধিকার যাহা দ্বারা মানুষ দেশের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, ভোটদানের অধিকার, সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার ইত্যাদি।

পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত। উদাহরণস্বরূপ চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা এবং মেলা-মেশার অবাধ স্বাধীনতা পৌর এবং রাজনৈতিক উভয় অধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

কর্তব্য

কর্তব্যকে একপ্রকার বন্ধন বলা যাইতে পারে। এই বন্ধন নৈতিক বা আইনগত হইতে পারে।

যদি কোন লোকের কাহারও প্রতি কোন কর্তব্য থাকে তাহা হইলে তাহাকে সেই কর্তব্যবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। তাহার কর্তব্যবোধে তাহাকে কোন কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে হয়।

আইনগত এবং নৈতিক কর্তব্য (legal and moral duty)—অধিকারের মত কর্তব্যও দুই প্রকার—আইনগত এবং নৈতিক। নীতিবোধ অনুসারে আমরা যে কর্তব্য করিয়া থাকি তাহা নৈতিক কর্তব্য, আর রাষ্ট্র আইন করিয়া আমাদিগের উপর যে কর্তব্যভার চাপাইয়া দেয় তাহা আইনগত কর্তব্য।

দরিদ্র, পীড়িত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। ইহা নৈতিক কর্তব্য। কেহ আমাদিগকে এই কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য করে না। সমাজে স্বভাবতঃই আমরা ইহা করিয়া থাকি।

কিন্তু আইনগত কর্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আইন অনুযায়ী আমরা এই কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য। অন্যথায় রাষ্ট্র আমাদিগকে শাস্তি দিতে পারে।

Rights and duties of a citizen

নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য—বর্তমান যুগে যেমন রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নাগরিকের জীবন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা, তেমনি নাগরিকেরও কর্তব্য হইল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা।

অধিকার ও কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক (correlation of rights and duties) —অধিকার এবং কর্তব্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অধিকারের কথা বলিলেই কর্তব্যের কথা উঠে। আমার একটি অধিকার আছে, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে হইবে যে অন্য সকলের কর্তব্য হইল আমার এই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। আবার, আমার যেমন অধিকার আছে, তেমনি অন্যের অধিকার খর্ব করিবার অধিকার আমার নাই। অন্যের আক্রমণ হইতে আমি নিজেকে যেমন রক্ষা করিতে চাই, তেমনি আমারও কর্তব্য হইল অন্যকে আক্রমণ না করা। রাষ্ট্র আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমার কর্তব্য হইল নিজেকে সুশিক্ষিত করিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করা। যে আপনার কর্তব্য কর্ম করিবে না তাহাকে কোনরূপ অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না। যেমন, যে অক্ষম নয় অথচ শ্রম করিবে না তাহার আহার্য দাবী করিবার কোন অধিকার নাই। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করা যায়ঃ—

(১) আমার যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য। আমার ইচ্ছামত চলাফেরা করার অধিকার আছে। অতএব তোমার কর্তব্য হইল আমার চলাফেরায় কোনরূপ বাধা না দেওয়া।

(২) ঠিক তেমনি অন্যের অধিকার রক্ষা করাও আমার কর্তব্য।

(৩) রাষ্ট্র আমাদের সকল অধিকারের উৎস। রাষ্ট্র না থাকিলে অধিকারও থাকিত না। অতএব আমাদের সকলের কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা।

(৪) অধিকার ও কর্তব্যের চরম লক্ষ্য হইল ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করা। আমি বাক্স্বাধীনতার অধিকার দাবী করি। কেননা, বাক্স্বাধীনতা না পাইলে স্বাধীন জীবন যাপন সম্ভব নয়।

Rights of citizens in a democracy

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার—অধিকার না থাকিলে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তির জীবন সুগঠিত না হইলে সমাজ উন্নত হইবে না। ব্যক্তির সমষ্টি হইল সমাজ। পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত নাগরিকের অধিকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে। বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের অধিকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে—এই সব অধিকার উপভোগের ব্যবস্থাও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার।

মৌলিক অধিকারসমূহ (fundamental rights) **: অধিকারনামা** (bill of rights)—অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে স্বাধীনতা রক্ষার উপায়স্বরূপ 'অধিকারনামা' (bill of rights) শীর্ষক একটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট আছে। এই অধিকারনামায় নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। স্বাধীনতা ভোগ করিতে হইলে এই সমস্ত অধিকার না থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনেব জন্য এইগুলি অত্যাবশ্যক। তাই এই সমস্ত অধিকারকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও কযেকটি পৌর ও অর্থনৈতিক অধিকার। জনসাধারণ যাহাতে নিরাপদে এবং যথাযথভাবে তাহাদের অধিকারসমূহ ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য এই অধিকারনামা বা সনদের সৃষ্টি। সাধাবণতঃ নাগরিকদের অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই অধিকারনামাকে দেশের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন-কর্তৃপক্ষ বা আইন-সভা কেহই শাসনতান্ত্রিক আইনানুযায়ী জনসাধারণের এই সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বিভিন্ন দেশে জনসাধারণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে তাহাব মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও মৌলিক অধিকারসমূহ সর্বত্র প্রায় একই প্রকারের হয়। মৌলিক অধিকার বলিতে জীবনধারণের স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, অবাধ গতিবিধির অধিকার, মেলামেশার অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা এবং আইনের চক্ষে প্রত্যেকের সমান মর্যাদা বা অধিকার বুঝায়।

মৌলিক অধিকার ব্যতীত নাগরিক আরও কয়েকটি অধিকার ভোগ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের কোনটিই নিরঙ্কুশ অধিকার নহে। সর্বসাধারণের পক্ষে যাহা

কল্যাণকর নহে এরূপ কোন কিছু করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। সামাজিক কল্যাণ এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আমাদের অধিকারসমূহ ভোগ করিয়া থাকি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকারসমূহ মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারে ভাগ করা যাইতে পারে।

পৌর অধিকার (Civil Rights)

(১) জীবনরক্ষার অধিকার (right to life)—মৌলিক অধিকারের মধ্যে জীবনরক্ষার অধিকার অন্যতম। অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। এই অধিকারের সাহায্যে আমরা শুধু যে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি তাহা নহে, উপরন্তু এই অধিকার আছে বলিয়া আমার উপর কেহ কোনরূপ বল প্রয়োগ করিতে অথবা আমাকে আটক রাখিতে পারে না। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে এবং নিজেকেও রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং জীবনরক্ষার অধিকার বলিতে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ এই উভয়বিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অধিকার বুঝাইবে।

জীবনরক্ষার অধিকার থাকিলে আমি আত্মরক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি। উপরন্তু আইনানুযায়ী আমার অস্ত্রধারণেরও অধিকার থাকা উচিত।

(২) সম্পত্তির অধিকার (right to property)—সম্পত্তির অধিকার বলিতে বুঝায় যে মালিক অবাধে তাহার সম্পত্তি ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারিবে। কেহ বেআইনীভাবে কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না বা অন্য কোনও ভাবে কাহারও সম্পত্তির নিয়মিত উপভোগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই অধিকারের ভিত্তিতেই পুঁজিবাদ (private capitalism) টিকিয়া আছে। কিন্তু জনকল্যাণের পরিপন্থী কোনরূপ সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইতে পারে না। জনসাধারণের অসুবিধা করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে কোনও সম্পত্তি উপভোগের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদ তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে চায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অধিকার থাকিলেই সেই সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্বও পালন করিতে হইবে। আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য যদি আমার বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির উপর আমার অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। যে সম্পত্তি আমার নিজের শ্রমার্জিত নহে তাহার উপর আমার কোনও অধিকার বা কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না।

আমাকে যে সম্পত্তি দিলে জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং আমার নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য যে সম্পত্তির প্রয়োজন নাই সেই সম্পত্তিতে আমার অধিকার স্বীকৃত হইতে পারে না।

(৩) **বিবেক এবং ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা** (right of belief and conscience)—চিন্তার স্বাধীনতা এবং নিজ ধর্মমত অনুযায়ী অর্চনা, উপাসনা এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার ইহার অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীন দেশসমূহে অবাধে এই অধিকারসমূহ ভোগ করিতে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে কোনরূপ অন্তরায় থাকা উচিত নয়। মনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা এই অধিকারের অপরিহার্য অঙ্গ, এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৪) **গতিবিধির স্বাধীনতা** (freedom of movement)-প্রত্যেক নাগরিক আপন ইচ্ছামত সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। কেহ তাহার ইচ্ছামত গমনাগমনে বাধা দিতে পারিবে না। বৃটেনে কাহাকেও অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হইলে অবৈধভাবে আটক রাখিবার জন্য সে ক্ষতিপূরণ বা খেসারৎ দাবী করিতে পারে। কোন ইংরাজকে বিনা বিচারে আটক রাখিলে তাহাকে গ্রেপ্তারের একপক্ষকালের মধ্যে কোন আদালতে বিচারার্থ হাজির করিবার জন্য সে হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্টের আশ্রয় লইতে পারে। আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে তাহার বক্তব্য শুনা যাইবে এবং কি কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাও জানা যাইবে, অর্থাৎ আইনানুযায়ী প্রকাশ্য আদালতে তাহার বিচার হইবে। এইভাবে আমাদের দেশেও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা যাইতে পারে।

(৫) **চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা*** (freedom of contract)—নাগরিকগণ পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন। উভয় পক্ষই এই চুক্তি মানিতে বাধ্য থাকিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই অধিকার দেওয়া হয়।

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য প্রকারের স্বাধীনতার ন্যায় এই চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতাও নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। সর্বসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে নাগরিককে এই অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয় না। এক ব্যক্তি অন্যের ক্রীতদাসে পরিণত হইবে এইরূপ কোন চুক্তি অনুমোদন করা হইবে না। দাসপ্রথা বিলোপ, কারখানা আইন (শ্রমিকদের সুবিধার্থ বিধিবন্ধ) প্রভৃতি হইতে বুঝা যাইবে যে বর্তমান সমাজে চুক্তি করিবার স্বাধীনতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সমাজে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রীরা সম্পত্তির অধিকার এবং চুক্তি সম্পাদনের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষপাতী।

বিচারপতি হোম্‌সের মত এই যে, শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে চুক্তি সম্পাদনকারী দুই পক্ষের ক্ষমতা সমতুল্য হইলেই চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৬) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য বৃত্তি সম্পর্কিত স্বাধীনতা (freedom of trade, industry and other occupations) —নাগরিকগণ তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন শিল্প, ব্যবসা ও বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সমাজের অমঙ্গল ঘটিতে পারে এরূপ কোন ব্যবসায়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্রকর্তৃক মাদকদ্রব্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ করা সঙ্গত হইয়াছে বলিতে হইবে।

(৭) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা* (freedom of opinion—freedom of speech and freedom of the press) —সত্যের সহজ প্রকাশ রুদ্ধ হওয়ায় জগতে কত অনর্থই না ঘটিয়াছে।

বাক্‌স্বাধীনতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই নাগরিকগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বরবিদ্বেষী, অশ্লীল, নিন্দাজনক বা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কোন কিছু বলিতে দেওয়া হইবে না।

মানুষের স্বাধীন চিন্তার ও মতামত প্রকাশের ক্ষমতাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলা হয়। নাগরিকগণ প্রয়োজন হইলে এমন কি কঠোর ভাষায় সরকারী কার্যাবলীর সমালোচনা করিতে পারেন। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি রাষ্ট্রদ্রোহী, মানহানিকর বা অশ্লীল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

স্বাধীন চিন্তা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করা হইলে তাহার চিন্তাশক্তির মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে। তাহার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইবে। বাক্‌স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকিলে সকল প্রকার মতামত, ধারণা ও সমালোচনা ছাপাইতে পারা যায়। ইহার ফলে জনমত জাগ্রত হয়, জনসাধারণও নানা বিষয়ে ভাবিতে শিখে। সরকারী অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা এবং অন্যান্য অভাব-অভিযোগ দূর করিবার পক্ষে ইহা একটি অমোঘ অস্ত্র। নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা বহুক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। সমালোচনার জোরে আমরা বহু পৌর অধিকার লাভ করিয়াছি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ হইলে

---

* "স্বাধীন মানুষ জনসাধারণকে পরামর্শ দিবার জন্য যখন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারে, তখনই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করি"—ইউরিপিডিস্‌।

"অন্যান্য প্রকার স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের পূর্বে আমাকে সর্বাগ্রে জানিবার এবং বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচার এবং মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা দাও"—মিল্টন।

আন্দোলন গোপন পথ ধরিয়া চলিতে থাকে। যে সরকার বা গভর্নমেণ্ট সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করিয়া থাকে তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে হইবে। মানুষ যদি যথাযথভাবে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে না পারে তাহা হইলে সে তাহার পৌর কর্তব্যসমূহ পালন করিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষে প্রেস আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইত। সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইলে সরকারী অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সেন্সর দ্বারা অনুমোদিত না হইলে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যাইত না। গত মহাযুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। স্বাধীন দেশগুলিতে কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের এইরূপ নিয়ম নাই।

(৮) **জনসভা ও মেলামেশার স্বাধীনতা** (freedom of public meeting and association)—সভা-সমিতি করিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকা উচিত। জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যাপারে প্রকাশ্যে আলোচনা করিবার এবং নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে মত প্রকাশের পূর্ণ ক্ষমতা সকলের থাকা উচিত। অন্যায়ের প্রতিকার প্রকাশ্য সমালোচনা ব্যতীত সম্ভব নহে।

বাক্‌স্বাধীনতা দেওয়া হইলে সেই সঙ্গে জনসভা করিবার এবং পরস্পরের সহিত মেলামেশার বা প্রতিষ্ঠান গঠনের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। বর্তমান যুগে কোন মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করিতে হয়। কাজের মধ্যেই মতবাদ মূর্ত এবং সার্থক হইয়া উঠে।

(৯) **আইন-আদালত সংক্রান্ত ব্যাপারে সমানাধিকার** (equality before the law)—নাগরিকদের জীবনধারণের পক্ষে এই অধিকারটির গুরুত্ব অনেক বেশী, বিচারের সময় যদি বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ আইন প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে বিচার ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হইবে। আইনের দরবারে উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র, সরকারী ও বেসরকারী লোকজনের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান না করিয়া একই আইনানুসারে সকলের বিচার করিতে হইবে। অন্যথায় ন্যায় বিচার করা হইবে না।

(১০) **শিক্ষা গ্রহণ এবং কাজ করিবার অধিকার** (right to education and right to work)—বাস্তবক্ষেত্রে কল্যাণসাধন ব্যতীত নাগরিকের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। প্রত্যেক সভ্যদেশেই ক্রমশঃ রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব স্বীকৃত হইতেছে। সুতরাং জনসাধারণ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত চাকুরী পাইতে পারে রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য জার্মান রিপাব্‌লিকের গঠনতন্ত্রে **১৮ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা** এবং পূর্ণ শ্রম করিয়া ন্যায্য উপার্জনের দাবী মৌলিক অধিকার বলিয়া

স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণ বেকারদের জন্য চাকুরী এবং সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ন্যায্য অধিকার দাবী করিতেছে।

শিক্ষার অধিকার (right to education)—সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করিয়া সাহায্য করিবেন—ইহাই নাগরিকতার আদর্শ। এইজন্য নাগরিকের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তি যাহাতে নাগরিক কর্তব্যপালনে সক্ষম হইতে পারে তজ্জন্য তাহাকে যথোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; তাহার এইরূপ শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিবেকবুদ্ধি অনুসারে যিনি অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন পরিণামে তিনিই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। যে নাগরিকের এই ক্ষমতা নাই অর্থাৎ যাহার চিন্তাশক্তি অপরিণত সে অন্যের অনুগামী হইতে বাধ্য। সে কখনই নেতৃত্ব করিতে পারিবে না। নাগরিককে বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, দোষগুণ নিবারণ করিতে হইবে। অতঃপর নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমতানুযায়ী পন্থা নির্ধারণ ও নির্বাচন করিতে হইবে। পরিশেষে সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য সুশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

শ্রম করিবার অধিকার (right to work)—প্রত্যেক নাগরিকেরই কাজ করিবার ও তাহার শ্রমের জন্য ন্যায্য বেতন বা পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার আছে। এই অধিকার ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ নাগরিকতা অর্জন সম্ভবপর নয়। এই অধিকার স্বীকৃত হইলে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করিতে হইবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত শ্রমের সময়ও বাঁধিয়া দিতে হইবে। শ্রমের সময় বাঁধিয়া না দিলে মানুষকে অকারণ বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে, অবকাশের কোন সুযোগই সে পাইবে না। অবকাশ না পাইলে নাগরিকগণ সমাজের মঙ্গল চিন্তা ও তদনুযায়ী কাজ করিবার সময় পাইবে কখন?

(১১) বিবাহের অধিকার এবং অন্যান্য পারিবারিক অধিকার (right to marriage and other rights of the family)—নাগরিকগণ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার অধিকারী।

রাষ্ট্রকে প্রত্যেকের পারিবারিক অধিকারাদি—যেমন, পিতার সন্তানবর্গের অভিভাবকত্ব করিবার অধিকার—স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমাজের মঙ্গলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের অধিকার এবং পারিবারিক অধিকারাদি ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কেহ উপরোক্ত অধিকারসমূহ এমনভাবে

ব্যবহার করেন যদ্দ্বারা সামাজিক অকল্যাণ বা জনসাধারণের অসুবিধা ঘটিবে তাহা হইলে নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রকে এই অধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সরদা আইনের (বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১২) ডাক, তার ও টেলিফোনযোগে প্রেরিত বার্তার গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার (right to the secrecy of correspondence through the post, telegraphs or telephones)—সব দেশেই ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। কিন্তু যদি জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ চিঠিপত্র খুলিতে অথবা ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তা আটক করিতে পারে।

(১৩) স্থানত্যাগের এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের অধিকার (liberty of migration and the right to the protection of the state)—বিশেষ কারণ না থাকিলে নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে তাহার ইচ্ছানুযায়ী অন্যত্র গমন করিতে দিতে হইবে। বিদেশে থাকিবার সময় নাগরিক নিজ জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে তাহার নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য দাবী করিতে পারে। যেমন, কোন ইংরাজ রাশিয়াতে বাস করিবার সময় মস্কোস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের সাহায্য পাইবে।

(১৪) ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার (right to culture and language)—প্রত্যেক নাগরিকেরই তাহার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। অধুনা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই অধিকার স্বীকার করে। সংখ্যা-লঘুদের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে ইহা একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

(১৫) অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার (right to the other advantages of social life)

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

উল্লিখিত অধিকারসমূহ প্রধানতঃ পৌর ও অর্থনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার স্বতন্ত্র ব্যাপার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ তিন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়ঃ—(১) **সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার অধিকার** (right to hold public office) (২) **ভোটাধিকার** (franchise or the right to vote) এবং (৩) **আবেদনপত্র দাখিল করিবার অধিকার** (the right of petition)। পৌর ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে পূর্বে যে পার্থক্য ছিল ক্রমশঃ তাহা বিলুপ্ত হইতেছে।

১। ধর্মাধিকরণ, আইনসভা ও শাসন পরিচালন বিভাগের অধীন চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার সকলের সমানাধিকার এবং শাসনকার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার (equal eligibility for public office, executive, legislative and judicial—and the right to criticise the public administration) —গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদসমূহ লাভ করিবার অধিকার আছে। একমাত্র নাগরিকরাই এই অধিকার দাবী করিতে পারেন। বিদেশীয়দের এরূপ কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক নাগরিকই সরকার বা গভর্নমেণ্টের কোন বিভাগের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি এবং সংস্কার সাধনের জন্য আন্দোলন করিতে পারে।

২। ভোটাধিকার (franchise or the right to vote) —রাজনৈতিক অধিকারসমূহের মধ্যে ভোটাধিকারের স্থান সর্বাগ্রে। নাগরিকগণ ভোটের সাহায্যেই দেশের শাসনকার্য পরিচালন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকেরই ভোটাধিকারের দাবী থাকিলেও এখনও পর্যন্ত সব দেশে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

নাবালক, বিদেশী, উন্মাদ, অপরাধী ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। তাহারা যথাযথভাবে এই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ইহা ব্যতীত ভোটাধিকার পাইতে হইলে সম্পত্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। পূর্বে নারীজাতির ভোটাধিকার ছিল না। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্যের প্রায় প্রত্যেক দেশেই এবং প্রাচ্যের কয়েকটি অগ্রগামী রাষ্ট্রে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

বর্তমানে অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে ভোটাধিকার পাইতে হইলে সম্পত্তি সংক্রান্ত যে বাধা আছে তাহা অপসারণ করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ সাধারণ লিখনপঠন-ক্ষমতা থাকিলেই প্রাপ্তবয়স্কগণ ভোটাধিকার পাইবে। যে সমস্ত দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে নাগরিকগণ অনায়াসেই ভোটাধিকারের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে।

৩। আবেদনপত্র দাখিল করিবার অধিকার (right of petition) —প্রত্যেক নাগরিকই কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে আবেদনপত্র পেশ করিতে অথবা অভিযোগ

জানাইতে পারে। নাগরিক এককভাবে বা কয়েকজন নাগরিক সমবেতভাবে এই অধিকার অনুযায়ী দরখাস্ত পেশ করিতে পারে।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অধিকার (right to resist the state) —অনেক সময় বলা হয় যে রাষ্ট্রের অন্যায় আচরণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নাগরিকগণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু আইনতঃ এরূপ অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কেননা, তাহা হইলে আইনতঃ রাষ্ট্রের প্রতিকূল আচরণ করিবার জন্যই রাষ্ট্রকে নাগরিকবৃন্দের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা স্বতঃবিরোধী, সেজন্য অলীক ও অসম্ভব।

রাষ্ট্রকে বাধাদানের অধিকার নৈতিক অধিকার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। নাগরিকের বিবেক অনুযায়ী গুরুতর রাষ্ট্রীয় সঙ্কট দেখা দিলে এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইলে এই অধিকার প্রয়োগের দাবী করা হয় এবং কোন কোন সময় নীতিশাস্ত্র অনুসারে সে দাবী সমর্থন করা যাইতে পারে।

কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের যদি উচ্চ নৈতিক আদর্শ থাকে তাহা হইলে তাহার কার্যকলাপও নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্র যদি এরূপ কোন আদেশ জারি করে যাহা নাগরিক তাহার বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বীকার করিতে অক্ষম তাহা হইলে তাহার রাষ্ট্রের অবাধ্য হইবার নৈতিক অধিকার আছে। প্রত্যেক নাগরিকের এই অধিকার আছে বলিয়াই তাহারা সমবেতভাবে গণবিপ্লব করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে সমষ্টির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিলে চলিবে না। বিপ্লবের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। বিপ্লবের ফলে সমাজের এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধিত হইবে কিনা এ সম্পর্কে বিপ্লবীদের পূর্বাহ্ণেই সংশয়মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ (duties and obligations of citizens)

নাগরিকের যেমন বহুবিধ অধিকার আছে তেমনি কয়েকটি বিষয়ে তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে।

বর্তমানে নাগরিকদের কর্তব্য ও অধিকার এই উভয় বিষয়ের প্রতিই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নাগরিককে আইন ও নীতি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

(১) **আনুগত্য প্রদর্শন** (allegiance)—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। বিপৎকালে এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করিয়া তাহাকে দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অপরাধ এবং অরাজকতা দমন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে সর্বদা সাহায্য করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে দেশ-রক্ষার্থ নিজেকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে। রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিলে যে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহা পালনের জন্য এবং দেশরক্ষার্থ প্রয়োজন হইলে নাগরিককে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইতে পারে। এই পবিত্র কর্তব্য পালনের জন্য আত্মদানে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

(২) **আইন মান্য করিয়া চলা** (obedience)—আইনকানুন মানিয়া চলা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইন প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং সমাজহিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই আইন মানিয়া চলিবে ইহাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রের আইনকানুন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে মান্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অবশ্য কোনও আইন যদি ন্যায়সঙ্গত না হয়, তবে তাহা রোধ করিবার জন্য জনমত গঠন করিতে হইবে।

কোন কোনও ক্ষেত্রে আইন অমান্য নীতিগত ভাবে সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আইন-বিগর্হিত কার্যকলাপ সমর্থনের পূর্বে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে অন্য কোন উপায়ে অর্থাৎ আইন অমান্য না করিয়া ঐ কাজ করা যাইত কি না।

একবার আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করিলে সমাজ-ব্যবস্থা অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

(৩) **করপ্রদান** (payment of taxes)—যথাসময়ে সরকারী কর দেওয়া নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। সরকারী কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকগণ নিয়মমত নিজ নিজ দেয় অর্থ প্রদান না করিলে সরকার অচল হইয়া পড়িবে।

(৪) **সুবিবেচনাপ্রসূত ভোটদান** (honest exercise of vote or franchise)—ভোট দেওয়াও নাগরিকের একটি কর্তব্য।

প্রত্যেক নাগরিককে সুবিবেচনা করিয়া ভোট দিতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভোটের দ্বারাই এই ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল মন্ত্রিসভা গঠনপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। যে দল সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে নাগরিকদের তাহাকেই সমর্থন করা উচিত। ভোটদানের

পূর্বে বিভিন্ন দলের কর্মসূচীর তুলনামূলক সমালোচনা করা উচিত। ইহা ছাড়া নির্বাচনপ্রার্থী বিভিন্ন ব্যক্তির গুণাগুণও বিচার করিয়া দেখা উচিত।

নাগরিকগণ ভোটদানের ক্ষমতাকে যদি পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে না করেন তাহা হইলে সুনিয়ন্ত্রিত সরকার গঠন সম্ভব হইবে না। ভোট দিবার সময় নাগরিককে মনে রাখিতে হইবে যে সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ তাহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। অসুদ্দেশ্যে বা নির্বিকারচিত্তে ভোট দিলে সমাজের ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষা ও কাজ (elementary education and work)—নাগরিকের যেমন কাজ ও শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে সেইরূপ নিজেকে সুশিক্ষিত করাও তাহার অন্যতম কর্তব্য। প্রত্যেক নাগরিকের তাহার পরিবারের জন্য অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। অধুনা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই পিতা আইনতঃ সন্তানকে সাধারণ শিক্ষা দিতে বাধ্য। জনসাধারণ যদি শিক্ষিত হইয়া উঠে তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদিগকে আর অপকর্মে ক্রীড়নকে পরিণত করিয়া তাহাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমের মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানে প্রত্যেককেই কাজ করিতে হয়। কাজ না করিলে কাহারও আহার্য পাইবার অধিকার নাই। কিন্তু ধন-তান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা অন্যরূপ। সেখানে একরূপ বাধ্য হইয়াই অনেককে অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়।

(৬) সাধারণ সেবা (service generally)—পরিশেষে প্রত্যেক নাগরিকেরই যথাসাধ্য সমাজসেবা করা কর্তব্য। প্রয়োজন হইলে জনহিতৈষণার উদ্দেশ্যে তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জনসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। নাগরিককে পৌরব্যাপারে অর্থাৎ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনে এবং সমাজসেবামূলক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় সৈন্যবিভাগকে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

জনসাধারণের মধ্যে সমাজসেবার মনোভাব না থাকার জন্যই আমাদের গ্রাম বা শহরের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে না। কিছুটা ঔদাসীন্য বশতঃ এবং কিছুটা অনিচ্ছা বশতঃ সৎ ব্যক্তিরা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সংস্রব রাখেন না। ফলে স্বার্থান্বেষী এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষমতা অধিকার করিতেছে। ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেই তৎপর থাকে। জনসাধারণের মঙ্গল সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

নবম অধ্যায়

আদর্শ নাগরিকত্ব

ইতিপূর্বেই আমরা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এই সব অধিকার ও কর্তব্য স্বীকৃত হইয়াছে। নাগরিককে এই কর্তব্য ও অধিকার যথাযথভাবে পালন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

আদর্শ নাগরিকের যোগ্যতা (elements of good citizenship)—প্রত্যেকেরই বুদ্ধি (intelligence), আত্মসংযম (self-control) এবং বিচার-বিবেচনা করিবার শক্তি (conscience) থাকা উচিত। কেহ কেহ নাগরিকের যোগ্যতা নিরূপণের সময় সাধারণ জ্ঞান, শিক্ষা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার (common sense, knowledge and devotion) বিচার করিয়া দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

(১) বর্তমানে প্রায় প্রত্যেককেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভালভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার মত বুদ্ধি প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। এই কার্য পরিচালনার মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি, চরিত্র এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব সকলেরই শাসনকার্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার।

(২) প্রত্যেক নাগরিককে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে। বৃহত্তর সার্বজনীন স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সকলেই যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে তাহা হইলে সমাজ বাঁচিবে কি করিয়া? জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই আইন রচনা করা হয়। প্রত্যেকের কর্তব্য এই আইন মান্য করা।

(৩) প্রত্যেক নাগরিককে নিষ্ঠাবান এবং বিবেচক হইতে হইবে (conscience and devotion)। আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য প্রত্যেকেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।

আদর্শ নাগরিক শুধু যে আইনের ভয়ে কর্তব্য করিয়া থাকে তাহা নহে, অনেক সময় সমাজসেবার মনোভাব লইয়া উৎসাহের সঙ্গে ইহা করিয়া থাকে।

নাগরিক আপন বিচার-বুদ্ধি অনুসারে ভোটদান প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। কাহাকেও ভোটদানে বাধ্য করা যায় না।

আদর্শ নাগরিক জীবনের বাধাবিঘ্ন (hindrances to good citizenship)

বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ সরকার গঠন করিয়া থাকে। জনসাধারণ যাহাতে সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। জনসাধারণ মূর্খ বা অজ্ঞ, উদাসীন বা স্বার্থপর অথবা দলীয় মনোভাবাপন্ন হইলে রাষ্ট্রের আশু উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নাগরিকের নিজের জীবন উন্নত এবং সুগঠিত না হইলে রাষ্ট্র উন্নত এবং সুপরিচালিত হইবে কিরূপে?

ভারতবর্ষে সামাজিক বৈষম্য, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ এবং তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব সুষ্ঠু নাগরিক জীবন যাপনের পথে বহু প্রকার বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যের তাড়নায় পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও আহার্য মিলিতেছে না। চারিদিকেই অভাব, অনটন, হাহাকার। এই অবস্থায় আপন অধিকার ও কর্তব্য সম্যক্‌রূপে জানিবার কর্তব্য ও প্রয়োজন বিশেষভাবে বিদ্যমান।

এইবার আমরা আদর্শ নাগরিক জীবনের বাধাবিঘ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) প্রথমেই **অজ্ঞতা** এবং **মূর্খতার** (ignorance and stupidity) নাম করিতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে অজ্ঞ এবং মূর্খ নাগরিকের পক্ষে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত থাকা সম্ভব নয়।

জ্ঞানই শক্তি (knowledge is power)। কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী এবং উন্নত করিয়া তুলিতে সক্ষম। এইজন্য রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হইল নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অজ্ঞ এবং মূর্খ হইলে দেশে অরাজকতা দেখা দিবে।

(২) দ্বিতীয় বাধা হইল **আত্মসম্ভোগ** (self-indulgence)।

সংযম বিনা শৃঙ্খলার সহিত কাজ করা যায় না। নাগরিকগণ আত্মসংযমী না হইলে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে কি উপায়ে? প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে সমাজে এবং রাষ্ট্রে অচিরেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

(৩) পৌর কর্তব্য পালনের পথে কতকগুলি বাধা আছে। যেমন, **(ক) উদাসীনতা** (indolence), **(খ) ব্যক্তিগত স্বার্থ** (private self-interest) এবং **(গ) দলীয় স্বার্থ** (party spirit)।

(ক) **উদাসীনতা***—আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—ভাগের মা গঙ্গা পায় না। সাধারণতঃ পাঁচজনের কাজে কেহ তেমন মাথা ঘামায় না। সবাই আপনার দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ আপন কর্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন থাকেন। সকলেই ভাবেন, কাজ শুধু তো তাঁহার একলার নয়। যদি তিনি নাই বা করেন, আরও তো অনেকে আছেন। পৌর কর্তব্যের প্রতি এইরূপ উদাসীন মনোভাব সমাজের পক্ষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিহিসাবে নাগরিকের স্বতন্ত্র ভূমিকা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। জীবনসংগ্রামের কঠোরতা, খেলাধূলা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রত্যেকের উচিত যথাসময়ে আপন সাধ্যমত সাধারণ কর্তব্যসমূহ পালন করা। সকল সময়ে বিবেচনা করিয়া ভোট দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সকলের সহযোগিতা ভিন্ন কোন বড় কাজ করা বর্তমান যুগে সম্ভব নয়।

মানুষ কর্মজগতে যেরূপ উদাসীন থাকে চিন্তাজগতেও তাহার সেরূপ ঔদাসীন্য দেখা যায়। কিসে সমাজের কল্যাণ হইবে সে সম্পর্কে সকলেরই গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে সর্বদা সচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে।

(খ) **ব্যক্তিগত স্বার্থ**—অনেক সময় আমরা আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ এবং জন-স্বার্থের ঊর্দ্ধ্বে ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্থান দিয়া থাকি। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য টাকা দিয়া ভোট ক্রয় করা, কর না দেওয়া, আত্মীয়স্বজনকে চাকুরী দেওয়া, সাধারণের তহবিল আত্মসাৎ করা ইত্যাদি নানা অপকর্ম করা হয়। আইনসভার সদস্যগণ অনেক সময় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কোন এক শ্রেণীর উপর অধিক করভার চাপাইয়া থাকেন; আবার কোন শ্রেণীর করভার হ্রাস করিয়া দেন। কোন বিশেষ অঞ্চলের উন্নতিকল্পে প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয়। আবার হয়ত কোন অঞ্চলের জরুরী প্রয়োজনেও অর্থ বরাদ্দ করা হয় না। এইরূপ নানা উপায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির

* রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদনে উদাসীন বলিতে বিপৎকালে যুদ্ধ না করা, ভোটদানে অবহেলা, সরকারী চাকুরী গ্রহণে অনিচ্ছা, শিক্ষা গ্রহণ না করা ইত্যাদি বুঝায়।

হীন চেষ্টা আমাদের নাগরিক কর্তব্য পালনের পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। আদর্শ নাগরিককে এইজন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

(গ) **দলীয় স্বার্থ**—বর্তমানে সকল রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল আছে। গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে এইরূপ দল অপরিহার্য। কিন্তু সময় সময় দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে। লোকে তখন দেশের ভালমন্দের বিচার না করিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে। যে কোন উপায়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নিজ দলের জয়লাভকে একমাত্র লক্ষ্য মনে করা হয়। ফলে দেশের মধ্যে দলাদলি এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। লোকের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

যাহাতে নিজ দলের প্রতি আনুগত্য দেশের প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা বড় হইয়া না উঠে সে দিকে প্রত্যেকের সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

ব্রাইসের মতে প্রতিকারবিধি

এই সব বাধাবিঘ্নের প্রতিকার দুই উপায়ে করা যাইতে পারে—(ক) **শাসনতান্ত্রিক উন্নতিবিধান**—আইন সংস্কার ইত্যাদি এবং (খ) **জনগণের নৈতিক উন্নতিবিধান**—শিক্ষা বিস্তার, মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি।

(ক) **শাসনতান্ত্রিক উন্নতিবিধান**—যদি রাষ্ট্র নাগরিকের উন্নতির কোনরূপ ব্যবস্থা না করে, উপরন্তু তাহার উন্নতির পথে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে তবে ঐ রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করা আশু কর্তব্য।

দেশে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই জাতীয় স্বার্থের সহিত আপন স্বার্থকে অভিন্ন করিয়া দেখিতে শিখে, যাহাতে সে মনে করিবে যে রাষ্ট্রের উন্নতি হইলে তাহার নিজেরও উন্নতি হইবে।

(খ) **জনগণের নৈতিক উন্নতিবিধান**—জনসাধারণের নৈতিক মান বা চরিত্র উন্নত করিতে হইলে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষা বিস্তারের ফলে মানুষের চরিত্র উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদাসীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দলীয় স্বার্থ ইত্যাদি সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি ক্রমশঃ দূর হইবে।

দশম অধ্যায়

পরিবার, গ্রাম, শহর ও স্বদেশের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক

এইবার আমরা নাগরিকত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পরিবার, গ্রাম, শহর এবং স্বদেশ—ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত নাগরিকের সম্পর্ক রহিয়াছে।

আমরা প্রথমতঃ স্থানীয়, জাতীয় এবং সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক (local, national, universal) দৃষ্টিভংগী হইতে নাগরিকের মর্যাদা এবং অধিকার ও কর্তব্য বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়তঃ নাগরিকতাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের বিভিন্ন স্তর পর্যালোচনা করিব।

নাগরিকত্ব এবং পরিবার (citizenship and the family)**—**সমাজে পরিবারের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা নাগরিকত্বের শিক্ষাকেন্দ্র। গৃহকর্তাকে নাবালকদের ভরণপোষণ করিতে হয়। সমাজ গঠনের প্রথমাবস্থায় পরিবারে পিতার কোনরূপ স্থান বা মর্যাদা ছিল না। মাতা এবং সন্ততিদের লইয়া এক একটি পরিবার গড়িয়া উঠিত। সকলেই গৃহকর্তার অনুগত ছিল। কালক্রমে এই অনুগত থাকার অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগেও আমরা সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকি। এইভাবে গৃহে আমরা নাগরিক জীবনের একটি প্রধান গুণ—আনুগত্য প্রদর্শন—শিক্ষা করিয়াছি।

কালক্রমে পরিবার দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আজও উহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। পরিবারকে একটি ছোট রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এইখানে ব্যক্তি সর্বপ্রথম পারিবারিক মঙ্গল অর্থাৎ সার্বজনীন মঙ্গল সম্পর্কে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। সে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে। এইভাবে আত্মসংযমের মধ্যে সে একজন আদর্শ নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠে।

আবার গৃহে ব্যক্তির কয়েকটি কর্তব্যও আছে। পিতামাতার কর্তব্য সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত করার ব্যবস্থা করা। পরিশেষে গৃহের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এইজন্য প্রত্যেক নাগরিককে স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

নাগরিকত্ব এবং গ্রাম বা শহর (citizenship and the village or the town)—আমাদের মধ্যে কেহ গ্রামে বসবাস করে। আবার কেহ বা শহরে চলিয়া যায়। পূর্বে কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি পরিবার একসঙ্গে বাস করিত। এইভাবে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে। শহরের পত্তন হইয়াছে অনেক পরে। কোন এক স্থানে শিল্পবাণিজ্য যখন কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে তখন দলে দলে মানুষ জীবিকার জন্য সেইখানে বসবাস করে। এইভাবে শহরগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। রাজধানী বা তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করিয়াও কোন কোন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

গ্রাম এবং শহরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। শহরের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং নানাবিধ কাঁচামাল গ্রাম হইতে আমদানী হয়। আবার শহর হইতে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রামে সরবরাহ করা হয়।

পুরাকালে ভারতীয় গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ গ্রামবাসীদের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রামের মধ্যেই উৎপন্ন বা তৈয়ারী করা হইত। প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট কাজ করিত। এই শ্রমবিভাগের (division of labour) ভিত্তিতেই ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন হয়। বর্তমান যুগে এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। যে কেহ ইচ্ছামত যে কোন কাজ করিতে পারেন। গ্রামগুলিও আর পূর্বের মত সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি আজ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।

বর্তমানে প্রধান প্রধান গ্রাম্য সমস্যা হইল শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সরবরাহ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত এই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। গ্রামের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক গ্রামবাসীর সাধ্যমত পরিশ্রম করা কর্তব্য।

শহরের সমস্যা প্রায় গ্রাম্য সমস্যারই অনুরূপ; শহরে বাসস্থানের ব্যবস্থায় জল নিষ্কাশন, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি আরও কতকগুলি কাজ করিতে হয়। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি এই সব কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। শহরের উন্নতি এবং বিশেষ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব রহিয়াছে। উক্ত দায়িত্ব অবহেলা করিয়া পালন না করিলে নিজেদেরই ক্ষতি হইবে।

নাগরিকত্ব ও দেশ (citizenship and the country)—ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গ্রাম, শহর, এমন কি প্রদেশের সীমা ছাড়াইয়া মানুষ এখন সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ আজ এক দুনিয়ার (one world) স্বপ্ন দেখিতেছে। এই

অবস্থায় প্রত্যেকের কর্তব্য হইল বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কল্যাণে আঞ্চলিক স্বার্থ ত্যাগ করা।

বিশ্বের নাগরিক (the citizen of the world)—মানুষ আজ সারা পৃথিবীর কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেক দেশেই আজ একই রকম সমস্যা দেখা দিয়াছে। সকল দেশের মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মানুষকে স্ব স্ব দেশের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিতে হইবে এবং নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক নাগরিকরূপে গণ্য করিতে হইবে। মানব-সভ্যতা আজ যে সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা দূর করিতে হইলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে জাতীয় স্বার্থ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী বলিয়া মনে করা ভুল। যে সকল জাতীয় স্বার্থ মানবতার কল্যাণ-বিরোধী সেগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। জাতিসংঘ (League of Nations) আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N.O.) সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে যদি আমরা জগতে স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করি।

একাদশ অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন সরকারী ক্ষমতার পৃথকীকরণ

মোটামুটিভাবে সরকারী কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—আইন-বিষয়ক, শাসনবিষয়ক এবং বিচারবিষয়ক। প্রত্যেক দেশেই এই তিন প্রকার কার্য করিবার জন্য তিনটি পৃথক বিভাগ রহিয়াছে। যথা,—আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ। আইনবিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন করা; বিধিবন্ধ আইন পালিত হইতেছে কি না, শাসনবিভাগকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; আর ক্ষেত্রবিশেষে বিধিবন্ধ আইন কিভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহা নির্ধারণ করা বিচারবিভাগের কর্তব্য।

কার্যের বিভিন্নতা অনুসারে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উপর সরকারী কর্তব্যসমূহ অর্পণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সরকারী কার্যের পৃথকীকরণ

(Separation of Powers)

নীতি এবং উপযোগিতা—ফরাসী লেখক মঁতেস্কো (Montesquieu) সর্বপ্রথম ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে (The Spirit of Laws)* সরকারী ক্ষমতাসমূহ তিন ভাগে বিভাগের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মঁতেস্কো ইংলণ্ডের শাসন-পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার আলোচিত এই নীতি ফ্রান্সে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবী নেতৃবর্গকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

---

* (The Spirit of Laws) গ্রন্থে মঁতেস্কো লিখিয়াছেন—"শাসনক্ষমতা এবং আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলে স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে না। কারণ এই অবস্থায় একই রাজা বা আইনসভা পীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। আইনসভাকে যদি বিচারক্ষমতাও দেওয়া হয় অর্থাৎ বিচারক স্বয়ং যদি আইন-রচয়িতা হন তাহা হইলে জনসাধারণের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। আবার শাসনকর্তৃপক্ষকে যদি বিচার-ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে বিচারক উৎপীড়ক হইয়া উঠিতে পারেন।"

নীতিটি সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারেঃ—

ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে স্বৈরাচার দেখা দিতে পারে। অতএব ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার্থ নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক—

(১) আইনবিষয়ক, শাসনবিষয়ক এবং বিচারবিষয়ক ক্ষমতা তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(২) প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে; এবং

(৩) প্রত্যেক বিভাগ স্বীয় নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

আইন-পরিষদ আইন প্রণয়ন করিবে, বিচারবিভাগ আইনসমূহের ব্যাখ্যা করিবে এবং শাসনবিভাগ আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবে।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রবর্তনের পূর্বের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তখন স্বৈরাচারী নৃপতিগণ একাধারে শাসক, আইন-রচয়িতা এবং বিচারক ছিলেন। তাঁহাদের মুখের কথাই ছিল আইন। রাজা স্বয়ং আইন প্রয়োগ করিতেন এবং আইন অমান্য করিলে দণ্ড দিতেন। এক কথায় রাজাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না; সব কিছুই রাজার আদেশ বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত।

কোন ব্যক্তি বা বিভাগের হস্তে সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলিয়া দিলে কেবল যে জনসাধারণের জীবন ও ধনসম্পত্তি বিপন্ন হইবে তাহা নহে, কোন বিভাগই সুপরিচালিত হইবে না। বিভিন্ন রূপ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট পৃথক পৃথক বিভাগগুলির দ্বারাই বর্তমান গভর্নমেণ্টসমূহের কার্যাবলী সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হইতে পারে।

সমালোচনা—কোনও সরকারকেই সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক তিনটি বিভাগে ভাগ করা সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতার* জন্য কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমতাবণ্টন আবশ্যক সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তিনটি বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করিলে সুশাসন করা সম্ভব হইবে না।

---

* অধ্যাপক লাস্কি ম্যাডিসনের (Madison) নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সমস্ত ক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার নামই অত্যাচার (tyranny)
—A Grammar of Politics, ২৯৭ পৃঃ।

সরকারকে একটি অখণ্ড বস্তুরূপে কল্পনা করিতে হইবে। ইহার প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে সুশাসন সম্ভব হইবে না।

বস্তুতঃ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইন-পরিষদের উপর শাসনবিভাগের প্রভূত কর্তৃত্ব আছে এবং শাসনবিভাগের উপর আইন-পরিষদেরও কিছু কর্তৃত্ব রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রেট বৃটেনের কথা মনে পড়ে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ কোন না কোন বিভাগের প্রধান কর্তা। কিন্তু আইন প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। আবার শাসন পরিচালনা ব্যাপারে আইনসভা শাসন-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

অধিকন্তু নীতির দিক হইতে সরকারী বিভাগগুলি পরস্পর সমান হইলেও কার্যতঃ তাহা নহে। বৃটিশ সরকারের আইনবিভাগ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং বিচার-বিভাগ সর্বাপেক্ষা দুর্বল।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একমাত্র সদাজাগ্রত জনমতই শাসনকর্তৃপক্ষকে সংযত রাখে। মঁতেস্কো কর্তৃক নির্দেশিত শাসনতান্ত্রিক বাধানিষেধই ইহার একমাত্র নিয়ামক নহে।

The Legislature

আইনসভা—আইনসভা রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান অঙ্গ। "সাধারণতঃ আইনসভার অভিমত অনুসারে শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের ক্ষমতা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে"—লাস্কি। আইনসভা নানাভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আইনসভার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়। ইহার সর্বপ্রধান কার্য হইতেছে আইন প্রণয়ন করা এবং এই উদ্দেশ্যে খসড়া আইন সম্বন্ধে আলোচনা করা। সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা বাজেট আলোচনা করিয়া থাকে।

গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আইনসভা শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। শাসন-তান্ত্রিক নীতি সম্পর্কেও আইনসভায় আলোচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আইনসভাই মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়া থাকে। আইনসভার সভ্যদের ইচ্ছা এবং আস্থার উপরেই মন্ত্রিমণ্ডলীর স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে; অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে মন্ত্রিরা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষকে পদচ্যুত করিয়া অন্যায়ের জন্য দণ্ড দান করিতে পারে, বিচারপতিগণকেও অসদাচরণের জন্য কর্মচ্যুত করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আইনসভা কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে না; ইহা সরকারী নীতি নির্ধারণ এবং কার্যাবলীর সমালোচনাও করিয়া থাকে এবং প্রয়োজনবোধে শাসনসংস্কার করে।

আইনসভার গঠনপ্রণালী—আইনসভা দুই রকমের হইয়া থাকে—এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইনসভা (unicameral legislature) এবং দুই-পরিষদবিশিষ্ট আইন-সভা (bicameral legislature)। অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রেই আইনসভা দুই পরিষদে বিভক্ত, একটিকে উচ্চ বা দ্বিতীয় পরিষদ (upper or second chamber) এবং অপরটিকে নিম্ন পরিষদ (lower chamber or lower house) বলা হয়।

নিম্ন পরিষদের সমস্ত সদস্যই ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ নিম্ন পরিষদের ক্ষমতা উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক রাষ্ট্রে করনির্ধারণ এবং সরকারী ব্যয়বরাদ্দ ব্যাপারে এই পরিষদের চূড়ান্ত ক্ষমতা রহিয়াছে। উচ্চতর পরিষদের সদস্যপদ অনেক সময়ে উত্তরাধিকারসূত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, গ্রেট বৃটেন এবং জাপানে। কানাডা প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে কেহ কেহ চিরজীবনের জন্য উচ্চতর পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে উচ্চতর পরিষদের সদস্য সীমাবদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের অপেক্ষা দীর্ঘতর সময়ের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা উচ্চতর পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন তাঁহাদের বয়স এবং অন্যান্য যোগ্যতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

The Second Chamber

উচ্চতর পরিষদের উপযোগিতা—এক-পরিষদবিশিষ্ট আইনসভা অনেক সময় অতি দ্রুত এবং অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। অনেক সময় ইহার সদস্যগণ সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলেন। দ্বিতীয় পরিষদে আইন প্রণয়ন করিবার পূর্বে আইন-সংক্রান্ত নানা বিষয় ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার অবসর মিলিবে। কখনও কখনও এই দ্বিতীয় পরিষদকে রাজনীতিকদের পরিষদ (chamber of statesmen) বলা হয়। ইহার সদস্যগণ সকলেই প্রায় বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ এবং রক্ষণশীল; কিন্তু নিম্ন পরিষদের কার্যাবলী ব্যাহত করাই ইহার উদ্দেশ্য নহে, ইহার কার্য হইল নিম্ন পরিষদের কার্যাবলী ভালভাবে পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখা। নিম্ন পরিষদ আইন পাশ করিবার পূর্বে ভাল করিয়া তাহা বিশ্লেষণ নাও করিতে পারে। উচ্চ পরিষদ বিলম্ব করিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য তাহা আবার নিম্ন পরিষদে ফেরৎ পাঠাইতে পারে। এই প্রকার বিলম্বের জন্য উত্তেজনা অনেক হ্রাস পাইবে এবং শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। তখন ইহা নিরপেক্ষভাবে আইনটি বিচার করিয়া দেখিতে পারে।

উচ্চতর পরিষদ থাকার অসুবিধা—আবে সিয়ে (Abbé Siéyés) বলিয়াছেন, "উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয় তবে তাহা অনাবশ্যক। আর

যদি মতানৈক্য ঘটে, তবে তাহা অনিষ্টকর।" এই যুক্তি নানা কারণে সমর্থন করা যাইতে পারে। উচ্চ পরিষদ সাধারণতঃ বিত্তশালী এবং রক্ষণশীল ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয়। সুতরাং ইহা প্রায়ই নিম্ন পরিষদের উদারমতাবলম্বী ও প্রগতিশীল বিধি-ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া থাকে, এইজন্য দ্বিতীয় পরিষদের অস্তিত্ব গণতন্ত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী।

অধ্যাপক লাস্কি তীব্র ভাষায় দুই-পরিষদবিশিষ্ট আইনসভার সমালোচনা করিয়াছেন। উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের উপর তদারকের কাজ করিয়া থাকে বলিয়া যে যুক্তি দেখান হয় অধ্যাপক লাস্কি তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে আইন আকাশ হইতে পড়িয়া আইনপুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় না। অধিকাংশ আইনই দীর্ঘ আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন পরিষদের অবিবেচনাপ্রসূত আইন বিধিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে উচ্চ পরিষদের আবশ্যকতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণতঃ দ্বিতীয় পরিষদে প্রথম পরিষদের আলোচনার পুনরাবৃত্তিই করা হয়। ইহাতে অযথা সময় নষ্ট হয়।

ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষে নবশাসনতন্ত্রে ভারতীয় ইউনিয়নে ও কয়েকটি প্রদেশে দুইটি পরিষদ রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

The Executive

শাসনবিভাগ—শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের অভিপ্রায়কে কার্যে রূপান্তরিত করে। শাসনবিভাগের কার্য হইল শাসনকার্য নির্বাহ করা, আইন কার্যে পরিণত করা এবং বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করা।

শাসনবিভাগের গঠনপ্রণালী—নৃপতি অথবা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিমণ্ডলী এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় সরকারী কর্মচারী লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ভোটে নির্বাচিত হন এবং নৃপতি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নৃপতি অথবা রাষ্ট্রপতি আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সাধারণতঃ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ অথবা সরকারী কর্মচারী-নিয়োগ কমিশন (Public Service Commission) অথবা অন্য কোন নিয়োগকর্তা শাসনবিভাগের নিম্নতন অথবা স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। শাসনকার্য নির্বাহ করা শাসনবিভাগের প্রধান কর্তব্য হইলেও শাসনবিভাগকে আইনসভা ও বিচারবিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। শাসনবিভাগ আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ সংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষমতার অধিকারী। শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভা আহ্বান করিতে, আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের

জন্য স্থগিত রাখিতে বা আইনসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আইনসভার গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদন অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে। শাসন-তন্ত্রে বর্ণিত উপায়ে ইহা জরুরী আইন বা অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারে। শাসন-বিভাগ আইনসভার আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ অথবা এ সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া থাকে। বিচারপতিগণ শাসনবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। শাসনবিভাগ আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে অথবা তাহাদের দণ্ডাদেশ মকুব করিতে অথবা দণ্ডকাল হ্রাস করিতে পারে।

শাসনবিভাগে ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর আছে। রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী সমগ্রভাবে বিভাগটির সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন। তাঁহার অধীনে একজন সেক্রেটারী অথবা বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা থাকেন। প্রধান বিভাগগুলি হইল—(১) দেশরক্ষা—নৌ, বিমান এবং সৈন্য বিভাগ; (২) বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র; (৩) স্বরাষ্ট্র—আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ, জেলখানা ইত্যাদি ব্যবস্থা; (৪) অর্থ; (৫) শিক্ষা; (৬) শ্রম এবং শিল্প; (৭) যানবাহন। অন্যান্য বিভাগগুলির মধ্যে কৃষি, জনস্বাস্থ্য, বাণিজ্য, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আমলাতন্ত্র এবং স্থায়ী সরকারী কর্মচারী (সিভিলিয়ানতন্ত্র)—সচরাচর দুই প্রকারের শাসনপ্রণালী প্রচলিত—গণতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্র (bureaucracy)। গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে। গণতন্ত্র জনসাধারণকে প্রগতির পথে চালিত করে। শাসন-পরিচালকবর্গের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আদর্শবাদ এই শাসনব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই ব্যবস্থায় অযোগ্যতা, অপব্যয় ও উৎকট অভিনবত্ব দেখা যায়। পক্ষান্তরে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শের কোন অবকাশ নাই—ইহা গতানুগতিক ও মামুলী পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার ফলে আমলাবৃন্দ দৈনন্দিন শাসনকার্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগ আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এবং আংশিকভাবে আমলাতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি অথবা মন্ত্রিসভা জনসাধারণের প্রতিনিধি। জনমতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন শাসনকার্যের ভার স্থায়ী রাজপুরুষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ইঁহারা আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি। ইঁহারা সকলেই সুদক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত। প্রত্যেককেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। অনেক সময় বৃটিশ গণতন্ত্রকে ছদ্মবেশী আমলাতন্ত্র বলা হয়।

ভারতবর্ষে আমলাতন্ত্রের প্রতাপ অপরিসীম। রাষ্ট্রে কর্মপটু আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু শাসননীতি নির্ধারণ ব্যাপারে ইঁহাদিগকে সর্বদা পরিহার করিয়া চলাই রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক। আইনসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই শাসননীতি নির্ধারণ করিবেন ইহাই কাম্য। প্রথমে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সম্যকরূপে জানিতে হইবে; শাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের কর্তব্য হইল অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতার সহিত এই সমস্ত অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থা করা। এই অভাব মোচনের মধ্যে দায়িত্বশীল অথবা গণতান্ত্রিক সরকারের সার্থকতা।

The Judiciary

বিচারবিভাগ—বিচারবিভাগের কার্য হইল বিভিন্ন স্থান হইতে আইনের বিধানসমূহ সংগ্রহ করিয়া ঐগুলির ব্যাখ্যা করা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা মামলায় তাহা প্রয়োগ করা। বিচারপতিগণ ফৌজদারী মামলায় অপরাধীর দণ্ডবিধান এবং দেওয়ানী মামলায় অধিকার সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। বিচার-পতিগণ যে কেবলমাত্র বিবদমান দুই ব্যক্তির প্রতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তাহাই নহে; উপরন্তু রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে বিরোধের মীমাংসাও তাঁহাকে ন্যায্যভাবে করিতে হয়। নাগরিক যাহাতে সুবিচার পায় তৎপ্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলে বা বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা বিচার করা দুঃসাধ্য হইলে বিচারপতিগণ প্রায়ই প্রচলিত প্রথা, রীতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিজ বিবেচনামত সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন। এইভাবে বিচারক-প্রণীত (judge-made) আইনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকার আইন ও নীতিবিজ্ঞান (equity) আইনশাস্ত্রের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আইন সম্পর্কে বিচারপতিগণের বিশুদ্ধ ও বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যাহাতে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন তজ্জন্য আইনসভা এবং শাসন-বিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বাধীন রাখিতে হইবে। নিরপেক্ষ বিচারের জন্য বিচারপতিদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, তাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ স্থায়ীভাবে নির্ধারণ এবং বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন অবস্থায় বিশেষ কারণ ব্যতীত অপসারণ না করিবার রীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

গুণ ও যোগ্যতানুসারে বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে। নিয়োগকালে কোন প্রকার রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক অথবা দলগত প্রভাব বিস্তার করা উচিত নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের কার্যাবলী

সরকারের কার্যাবলী (Functions of Government)

আধুনিক কোন সরকার বা গভর্নমেণ্টের কার্যাবলীর শ্রেণী বিভাগ ও সংখ্যা গণনা করিবার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে ঐগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিব। কারণ কি আদর্শ সরকারের অনুসরণ করা উচিত এবং কি পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা আবশ্যক সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বর্তমানে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন মনে জাগে। রাষ্ট্র কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং এই নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করা যায় কি না? সুতরাং সরকারের কার্যকলাপের ক্ষেত্র এবং সীমা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মত প্রচলিত আছে—ব্যক্তিতন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ। ব্যক্তিতন্ত্রবাদ (individualistic theory) অনুযায়ী রাষ্ট্রের কার্য-ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত এবং নিজ ইচ্ছামত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের বিকাশলাভের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদ (socialist theory) অনুযায়ী সরকারী কার্যক্ষেত্র যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইবে প্রজার আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কল্যাণসাধন।

১। **নৈরাজ্যবাদ** (anarchist theory) –উল্লিখিত মতবাদ দুইটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা আরও একটি মতবাদের উল্লেখ করিব। এই মতবাদটির নাম নৈরাজ্যবাদ। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; সেজন্য কার্যতঃ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত আলোচনার সহিত এই মতবাদের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদের মত রাষ্ট্রে অবিশ্বাসী। এইজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে এই মতবাদটি আলোচনা করিব। ব্যক্তিতান্ত্রিক ও নৈরাজ্যবাদী উভয়েই সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ম ও বাধানিষেধকে মূলতঃ অন্যায় বলিয়া মনে করে। ব্যক্তিতন্ত্রবাদ অপরিহার্য প্রয়োজনে অবশ্য সামান্য নিয়ন্ত্রণ এবং সেই জন্য রাষ্ট্রের

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদের মূল কথা এই যে, সর্বপ্রকার বিধিনিষেধই অন্যায় এবং রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

নৈরাজ্যবাদের মতে দেশে শাসনব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। মানুষ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। সে নিজেই আপন ভালমন্দ বিচার করিবে। তাহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। নৈরাজ্যবাদীরা সরকারকে স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া মনে করে।

নৈরাজ্যবাদীর মতে সাধারণতঃ স্বার্থপর, সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সরকার পরিচালনা করিয়া থাকে। ভীতি প্রদর্শন এবং বল প্রয়োগ করিয়া ইহারা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে। নৈরাজ্যবাদীরা বলপ্রয়োগ নীতি স্বীকার করেন না—ইঁহাদের বিশ্বাস যে, একমাত্র রাষ্ট্রবিহীন সমাজের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

নৈরাজ্যবাদের সমালোচনা (criticism of the anarchist theory)—অধ্যাপক জেথরো ব্রাউন (Jethro Brown) নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—

(ক) নৈরাজ্যবাদিগণ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা প্রতিকারের যে বিধান দিয়াছেন তাহা সঠিক নাও হইতে পারে।

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের শাসক হইবে—ব্যক্তির এই আত্মশাসনাধিকারের উপর নৈরাজ্যবাদিগণ যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা খুবই সমীচীন।

(গ) রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ক্ষমতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের দাবী করিয়া নৈরাজ্যবাদিগণ সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

(ঘ) নৈরাজ্যবাদিগণ বিশ্বাস করেন যে, পুলিশ ও সৈন্যের পরিবর্তে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে।

২। **ব্যক্তিতন্ত্রবাদ** (individualistic theory)—নৈরাজ্যবাদীর মত ব্যক্তি-তান্ত্রিকও সমস্ত প্রকার বাধানিয়ন্ত্রণকে অনিষ্টকর মনে করেন। ইঁহাদের বিশ্বাস, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের তাগিদে ইঁহারা রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়াছেন। সরকারী ক্ষমতা যতই কম থাকিবে ততই মঙ্গল। দেশে শান্তি শৃংখলা এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ক্ষমতা সরকারের থাকা উচিত।

ব্যক্তিতান্ত্রিকগণ কারখানা আইন, সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা, দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং বেকারদের জন্য সরকারী সাহায্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার সরকারী ব্যবস্থার বিরোধী। ইঁহাদের মতে "সরকার একটি পুলিশসংঘ (police organisation) বিশেষ। ইহার কর্তব্য হইল চুক্তি পালনে মানুষকে বাধ্য করা, শান্তি রক্ষা করা এবং অপরাধীর দণ্ডবিধান করা। ইহার বেশী কোনও কাজ সরকারের করা উচিত নহে"।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি (arguments in favour of individualism)

(ক) মানুষের সকল চেষ্টার মূলে পূর্ণ বিকাশের আকাঙ্ক্ষা। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ—সব কিছুরই লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে সকল দিক থেকে ফুলের মতন ফুটিয়ে তোলা। আসল কথা, ব্যক্তির বিকাশের জন্যই সব কিছু। যত কিছু আইন, যত কিছু কর্তৃত্বের দাবী—সকলের লক্ষ্য ব্যক্তির জীবনকে বিকশিত করে তোলা। ব্যক্তির এই আত্মবিকাশের পথে রাষ্ট্র যদি বাধা দেয় তাহা হইলে মানুষের জীবন পঙ্গু হইয়া পড়িবে। তাহার কর্মশক্তি এবং উদ্যম হ্রাস পাইবে, তাহার ব্যক্তিত্ব খর্ব হইবে।

(খ) ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার সহিত বিবর্তন-বাদের (Theory of Evolution) পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া প্রত্যেককে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। ফলে যাহারা বলবান বা যোগ্য তাহারাই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে।

(গ) মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থান্বেষী। কি উপায়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে তাহা প্রত্যেকেই ভালভাবে জানে। এই প্রকার যুক্তি অনুসারে এই মতবাদ সমর্থন করা যায়।

(ঘ) ব্যক্তিতন্ত্রবাদ একটি বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ প্রবর্তিত হইলে সর্বাপেক্ষা বেশী ধনোৎপাদন হইবে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি পাইবে, উৎপন্ন দ্রব্য উন্নত শ্রেণীর অথচ অল্প মূল্যের হইবে।

(ঙ) ব্যক্তি অপেক্ষা সরকারকে ক্ষমতাশালী মনে করা ভুল। কারণ ব্যক্তিই সরকার গঠন করিয়া থাকে। অতএব ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগ সরকার অপেক্ষা ব্যক্তি ভাল বুঝিয়া থাকে।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের সমালোচনা (criticism of the individualistic theory) —ব্যবহারিক নীতি হিসাবে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ অচল। নিছক ব্যক্তিতন্ত্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কোন সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। ব্যক্তিতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তির অভাব নাই।

(ক) রাষ্ট্র অতি মন্দ জিনিষ, ইহা বিশ্বাস করা অন্যায়। ইতিহাসে বহু প্রমাণ আছে যে রাষ্ট্র মানবসভ্যতার উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

(খ) রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে বলিয়া ব্যক্তিতন্ত্রবাদিগণ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সত্য নহে। বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রের মত একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত একলা কোন মানুষের পক্ষে আধুনিক জীবনের এত বিচিত্র, ব্যাপক ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

(গ) সরকারকে স্বাধীনতার পরিপন্থীরূপে বর্ণনা করিয়া ব্যক্তিতন্ত্রবাদিগণ স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। সরকার ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নহে, সুগঠিত এবং সুপরিচালিত সরকারের কর্তব্য হইল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা। বস্তুতঃ রাষ্ট্র আমাদের অধিকার রক্ষা করে বলিয়াই ব্যক্তি আপন অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়।

(ঘ) অধিকন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই যে অনিষ্টকর হইবে এমন কোন কথা নাই। চরিত্রগঠনে শৃঙ্খলা এবং শাসন যেমন আবশ্যক, স্বাধীনতাও তেমনি আবশ্যক। ব্যক্তিতন্ত্রবাদিগণ সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তিকে অকারণ প্রাধান্য দিয়াছেন।

(ঙ) সরকার অপেক্ষা ব্যক্তি আপন স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝে সর্বদা এরূপ মনে করাও ভুল। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্বার্থ বা মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিবার মত বুদ্ধি নাই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে ব্যক্তির স্বার্থ ব্যক্তি অপেক্ষা সরকার ভাল বুঝিয়া থাকে।

(চ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা একচেটিয়া ব্যবসায় দ্বারা প্রায়ই ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং সমাজের স্বার্থে সরকারের হস্তক্ষেপ আবশ্যক। সরকারের সাহায্য ব্যতীত দরিদ্রেরা ধনীদের সহিত সমান সুযোগ উপভোগ করিতে পারিবে না।

(ছ) পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং বিভিন্ন জাতিসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য আরও ব্যাপকভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সংরক্ষণ শুল্ক, জরুরী প্রয়োজনে অর্থসাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে সরকার সাহায্য না করিলে কোন দেশের শিল্পবাণিজ্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

৩। **সমাজতন্ত্রবাদ** (Socialist theory)—সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতবাদ অনুযায়ী সরকারী কার্যক্ষেত্র যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হওয়া উচিত।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের আদর্শ হইল সমাজসেবা। ব্যক্তি এবং সমাজের স্বার্থ একমাত্র সরকারই রক্ষা করিতে পারেন। সাধারণতঃ ব্যক্তি নিজ স্বার্থ লইয়া বিব্রত থাকেন।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি (arguments in favour of socialism)—ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের জন্য সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া থাকে।

(ক) সমাজতন্ত্রবাদ এমনভাবে সমাজ পুনর্গঠন করিতে চায় যাহাতে উৎপন্ন সম্পদ সকলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করা যাইবে। বর্তমান উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থায় অসাম্য থাকার জন্য সমাজে ধনী প্রতিদিন অধিকতর ধনশালী হইতেছে আর দরিদ্র প্রতিদিন দরিদ্রতর হইতেছে। সমাজতন্ত্রবাদই একমাত্র এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে পারে।

(খ) সমাজতন্ত্রবাদ ন্যায় ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জমি ও খনিসমূহ আলো ও বাতাসের মত প্রকৃতির দান। অতএব ইহাদের উপর সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হইতে পারেন না।

(গ) সমাজতন্ত্রবাদ সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্প জাতীয়করণের পক্ষপাতী। শিল্পগুলি জাতীয়করণ হইলে সরকার জনস্বার্থের প্রয়োজনে কারখানা, ডাক, তার, রেল ইত্যাদি সামাজিক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রকে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেকে যাহাতে তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমানে প্রায় সর্বদেশেই সরকার মালিকশ্রেণীকে শ্রমিককে অবাধে শোষণ করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকই ধনোৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাকে বাঁচিবার মতও মজুরী দেওয়া হয় না। সমাজতন্ত্রবাদ এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমূলে উচ্ছেদ করিতে চায়।

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা (criticism of the socialist theory)—সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান যুক্তি হইলঃ—

(ক) সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষের ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা বিনষ্ট হইবে। জনসাধারণ যদি সম্পত্তি অর্জন এবং উপভোগ করিতে না পায় তাহা হইলে

তাহারা কাজ করিতে আগ্রহ দেখাইবে না। তাহাদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিবে। ফলে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্নিহিত নীতি হইল যে, সুদক্ষ এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিরা নিজ চেষ্টায় যাহা অর্জন করিবে অলস এবং অযোগ্য ব্যক্তিরা তাহাদের সহিত সমানভাবে ফল ভোগ করিবে।

(খ) সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্রের কার্যক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের উপর যে সব কার্যভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নাই।

(গ) রাষ্ট্রকেই যদি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় তাহা হইলে ব্যক্তি নগণ্য হইয়া পড়িবে। সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হারাইয়া মানুষ রাষ্ট্রের অধীনে দাসজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে।

সিদ্ধান্ত (conclusion)—ব্যক্তিতন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এই দুইটি মতবাদের মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। উভয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন (changed outlook)—সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। ব্যক্তিতন্ত্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কোন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। তেমনি পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ এখন পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আসল কথা এই যে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোথায় সংগত এবং কোথায় অসংগত তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না।

সমাজের প্রথম যুগে রাষ্ট্রের কার্যপরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যপরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। বর্তমানে সার্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সমাজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসার—বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রেই ব্যক্তিগত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন সমস্যা বিচার করা হয় না। সকলেই আজ সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতির কথা চিন্তা করিতেছেন। সর্বত্রই সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি স্বীকৃত হইতেছে। সকলেই বিশ্বাস করেন যে একমাত্র রাষ্ট্রই মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে পারে।

বর্তমান যুগে ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা দিলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তার পরিবর্তে অনিষ্টই করা হইবে। কারণ, বলবান দুর্বলের উপর অত্যাচার করিবে, দুর্বল উন্নতির কোন সুযোগই পাইবে না।

এতদ্ব্যতীত এমন কতকগুলি কার্য আছে যাহা ব্যক্তিগত উদ্যমে সম্পন্ন হইতে পারে না; অন্ততঃ সুচারুরূপে তো নয়। সেখানে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানে রাষ্ট্র এবং নাগরিক উভয়েরই সমান দায়িত্ব রহিয়াছে। নাগরিকের কল্যাণ সাধন এবং স্বার্থরক্ষা ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অংশীভূত হইতেছে। এক কথায় রাষ্ট্রই আজ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই আজ রাষ্ট্রীয় প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সরকারী কার্যের শ্রেণীবিভাগ (classification of functions of government)—ইতিপূর্বে আমরা রাষ্ট্রের কার্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে শ্রেণী বিভাগ করিয়া সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিব। মোটামুটিভাবে এই কর্তব্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মৌলিক বা অপরিহার্য কর্তব্য (fundamental or essential functions) এবং (২) গৌণ বা অপ্রধান কর্তব্য (non-essential or ministrant functions)

মৌলিক কর্তব্য—(১) বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং (২) দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ট্রের মৌলিক এবং প্রাথমিক কর্তব্য।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা—বহিঃশত্রুর আক্রমণ বলিতে সামরিক অভিযান অথবা রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বুঝায়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী পোষণ করিয়া থাকে এবং জরুরী অবস্থায় মাতৃভূমি রক্ষার জন্য নাগরিকগণকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করে।

শান্তির সময়েও রাষ্ট্রকে বৈদেশিক শক্তিবর্গের সহিত সম্পর্ক রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীই যথেষ্ট নহে। এই উদ্দেশ্যে সতর্কভাবে এবং সুবিবেচনা সহকারে স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করিতে হয়।

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা—প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা না থাকিলে কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভব নয়। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা সরকারের যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি নাগরিকেরও এই কার্যে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা কর্তব্য।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারকে ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। অপরাধ দমন, অপরাধীর সন্ধান এবং বিচারের জন্য সরকারকে পুলিশ-বিভাগ পোষণ এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গঠনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

অপ্রধান অথবা গৌণ কর্তব্য—প্রজার মঙ্গল সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে এই কর্তব্যগুলি পালন করিতে হয়। প্রজার নিজের উপর যদি এই সকল কার্যের ভার দেওয়া হয় তাহা হইলে হয়ত সে আদৌ কিছু করিবে না অথবা করিলেও তাহা সন্তোষজনক হইবে না। সেইজন্যই রাষ্ট্রকে এই সব দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

প্রয়োজন-ভেদে বিভিন্ন দেশে এই সকল অপ্রধান বা গৌণ কর্তব্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই সকল গৌণ কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

১। **শিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ** (regulation of industry and trade)—মুদ্রা, ওজন এবং মাপ ও ব্যবসায়ের লাইসেন্সের প্রতি রাষ্ট্রকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের শুল্ক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্প রক্ষার জন্য সংরক্ষণ শুল্কের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে করিতে হয়। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র কারখানার কাজকর্ম সম্বন্ধেও নানারূপ নির্দেশ দিয়া থাকে।

২। **জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ** (maintenance of public utility services)—সর্বত্রই জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার আগ্রহ দেখা গিয়াছে। কেবলমাত্র ডাক ও তার বিভাগ নয়, রেলপথ, ট্রাম ও টেলিফোন ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বিভিন্ন দেশে জল, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত মালিকানা হইতে রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইতেছে।

৩। **জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা** (public health, sanitation and medical relief)—জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর বিধিব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার হাসপাতাল এবং চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া থাকেন। সরকার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণাগারসমূহকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

৪। **শিক্ষা** (education)—রাষ্ট্রকে নাগরিকের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুশিক্ষা ব্যতীত নৈতিক বা মানসিক উন্নতি সম্ভব নয়। নাগরিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

৫। **দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তির তত্ত্বাবধান** (care of the poor, the aged, and the infirm)—রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হইল সমাজের

সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন। অতএব দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য। যাহাতে কাহারও অনাহারে মৃত্যু না হয়, সেদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত। অধিকন্তু বৃদ্ধ এবং দৈহিক অক্ষমতাবশতঃ যাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জনে অক্ষম তাহাদের প্রতি সরকারের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রে বার্ধক্য ভাতা, পারিবারিক ভাতা এবং বেকার ভাতার ব্যবস্থা আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের প্রকারভেদ

এ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's classification)—কতজন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন তাহা বিচার করিয়া এ্যারিস্টটল সরকারকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যখন একজন ব্যক্তির হাতে থাকে, তখন ইহা রাজতন্ত্র (monarchy), সার্বভৌম ক্ষমতা যখন কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকে তখন ইহা অভিজাততন্ত্র (aristocracy) এবং সার্বভৌম ক্ষমতা যখন বহু ব্যক্তির হাতে থাকে তখন ইহা সত্যকার গণতন্ত্র (polity)।

এ্যারিস্টটল শাসনপদ্ধতির এই ত্রিবিধ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—যথা, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র। কিন্তু যখন কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাসনকার্য পরিচালিত হয় তখন শাসনপদ্ধতির বিকৃতি ঘটে। এ্যারিস্টটল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বিকৃত রূপকে যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র (tyranny) শ্রেণীস্বেচ্ছাতন্ত্র (oligarchy) এবং উচ্ছৃংখল জনতন্ত্র (mob-rule or democracy) রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এ্যারিস্টটল উচ্ছৃংখল জন-শাসনকে democracy রূপে বর্ণনা করিলেও বর্তমানে আমরা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকপ্রিয় সরকারকে (democracy) বলিয়া থাকি।

সরকার ঃ স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং গণতন্ত্র (government: autocratic and democratic)—সাধারণতঃ সরকারকে স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং গণতন্ত্র—এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। সার্বভৌম ক্ষমতা মাত্র একজন ব্যক্তির হাতে থাকিলে তাহাকে স্বেচ্ছাতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্র প্রসারের সংগে স্বেচ্ছাতন্ত্রের দ্রুত বিলোপ সাধন হইতেছে। স্বেচ্ছাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বর্তমান যুগে একমাত্র আফগানিস্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে যে রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের উপর ন্যস্ত এবং জনসাধারণই যেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে সেই রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (democratic state) বলা হয়—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেন।

(ক) রাজতন্ত্র (monarchy)—যে সরকারের সার্বভৌম শাসনক্ষমতা একজন রাজার হাতে থাকে, সেই সরকারকে রাজতান্ত্রিক বলা হয়। একমাত্র রাজাই এই সার্বভৌম শাসনক্ষমতার অধিকারী। সাধারণতঃ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজপদ

লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে কোন কোন দেশে, যেমন—রোমে প্রজাসাধারণ রাজা নির্বাচন করিত। বর্তমান যুগেও রাজাকে নির্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেমন—আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব রাজা নাদির খাঁ। রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা লাভ। বস্তুতঃ এই বৈশিষ্ট্য ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (President of the Republics) এবং বর্তমান যুগের কয়েকজন রাজার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

রাজতন্ত্রকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—(১) অসীম ক্ষমতাশালী বা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র (absolute, arbitrary or despotic monarchies) এবং (২) নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (constitutional, parliamentary or limited monarchies)।

রাজতন্ত্রঃ অবাধ এবং সীমাবদ্ধ (monarchy : absolute and limited)

(১) অবাধ রাজতন্ত্র—যে রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাহাকে অবাধ রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজা আপন ইচ্ছামত শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহার মুখের কথাই আইন রূপে গণ্য হয়। ফ্রান্সের ইতিহাসবিখ্যাত রাজা চতুর্দশ লুই এইরূপ একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক। বর্তমান জগতে এইরূপ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব নাই। রাশিয়ার জার, জার্মানীর কাইজার এবং তুরস্কের সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবাধ রাজতন্ত্রের সমাধি হইয়াছে।

অবাধ রাজতন্ত্রের যুগেও আমরা বহু মহানুভব রাজার সাক্ষাৎ পাই। যথা, অশোক, আকবর, পিটার-দি-গ্রেট। ইঁহারা মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

রাজতন্ত্র সময়বিশেষে কল্যাণকর হইলেও ইহা সমর্থন করা যায় না। জনসাধারণ দেশের শাসনকার্যে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় না। তাহাদের কর্মোদ্যম এইভাবে বিনষ্ট হয়। তাহাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। তাহারা আদর্শ নাগরিক রূপে নিজদিগকে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পায় না। এই সব কারণে অবাধ রাজতন্ত্রকে কিছুতেই আদর্শ শাসনব্যবস্থারূপে গণ্য করা যায় না।

(২) সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র—যে শাসনব্যবস্থায় রাজা শাসনতন্ত্রের অনুশাসনের অধীন অথবা জনসাধারণ যেখানে রাজার শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র বলা হইয়া থাকে। কখন কখন রাজা স্বেচ্ছায় এই নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লন; আবার কখন কখন প্রজার বিদ্রোহের ফলে বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করেন। ইংলণ্ডের রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র। তিনি রাজত্ব করেন; কিন্তু শাসন করেন না।

রাজতন্ত্রের উপর ক্রমাগত আঘাত আসিতেছে। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই রাজতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র অথবা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(খ) অভিজাততন্ত্র (aristocracy)—যখন চূড়ান্ত শাসনক্ষমতা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকে তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। দেশের জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিদের লইয়া সরকার গঠন করা হইত। স্বভাবতঃই জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তির সংখ্যা অল্প হইয়া থাকে। এই কারণে গ্রীকগণ অভিজাততন্ত্রকে শ্রেষ্ঠতম শাসনপদ্ধতি বলিয়া মনে করিতেন। কার্লাইলও (Carlyle) নির্বোধের পক্ষে জ্ঞানীর শাসন শুভ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সর্ব বিষয়ে শাসকগণকে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মনে করা ভুল।

যখন মুষ্টিমেয় শাসকগণ কেবলমাত্র আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় রত থাকেন তখন অভিজাততন্ত্র বিকৃত হইয়া শ্রেণীস্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হয়।

কতকগুলি সদ্‌গুণ, ধনসম্পদ, বংশমর্যাদা থাকিলে অথবা সামরিক খ্যাতি অর্জন করিলে অভিজাত বলিয়া শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দাবী করা হয়।

অভিজাততন্ত্রের অসুবিধাঃ—(১) কোন্ নীতি অনুযায়ী শাসকবর্গ নির্বাচিত হইবেন তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য এবং (২) মুষ্টিমেয় শাসকবর্গ যে সর্বদাই সাধারণের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিবেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

(গ) গণতন্ত্র (democracy)—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণ যে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে এব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) বলিয়াছেন, "জনতা কর্তৃক, জনতার জন্য, জনতার শাসনের নাম গণতন্ত্র" (government of the people, by the people, for the people)।

গণতন্ত্রের মূল নীতি হইল এই যে, প্রত্যেক নাগরিকের নিজ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকার আছে।

এখনও অনেক দেশের সরকার গণতান্ত্রিক রূপে পরিচিত হইলেও কার্যতঃ সেখানকার নাগরিকদের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার নাই। সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নাগরিকগণের দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার বয়স, স্ত্রীপুরুষভেদ, সম্পত্তি ও শিক্ষাসংক্রান্ত নানা বিধিনিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য প্রগতিশীল দেশগুলিতে নাগরিকগণ রাজনৈতিক সমানাধিকার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দাবী করিতেছে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভোটদানের অধিকার, আইন পরিষদের সদস্য হইবার অধিকার এবং সরকারী চাকুরী লাভের অধিকার থাকিবে।

গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (pure and direct democracy) এবং (২) প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র (representative or indirect democracy)।

(১) বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র—যে গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন প্রদেশে প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র প্রচলিত। এই সকল প্রদেশে জনসাধারণ একত্র মিলিত হইয়া আইন প্রণয়ন, কর ধার্য, ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর এবং সরকারী কর্মচারী নির্বাচন করিয়া থাকে। প্রাচীন এথেন্সে খাঁটি গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এথেন্সের নাগরিকগণ নানা ভাবে দেশের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতেন। প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রগুলি আকারে ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব ছিল। তদুপরি, ক্রীতদাসেরা গৃহস্থালী কর্ম করিত বলিয়া গ্রীক নাগরিকগণ রাজনীতি চর্চা করিবার প্রচুর অবসর পাইতেন।

(২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—বর্তমান যুগে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আর সম্ভব নহে। বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। বর্তমান কালে এত অধিক লোকজন এক সঙ্গে মিলিত হইবার সময় নাই এবং বর্তমান সরকারের বহুবিধ জটিল কাজকর্ম বুঝিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা সকলের নাই।

তাই বর্তমানে গণতন্ত্র সর্বত্রই প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ। সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে একত্রিত হইয়া শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব বলিয়া জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকে। জনসাধারণের হইয়া এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ এই ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকেন।

প্রতিনিধিমূলক সরকারই শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা (representative government is the best form of government) —বর্তমান অবস্থায় প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থারূপে সর্বত্রই স্বীকার করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আয়তন এবং জনসংখ্যার জন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এ যুগে আর সম্ভব নয়। আবার অভিজাততন্ত্র বা রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইবে না। সরকারের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে মিলের (Mill) উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ—**প্রথমতঃ সমাজে যাহা কিছু ভাল আছে সরকার তাহা কি পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দ্বিতীয়তঃ সরকার ভবিষ্যৎ সমাজের কতখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে তাহা**

বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র এই দুইটি সর্তই সুষ্ঠুভাবে পূরণ করিতে সক্ষম।

ব্রাইস (Bryce) এবং লাস্কিও (Laski) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাইসের মতে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র জনসাধারণের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে। লাস্কিও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "তত্ত্ব হিসাবে রাষ্ট্রের যে আদর্শ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কোন শাসনব্যবস্থা এই আদর্শ পূরণ করিতে সক্ষম নয়" (there is no other system which has the merit of meeting as an institutional scheme, the theoretical end that the state must serve" —An Introduction to Politics)।

গণতন্ত্র কার্যকরী এবং সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সুবিবেচনা করিয়া যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন সরকারকে প্রতিনিধিমূলক বলিয়া মনে হইতে পারে, যেমন—বৃটিশ আমলে ভারত সরকার। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার না থাকিলে কোন রাষ্ট্রেই প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন করা সম্ভব নয়।

মিলের মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার না দেওয়া হইলে কখনই সত্যকার গণতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া ক্ষুদ্রতর সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে বলি দিতে হইয়াছে।

খাঁটি প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কাহারও স্থান নাই। বৃটিশ আমলে ভারতীয় আইনসভায় সরকার মনোনীত সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা থাকায় ভারতবর্ষে সত্যকার প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন সম্ভব হয় নাই।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র এবং সরকারের শ্রেণীবিভাগ (modern classification of states—more recent forms of government)— উপরে রাষ্ট্রের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে বর্তমান যুগে তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের স্বরূপ ঠিকমত বিশ্লেষণ করা যাইবে না। প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া ও তুরস্কেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে! বাহ্যতঃ বৃটিশ সরকারকে রাজতান্ত্রিক মনে হইলেও

মূলতঃ ইহা গণতান্ত্রিক। রাজার নামমাত্র ক্ষমতা আছে। কার্যতঃ জনসাধারণই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। তাহারাই নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সরকার গঠন করিয়া থাকে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত ঐ প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের আর বিশেষ কোন মূল্য নাই।

(ঘ) একনায়কত্ব (dictatorship)—প্রথম মহাযুদ্ধের পর সর্বত্রই সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পর সকল দেশেই নানাবিধ জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। কোন সরকারই তৎপরতার সহিত এই সব সমস্যার দ্রুত সমাধান করিতে পারিল না। ফলে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এই সুযোগে একনায়কত্বের* আবির্ভাব ঘটে।

একনায়ক সরকার আকারে প্রতিনিধিমূলক হইলেও কার্যতঃ মাত্র একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ব্যতীত আর কাহারও পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন না। একনায়ক ষড়যন্ত্র বা বল প্রয়োগ করিয়া অথবা নির্বাচনক্রমে ক্ষমতা করায়ত্ত করেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবিবেচক এবং স্বার্থপর শাসকগণ যখন সুষ্ঠুভাবে শাসন-কার্য পরিচালন করিতে পারেন না, তখন একনায়কগণ আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। আবার অধিকাংশ নাগরিকের যদি শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকে তাহা হইলেও একনায়কের অভ্যুত্থান ঘটিয়া থাকে।

একনায়কতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একনায়কগণ রাজার মত বংশানুক্রমিক শাসক নহেন। স্বৈরাচারী রাজা এবং একনায়কের উদ্দেশ্য এবং শাসনপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। স্বৈরাচারী রাজার মত অত্যাচারী হইলেও একনায়ক স্বার্থপর হইতে নাও পারেন। গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে আর একনায়কতন্ত্রে শাসক মাত্র একজন। গণতন্ত্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত: একনায়কতন্ত্র বল প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

* একনায়কগণ খুব দ্রুত কুশলতার সহিত কাজ করিতে পারেন। কিন্তু শারীরিক বল প্রয়োগের উপর এই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া একনায়কগণ শীঘ্রই আসুরিক বলের উপাসক হইয়া পড়েন এবং ইঁহারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধাইয়া থাকেন। রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র উভয়েই একনায়কের অধীন হইতে পারে (যেমন, মুসোলিনীর অধীন ইতালী বা হিটলারের অধীন জার্মানী)।

স্বাধীনতা এবং প্রগতি-বিরোধী বলিয়া গণতন্ত্রের পূজারীগণ একনায়কতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন।

যুদ্ধবিগ্রহের সময় এবং অর্থনৈতিক সংকটকালীন অবস্থায় বিশেষভাবে একজন যোগ্য এবং সুদক্ষ শাসকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থার ফলেও অনেক একনায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

১। মন্ত্রিসভা-পরিচালিত এবং রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার (Cabinet and Presidential Forms of Government) —আইনসভা এবং কার্যনির্বাহক পরিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে বর্তমানে সরকারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—(ক) মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকার এবং (খ) রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার।

(ক) মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকার (Cabinet government) **—যে** সরকারে আইনসভার কতিপয় সদস্য লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা শাসন পরিচালনা করেন তাহাকে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকার বলা হয়। ব্রিটেনে শাসনক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হাতে রহিয়াছে। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা দলসমূহের মধ্য হইতে কতিপয় সদস্য লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিগণ সমবেতভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য কমন্সসভার নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। মন্ত্রিসভার উপর যতদিন কমন্সসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা থাকিবে ততদিন তাঁহারা মন্ত্রিত্ব করিয়া থাকেন।

বৃটেনে মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। রাজা নামে মাত্র শাসক। মন্ত্রিসভাই রাজার নামে সরকার পরিচালনা করিয়া থাকে।

যে সকল মন্ত্রীর হাতে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার থাকে তাঁহাদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিগণ একাধারে আইন পরিষদের সদস্য এবং বিভাগীয় প্রধান কর্তা বলিয়া শাসন বিভাগীয় এবং আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। মন্ত্রিগণ কেবলমাত্র শাসনকার্য পরিচালনা করেন না, আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকারই সর্বাপেক্ষা কার্যোপযোগী। ইহা শাসনপরিষদ, আইনসভা এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সুষ্ঠু শাসনকার্যের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে। আবার যে সকল দলীয় নেতাকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহাদের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িলে পার্লামেণ্ট নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট দায়ী। এইজন্য মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকারকে **দায়িত্বশীল সরকার** (responsible government) বলা হয়।

পার্লামেণ্ট বা আইনসভা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার এবং ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে বলিয়া ইহার অপর একটি নাম পার্লামেণ্টীয় সরকার (parliamentary government)। এই শাসনপদ্ধতির জন্মস্থান ইংলণ্ড। অন্যান্য বহু রাষ্ট্র বর্তমানে

ইংলণ্ডকে অনুসরণ করিতেছে। বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে বৃটিশ শাসনপদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করা হইতেছে।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল সরকার বা পার্লামেণ্টীয় গভর্নমেণ্টের প্রবর্তন করা হয়। কয়েকটি বিধিনিষেধও এই সঙ্গে আরোপিত হয়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার (Montford Reforms) অনুসারে ভারতবর্ষে আইনসভার নিকট সরকার আংশিকভাবে দায়ী ছিল। কেবলমাত্র প্রদেশসমূহের হস্তান্তরিত বিষয়গুলি (transferred subjects) সম্পর্কে মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্বশীল বা সংরক্ষিত বিষয়ে প্রাদেশিক আইনসভার নিকট সরকারকে দায়িত্বশীল করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

(খ) রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার (Presidential Government)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি সরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন।

যে সরকারে মাত্র একজন কর্মকর্তা বা রাষ্ট্রপতি সমুদয় শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাকে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার বলা হয়।

এই শাসনপদ্ধতিতে প্রধানতঃ দুইটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত (অর্থাৎ শাসনকর্তৃপক্ষ বৃটিশ পদ্ধতির মত আইনসভার কর্তৃত্বাধীন নহে)। এইজন্য এই সরকার রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার রূপে (Presidential type of government) পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা বা কংগ্রেস শাসনকর্তৃপক্ষের অধীন নহে। এইজন্য এই সরকারকে সময় সময় congressional government রূপে বর্ণনা করা হয়।

এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে* রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এবং ক্ষমতাকে শাসনবিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নহেন। বৃটিশ মন্ত্রিসভার মত তিনি আইনসভার অধীন নহেন। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচন করেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধীনে কাজ করেন। তাঁহারা আইনসভার সদস্যও নহেন এবং উহার অধীনও নহেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ সাক্ষাৎভাবে প্রধান শাসক বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া থাকে। একমাত্র জনসাধারণের নিকটই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ এবং আইনসভা কাহারও অধীন নহে। শাসনবিভাগ এবং আইনসভাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং পরস্পর-নিরপেক্ষ। দেশের শাসনতন্ত্র প্রত্যেক বিভাগের স্ব স্ব পৃথক ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

করা হয়। রাজনীতির দিক হইতে তিনি আইনসভার নিকট দায়ী নহেন; তবে আইনসভা অপরাধের জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে রাষ্ট্রপতি-পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

২। এককরাষ্ট্রীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Unitary and Federal Government)—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ (concentration) বা বিকেন্দ্রীয়করণ (distribution) অনুসারে সরকারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) এককরাষ্ট্রীয় সরকার (Unitary Government) এবং (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)।

(ক) **এককরাষ্ট্রীয় সরকার**—সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন একটি মাত্র স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তখন সেই সরকারকে এককরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। এককরাষ্ট্রীয় সরকার বলিতে রাষ্ট্রে একটি মাত্র সরকার বুঝায়।

রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ এবং একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে শাসনকার্য পরিচালনা করা কষ্টকর হইলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য স্থানীয় সরকার গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারই এই স্থানীয় সরকার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং এই সরকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। বৃটিশ সরকার এককরাষ্ট্রীয় সরকার। লণ্ডনে ওয়েস্টমিনস্টারে অবস্থিত সরকারী মহাকরণ সমগ্র গ্রেট বৃটেন শাসন করিয়া থাকেন। ফরাসী, ইতালীয় এবং জাপানী সরকারও এককেন্দ্রিক।

(খ) **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার**—যে রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভিন্ন সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় সেই সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কতকগুলি স্থানীয় সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে দ্বৈত-শাসন প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিউ ইয়র্কের নাগরিকগণ 'রাষ্ট্রীয়' (state) ব্যাপারে নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের অধীন; আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal) ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীন।

কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার মনে করা ভুল। কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারসমূহ একত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করিয়া থাকে। একটি সাধারণ শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। নিজ সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারই স্বাধীন। কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

সংক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিশেষত্ব হইলঃ—(১) শাসনতন্ত্রের সার্বভৌম ক্ষমতা (supremacy of the constitution) (২) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিভাগ, (৩) বিভিন্ন সরকারের শাসনাধিকার এবং শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি আদালতের ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা এবং অসুবিধা (advantages and disadvantages of federation) (১) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মূল নীতি হইল ঐক্যই শক্তি (union is strength)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রের সর্বদা স্বাধীনতা হারাইবার ভয় থাকে। এই রাষ্ট্রগুলি একত্রিত করিয়া একটি বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিবার পক্ষে একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা হইল একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া স্বৈরাচার হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করে। ইহাতে স্থানীয় বা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয় না; অথচ জাতীয় ঐক্যও ক্ষুণ্ণ হয় না।

অসুবিধা—(১) দ্বৈত-শাসনের ফলে দুর্বলতা এবং (২) সর্বদা কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ভয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের প্রণালীঃ দুই রকম পদ্ধতি (the distribution of powers in a federation: two types) —**কেন্দ্রীয় সরকার এবং** স্থানীয় সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ সর্বত্র একরূপ নহে এবং এইরূপ ক্ষমতা বিভাগকে চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ মনে করা ভুল।

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, যথা—দেশরক্ষা, রেল, ডাক, তার ইত্যাদি। যে সমস্ত বিষয়ে সমগ্র রাষ্ট্রে একই প্রকার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় সেই বিষয়গুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, যেমন—মুদ্রা, টাঁকশাল ইত্যাদি। স্থানীয় সরকারসমূহ সাধারণতঃ কেন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে স্থানীয় শাসনকার্য নির্বাহ করে।

কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুল্লিখিত বা অবশিষ্ট ক্ষমতা (the residuary powers in Canada and the U. S. A.)—**যুক্তরাষ্ট্রীয়**

সরকার এবং উহার অংশগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া একটি বিষয়-তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং প্রত্যেক সরকার আপন নির্দিষ্ট এলাকায় এই তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। এই তালিকা কখনই সম্পূর্ণ-ভাবে তৈয়ারী করা যায় না, কতকগুলি বিষয় তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া যায়।

তালিকায় যে সকল ক্ষমতার উল্লেখ করা থাকে না সেগুলিকে অবশিষ্ট বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা (residuary powers) বলা হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার এই অবশিষ্ট ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। আবার কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারসমূহকে এই অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠনপদ্ধতি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠন-পদ্ধতি ঊর্দ্ধ্বগামী। রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য মিলন—ঐক্য নয় (union—not unity)। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহের কার্যক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্ট বা অনুল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ আঞ্চলিক সরকারসমূহের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরপক্ষে, কানাডার যুক্তরাষ্ট্র গঠনপদ্ধতি নিম্নগামী। কেন্দ্রীয় সরকার নিজ ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত করিয়াছে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল প্রদেশ গঠন করিয়া নিজের ক্ষমতা উহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছে। এই স্বায়ত্ত-শাসনশীল অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একত্রিত হইয়া কানাডা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা কানাডার যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়তর হইয়াছে। কানাডায় সমুদয় অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রহিয়াছে। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির কোন কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির প্রধান লক্ষণ—(১) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র সরকার এবং গঠনতন্ত্র থাকিবে। অঞ্চলগুলি নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। (২) প্রত্যেক অঞ্চলের সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ গঠনতন্ত্র এবং সাধারণ বা কেন্দ্রীয় সরকার থাকিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রসার—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের

রাজধানী ওয়াশিংটন। কিন্তু স্বার্থের প্রয়োজনে (অর্থাৎ দেশরক্ষা, মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি) ৪৮টি রাষ্ট্র মিলিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব পৃথক রাজধানী আছে। ইহারা যে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে নাই সেইগুলি ভোগ করিয়া থাকে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ব্যাপকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ প্রজাতন্ত্রে এবং জার্মান প্রজাতন্ত্রেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে এক-কেন্দ্রিক সরকারের স্থলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার স্থাপনের বিধান দেওয়া হয়।

"মধ্যযুগে যেমন সামন্ততন্ত্রের (feudalism) দিকে, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন সার্বভৌম রাজতন্ত্রের (absolutism) দিকে রাজনীতির গতি ধাবিত হইয়াছিল, তেমনি বর্তমান যুগে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হইতেছে।"

"বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক ভাবধারা এবং অতীত ইতিহাসের সংঘবদ্ধতার দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিবে।" সিজউইকের (Sidgwick) এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে। লাস্কিও বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট সমাজ গঠন করিতে হইলে উহাকে যুক্তরাষ্ট্রধর্মী হইতে হইবে (society to be adequate must be federal in nature)।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতান্ত্রিক অসুবিধা (the constitutional difficulties of a federation)—যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অসুবিধা—

প্রথমতঃ, গঠনতন্ত্র সংশোধন। যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র প্রায়শঃই জটিল এবং অত্যধিক ব্যাপক হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিরোধ দেখা দিলে তাহার মীমাংসা।

এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সরকারের অধিকার সম্পর্কে বিতর্কের সমাধান এবং শাসনতন্ত্রের বিধিগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত নির্দেশদানের জন্য প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপন আবশ্যক।

এককরাষ্ট্রীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে তুলনা (Unitary and Federal Governments compared)—এককরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন এবং শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন

করিয়া এককরাষ্ট্রীয় সরকার জনসাধারণের মনে গভীর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত। রাজধানী হইতে দূরবর্তী প্রদেশগুলির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থ বড় হইয়া উঠিলে এককরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবে। এককরাষ্ট্রীয় সরকারে স্থানীয় সরকারের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা বলিয়া কিছু থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে পারস্পরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃহত্তর দেশ শাসনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ অঞ্চলের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার উপভোগ করিয়া থাকে।

ব্রাইস (Bryce) যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন— (১) পররাষ্ট্র ব্যাপারে দুর্বলতা, (২) স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে দুর্বলতা, (৩) বিভিন্ন অঞ্চলেব যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা, (৪) আইন এবং শাসন বিষয়ক অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলা, (৫) দুই রকম শাসনের জন্য অকারণ ব্যয়, বিলম্ব এবং গোলযোগ।

চতুর্দশ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক বা জনপ্রিয় সরকার

বর্তমান যুগে গণতন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক বা জনপ্রিয় সরকারে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্ব ও প্রাকৃতিক ব্যবধান দূর হওয়ায় দেশের সঙ্গে দেশের মিলন হইতেছে। কাজেই আজকের দিনে জনপ্রিয় সরকার অর্থে সাধারণতঃ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বুঝায়। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নহে। গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি হইল সাম্য (equality)। সম্ভবতঃ অদ্যাবধি বিশ্বের কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু এই গণতন্ত্রেরই লক্ষ্য ও আদর্শ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সাম্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দিয়াছে এবং দিতেছে।

গণতান্ত্রিক সরকার—গণতান্ত্রিক সরকারকে অন্য কথায় দায়িত্বশীল সরকারও বলা চলে। কারণ চূড়ান্ত বিচারে জনসাধারণই আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এই সরকার গঠন করে ও ইহাকে অপসারিত করে। মূলতঃ এই ধরণের সরকার জনসাধারণের নিকটই দায়ী থাকেন।

গণতন্ত্রের মূলনীতি—জনগণের সম্মতির উপর সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিক স্ব স্ব মাতৃভূমির সরকারে অংশ গ্রহণ করিবেন ইহাই হইল গণতন্ত্রের মূল নীতি। জনসমাজের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস এবং সাধারণ মানুষের যথাযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের উপরই ইহা নির্ভরশীল। এরূপ প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে যাঁহারা সমাজের স্বার্থে সরকার পরিচালনা করিবেন।

এব্রাহাম লিংকন জনসাধারণের অন্তর্নিহিত সাধারণজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছুসংখ্যক লোককে চিরদিনের জন্য, সকলকে কিছুকালের জন্য প্রতারণা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সকল মানুষকে চিরকাল প্রতারণা করা অসম্ভব।"

জনপ্রিয় সরকারের সুবিধা—(ক) জনপ্রিয় অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকারই আদর্শ লোকপ্রিয় সরকার। কারণ ইহা কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী স্বীকার

করে না, বরঞ্চ সমস্ত মানুষের রাজনৈতিক সমানাধিকারের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে। "আইনের চোখে সকলেই সমান"—ইহাই গণতন্ত্রের নীতি।

(খ) একমাত্র জনপ্রিয় সরকারই জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রয়োজন সম্পর্কে সজ্ঞান ও অবহিত করিয়া সুশৃংখল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

(গ) জনপ্রিয় সরকার অন্য যে কোন ধরণের সরকারের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

মিল ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—(১) "কোন ব্যক্তি নিজের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তৎপর ও সক্রিয় হইলেই কেবলমাত্র ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ নিরাপদ থাকিতে পারে।" (২) দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের সমষ্টির কল্যাণসাধন ততই বেশী পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে যতই বেশীসংখ্যক জনতা ইহাতে অংশ গ্রহণ করে।

(ঘ) জনপ্রিয় সরকার একটি প্রগতিশীল শক্তি। প্রকৃত গণতন্ত্র জনসাধারণের চরিত্র ও রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করে এবং মানবতার সেবার মহান আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া ক্রমবর্ধিষ্ণু, সক্রিয়, প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃত গণতন্ত্র পরিবর্তিত অবস্থা অনুসারে যুগোপযোগী ভাবে নিজেকে পরিবর্তিত বা পুনর্গঠিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

(ঙ) গণতন্ত্র প্রজার অনুমোদন ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। সকলের জন্য সমানাধিকারের নীতিই ইহার ভিত্তি। সেইজন্য সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক বা জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না। কোন অভিযোগ থাকিলেও শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সহজেই তাহার সমাধান হইতে পারে। তজ্জন্য ইহা সর্বদাই বৈপ্লবিক উপদ্রব হইতে মুক্ত থাকে। এই বৈপ্লবিক উপদ্রবগুলি এমন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায় যাহাতে জনসাধারণের কোন অংশ থাকিবে না।

(চ) সর্বশেষে কর্মক্ষম, সুস্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন নাগরিকের পক্ষে গণতন্ত্রই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে গণতন্ত্রের শিক্ষাগারে সাধারণ মানুষ সরকার ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা করিবার অনেক বেশী সুযোগ পায়। জনসাধারণ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া হাতেকলমে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাহারা সময় সময় ভুল করিতে পারে, কিন্তু ভুলের ফসলকে কাজে লাগাইয়া সাফল্যজনক অগ্রগতির পথে তাহারা অগ্রসর হয়।

জনপ্রিয় সরকার: সমালোচনা—(ক) গণতন্ত্র কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তাই গুণের চেয়ে ইহা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। লেকী (Lecky)

জনপ্রিয় সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "জনপ্রিয় সরকার সমাজের দরিদ্রতম, অজ্ঞতম ও সব চেয়ে অক্ষম মানবশ্রেণীর সরকার। কারণ সাধারণতঃ সমাজে ইহারাই সংখ্যায় অনেক বেশী"।

সরকার ও জনসাধারণের সামনে যে সব নিত্য নূতন সমস্যা দেখা দেয় তৎসম্পর্কে যথাবিহিত তথ্যাদি জানার বা চিন্তা করার সময় সাধারণ মানুষের থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগ্রহ বা যোগ্যতারও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে অন্যদের উপর সিদ্ধান্তের ভার ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মানুষ বসিয়া থাকে। যাহারা জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করিয়া জনসাধারণের স্বার্থের নামে কাজ চালায় তাহারাই সংবাদপত্র, পত্রিকা, সিনেমা ও বেতারজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা সকলের সমান থাকে না। অথচ গণতন্ত্র এই ভূয়া নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত যে আইনের চোখে প্রত্যেক মানুষই সমান। গণতন্ত্র সরকারী কার্যক্ষেত্রে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে ছোট করিয়া দেখায়।

(গ) সকলের নিকট দায়ী সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও নিকট দায়ী নহে।

(ঘ) গণতন্ত্রের অর্থভাণ্ডার জনসাধারণের। অতএব এখানে অনাবশ্যক ব্যয় বন্ধ করা বা ব্যয়সঙ্কোচের প্রবৃত্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(ঙ) গণতন্ত্রে সরকারী নীতির স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নাই। পররাষ্ট্র বা স্বরাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই স্থায়ী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির নিরাপত্তা সম্ভব নহে।

(চ) গণতন্ত্র সমাজকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিম্নতর স্তরে নামাইয়া দেয়। ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতাকে দমন করে। সুতরাং ইহা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল।

(ছ) কয়েকজন লেখকের মতে গণতন্ত্র উন্নততর শাসনব্যবস্থা বা বৃহত্তর স্বাধীনতার কোনটিরই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

• লর্ড ব্রাইসের মতে বর্তমান জনপ্রিয় সরকারগুলির প্রধান প্রধান দোষত্রুটিগুলি এইরূপঃ—(১) জনসাধারণের জীবনে অর্থের দুর্নীতিমূলক প্রভাব, (২) রাষ্ট্রনীতি একটা ব্যবসা বা পেশায় পরিণত করিবার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা, (৩) শাসনকার্যে দক্ষতার মূল্য উপলব্ধি করিবার ব্যর্থতা, (৪) শাসনকার্যে অমিতব্যয়িতা, (৫) অকল্যাণকর দলীয় প্রভাব, (৬) ভোট লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা।

উপসংহার—জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের যে প্রবাহ ক্রমশঃই শক্তিশালী ও দুর্বার হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রতিরোধ করা অসম্ভব। পৃথিবীতে প্রায় প্রত্যেকটি সভ্য দেশেই

ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লেকীর মত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচকরাও স্বীকার করিয়াছেন যে, আগামী বহু শতাব্দীতেও গণতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে গণতন্ত্রের পথ অত্যন্ত জটিল ও সংকটপূর্ণ। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সংগে ইহাকে তুলনা করা চলে। জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ দায়িত্ববোধ, রাজনৈতিক চেতনা, সতর্কতাবোধ এবং কর্মক্ষমতার উপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন যে, সমাজের শ্রেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তিবৃন্দের নেতৃত্বে অপ্রতিহত প্রগতির নামই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও দায়িত্ব—উইলোবি ও রজার্সের মতে যে সব বিষয়ের উপর প্রধানতঃ গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভরশীল সেগুলি এইরূপ—(১) দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত, সুচিন্তিত, প্রখর ধীসম্পন্ন জনমত; (২) জনমতকে সুনির্দিষ্ট ও কল্যাণমুখী রূপ দেওয়ার সুযোগ; (৩) শাসনবিভাগের উপর জনমতকে কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করিবার মত নিয়মতান্ত্রিক উপায় ও পদ্ধতি; (৪) শক্তিশালী শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।

মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য—(১) জনসাধারণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে; (২) গণতন্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে; (৩) নাগরিক হিসাবে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদনের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে এবং গণতন্ত্রের উপর একনায়কত্ব, শ্রেণীস্বেচ্ছাতন্ত্র বা আমলা-তন্ত্রের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রয়োজন বোধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

একনায়কত্বের* অভ্যুদয় ও গণতন্ত্রের বিপদ

একনায়কত্ব ও সর্বস্বত্ববাদী রাষ্ট্র (dictatorship and the totalitarian state)—ল্যাটিন শব্দ 'ডিক্‌টেটর' (Dictator) হইতে ইংরেজী ডিক্‌টেটর বা এক-

---

* পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার Glimpses of World History (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭৪) বইতে একনায়কত্ব সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগী বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "সুতরাং আমরা দেখি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা প্রচলিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে ততক্ষণই ঐশ্বর্যশালী শ্রেণীবিশেষ পার্লামেণ্ট ও গণতন্ত্রকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। অবশ্যই ইহা প্রকৃত গণতন্ত্র নহে। ইহা দ্বারা গণতান্ত্রিক ভাবধারাসমূহকে গণতন্ত্রবিরোধী উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে নাই। কারণ ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা মৌলিক

নায়ক কথার উৎপত্তি। একনায়কত্ববাদে নেপোলিয়ন বা ক্রমওয়েলের মত কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে অথবা হিটলার বা মুসোলিনীর মত দলীয় নেতার হাতে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ইহা সামরিক ধরণের সরকার। প্রাচীন রোম সাধারণতন্ত্রে কোন বিশেষ জরুরী পরিস্থিতিতে ৭ বৎসরের জন্য একজন একনায়ক নির্বাচিত করা হইয়াছিল। ইহাই একনায়কত্বের গোড়ার ইতিহাস। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপে আধুনিক কালে একনায়কত্বের উদ্ভব হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের সাম্রাজ্যকে বহুবিস্তৃত ও শক্তিশালী করিয়া তুলে। মিত্রপক্ষে যোগদান করা সত্ত্বেও ইতালীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। জার্মানীর উপর জোর করিয়া এক অপমানজনক সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হয়। মুসোলিনী ও হিটলার পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারেন যে, বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত না করিলে ইতালী ও জার্মানী বিশাল বিশ্ব-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব দেশের দুর্বল গণতন্ত্রী সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থলে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে একনায়কত্বের অর্থ ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের সরকার।

ব্যক্তি-জীবনের ও সমাজ-জীবনের সকল ব্যবস্থা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে এরূপ রাষ্ট্রকে সর্বস্বত্ববাদী রাষ্ট্র (totalitarian state) বলে। সুতরাং জার্মানী, ইতালী এবং রাশিয়াকে সর্বস্বত্ববাদী রাষ্ট্র বলা হয়।

এরূপ রাষ্ট্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই হইবে সকল ক্ষমতার অধিকারী, সর্বময় ও সার্বভৌম। ক্রমবর্ধমান উগ্র সামরিকতার বিস্তার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার ভিতর দিয়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন ও জাতীয় নিরাপত্তাবিধানই ইহার প্রাথমিক লক্ষ্য।

রাশিয়ার সোভিয়েট সরকারকেও প্রায়ই ভুল বশতঃ একনায়কত্ব বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে রাশিয়ায় সর্বহারার একনায়কত্ব (dictatorship of the

---

বিরোধ রহিয়াছে। গণতন্ত্র বলিতে সাম্যকেই বুঝায় এবং কেবলমাত্র ভোট দানের সমানাধিকার নহে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকারও ইহার অপরিহার্য অংগ। ধনতন্ত্র ইহার ঠিক বিপরীত। ধনতন্ত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া নিজ স্বার্থে ইহা ব্যবহার করে।

এইরূপে আমরা দেখি যে, গণতন্ত্রের তথাকথিত ব্যর্থতা দ্বারা গণতান্ত্রিক নীতির অসারতা প্রমাণিত হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, আর্থিক সাম্যের উপর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতনভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।”

proletariat) **প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার অর্থ সেখানে জনসাধারণের শতকরা নিরানব্বই জনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।**

গণতন্ত্র বনাম একনায়কত্বঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একনায়কত্বের সুবিধা (merits)—(১) ইহা দ্বারা অখণ্ড জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়; (২) ইহা অনেক দ্রুত ও সাফল্যজনকভাবে কর্তব্য সম্পাদন করে এবং কোন সিদ্ধান্ত করিতে বিলম্ব করে না; (৩) বৈদেশিক ও যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা অধিকতর কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়; (৪) ধনতান্ত্রিক প্রথার গলদপূর্ণ ও জটিল অবস্থায় ইহা অধিকতর সাফল্যজনকভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে; (৫) ইহা সর্বদাই নাগরিকদের সম্মুখে দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

একনায়কত্বের কুফল (defects)—(১) একনায়কত্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জনগণের সম্মতি বা অনুমোদনের উপর নহে, সুতরাং ইহা যুদ্ধ ডাকিয়া আনে; (২) সমানাধিকারের ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত জাতির শান্তিতে বসবাস করিবার অধিকারকে ইহা অস্বীকার করিয়া চলে; (৩) চিন্তার স্বাধীনতা, বক্তৃতা দানের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতাকে ইহা দমন করিয়া রাখে; (৪) ব্যক্তিকে নির্মমভাবে রাষ্ট্রের অধীনস্থ করিয়াই ইহা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে; (৫) ইহা শ্রমিকশ্রেণীর দাবীকে অস্বীকার করে এবং জাতিকে দরিদ্র ও নিঃস্ব করিয়া দেয়।

অনেক দেশে গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আজ আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহা বিকৃত গণতন্ত্র, অর্থাৎ যেখানে গণতন্ত্রকে শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গণতন্ত্রের ব্যর্থতার পর এই সব দেশে ধনিকস্বার্থ একনায়কত্বের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। দাসত্ব ও পশুবলের বনিয়াদের উপরই একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র শান্তির উপাসক, একনায়কত্ব শান্তি-বিরোধী।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জনমত

সকল সরকারের শাসনকর্তৃত্ব জনমতের সম্মতির উপর নির্ভর করে।

জনমত কি (What is public opinion) ?—সমাজের বিশিষ্ট অংশ কোন বিষয়ে অভিমত পোষণ করিলে ও তাহা জনসমাজে প্রচারিত ও গৃহীত হইলেই 'জনমত' বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যক্তিবিশেষ কিংবা মুষ্টিমেয় কোন গোষ্ঠীর অভিমত 'জনমত' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার মৌলিক প্রশ্নে জনসাধারণকে যথাসম্ভব একমত হইতে হইবে ও একই প্রকার অভিমত পোষণ করিতে হইবে।

কিন্তু ইহা দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে সকল মানুষ একই ভাবে চিন্তা করিবে। সমস্যাগুলির মূল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশে ঐক্য ও সহযোগিতার মনোভাব থাকাই যথেষ্ট। অপ্রধান বিষয়গুলিতে মতানৈক্য থাকিলে আপত্তি নাই।

বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের জাতীয় আদর্শসমূহকে বাস্তবে রূপায়িত করা এবং তদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সাহায্য করার প্রশ্নে সকলকে একমত হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে।

সমাজের যত বেশীসংখ্যক ব্যক্তি কোন বিশেষ 'মত' (opinion) পোষণ করে, ততই সেই 'মত' জনমত হিসাবে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

জনমত কখনও সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিবিশেষের সুচিন্তিত ব্যক্তিগত অভিমত রূপে জন্মলাভ করে না। সমাজ-জীবনের সাধারণ সমস্যাবলী সম্পর্কে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মানুষ চিন্তা করেন, বিচার করেন ও সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধারণ মানুষ সেই মতামত বিচার করিয়া নিজেরা গ্রহণ করে। এইভাবে জনমত গঠিত হয়। লাওয়েল (Lowell) বলেন, কোন অভিমতকে জনমতে রূপায়িত করিতে হইলে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নহে তেমনি সর্ববাদিসম্মত অভিমতও নিষ্প্রয়োজন (a majority is not enough and unanimity is not required).

জনপ্রিয় সরকার ও জনমত (popular government and public opinion)—জনপ্রিয় সরকার বলিতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ শাসনই বুঝায় না, পরন্তু আধুনিক সকল গণতান্ত্রিক দেশেই জনসাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে শাসনকার্যে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই সব প্রতিনিধি জনমতের মধ্য দিয়া তাঁহাদের নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন, অর্থাৎ আইন-সভায় বসিয়া প্রতিনিধিগণ জনমতের প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও তদনুযায়ী কাজ করেন। আমরা দেখিয়াছি যে, জনমত যখন কোন সামাজিক বা অন্যবিধ সংস্কার দাবী করে, আইনসভা বা সরকার দীর্ঘকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জনমতের দাবী স্বীকার করিতে হয়। জনমত অনুযায়ী আইন পাশ হয় ও শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

এইভাবে গণতন্ত্রে জনমত ও আইন প্রণয়নের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে।

যে সরকার জনমতকে স্বীকার করে, যে সরকার জনমতের প্রভাবে পরিচালিত হয়, তাহাই জনপ্রিয় সরকার। কিন্তু লাওয়েলের ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ জনমত জনতার সাময়িক হুজুগ নহে, ইহা তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত।

জনমতের বিচার ও সরকার (justification of government by public opinion)—জনমতের কষ্টিপাথরে সরকারকে বিচার করিতে হইবে। এদ্বারা একথা বুঝায় না যে, জনতা সব সময়ই নির্ভুল পথে চলিবে ও সাধারণের অভিমতই সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত হইবে। তবে কোন ব্যক্তি বা দলের চেয়ে বৃহত্তর জনসাধারণের মতামতই অনেক বেশী নির্ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

সরকার জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে দেশে শান্তি ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, নাগরিকগণ অধিকতর আইনানুগত হন, রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণভাবে মানুষ একনিষ্ঠ-ভাবে অনুগত থাকে।

জন-নিয়ন্ত্রণ বলিতে কি বুঝায়? (meaning of popular control)—দুইটি মাপকাঠিতে জনপ্রিয় সরকারকে বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভোটদান, সরকারী চাকুরী ইত্যাদির মধ্য দিয়া সমাজের কত লোক সরকারী কার্যপরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে আকৃতিগত গঠনের চেয়ে প্রকৃতিগত স্বরূপ দ্বারাই জনপ্রিয় সরকারকে বিচার করিতে হইবে।

জনপ্রিয় সরকারের মূলভিত্তি ও জনমত (the essence of popular government—control by public opinion)—গ্রেট বৃটেনের মত

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মধ্যে জনপ্রিয় সরকার বিদ্যমান থাকিতে পারে। সুতরাং জনমতের নিয়ন্ত্রণই জনপ্রিয় সরকারের মূলভিত্তি, আকৃতিগত গঠন নহে। জনসাধারণ উদাসীন ও অক্ষম হইলে সরকারের উপর জনমতের প্রভাব না আসিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির হস্তগত হয়। ফলে শাসনযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও নিষ্ক্রিয়তা প্রবেশ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করিয়া তুলে।

জনসাধারণের গভীর চেতনা ও সজাগ সতর্কতা বোধই স্বাধীনতাকে একনায়কত্বের বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। জনসাধারণকে বিশেষভাবে এ কথা উপলব্ধি করিতে হইবে, নিজেদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই সামাজিক কল্যাণ সাধনের পথ সুগম ও বিপন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

জনমত গঠনের পথ (agencies for the growth and expression of public opinion)—জনমত গঠন ও জনমতের প্রকাশভঙ্গীর উপর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ জনমতের সাহায্যে গণসংযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বুদ্ধি ও বিবেচনাসম্পন্ন, সুস্থ ও সবল জনমত দেশের শাসনব্যবস্থার উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। জনমত প্রকাশের অবাধ সুযোগ দেওয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

বর্তমান যুগে (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (২) সংবাদপত্র (press) (৩) সভাসমিতি (platform) (৪) রাজনৈতিক দল, (৫) চলচ্চিত্র ও বেতার এবং আইনসভার সাহায্যে প্রত্যেক দেশে সুস্থ ও সবল জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়।

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (educational institutions)—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন গঠিত হয়। বিদ্যালয়েই তাহারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে ও এই সময়ই তাহাদের নিজস্ব অভিমত গঠন আরম্ভ হয়। কোন ছাত্রের পক্ষে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে; কিন্তু এ কথাও সত্য যে কলেজের বিতর্কসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া যাহারা আজ বক্তৃতাদান করে তাহাদের মধ্য হইতেই দেশের ভাবী রাষ্ট্রনেতার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে তরুণ মনে যে সব ভাব ও আদর্শ সঞ্চারিত হয়, সেগুলি ছাত্রজীবন সমাপ্ত হইবার বহুকাল পরও কর্মজীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। রাশিয়া, জার্মানী ও চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করিলে বুঝা যাইবে যে দেশের জনমত গঠনের উপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী।

গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষার বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে। যুগে যুগে দেশে দেশে অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্র জনসাধারণকে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে রাখিয়া গণতন্ত্রের অগ্রগতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছে। গণতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় ও নিরাপদ করিতে হইলে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

(২) **সংবাদপত্র** (press)—সংবাদপত্রসমূহ জনসাধারণের সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে সংবাদ ও মতামত পরিবেষণ করিয়া থাকে। ইহারা সাময়িক ঘটনাবলীর উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়া জনমত গঠন ও প্রকাশ করে। সংবাদপত্র জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়। সেই শিক্ষার দোষগুণ ও ভালমন্দ সম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্রের লক্ষ্য ও আদর্শের সততার উপর নির্ভর করে। সত্য গোপন করা, বিরোধী পক্ষের সংবাদ প্রকাশ না করা, ঘটনার উদ্দেশ্যমূলক বিকৃত ব্যাখ্যা সাংবাদিক সততার বিরোধী। সুস্পষ্ট, নির্ভীক, নিরপেক্ষ চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গীই সাংবাদিকতার আদর্শ। বর্তমান যুগে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতির জীবনে সংবাদপত্র আজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্রাইস বলিয়াছেন যে, মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা দলের স্বার্থ-সিদ্ধির যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইলে সংবাদপত্রের বিরাট প্রভাবের অপব্যবহার হইবে। কোন দেশেই সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, তাহা হইলে সরকারের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সরকার কর্তৃক কণ্ঠরোধ ব্যতীত মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ধনী ব্যক্তি দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও গ্রেট বৃটেনের ধনিকগোষ্ঠী বিভিন্ন শক্তিশালী সংবাদপত্রকে স্ব স্ব স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করিতেছেন। এইভাবে সংবাদপত্র সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণ দুইই করিতে পারে। সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদপত্র দ্বারা যাহাতে জনমত বিভ্রান্ত না হইতে পারে, তৎসম্পর্কে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ সংগ্রাম করিতে পারে না। জনসাধারণের বক্তব্য সত্য ও সুস্পষ্টভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া উচিত।

মানবসভ্যতা এবং গণতন্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাসে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্র শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও দুর্নীতিকে প্রকাশ করিয়াছে, শাসকশ্রেণীর ভুলভ্রান্তি ও স্বার্থপরতাকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং স্বাধীনতার পূজারীবৃন্দকে জন-জাগরণের কাজে সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু বিপদ এই যে, সংবাদপত্রও দুর্নীতির করাল গ্রাসে পতিত হইতে পারে। অর্থ ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তি বা দল সংবাদপত্রকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সাধারণ ব্যবসার পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে।

(৩) **সভা-সমিতি** (platform)—সভা-সমিতির প্রভাবও জনমতের উপর কম নহে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যা সম্পর্কে-যাঁহারা চিন্তা করেন সেই সব অগ্রণী ব্যক্তি বক্তৃতা, বিতর্ক, আলোচনার মধ্য দিয়া জনমত গঠন করেন। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ইঁহারা জনসাধারণের মনে আলোকপাত করেন এবং সেই সব সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠনে সাহায্য করেন।

(৪) **রাজনৈতিক দল** (parties)—জনমত গঠনের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল-গুলির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। সাধারণ মানুষ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা বুঝিতে পারিলেও ব্যক্তিগত কর্তব্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সেই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা বা তাহা সমাধান করিবার সময় এবং শক্তি সকলের থাকে না। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলে। সুতরাং রাজনৈতিক দল ছাড়া জনমত গঠন সম্ভব হয় না।

(৫) **চলচ্চিত্র ও বেতার** (the radio and the cinema)—**চলচ্চিত্র** ও বেতারের মধ্য দিয়াও জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হয়, জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানে না। তাহারা শুনিয়া ও দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষে সংবাদপত্র ও স্কুল-কলেজ অপেক্ষা চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষিত করা এবং জনমত গঠন করা সহজ।

(৬) **আইনসভা** (legislature)—প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক, প্রগতিবাদী আইন-সভার মধ্য দিয়াও জনমতের অভিব্যক্তি হয়। জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাবও কম নহে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনসভা জনমত প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান নহে।

জনমতগঠনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অপব্যবহার
(Their Limitations and Dangers of Abuse)

অধুনা অনেক দেশে জনমত সংগঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল এবং বেতার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ করা হয়। অভিযোগকারীদের বক্তব্য এই যে, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান-

সমূহ শ্রেণীস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থের সেবা করিতেছে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণী জনমত সংগঠন ও প্রকাশের এই সব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের স্বার্থপ্রণোদিত মতামত প্রচার করিতেছে। এইরূপ প্রচারের ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যার সত্য-রূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত না হইলে জনসাধারণের পক্ষে সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। এইভাবে প্রকৃত জনমত গঠনের অভাবে দেশে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্দিন ঘনাইয়া আসে।

ষোড়শ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল এবং দলীয় সরকার

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে (What is a party)?—দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে একমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া একটি দল গঠন করেন। দলের নীতি এবং কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া থাকেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

কিভাবে দল গঠন করা হয় (How parties are formed)?—দেশের সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে। যে যাহার নিজের মত সাধ্যমত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে। একমতাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজেদের সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি গড়িয়া উঠে। নেতার বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উপর দলের জনপ্রিয়তা অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁহার উচিত জাতীয় স্বার্থকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া এবং আপনার জীবন দ্বারা সমাজে আদর্শ স্থাপন করা। তাঁহাকে জনচিত্ত জয় করিতে হইবে।

দল এবং উপদলের মধ্যে পার্থক্য (party distinguished from mere faction)—"সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা জাতীয় কল্যাণের জন্য কোন বিশেষ নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ লোকজনকে রাজনৈতিক দল বলা হইয়া থাকে।"—বার্ক। (Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours the national interest, upon some particular principle in which they are all agreed.—Burke).

দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হইল সমবেতভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করা। যে কেহ ইচ্ছা করিলে দলের সভ্য হইতে পারে।

দল হইতে উপদল অপেক্ষাকৃত একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান। ইহার কোনরূপ উচ্চ আদর্শ নাই। সভ্যগণ সর্বদা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের কার্য (the functions of political parties)—দলের প্রধান কার্য হইল জনসাধারণকে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করিয়া

জনমত গঠন করা। নানা উপায়ে রাজনৈতিক দলের নীতি প্রচার করা হয়। বলিষ্ঠ জনমত গঠন করিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচার বন্ধ করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টীয় শাসনে দলের প্রাথমিক কার্য হইল নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা। এইজন্য সংগঠন প্রয়োজন। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলসমূহ নানাবিধ কাজ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান:--

(১) নানা উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে দলের নীতি এবং উদ্দেশ্য প্রচার করা হয়।

(২) দলের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনসভা এবং সংবাদপত্র মারফৎ সারা বৎসর এবং বিশেষ করিয়া নির্বাচন-দ্বন্দ্বের পূর্বে রাজনৈতিক প্রচার-কার্য চালান হয়।

(৩) প্রার্থী মনোনয়ন করা হয় এবং জনসাধারণ ও দলের সভ্যগণকে দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

(৪) সরকারী ক্ষমতা এবং পদ করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। ভোটদাতার কাছে নিজ দলের নীতি এবং প্রার্থীকে অন্য দলের নীতি ও প্রার্থী অপেক্ষা ভাল বলিয়া প্রচার করা হয়।

(৫) নির্বাচনে জয়লাভের পর দল নিজ নীতি কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে নির্বাচনে জয়লাভের পর আপন প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া সভ্যগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন।

দলীয় সরকার (party government) —প্রত্যেক দল আইন-পরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকারী ক্ষমতা অধিকার করিতে চায়। সাধারণতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সভ্যগণ সরকার-বিরোধী দল গঠন করিয়া থাকে। কখন কখন পরিষদের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিপক্ষদলের সভ্য ভাঙগাইয়া নিজদলের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সরকার করায়ত্ত করিয়া থাকে। পূর্বতন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তখন হীনবল হইয়া সরকার-বিরোধী দলে পরিণত হয়। এইরূপে গঠিত সরকারকে দলীয় সরকার (party government) বলা হয়।

দলীয় সরকারের মূলনীতি হইল এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতানুযায়ী দেশ শাসিত হইবে।

বহুজনের স্বার্থে বা প্রয়োজনে অল্পসংখ্যক লোকের মত বা স্বার্থ রক্ষা করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। শাস্ত্রেই আছে—"বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় চ।" সুপরিচালিত দলীয় সরকার যেমন দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে পারে,

আবার তেমনি বিপথগামী হইলে এই সরকার উচ্ছৃঙ্খল এবং অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারে—ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

দেশে মাত্র দুইটি দল, না বহু দল থাকা উচিত? (multiple parties and two party system)—কোন দেশে দুইটি দল আবার কোন দেশে তিন বা ততোধিক দল রহিয়াছে। বহু দল থাকিলে বুঝিতে হইবে অধিবাসীদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য নাই।

বহু দল জাতীয় উন্নতির বাধাস্বরূপ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং উপদল জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া আপন ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। দেশে বহু দল থাকিলে যে মিলিত মন্ত্রিসভা (coalition ministry) গঠিত হয় তাহা স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া থাকে। যে কোন মুহূর্তেই সেই মন্ত্রিসভার পতন হইতে পারে। ক্ষমতালোভী দল নানা কৌশলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে আপনার পক্ষে টানিয়া লয়। বহু দল থাকার ফলে দেশের রাজনীতিতে বহু কূটনৈতিক খেলা এবং দুর্নীতি দেখা দেয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক দেশে অন্ততঃ দুইটি রাজনৈতিক দল থাকা বাঞ্ছনীয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার পরিচালনা করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকার-বিরোধী দলরূপে উহাদের কার্যাবলী সমালোচনা করিয়া সরকারকে সর্বদা সজাগ, সতর্ক এবং দুর্নীতি হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করে। সমদলীয় মন্ত্রিসভা আইনসভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন পাইয়া থাকে। এইজন্য মন্ত্রিগণ নিশ্চিন্তমনে ধীরভাবে তৎপরতার সহিত সরকারী কার্য নির্বাহ করে। অন্যায় বা অত্যাচার করিলে বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে সরকারপক্ষ সর্বদা সতর্কভাবে কাজ করিয়া থাকে।

বিরোধী দল সর্বদা শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করে। অকারণ সমালোচনা করিলে জনসাধারণ রুষ্ট হইতে পারে এই ভয়ে বিরোধী দলও কখন সরকারের অন্যায় বা অকারণ সমালোচনা করে না।

দুইটি মাত্র দল থাকিলে শাসনকার্য পরিচালনা সহজ এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

দলের উপকারিতা (merits of the party system)

(১) বৃহৎ দেশের পক্ষে দল অপরিহার্য। দল না থাকিলে অধিবাসিগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যার কিছুই জানিতে পারিত না। দলীয় প্রচারের ফলে অধিবাসীরা বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে।

বিশেষতঃ নির্বাচনী প্রচারকার্যের সময় মানুষ অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক দল নির্বাচন-দ্বন্দ্বে স্বীয় প্রার্থী মনোনয়ন করে। যাহাতে ভোটদাতারা নিজ দলের প্রার্থীকে নির্বাচন করে সেজন্য প্রত্যেকটি দল জোর প্রচার-কার্য চালায়। দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং তাহার সমাধানের উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি দল ভোটদাতাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে লাস্কি বলিয়াছেন, "দলগুলি বিভিন্ন সমস্যার সমস্ত দিক জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরে এবং ইহা বিচার করিয়া তাহারা ভোট দেয়" (Parties arrange the issues upon which the people are to vote)।

(২) রাজনৈতিক দলগুলি নাগরিককে ভোট দিতে উৎসাহিত করে। ফলে প্রত্যেককেই দেশের শাসনকার্যে সহযোগিতা করিতে হয়, কেহই উদাসীন থাকিতে পারে না।

(৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংঘবন্ধ রাজনৈতিক দল না থাকিলে সরকার দুর্বল হইয়া পড়িবে। আইনসভাই প্রকৃতপক্ষে সরকার গঠন এবং পরিচালনা করিয়া থাকে। আইনসভার অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন ব্যতীত কোন মন্ত্রিসভা কাজ করিতে পারে না।

আইনসভায় কোন সংঘবন্ধ দল না থাকিলে মন্ত্রিগণ জানিতেই পারিবেন না যে তাঁহারা অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাইবেন বা পাইবেন না। আইনসভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের সমর্থন থাকিলে সরকার দেশশাসনে মনোনিবেশ করিতে পারে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলিয়া জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবন্ধ না হইতে পারে তাহা হইলে দেশে বিশৃংখলা এবং গোলযোগ দেখা দিবে।

(৪) সংঘবন্ধ রাজনৈতিক দল না থাকিলে দেশে স্বৈরাচার দেখা দিতে পারে। সরকারকে বিরোধী দলের মতামত বিবেচনা করিয়া এবং দেশের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। কারণ কোনও ভুল হইলে বিরোধী দল সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে সরকারী দল কখনও অন্যায়ভাবে শাসন করিতে পারে না।

অপকারিতা (demerits)

(১) দলের প্রতি আনুগত্য দেশের প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে. লোকে জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে; দেশের ভালমন্দের দিক হইতে বিচার না করিয়া দলীয় স্বার্থের দিক হইতে সব কিছু বিচার করিতে থাকে। কোন প্রকারে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করাই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে।

(২) দলের স্বার্থে সভ্যগণকে ব্যক্তিত্ব বলি দিতে হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেককে বিনা বিচারে দলের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ কাহারও দলের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার সাহস বা অধিকার নাই। দলের নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত করা হয়। সভ্যদের স্বাধীন চিন্তা করিবার বা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার নাই।

(৩) স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি দলের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়। যে সকল সদস্য বিনা বিচারে দলের নির্দেশ মানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে এই সকল পদে নিয়োগ করা হয়। সুতরাং অনেক যোগ্য ব্যক্তি শুধু অপর দলভুক্ত বলিয়াই মন্ত্রী হইতে পারেন না। এমন কি দলের স্বাধীনচেতা সদস্যগণও এই সর্তাধীনে পদ গ্রহণ করেন না।

(৫) দলগুলি নানা স্তোকবাক্যের দ্বারা জনসাধারণের মন হরণ করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। অনেক সময় সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র ভোট লাভের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হয়।

নাগরিক এবং দল (the citizen and the party)—দলীয় সরকারের দোষ দেখিয়া অনেকে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু নাগরিকেরা যদি শাসনব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং নিজেরাই দেশের বিভিন্ন সমস্যা চিন্তা করিয়া সমাধানের চেষ্টা করে তাহা হইলে দলগুলি আর তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেককে অবহিত থাকিতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী

আমরা দেখিয়াছি যে, ভোটদানের অধিকার বর্তমান যুগে নাগরিকদের একটি অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

প্রতিনিধিমূলক সরকারের যুগে ভোটাধিকারের গুরুত্ব আরও বেশী। আজকাল নাগরিকগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা দলের মধ্য হইতে নিজেদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে হয়। এই সব প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা ব্যক্তি প্রত্যেকেই জনসাধারণের পক্ষ হইতে কথা বলিবার ও কাজ করিবার সুযোগ দাবী করেন।

আকারে ও জনসংখ্যায় বৃহৎ কোন রাষ্ট্রের সরকারী কার্যে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্থলে প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় নাগরিকবৃন্দ প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারী নির্বাচন করিয়া থাকেন। ইঁহারাই নাগরিকদের পক্ষ হইতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য (the nature and functions of the electorate) —সমগ্রভাবে নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক (প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বা ব্যক্তির মধ্যে) প্রতিনিধি মনোনয়ন করাকে নির্বাচন বলে, মনোনয়নের বিশেষ কার্যটিকে ভোটদান বলে, যে নাগরিকবৃন্দ মনোনয়ন করেন তাহাদের ভোটদাতা(voter) বলে এবং সমগ্রভাবে তাহাদিগকে নির্বাচকমণ্ডলী (electorate) বলা হয়।

ভোটদানের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারেঃ—(ক) সরকারী পদের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন এবং (খ) কোন সরকারী কার্য অনুমোদন করা বা না করা।

যথাযোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন বা নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য সম্পাদন করাই প্রতিনিধিমূলক সরকার বা আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি।

আধুনিক রাষ্ট্র ও নির্বাচকমণ্ডলী (the modern state and the electorate) —আধুনিক রাষ্ট্রের শক্তি ও স্থায়িত্ব উহার গণতান্ত্রিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে।

গণতন্ত্রের দুইটি দিক—(১) ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্থাৎ আইনের চক্ষে সকলেই সমান; (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ দেশের সরকার গঠন ও পরিচালনায় প্রত্যেকেরই অংশ আছে।

প্রকৃত গণতন্ত্রে কেবলমাত্র সকলেই যে আইনের চক্ষে সমান তাহা নহে, উপরন্তু সরকারী ব্যাপারে সকলেই সমান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ গণতন্ত্র কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি বর্তমানে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সরকার জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন, সে নিয়ন্ত্রণ যতই অসম্পূর্ণ ধরণের হউক না কেন।

গণ-নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচকমণ্ডলী (popular control and the electorate) —নির্বাচকমণ্ডলীর আকার যত বৃহত্তর হইবে অর্থাৎ যত অধিক সংখ্যায় জনসাধারণের ভোটাধিকার থাকিবে সরকারের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ ততই বেশী হইবে। বয়স, নাগরিকত্ব, বাসস্থান, সম্পত্তি, শিক্ষা, অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর আকার নির্ভর করে। কোন রাষ্ট্রেই সকল মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় নাই। নাবালক, উন্মাদ, অপরাধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নাই। কারণ ইহারা অধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের কথা বাদ দিলেও অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে ভোটের অধিকার দেওয়া সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ভোটাধিকারের প্রকৃত ভিত্তিভূমি (the true basis of franchise) —রুশো এবং অন্য কয়েকজন ফরাসী চিন্তানায়ক বলেন যে, জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অতএব প্রত্যেক নাগরিকেরই ভোটদানের অধিকার জন্মগত।

জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill), লেকী (Lecky), মেইন (Maine), ব্লুন্শলি (Bluntschli) প্রমুখ চিন্তানায়কগণ বলেন যে, ভোটদানের অধিকার জন্মগত নহে। সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহারা যথাযোগ্যভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী সেই ব্যক্তিবৃন্দেরই কেবলমাত্র ভোটাধিকার থাকিবে।

এ কথা সত্য যে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষপাতী ব্যক্তিরাও কয়েকটি সীমারেখা স্বীকার করিতে বাধ্য।। নাবালক, উন্মাদ বা বিদেশীদের তো ভোটাধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও এই অধিকারদানের পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই। এই সমস্ত সীমারেখা সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষপাতী ব্যক্তিবৃন্দও সহজেই মানিয়া লন।

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারদানের পক্ষপাতী ব্যক্তিরা বলেন যে, যোগ্যতা প্রমাণিত না হইলে কাহাকেও এই অধিকার দেওয়া চলে না। ইহারা শিক্ষা, সম্পত্তি ও করদানের ক্ষমতাকে যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি বলিয়া মনে করেন।

মিল বলিয়াছেন, কেহ লিখিতে পড়িতে অথবা পাটীগণিতের সাধারণ সূত্রসমূহ না জানিলে তাহাকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, যাহারা কিছু না কিছু কর দিয়া থাকে কেবল তাহাদিগকেই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। যাহারা কর দেয় না তাহাদের হাতে করদাতাদের অর্থ সম্পর্কিত ব্যবস্থা করিবার ভার দিলে তাহারা স্বভাবতঃই অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিবে।

মানুষ বুদ্ধি এবং বিবেচনার সহিত এই অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিলেই ইহার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

লেকী (Lecky) এবং মেইন (Maine) ব্যাপক ভোটদানের অধিকারকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতেন। কারণ তাঁহাদের মতে ইহা দ্বারা অজ্ঞ এবং নির্বোধ জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁহারা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার বহু দেশে ব্যাপক ভোটদানের অধিকার প্রবর্তনের ফলে তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শিক্ষা, সম্পত্তি প্রভৃতিকে যোগ্যতার মাপকাঠি হইতে বাদ দিয়া আমেরিকা এবং ইয়োরোপের বহু দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশের নব-শাসনতন্ত্রে গণ-ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষাকে ভোটাধিকার লাভের আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য মিল গুরুত্ব দিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

সম্পত্তি ও করদান সম্পর্কিত যোগ্যতা সম্পর্কে এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তাহাদের নাগরিক অধিকারলাভের পক্ষে বর্তমান যুগে অন্তরায়স্বরূপ হইতে পারে না।

প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারদান আদর্শ হইলেও এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যথাযোগ্যভাবে সেই অধিকার প্রয়োগ করার উপর রাষ্ট্রের প্রগতি নির্ভর করে। কেবলমাত্র ভোটাধিকারের পরিধি বিস্তৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশীলতা ও দায়িত্ববোধকে ক্রমশঃ উন্নততর করিবার দিকেও অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (adult suffrage)—পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার দানের মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকেই গণতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা হয়।

সুফল (merits)—একমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই সকল মানুষ সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে পারে। এই পথেই দেশের সমগ্র জনসমষ্টি সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে ও সমাজের সকল অংশই প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের উদ্ভব হয়। দলগুলি সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় বা শ্রেণীগত স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবে জনসাধারণের জীবনে রাজনীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।

বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি (objection)—লেকী ও মেইনই সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বিপজ্জনক ও অসঙ্গত। লেকী প্রশ্ন করিয়াছেন, "পৃথিবীতে অজ্ঞতা অথবা জ্ঞান কোন্‌টা পৃথিবীকে শাসন করিবে?" তাঁহার মতে, ইহা দ্বারা সরকার অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে চলিয়া যাইবে। সুতরাং ইহার ভূমিকা প্রগতিশীল হইতে পারে না।

• **সিদ্ধান্ত** (conclusion)—সকল প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতিই জয়লাভ করিয়াছে।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বে সকলের জন্য সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে মিলের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ভারতে পুরুষদের ভোটাধিকার (mánhood suffrage in India)—পুরুষদের ভোটাধিকার বলিতে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার বুঝায়, নারীদের ইহার মধ্যে ধরা হয় না। এইভাবে ইহা সীমাবদ্ধ আদর্শ। বর্তমানে নরনারী নির্বিশেষে সার্বজনীন ভোটাধিকারই আদর্শস্থানীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

নানাদিক দিয়া ভারতের সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবী করেন। কিন্তু শৃঙ্খলিত ভারতে বৃটিশ সরকার সে দাবী বাতিল করিয়া দেন। কারণস্বরূপ তাঁহারা নারীদের পর্দাপ্রথা, ভারতীয় নরনারীর ভয়াবহ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁহারা রাজনীতি ও শাসনসংক্রান্ত অসুবিধারও অজুহাত দেখান।

ভারতীয় জনসমাজের শতকরা ৮ জন মাত্র শিক্ষিত। জনসাধারণ বই বা সংবাদপত্র পড়িতে জানে না। জ্ঞানের জন্য প্রতিবেশীদের আলাপ-আলোচনার উপরই তাহাদের নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু প্রতিবেশীরাও অধিকাংশ নিরক্ষর। সুতরাং জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ পল্লীর প্রজাদিগকে ভোটের অধিকার দান সংগত মনে করা হয় নাই। কারণ তাহারা বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না।

এই কারণে ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা অন্যায়। পর্দাপ্রথা অত্যন্ত দ্রুত অবলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণভাবে ভারতীয়গণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন। লেখাপড়া না জানিলেও জ্ঞান, চরিত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক দিয়া সে অক্ষম ও পংগু নহে। তাহার নিরক্ষরতাই অজ্ঞানতা, চরিত্রগত দুর্বলতা বা রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতার প্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষভাবে চলচ্চিত্র ও বেতারের যুগে এই অজুহাত অচল।

নিরক্ষরতার অজুহাতে ভারতবর্ষে ভোটাধিকার সংকুচিত না করিয়া অবিলম্বে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন দ্বারা জনসাধারণকে যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া তোলাই সরকারের অবশ্য কর্তব্য। এই ব্যবস্থা না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের বেতারের সাহায্যে জনসাধারণকে শিক্ষা ও নির্দেশদানের সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। গ্রামে গ্রামে রেডিও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আনন্দের কথা এই যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হইয়াছে।

নারীদের ভোটাধিকার (women's suffrage)—নারীদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধবাদীরা আশংকা করেন যে নারীগণ রাজনীতিতে যোগদান করিলে তাহাদের নারীজনোচিত বিশিষ্ট গুণাবলী বিনষ্ট হইবে এবং পরিবারের সুখ ও শান্তি থাকিবে না। পরিবারের প্রতি নারীরা যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন না করিলে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিবে। সামাজিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কর্তব্য সম্পূর্ণভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

বর্তমানে এই বিরোধিতা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার অপরাধে তাহারা ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

নারীদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি এই—(১) নৈতিক ও বুদ্ধিগত যোগ্যতাই ভোটদানের মাপকাঠি, সুতরাং নারী বলিয়াই কেহ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না; (২) আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও নারীদের এই অধিকার থাকা প্রয়োজন; (৩) নারীরা রাজনীতিতে পবিত্রতর প্রভাব বিস্তার করিবে।

মিলের কথায় বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি এই যে, "নারীরা পুরুষ আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভরশীল হইয়া তাহাদেরই আদেশে ভোট দিবেন।......যদি তাহাই হয়, হইতে দাও।"

নির্বাচনপদ্ধতি (modes of election)—নির্বাচনপদ্ধতির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে—কি ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে?

প্রত্যক্ষ বনাম পরোক্ষ নির্বাচন (direct versus indirect election)—প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ ভোটদাতারা সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ নির্বাচনে সাধারণ ভোটদাতাগণ নিজেদের ভোট দ্বারা এক সংকীর্ণ নির্বাচক-মণ্ডলী গঠন করেন। এই নির্বাচকমণ্ডলী সাধারণ ভোটদাতাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। পরোক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাদের প্রভাব ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়।

পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি এইরূপঃ—পরোক্ষ নির্বাচনে মূল প্রতিনিধি নির্বাচন অপেক্ষাকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে সার্বজনীন ভোটাধিকারের কুফলগুলি আত্মপ্রকাশ করে না এবং নির্বাচন ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খল জনতার (mob-rule) প্রাধান্য থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে পরোক্ষ নির্বাচনপ্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা বাতিল করিয়া তৎস্থলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনপ্রথাই উন্নততর ব্যবস্থা হিসাবে প্রবর্তন করা হইয়াছে। মধ্যশ্রেণীর হস্তক্ষেপের ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে দুষ্কার্য আত্মপ্রকাশ করে। এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েট সরকার প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ এবং রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ বাড়িয়া যায় ও রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সাধারণ ভোটদাতারা স্বার্থপ্রণোদিত রাজনীতিবিদ্‌দের কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের চিন্তা ও সুবুদ্ধির পরাজয় ঘটিতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অসুবিধার চেয়ে ইহার সুবিধা ও সুফল বেশী এবং প্রত্যেক দেশে ইহা গৃহীত হইয়াছে।

গোপন বনাম প্রকাশ্য ভোটদান (secret *versus* public voting)—বর্তমানে গোপন বনাম প্রকাশ্য ভোটদান সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। কারণ সমস্ত দেশে গোপন ভোটপত্রে (ballot) ভোটদানের পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।

স্বাধীনভাবে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতে হইলে ভোটদাতাকে সুস্পষ্টভাবে এই আশ্বাস দিতে হইবে যে ভোটদানের জন্য তাহাকে কোন প্রকার লাঞ্ছনা বা অপমান সহ্য করিতে হইবে না। এই ব্যবস্থা একমাত্র গোপনে ভোটদানের মধ্য দিয়াই সম্ভব। তাহাতে কে কাহাকে ভোট দিয়াছে ইহা একমাত্র ভোটদাতা ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারিবে না।

শাসকগোষ্ঠী, জমিদার ও মালিকশ্রেণী এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে বহুদিন প্রবল-ভাবে বাধা দিয়াছেন। কারণ প্রকাশ্যে ভোট-ব্যবস্থায় ইঁহারা ভোটদাতাদের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। জার্মান পণ্ডিত ত্রাইত্স্কে (Treitschke) প্রকাশ্য ভোটদানের পক্ষে বলেন, "ভোটদানের মধ্যে সর্বসাধারণের দায়িত্ব রহিয়াছে। অতএব ইহা সাধারণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।" মিলও এই ব্যবস্থার সমর্থনে বলেন, "ভোটদানের কর্তব্য জনসাধারণের সমষ্টিগত কর্তব্য। সুতরাং অন্যান্য সমষ্টিগত কার্যের মত ইহাও জনসাধারণের চোখের সামনে সমালোচনার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।"

নির্দোষ নির্বাচনপ্রথার উপাদান (the essentials of a good electoral system)—উত্তম নির্বাচনপদ্ধতির জন্য গোপন, প্রত্যক্ষ ও সার্বজনীন ভোটদানের অধিকার প্রবর্তন করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

তাহা ছাড়া সর্বসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে ভোটদাতাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, আইনপ্রণয়ন ও শাসনকার্যে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং নির্বাচনকে সর্বতোভাবে দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে।

নির্বাচনে জালিয়াতী ও দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য নির্বাচনে পবিত্রতা রক্ষা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের চেয়ে নাগরিকদের দায়িত্বও মোটেই কম নহে।

মানুষ এখনও নির্দোষ নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারে নাই। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য মানবসমাজকে সচেতনভাবে অনবরত চেষ্টা করিতে হইবে।

নির্বাচনপদ্ধতি (the electoral procedure)—নির্বাচনের কার্য বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ ভোটদাতাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ভোটদাতার তালিকাভুক্ত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। ভোটদাতার তালিকাভুক্ত না থাকিলে কেহ ভোট দিতে পারে না।

তারপর যে সব ব্যক্তি প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থী হইবেন তাঁহাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে। এই মনোয়নপত্র নির্ভুল ও নির্দোষ কি না রিটার্নিং অফিসার তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা (scrutinise) করিয়া দেখেন। নির্বাচন তারিখ, প্রার্থীদের নাম ও ভোটকেন্দ্রসমূহের নাম জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনের তারিখে বা সময়ে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের দায়িত্ব একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা পোলিং অফিসারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভোটদাতাগণ কেন্দ্রে গিয়া ব্যালট বাক্সে স্ব স্ব ভোট রেকর্ড করেন। ব্যালট বাক্স পর্দার অন্তরালে রাখা হয়। ভোটগণনা হওয়ার পর রিটার্নিং অফিসার ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচনে কোন অসদুপায় অবলম্বিত হইলে পরাজিত প্রার্থী যথাযথ প্রমাণ দ্বারা নির্বাচন বাতিল করাইয়া লইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় পুনরায় নূতনভাবে নির্বাচনকার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

নির্বাচকমণ্ডলীর সমস্যা (problems of the electorate)—নির্বাচকমণ্ডলীর সমস্যাগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটি এইরূপঃ—

(ক) সরকারী কার্যের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ এবং (খ) প্রতিনিধিত্বের সমস্যা।

(ক) নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (the control of the electorate)—কেবলমাত্র ভোটাধিকার ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়াই গণতন্ত্রের বিচারের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ভোটদানের অধিকার ব্যাপক থাকিতে পারে। কিন্তু যদি নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব না খাটাইতে পারে, তাহাদের হাতে প্রয়োজনমত সরকারী কার্য নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা না থাকে এবং এই ক্ষমতা অবস্থানুযায়ী যথাসময়ে প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে এরূপ সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলিয়া যায়।

নির্বাচকমণ্ডলী সর্বদা সরকারী কার্য ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়।

নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধরণের হইতে পারে। সতর্ক ও সচেতন জনমত সভা, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য দিয়া সরকারের উপর চাপ ও প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে ব্যর্থ ও নিরাশ হইয়া সাধারণতন্ত্রী জার্মানীর মত অনেক গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচকমণ্ডলী চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বহস্তে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

(১) ঘন ঘন নির্বাচন (frequent elections) **(২) পদচ্যুতির ক্ষমতা** (the recall) **(৩) গণভোট** (referendum) **(৪) প্রবর্তনের ক্ষমতা** (initiative) ইত্যাদির মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিয়া থাকে।

(১) **ঘন ঘন নির্বাচন** (frequent elections) —ঘন ঘন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে আইনসভার স্বৈরাচারী ও জনমতের প্রতি উদাসীন হইবার সম্ভাবনা নাই।

(২) **পদচ্যুতির ক্ষমতা** (the recall)—কোন কোন দেশে এরূপ প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, কোন প্রতিনিধি নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা বা নির্দেশের বিরুদ্ধে চলিলে ভোটদাতাগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। এইভাবে ভোটদাতাগণ নির্বাচিত যে কোন সরকারী কর্মচারী বা প্রতিনিধিদের অপসারণ করিতে পারে।

(৩) **গণভোট** (the referendum)—এই ব্যবস্থা দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সমূহকে সমগ্র জনসাধারণের ভোটে দেওয়া হয় এবং জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্মতি লাভ করিলেই এই সব বিষয়ে আইন হইতে পারে।

(৪) **প্রবর্তনের ক্ষমতা** (the initiative) —এই ব্যবস্থা দ্বারা নির্বাচক-মণ্ডলী হইতে আইনসভার কাছে কোন বিষয় বিবেচনা করিবার এবং তাহা জনসাধারণের ভোটে দিবার দাবী করিতে পারেন।

(খ) প্রতিনিধিত্বের সমস্যা (problems of representation)—নির্বাচক-মণ্ডলীর সমস্যাবলীর মধ্যে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ও বিশেষ স্বার্থের (special interest) প্রতিনিধিত্বের সমস্যা অন্যতম।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব (representation of minorities)—সমগ্র জন-সমষ্টির সরকার কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকারে পর্যবসিত হওয়ার তীব্র সমালোচনা করিয়া মিল বলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়। সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ।

তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদলই শাসন করিবে এবং সংখ্যালঘুদের ইহা মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু সংখ্যালঘুদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্সে ও ইউরোপের আরও কয়েকটি

দেশে আনুপাতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নীতিগতভাবে এবং শাসনসংক্রান্ত অসুবিধার জন্য অনেকে আনুপাতিক নির্বাচনের নিন্দা করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের অত্যাচার এবং অবিচার হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠদলকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন (communual representation)—সংখ্যালঘুদের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য অধিকার ও প্রয়োজন সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু পৃথক নির্বাচন ও যুক্ত নির্বাচন সম্পর্কে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে।

মুসলমান, ইউরোপীয় ইত্যাদি সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিত্তিতে নির্বাচন জাতীয়তা-বিরোধী, অগণতান্ত্রিক। ইতিহাসে ইহার ভয়াবহ পরিণতি হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহার ফলে কোন সম্প্রদায়বিশেষ চিরদিন জাতীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের সম্মুখে সাম্প্রদায়িক সমস্যা হইতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় আছে—তাহা গরীব সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ সকলেই গরীব, সকলেই অজ্ঞ, সকলেই ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সকলের দুঃখ-দুর্গতি অপরিসীম। এই শোচনীয় দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার পর্বতপ্রমাণ স্তূপকে অপসারিত করিতে হইলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়কে এক স্বার্থে এক জাতির পতাকাতলে সমবেত হইতে হইবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ না হইলে জনসাধারণের উন্নতি-বিধান অসম্ভব।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পাপচক্রের ঘূর্ণীপাকে আমরা আমাদের মহান জাতীয় স্বার্থ ও আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়াছি আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে—কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এইজন্য বর্তমানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সমর্থন দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। গণপরিষদ ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথা বিলুপ্ত করিয়াছেন।

পৃথক নির্বাচন (separate electorate)—সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মন্দ, কিন্তু পৃথক নির্বাচন জঘন্যতর। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ব্যতীত কেহ পদপ্রার্থী হইতে পারিবে না এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ভোটদাতাবৃন্দ ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। এই ব্যবস্থাও নূতন শাসনতন্ত্রে লুপ্ত হইয়াছে।

বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব (the representation of special interests) —ভারতবর্ষে ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও জাতীয়তার বিরোধী। এই ব্যবস্থার অন্তরালে একই ব্যক্তি দুইটি ভোট পর্যন্ত দিতে পারে এবং ইহাতে শ্রেণীবিশেষকে সাধারণ মানুষের উপর বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ইহার ফলে বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং ইহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতীয় গণপরিষদ ভারতের নব-শাসনতন্ত্র রচনায় এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। সাধারণ নির্বাচনে সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের জাতীয় স্বার্থ হইতে বিভিন্ন কোন বিশেষ স্বার্থ আছে বলিয়া মনে করেন না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

সাধারণতঃ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বৃহদায়তন রাষ্ট্রকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপর এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে ইহাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (local self-government) এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহাকে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা (local government) বলা হয়।

ভারতবর্ষে নগর বা শহরের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ (municipalities) এবং জেলা, মহকুমা ও গ্রামের জন্য যথাক্রমে জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

এইভাবে ফ্রান্সকে কয়েকটি commune-এ, জার্মানীকে কয়েকটি city circles এবং rural communeএ, গ্রেট বৃটেনকে কয়েকটি counties, boroughs, parishes এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কয়েকটি counties এবং townships-এ ভাগ করা হইয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনেরাই সম্যকভাবে পরিচিত থাকে। এইজন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা স্থানীয় বিষয়ের সুপরিচালনা করা সম্ভব। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হইলঃ—

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হ্রাস করা। কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি লইয়া সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় (দেশরক্ষা, ডাক, তার ইত্যাদি)। ইহার পক্ষে গ্রাম ও নগরের আঞ্চলিক শাসন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। সেজন্য আংশিকভাবে শাসনভার স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া হয়।

(২) আঞ্চলিক সমস্যা অঞ্চলের অধিবাসীরা সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া বুঝে। অতএব তাহাদের হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেকেই সাধ্যমত আপন আপন অঞ্চলের উন্নতির চেষ্টা করিবে।

(৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক অধিবাসী দেশের শাসন-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। স্বায়ত্তশাসনমূলক

প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই নাগরিক আপন স্বাধীনতা পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিবে।

ইংলণ্ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা—ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলির স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে স্বায়ত্তশাসনের কার্যভার অধিক দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বহুলাংশে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ায় অধিক কার্যকরী। পক্ষান্তরে ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইতালীর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রিত বলিয়া তাহাদের মূল শাসনের অংশরূপে গণ্য করা হয়। ইহারা নানা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে কখন হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে—শাসনকার্যে অব্যবস্থার জন্য বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য ঃ—জননিরাপত্তার ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, যানবাহনের ব্যবস্থা, জল সরবরাহ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইহা ব্যতীত শহরের কতকগুলি বিশেষ অভাব আছে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যেমন—রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, বস্তি-উন্নয়ন, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম, পার্ক এবং খেলার মাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ভারতবর্ষের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন প্রকার শাসনক্ষমতা নাই। এ দেশে পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় কোন বৃহৎ শিল্প বা বাণিজ্য গড়িয়া উঠে নাই।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপকারিতা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহা নাগরিকগণকে গণতন্ত্র সম্পর্কিত সকল বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলে।

আঞ্চলিক বিষয়ে (যেমন, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ইত্যাদি) দূরবর্তী রাজধানী হইতে সুব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু শিক্ষা-কেন্দ্র হিসাবে ইহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য যে কোন সরকারী বিভাগ অপেক্ষা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণ অনেক বেশী শিক্ষার সুযোগ পায়।

স্বায়ত্তশাসনের ফলে বহু লোককে সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। ফলে নাগরিকেরা স্বাবলম্বী হইয়া উঠে এবং আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে। সকলকে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হয়। জনকল্যাণ বিষয়ে কেহই উদাসীন থাকিতে পারে না। প্রত্যেককে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া

দশজনের উপকারের জন্য কাজ করিতে হয়। এইভাবে মানুষ বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া মানুষ যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানলাভ করে তাহা বৃহত্তর জীবনে সাফল্য অর্জনে তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

এইভাবে স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়া নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রের সফলতার জন্য আবশ্যক গুণাবলী বিকশিত হইয়া থাকে।

ব্রাইস (Bryce) বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্তশাসনই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইহার সাফল্যের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। (The best school for democracy and the best guarantee for its success is the practice of local self-government)

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বলিতে শাসন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কতকগুলি বিধানের সমষ্টি বুঝায়। সরকারের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তির স্বাধীনতা কি থাকিবে, কাহার উপর এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার দেওয়া হইবে এবং কিভাবে এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শাসনতন্ত্র রহিয়াছে। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে সরকার গঠিত এবং পরিচালিত হয়।

প্রত্যেক নাগরিকের নিজ দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

১। **লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র** (written and unwritten constitution)—পূর্বতন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ শাসনতন্ত্রকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথাঃ—(ক) **লিখিত** এবং (খ) **অলিখিত।**

(ক) **লিখিত শাসনতন্ত্র** (written constitution) —যে শাসনতন্ত্রে সরকার কিভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হইবে তাহা লিখিত নিয়মাবলীর আকারে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। যথা— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনতন্ত্র।

(খ) **অলিখিত শাসনতন্ত্র** (unwritten constitution)—অলিখিত শাসনতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ আইন বলিয়া কিছু নাই। দেশাচার, প্রচলিত প্রথা, আদালতের এবং আইনসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার গঠিত এবং পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত গঠনতন্ত্রের উদাহরণ।

মোটামুটিভাবে শাসনতন্ত্রকে লিখিত এবং অলিখিত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ লিখিত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্রে কালক্রমে অনেক অলিখিত অংশ যুক্ত হইয়াছে। আবার এ কথাও সত্য যে কোনও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ অলিখিত নহে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র মূলতঃ অলিখিত হইলেও Magna Carta ও Bill of Rights প্রভৃতি বিভিন্ন লিখিত বিধান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২। সহজে অপরিবর্তনীয় বনাম সহজে পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র (rigid and flexible constitution) —বর্তমান যুগে শাসনতন্ত্রকে নিম্নলিখিত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—**(ক) সহজে অপরিবর্তনীয়** (rigid) এবং **(খ) সহজে পরিবর্তনশীল** (flexible) **শাসনতন্ত্র।**

(ক) সহজে অপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (rigid constitution) —যে সকল রাষ্ট্রে আইনসভা সহজেই সাধারণ আইন সংশোধনের মতই শাসনতন্ত্রের সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারে না সেই সকল রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে সহজে অপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই সব রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও দুরূহ পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। সংশোধন বা পরিবর্তন এক্ষেত্রে সহজসাধ্য নয়। সহজে অপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বিধান সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। ইহার স্থায়িত্ব বেশী। এইরূপ শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনীয় নহে বলিয়া জনচিত্তের সাময়িক উত্তেজনার ফলে ইহার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। মেকলে (Macaulay) সহজে অপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, জাতি যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিয়াছে তখন শাসনতন্ত্র যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্রে বিপ্লব সংঘটিত হয় (the great cause of revolutions is this that while nations move on-ward constitutions stand still) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সহজে অপরিবর্তনশীল।

সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের আদর্শ এবং প্রয়োজনও পরিবর্তিত হইতেছে। এই পরিবর্তনের সহিত শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত না হইলে তাহা কার্যকরী থাকে না।

(খ) সহজে পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র (flexible constitution)—যে সব শাসনতন্ত্র আইনসভায় সহজে পরিবর্তন করা যাইতে পারে সেই সব শাসনতন্ত্রকে সহজে পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র বলা হয়। যথা—বৃটেনের শাসনতন্ত্র। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন সংশোধনের মত শাসনতন্ত্রের সংশোধন বা পরিবর্তন সহজেই করিতে পারে। এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা নাই।

পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্রের প্রধান সুবিধা এই যে ইহা দেশের পরিবর্তনশীল অবস্থার সংগে অগ্রসর হইতে পারে। যখনই পরিবর্তন

প্রয়োজনীয় মনে হয় তখনই ইহার পরিবর্তন করিতে পারা যায়। এইভাবে পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র থাকার ফলে দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর হয়। এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার স্থায়িত্ব কিছুই নাই। জনসাধারণের সাময়িক উত্তেজনায় প্রায়ই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে জনসাধারণের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া অলিখিত বা পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র অনুসারে গঠিত সরকার আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে।

কখনও কখনও শাসনতন্ত্রকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়ঃ—

(ক) (১) **বিপ্লবমূলক** (revolutionary)—যথা, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার শাসনতন্ত্র; (২) **বিবর্তনমূলক** (evolutionary) যথা, ভারতবর্ষ ও বৃটেনের শাসনতন্ত্র।

(খ) (১) **যুক্তরাষ্ট্রীয়** (federal)—যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ভারতের নব-শাসনতন্ত্র; (২) **এককরাষ্ট্রীয়** (unitary) যথা, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং জাপানের শাসনতন্ত্র।

বিংশ অধ্যায়

নাগরিক আদর্শ

Nature and Value of Civic Ideals

নাগরিক আদর্শের স্বরূপ এবং উপকারিতা—প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির একটি আদর্শ রহিয়াছে। উচ্চ বা মহান্ আদর্শ না থাকিলে যেমন ব্যক্তি বড় হইতে পারে না তেমনি জাতিও বড় হইতে পারে না। ইতিহাসে দেখা যায় যে, মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে (যেমন, প্রাচীন ভারতবর্ষ, প্রাচীন গ্রীস এবং প্রাচীন রোম)। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ আদর্শ স্থির করিয়া তাহা নাগরিকদের সম্মুখে স্থাপন করা উচিত। জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের শরীর এবং মনকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা জাতীয় আদর্শ এবং নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

সকল আদর্শই নাগরিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। নাগরিকের এমন কতকগুলি আদর্শ রহিয়াছে যাহার সহিত সমাজের কোন সম্পর্ক নাই। রাজনীতি সংক্রান্ত যে সব আদর্শ নাগরিকেরা অনুসরণ করিয়া থাকে কেবলমাত্র সেইগুলিকে নাগরিক আদর্শ (civic ideals) বলা হয়। এই আদর্শের মধ্যে কতকগুলি সার্বজনীন আবার কতকগুলি কোন এক বিশেষ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশপ্রেম, সাম্য এবং স্বাধীনতা সার্বজনীন নাগরিক আদর্শ। আবার "হারিকিরি" (Hari-kiri) জাপানীদের আদর্শ।

সর্বপ্রধান নাগরিক আদর্শ হইল সমাজের উন্নতিবিধান। বিচিত্র এই পৃথিবী। মানুষের জীবনও কত বৈচিত্র্যময়! জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেককে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্পী চিত্র অঙ্কন করেন, ভাস্কর মূর্তি নির্মাণ করেন, কবি কাব্যরচনা করেন, গুরু শিক্ষাদান করেন, মহাত্মারা সৎভাবে জীবনযাপন করেন, শ্রমিক কারখানায় পরিশ্রম করেন এবং কৃষক মাঠে কৃষিকর্ম করেন—এইভাবে প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম সুসম্পন্ন করিয়া সমাজকে উন্নত এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে।

জাতীয় আদর্শকে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের তরুণ সমাজকে শিক্ষিত করিয়া তোলে। এইবার আমরা কয়েকটি প্রাচীন এবং বর্তমান রাষ্ট্রের আদর্শ বিশ্লেষণ করিব।

স্পার্টা (Sparta) এবং এথেন্সের (Athens) শিক্ষাপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা। কিন্তু উভয় দেশের আদর্শ ভিন্ন হওয়ায় উহাদের শিক্ষাপদ্ধতি পৃথক ছিল।

স্পার্টানদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, যোদ্ধা এবং শক্তিমান্ হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়া হইত।

আদর্শ নাগরিক সম্বন্ধে এথেন্সের ধারণা ছিল আরও ব্যাপক। তাহাদের মতে প্রত্যেকের দেহ ও মন সুগঠিত হইবে এবং প্রত্যেকে সুরুচিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। রোমানদের আদর্শ এথেন্সের অনুরূপ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের আদর্শ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন।

Civic Ideals and their realisation

নাগরিক আদর্শ এবং তাহার উপলব্ধি বা সম্পন্নতা—প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের সম্মুখে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। যথা—

(১) **স্বাস্থ্যরক্ষা করা**—স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে কেহই কাজ করিতে পারিবে না, কাজে কোনরূপ উৎসাহ আসিবে না। বর্তমানে প্রত্যেক দেশে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) **দেশপ্রেম**—প্রত্যেককে দেশপ্রেমিক হইতে হইবে। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক নাগরিককে যুদ্ধ করিতে হইবে। দেশপ্রেমের আতিশয্যে সময় সময় শক্তিশালী জাতি অপেক্ষাকৃত হীনবল কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত হইয়া উঠে। ইহা প্রকৃত দেশপ্রেম নয়—দেশপ্রেমের বিকৃতি মাত্র। দেশপ্রেমের সহিত নীতির প্রশ্নও জড়িত। যখন অন্যায়ভাবে কোন দেশ অপর দেশ আক্রমণ করে তখন ঐ আক্রমণকারী দেশের নাগরিকদের নৈতিক কর্তব্য হইল যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করা।

(৩) **সমাজ-চেতনা**—সমাজসেবা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আদর্শ হওয়া উচিত। সকলকেই দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেকেরই বিবেচনা করিয়া ভোট দেওয়া উচিত এবং বিনা পারিশ্রমিকে এমন কি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া সাধ্যমত দেশের ও সমাজের সেবা করা উচিত। দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আলোচনা

করা এবং শাসকমণ্ডলীর কার্যকলাপের উপর সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক সমাজ-সচেতন ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

(৪) জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি—সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত এবং বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া জাতির চেতনা অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই সমস্ত বিষয়ের সহিত পরিচিত থাকা উচিত। জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতিবিধান এবং তাহা রক্ষা করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

(৫) বাসস্থানকে নয়নাভিরাম করা—প্রত্যেকের নিজ বাসভূমিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করিয়া রাখা উচিত। নগরবাসীর উচিত নগরকে নানাবিধ উপায়ে সুশোভিত করা।

(৬) উন্নতি—সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা প্রত্যেক মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। সর্বপ্রকার অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া আজ নূতন দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন করিয়া ইহাদিগকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। কৃষি এবং শিল্পের উন্নতিবিধানে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে হইবে। ছাত্রদিগকে আবিষ্কার এবং গবেষণাকার্যে উৎসাহ দিতে হইবে।

Conditions for the Realisation of Civic Ideals

নাগরিক আদর্শসমূহকে রূপায়িত করিবার উপায়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ—

(১) গণতন্ত্র—রাষ্ট্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে নাগরিকেরা সমাজ-সচেতন হইবে না, ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সর্বপ্রকার সুখসুবিধা ভোগ করিতে থাকিবে। প্রকৃত গণতন্ত্র বলিতে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক গণতন্ত্র (political democracy) বুঝায় না; ইহার সহিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রও (social and industrial democracy) জড়িত। সকল বিষয়ে সকলকেই সমান অধিকার দিতে হইবে। তবেই সকলে রাষ্ট্রের অনুগত থাকিবে।

(২) শিক্ষা সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক—আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রায় ২000 হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীকগণ শিক্ষার মূল্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল।

(৩) **সমাজ-চেতনা এবং সতর্কতা**—সরকারের কার্যাবলীর উপর প্রত্যেক নাগরিকের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। জনসাধারণ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করে তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি দেখা দিবে এবং সমস্ত উচ্চ আদর্শ অচিরে ধূলিসাৎ হইবে।

(৪) **প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী**—প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত নাগরিক-আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিবার কোন উপায় নাই।

ভারতবর্ষে অতীতের গৌরবের কথাই সর্বদা উল্লেখ করা হয়; বর্তমানে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে অল্প লোকই চিন্তা করেন। জনসাধারণ যাহাতে স্বাধীন, সুখী এবং উন্নত সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। বর্তমান গন্ডী অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের কথা এবং নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্রভাবে পৃথিবীর কথা চিন্তা করিবার দিন আজ আসিয়াছে। নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে সকল সমস্যা বিচার করিয়া আমাদের দেখিতে হইবে।

একবিংশ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ

সংজ্ঞা—বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভ ও নিজ রাষ্ট্র গঠনের চেতনা ও প্রচেষ্টাকে জাতীয়তাবাদ বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের মত স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বদেশকে সমুন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার বলবতী ইচ্ছাকেই জাতীয়তাবাদ বলা হয়।

যে জাতীয় ভাবাদর্শ স্বাধীনতা লাভের সক্রিয় সংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে চায়, তাহাই জাতীয়তাবাদ।

১৯১৯-এর ভার্সাই সন্ধি বহু জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা ব্যাহত করিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র', 'জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার' প্রভৃতি ধ্বনি উঠিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের বহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা—ব্যক্তিস্বাধীনতা না থাকিলে যেরূপ ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব হয় না তেমনি জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত জাতির প্রগতি সম্ভব নহে। মানবসভ্যতায় প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশের নিমিত্ত সকলেরই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনিবার্যভাবে থাকা আবশ্যক। সমগ্র মানব-সমাজের প্রগতির জন্যই জাতিসমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজনীয়। হবসন (Hobson) বলেন, "জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পথই প্রশস্ত করে"।

জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা স্বীকার করিয়াও আমাদের জাতীয়তাবাদের কুফল সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জাতীয়তাবাদের বিপদ—বিকৃত জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রূপ পরিগ্রহ করে। এরূপক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেম বিদেশীয়দের প্রতি ঘৃণায় পর্যবসিত হয়, জাতির স্বার্থ ও গৌরব বলিতে দুর্বল জাতিগুলিকে পদানত ও শোষণ করা বুঝায়। এরূপ বিকৃত জাতীয়তার আদর্শঃ আমার দেশ, আমার জাতি, আমার জনসাধারণ সর্বাগ্রে—ইহাতে ন্যায় বা অন্যায় যাহাই হউক না কেন। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ এরূপ বিকৃত জাতীয়তার আদর্শ অপর সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করে।

এই সংকীর্ণ, স্বার্থপর, উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপীয় জাতির মত জাতিগত (racial) রূপ ধারণ করিতে পারে। হিটলারী শাসনে ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের জন্য এই উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদই দায়ী। আবার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ অন্য দেশকে রাজনৈতিক শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া সে দেশের জনসাধারণের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালায়।

লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন হরণ করিয়া, অপরিসীম সম্পদ বিনষ্ট করিয়া প্রতিটি মহাযুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেষ হইবার সংগে সংগে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী উগ্র, জাতীয়তাবাদের সাম্রাজ্যলোভী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তাহারই পরিণাম বিশ্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের পর আজ সমগ্র বিশ্বে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্বশান্তির পক্ষে জনমত ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথ একদিন উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়, ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।"

আন্তর্জাতিকতা—বর্তমান দুনিয়ায় সর্বত্র শোষিত, পদানত ও অত্যাচারিত জনসমষ্টির প্রতি সমগ্রভাবে মানবসমাজ সহানুভূতিশীল। সর্বত্রই এই মনোভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতেছে যে, প্রত্যেক জাতির মানুষকে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণের নিমিত্ত একযোগে কাজ করা উচিত। দেশ ও জাতির সংকীর্ণ সীমারেখার ঊর্দ্ধে মানবকল্যাণের এই সামগ্রিক দৃষ্টিভংগীই আন্তর্জাতিকতা।

আদর্শবিচার—আদর্শ হিসাবে জাতীয়তা হইতে আন্তর্জাতিকতার স্থান অনেক ঊর্দ্ধে। কারণ কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের চেয়ে সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন নিশ্চয়ই মহত্তর।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে উন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিভিন্ন জাতির অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ এমন পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে একমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারাই এই সব ব্যাপারে জাতীয় উন্নতিবিধান সম্ভবপর। রণবিধ্বস্ত বৃটেন ভারতের পাট কিনিতে পারে না। তাহার ফলে ভারতীয় পাট-চাষীরা বৃটেনে প্রস্তুত বস্ত্র কিনিতে অপারগ হয়, ফলে বৃটেনের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ বেকার হইয়া পড়ে। সুতরাং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে এইরূপ নির্ভরশীলতাই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। পারস্পরিক বন্ধুত্বের সাহায্যে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে,

উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রতিরোধ করিতে হইবে ও সকলের স্বার্থে আন্তর্জাতিকতাকে প্রসারিত করিতে হইবে।

আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিকতা প্রত্যেক দেশের মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তির ধ্যান ও স্বপ্নের বস্তু ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের যুগ ছিল। আপামর জনসাধারণ আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন দেখে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী যুগে আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্ব স্ব দেশের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইয়াছে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নহে। ইহা আন্তর্জাতিকতার পথের একটি সোপান মাত্র। সমস্ত পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলেই আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সত্যিকার মানবকল্যাণ সাধন করিতে পারে।

আন্তর্জাতিকতা ও জাতিসংঘ—আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হাত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করিতে পারে নাই। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যর্থ হইয়া পড়ে ও প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে থাকে।

নূতন বিশ্বসংগঠন—মানবসমাজ দুইটি মহাযুদ্ধের সভ্যতা-বিধ্বংসী বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ কথা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান ব্যবস্থা আর মানুষের কল্যাণসাধনে সক্ষম নহে। তাই এক নূতন ও উন্নততর বিশ্ব-বিধান (new and better world order) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। হিটলার ইউরোপের নববিধানের কথা বলিয়াছিলেন। এদিকে চার্চিল ও রুজভেল্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এক নূতন বিশ্ববিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাগজপত্রে আদর্শের ঘোষণা ব্যতীত এই সনদের আর কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

The Four Freedoms—The Atlantic Charter

চতুর্বিধ স্বাধীনতা : আতলান্তিক সনদ—রুজভেল্ট চতুর্বিধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ—

(১) বাক্‌স্বাধীনতা (freedom of speech)

(২) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (freedom of religion)
(৩) অভাব হইতে মুক্তি (freedom from want)
(৪) ভয় হইতে মুক্তি (freedom from fear)

রুজভেল্ট ও চার্চিল জাতীয় ও মানবিক স্বাধীনতার সমাধানার্থে আতলান্তিক সনদ প্রচার করেন। মিত্রশক্তির পক্ষে ইউরোপীয় জাতিগুলির ভৌগোলিক ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখাই এই সনদের মূল কথা ছিল। আড়ম্বরপূর্ণ আশ্বাসবাণী ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার পরপদানত জাতিগুলি সম্পর্কে ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। এই দিক দিয়া বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন লেখিকা ও সাংবাদিক পার্ল বাক সত্যই বলিয়াছেন, "বর্তমান যুদ্ধ আর বিশ্বমানবের মুক্তিযুদ্ধ নহে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য"। ইউরোপই সমগ্র বিশ্ব নহে—ইউরোপের বাহিরেও বিশ্বের বহু সভ্যজাতি বাস করে। ইহাদের রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত নূতন বিশ্ববিধানের কথা বলা হাস্যকর ব্যাপার।

Dumberton Oaks Proposal, October 7, 1944

ডাম্বারটন ওকস্ প্রস্তাব—ডাম্বারটন ওকসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের প্রতিনিধিবৃন্দ বিশ্বশান্তি ও প্রগতির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠনে সম্মত হন।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-রক্ষা, শান্তি ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কামূলক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ নিবারণ, আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও এই সব উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ; (২) জাতিপুঞ্জের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বশান্তির জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন; (৩) আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার; (৪) এই সব সাধারণ উদ্দেশ্যে সমস্ত জাতির কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

United Nations Organisation—U.N.O.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান

মূল শাখাসমূহ (principal organs)—জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মূল পাঁচটি শাখা আছে—(ক) সাধারণ পরিষদ (General Assembly) (খ) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) (গ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International

Court of Justice) (ঘ) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ** (Economic and Social Council) (ঙ) **সামরিক স্টাফ কমিটি ও সেক্রেটারিয়েট** (Military Staff Committee and Secretariat)

নিরাপত্তা পরিষদ—আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান করাই নিরাপত্তা পরিষদের কাজ। শান্তিপূর্ণ সমাধান করিতে ব্যর্থ হইলে পরিষদ অপরাধী জাতির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিতে পারে। পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া পরিষদটি গঠিত। বৃটেন, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার স্থায়ী সদস্য। এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকেই পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর 'ভেটো' (বাতিল করিবার নির্দেশ) প্রয়োগ করিতে পারেন।

সাধারণ পরিষদ—৫২টি জাতি সাধারণ পরিষদের সদস্য। প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট আছে। সাধারণ পরিষদকে জাতিসমূহের সাধারণ সমাবেশ (public meeting of nations) বলা চলে। এই পরিষদে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব, আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত হয়। নিরাপত্তা পরিষদ ইহার একটি কার্যকরী সংগঠন (enforcement officer)। সামরিক স্টাফ কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের কাজে সাহায্য করেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ—সাধারণ পরিষদ ৩ বৎসরের জন্য ১৮টি জাতিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ-কেন্দ্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কার্য পরিচালনা করে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়—সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পনের জন বিচারপতি লইয়া এই আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। জাতিসমূহের পারস্পরিক বিরোধগুলি এই বিচারালয়ে উত্থাপন করা চলে।

অছি পরিষদ—অছি-ব্যবস্থাধীন অঞ্চলসমূহের শাসন ও পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক অছি-ব্যবস্থা প্রবর্তনই অছি পরিষদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের বাস সেই স্থানে অছিহিসাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রশাসন বলবৎ থাকিলে অছি পরিষদ তাঁহাদের শাসন তদারক করিবেন এবং যথাকালে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিবেন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ—সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ একটি অর্থনৈতিক কমিশন, একটি সামাজিক কমিশন ও আরও কয়েকটি কমিশন গঠন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা আন্তর্জাতিক শ্রম-প্রতিষ্ঠান (International Labour Organisation), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিপ্রতিষ্ঠান (United Nations Food and Agriculture Organisation), আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (the World Health Organisation), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থা (United Nations Relief and Rehabilitation

Administration—U. N. R. R. A.), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষাসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (the United Nations Educational, Social and Cultural Organisation—U. N. E. S. C. O.) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-সমূহের সমাধানই এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (International Monetary Fund) এবং আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development) ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হইয়াছে। রণবিধ্বস্ত পৃথিবীর পুনর্গঠন, বিশ্ববাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও বিশ্বের সম্পদবৃদ্ধিই এই সব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

সনদে ঘোষিত লক্ষ্য—সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার, বিশ্বের সম্পদবৃদ্ধি ও সামাজিক প্রগতিসাধন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইহা ছাড়া জাতিসমূহের বিরোধ সম্পর্কে তদন্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করাও ইহার কর্তব্য।

সদস্যপদ—সমস্ত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রই ইহার সদস্য হইতে পারে। জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যে সব রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল প্রথমতঃ তাহারাই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। সনদ অমান্য করিবার অভিযোগে ইহার কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা চলে। শান্তি-সম্মেলনগুলি হইতেই ইহার সাফল্যের পরিমাণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। ইহা যদি প্রাচীন জাতিসংঘের মত সাম্রাজ্যলোভী বৃহৎ-শক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয় তাহা হইলে রক্তমোক্ষণে শ্রান্ত ও রণবিধ্বস্ত বিশ্বের কোন কল্যাণসাধন ইহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সমগ্র মানবসমাজ আজ একান্তভাবে যে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-প্রগতির কামনা করে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতের শাসনপদ্ধতি

ভূমিকা

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার ফলে আজ নূতন ভাবে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৈদেশিক যোগাযোগ রহিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা আফগানিস্থান, ইরাণ, আরব, মিশর, প্যালেস্টাইন, গ্রীস, ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাপান, সুমাত্রা, শ্যাম, ইন্দোচীন, চীন প্রভৃতি দেশে প্রসারলাভ করিয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষ চিরদিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষ ও ইরাণ—ভারতবর্ষ ও ইরাণের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। বৈদিক ভারত ও প্রাচীন পারসিকের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। ভাষার দিক দিয়া বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষার সঙ্গে প্রাচীন পহ্লভীর সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। পাঠান ও মোগল শাসনকালে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল পারসিক। পারস্যে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সহস্র সহস্র পারসিক ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালক্রমে ভারতীয়গণের অংগীভূত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে পার্শীরা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পারস্য উপসাগরের জলপথে এবং স্থলপথে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। কিন্তু ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ভারতবর্ষ বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ ও গ্রীস—ভারত ও গ্রীসের মধ্যে ভৌগোলিক ও বর্ণগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় দেশের দার্শনিক চিন্তাধারা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিয়াছিল। পাইথাগোরাস ভারতীয় দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভে এ্যাপোলোনিয়াস তক্ষশীলা পরিদর্শন করিতে আসেন। ভারতের মূর্তিপূজা গ্রীকদের নিকট হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। বৈদিক বা বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার কোন বিধান নাই। পাইথাগোরাসের অনুগামীরা যে দর্শন, ধর্ম ও অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারতীয় ও গ্রীকদের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক ছিল। ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দিক দিয়া এই সংমিশ্রণের প্রভাব পরবর্তী কালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।

ভারত ও চীন—বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত ও পরিব্রাজকগণ সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ এই দুই প্রাচীন জাতির মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনের একটি মাত্র প্রদেশেই ৩ সহস্র ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু, ১০ সহস্র ভারতীয় পরিবার বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পণ্ডিত নেহরুর মতে হুয়েন সাং-এর ভারত-আগমনের ফলে উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছিল। এমন কি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীন সরকার স্বাধীন বাংলায় একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন ও ভারতবর্ষ বৈদেশিক শক্তির পদানত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিমালয়ের স্থলপথে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলপথে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

ভারতবর্ষ ও আরব—ভারতের সঙ্গে আরবের সম্পর্ক বিশেষভাবে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ঐ সময় আরব পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উন্নত ধরণের জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যাপনা করিতেন। ফলে বোগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয়দের কূপমণ্ডুকতা ও পরাধীনতার ফলে ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—ভারতীয় শাসকবৃন্দের সক্রিয় সাহায্যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই ভারতীয়গণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। অল্পকাল মধ্যেই ভারতীয়রা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাপান, সুমাত্রা, বোর্নিও, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই সকল অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্প ও বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। যে সকল ভারতীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সব দেশের অধিবাসিবৃন্দ ভারতীয় ধর্ম, কলা, বিদ্যা ও সংস্কৃতি গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অদ্যাপি তাহাদের নামকরণে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন—ইন্দোনেশিয়ার ডাঃ সুকর্ন, শ্যামের বিপুল সংগ্রাম ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। এ দেশের তৎকালীন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইউরোপীয় শক্তিগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্য-স্বার্থ লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করে। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ বণিকদল অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া ভারতের রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে।

ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ভারতের জলপথ আবিষ্কার—কলম্বাস জলপথে ভারত আবিষ্কার করিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইহার পর ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-দি-গামা নামক জনৈক পর্তুগীজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জলপথ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। ইউরোপের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের দেশগুলির পক্ষে স্থলপথ দিয়া ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করা সহজসাধ্য ছিল না। সেই জন্যই তাহারা জলপথ আবিষ্কারের জন্য এত বেশী আগ্রহান্বিত হইয়াছিল।

ভারতে পর্তুগীজ—১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ কেব্রালের (Cabral) নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের কালিকটে একটি কারখানা স্থাপন করে। ঐ সময় কালিকট হিন্দু রাজা জামোরিনের (Zamorin) শাসনাধীন ছিল। ইহার ৩ বৎসর পর তাহারা এ্যালফোনসে-দ্য-এ্যালবুকর্কের (Alphonse de Albuqurque) পরিচালনায় কালিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এ্যালফোনসে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে গোয়া দখল করেন ও তাঁহার নেতৃত্বে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কালিকট লুণ্ঠিত ও আশ্রয়দাতা হিন্দু-রাজার প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়। হিন্দুরাজাদের দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, পর্তুগীজদের মত তাহাদের কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। গোয়া এখনও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল।

ভারতে ওলন্দাজ—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ওলন্দাজগণ বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। জলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া বাংলা দেশে তাহারা অনেকগুলি দুর্গ নির্মাণ করে। বাংলায় তাহাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল চুঁচুড়ায়। এতদ্ব্যতীত আগ্রা, পাটনা, সুরাট ও আমেদাবাদে তাহারা কুঠী নির্মাণ করিয়াছিল। কালক্রমে বাংলায় ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ওলন্দাজদের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সুমাত্রার কর্তৃত্ব ওলন্দাজদের হাতে দিয়া ইহার বিনিময়ে চুঁচুড়া ও মালাক্কার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

ভারতে ফরাসী—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মঃ কোলবার্তের (Colbert) উদ্যোগে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তাহারা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরাটে, ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে

মসলীপত্তনে ও ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে কুঠী স্থাপন করে। শীঘ্রই ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ দুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহা একেবারে ব্যর্থ হয়। দুপ্লে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্রাণত্যাগ করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া যায়। পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহে এখনও ফরাসী অধিকারে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন গণভোটের দ্বারা চন্দননগর ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ভারতে ইংরাজ—ভারতে পর্তুগীজ বণিকদের সৌভাগ্য দেখিয়া ইংরাজ বণিকরা বহুদিন হইতে ভারতে আসিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। তদানীন্তন কালে লিসবন ছিল ইউরোপে ভারতীয় পণ্যের প্রধান কেন্দ্র। ড্রেক নামক জনৈক ইংরাজ নাবিক ভারত হইতে লিসবনগামী একখানি পর্তুগীজ জাহাজ দখল করে। ঐ জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া জলপথে ভারতে আগমনের নক্সা ছিল। ঐ নক্সাটি ড্রেকের হস্তগত হয়। ইংরাজদের মধ্যে কাপ্তেন হকিন্স Hawkins সর্বপ্রথম ভারতে আসেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের পত্র নিয়া আগ্রায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বাদশাহের দরবারে পর্তুগীজ যৈশু সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে সুরাটে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা পর্তুগীজদের নিকট হইতে সুরাট বন্দরটি দখল করিয়া লয়। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী মোগল দরবারে একজন বৃটিশ-দূত রাখার ব্যবস্থা হয়। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা কলিকাতায় কুঠী নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। ঐ সময় বাংলার ব্যবসা পর্তুগীজদের হাতে ছিল। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরাজদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম অধ্যায়

ইংরাজ শাসনের ইতিবৃত্ত

আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্রকে ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইলে এ দেশে ইংরাজ শাসনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে চার অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রথম অধ্যায়—১৬০০ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ—এই সময়কার ইতিহাস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্মের ও ভারতের সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্যসম্পর্কিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের ইতিহাস। এই দেড়শত বৎসর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ছিল। বাণিজ্যবিস্তারই ছিল তার মূল লক্ষ্য।

(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়—১৭৬৫ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ—এই সময়ের ইতিহাস কোম্পানীর রাষ্ট্রশক্তি লাভের ইতিহাস অর্থাৎ একটা বণিকসম্প্রদায়ের শাসক-সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস। এই একশত বৎসরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ায় কোম্পানী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়। ক্রমে ক্রমে কোম্পানী এ দেশে একটি রাজ্য গড়িয়া তুলে ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য চালাইয়া যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। ভারতবর্ষে উন্নততর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া নিজহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

(গ) তৃতীয় অধ্যায়—১৮৫৮ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ—ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পরও শাসনপদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ভারত সরকার পূর্বের মত স্বৈরতন্ত্রমূলক শাসন চালাইতে লাগিলেন।

(ঘ) চতুর্থ অধ্যায়—১৯১৭ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-ঘোষণার পর ভারতে বৃটিশ শাসনের নীতির পরিবর্তন হয়। উক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের লক্ষ্য। এই ঘোষণা অনুযায়ী পার্লামেণ্টে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নূতন ভারতশাসন আইন (Government of India Act, 1919) পাশ হয়। নূতন নীতিকে শাসনক্ষেত্রে কার্যকরী করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য। ইহার পর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পরিবর্তিত রাজনৈতিক

অবস্থা অনুযায়ী আর একটি ভারতশাসন আইন (Government of India Act, 1935) পাশ হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে (the Indian Independence Act of 1947) ভারতে প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে।

(ঙ) পঞ্চম অধ্যায়—১৯৪৭—ভারতীয় গণপরিষদ ঘোষণা করিয়াছে যে, ভারতবর্ষে একটি সার্বভৌম স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। "ভারত ছাড়" ইহাই ছিল জাতীয়তাবাদী ভারতের দাবী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ দুর্বল হইয়া পড়ে ও ভারত ছাড়িতে বাধ্য হয়। ভারতের সম্মুখে এক সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।

বৃটিশরাজের অভ্যুত্থান ও অবসান

উন্নতধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের বলেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির অভ্যুত্থান ও দীর্ঘ দুইশত বৎসর রাজ্যশাসন চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য ভারতবাসীদের ঐক্য ও শক্তির অভাবও ইহার জন্য দায়ী।

দুঃসাহসী ইংরাজদের বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়া এই দেশ জয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের নিজদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহারা বিনারক্তপাতে জয়লাভ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ইংরাজকে বহু বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হয়—"১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে নবগঠিত বেঙ্গল আর্মির একটি বাহিনী বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের চব্বিশ জন নেতাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ভেল্লোর বিদ্রোহ আরও ভয়ংকরভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই বিদ্রোহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পথ-প্রদর্শক।.........প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে ব্যারাকপুরে উচ্চশ্রেণীভুক্ত সিপাহীরা বিদ্রোহ করে।.........নির্বিচারে গুলী চালাইয়া বিদ্রোহীদের হত্যা করার পর এই সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।" আফগান যুদ্ধের ফলেও সৈন্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশৃংখলা দেখা দেয়। চারিটি বাঙ্গালী সৈন্যদল সিন্ধুগমনে অস্বীকার করে এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে শিখ-সীমান্তে দুইটি সৈন্যদল বিদ্রোহ করে।

১৮৫৭—বিদ্রোহী ভারত—"কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের সহিত আগের কোন ঘটনার তুলনা করা চলে না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের চারিটি মাস মনে হইয়াছিল যে এই বিদ্রোহ প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হইতে পারে এবং ভারতবর্ষকে পুনরায় জয়

করা অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। সেপ্টেম্বর মাসে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে ভারতীয় বিদ্রোহীরা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে সক্ষম নহে এবং তাহারা কোন একজন নেতার অধীনে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিতেও প্রস্তুত নহে।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের সাফল্য এমনই হয় যে, ভারতে বৃটিশ শাসন বিশেষভাবে বিপন্ন হয়। কিন্তু প্রাদেশিক ও ধর্মমতের অনৈক্য জয়লাভের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠে।

যে সব বিদ্রোহীরা ধরা পড়িয়াছিল তাহাদের গুলী করিয়া হত্যা করা হয় অথবা ফাঁসি দেওয়া হয়। হড্‌সন সাহেব সম্রাট হুমায়ুনের স্মৃতিস্তম্ভ হইতে সম্রাট বাহাদুর শাহকে গ্রেপ্তার করেন। বৃটিশরা দিল্লী পুনরধিকার করার পর পাইকারী-ভাবে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ এবং যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সন্নিহিত জিলাগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের দলিলপত্রে ও সপরিষদ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্রে উল্লিখিত আছে যে, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদেরও অপরাধী বিদ্রোহীদের মত বলি দেওয়া হইয়াছে। সুপরিকল্পিত ভাবে তাহাদের ফাঁসি দেওয়া হয় নাই, কিন্তু গ্রামে গ্রামে তাহাদের মারা হইয়াছে, তাহারা অকারণ গুলীর মুখে প্রাণ হারাইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের তিক্ত স্মৃতি ভারতীয়দের মনে আজও জাগরূক রহিয়াছে।

বিদ্রোহের ফলে ভারতে বৃটিশ নীতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বৃটিশ রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয়। বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে এক নূতন নীতি অবলম্বন করা হয়।

পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে ভারতে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের সময় নিম্নোক্ত অনুপাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়—ভারতীয় ৫ : ইউরোপীয় ২, আবার এই সব ভারতীয়দের অধিকাংশকেই পঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করা হইত। ইহারা বৃটিশ সরকারের অনুগত ছিল। গোলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের লইয়া গঠিত হইত।

বিদ্রোহ : বৃটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ—কোম্পানীর কুশাসনে জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনীর এক বৃহৎ অংশ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। নূতন সংকটে ভারতে কোম্পানীর শাসন চালাইয়া যাওয়ার বিপদ ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং বিদ্রোহ দমনের পর মহারাণী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা ('The Queen's Proclamation of 1858) ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। বিদ্রোহ প্রাচীন

ও নবীন ভারতের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা টানিয়া দিলেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত শাসনকার্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই।

১৮৬১-১৮৯২ খৃষ্টাব্দ—১৮৬১ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নানা দিক দিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি হয়। নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, মাধ্যমিক শিক্ষাও বহু পরিমাণে বিস্তার লাভ করে। লর্ড ডাফ্রিন ও লর্ড রিপনের চেষ্টায় প্রধান প্রধান প্রদেশসমূহে আংশিকভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ভারতবাসীরা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবী করিতে লাগিলেন। ফলে বৃটিশ সরকার ব্যবস্থাপকসভার গঠনতন্ত্র সংশোধন করিয়া ইহাকে অধিকতর জনপ্রিয় ও প্রতিনিধিমূলক করিয়া তুলিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন।

১৮৯২ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পর ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে শিক্ষারও বিস্তার হইয়াছিল এবং জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের বীরত্ব ও জয়লাভ স্বপ্নচঞ্চল ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে এক নূতন প্রেরণা, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিল। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

এই সমস্ত কারণে বৃটিশ রাষ্ট্রনেতারা বুঝিতে পারেন যে, ভারতে দায়িত্বশীল সরকারের দাবী ক্রমশঃই বিস্তারলাভ করিতেছে এবং ভারত সরকারের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শাসনপরিষদ আইন—এই আইনের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের মনোভাবকে বিষাক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আভ্যন্তরীণ অনৈক্যই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা ছিল।

ভারতবর্ষ ও মহাযুদ্ধ—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের আত্মশাসনের দাবী অস্বীকার করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

The Montagu Declaration

মণ্টেগু-ঘোষণা—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু কমন্সসভায় নিম্নোক্ত ঘোষণা করেনঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ

হিসাবে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাই বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভারত সরকার সম্পূর্ণ একমত। সেইজন্য শাসনতন্ত্রের প্রত্যেকটি বিভাগে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক ভারতীয়কে গ্রহণ করা হইবে এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনে বিষয় বিভাগ—এই আইনে দ্বৈত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সব বিষয়ে ভারতে বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল না শুধু সেই বিষয়সমূহই ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। অন্যগুলি "সংরক্ষিত" বিষয়রূপে ইংরাজ প্রদেশপালের হাতে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯১৯ ও পরবর্তী কাল

১৯১৯ ও পরবর্তী কাল—১৯১৯ সালের আইনে ভারতবর্ষকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা স্বায়ত্তশাসনের প্রহসনমাত্র।

এই শাসনসংস্কার আইনের প্রতি রাজনৈতিক অসন্তোষ জাতীয় কংগ্রেসের অমৃতসহর অধিবেশনে মূর্ত হইয়া উঠে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিলেন যে, বৃটিশ সরকার তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করেন নাই। তাঁহারা কেন্দ্রে দায়িত্বহীন সরকার ও প্রদেশে দ্বৈত-শাসনের তীব্র নিন্দা করেন।

বৃটিশ সরকারের আচরণের ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনে নৈরাশ্য ও ও বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। রাউলাট অ্যাক্ট (Rowlatt Act), জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড, পঞ্জাবে সামরিক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের সর্বত্র দমননীতির ফলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিল। খিলাফৎ সমস্যার সমাধানের জন্য মুসলমানেরাও বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আইনসভা, আইন-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বৃটিশ-পরিচালিত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ বর্জন করিবার আহ্বানে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া পড়িয়া যায়। বিদেশী ও মাদকদ্রব্য বর্জন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, চরকায় সুতাকাটা, সালিশীর সাহায্যে বিরোধের নিষ্পত্তি, জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজও এই আন্দোলনের কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংগ ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনই ভারতে প্রথম গণ-আন্দোলন। আন্দোলনের চরম লক্ষ্য ছিল স্বরাজ অর্জন করা। এই দিক দিয়া আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

স্বরাজ্য দল—পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্যদল প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থির করেন যে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া পদে পদে বৃটিশ সরকারকে বাধা দিবেন এবং এইভাবে সরকারকে অপদস্থ ও শাসনযন্ত্রকে অচল করিয়া তুলিবেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে প্রায় সকল প্রদেশেই

তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের এক প্রস্তাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনমূলক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়।

সাইমন কমিশন—১৯১৯ সালের আইনের সর্ত অনুযায়ী বৃটিশ সরকার ভারতে শাসনসংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠন করেন। ইহাই কুখ্যাত সাইমন কমিশন। ইহার মধ্যে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিলেন না। ভারতের নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা একযোগে এই কমিশন বর্জন করেন। এই কমিশন জাতির স্বাধীনতা লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেন।

নেহরু রিপোর্ট—অতঃপর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে রচিত নেহরু রিপোর্টে ভারতবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন ও সংরক্ষিত আসনসহ যুক্ত নির্বাচনপ্রথা দাবী করা হয়।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের শান্ত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে **ডোমিনিয়ন স্টেটাস** না দিলে কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে আহ্বান করিবে ও গান্ধীজী স্বয়ং সেই সংগ্রামের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবেন। উত্তেজিত ও সংগ্রামোন্মুখ ভারতবাসীকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করেন যে, ডোমিনিয়ন শাসনতন্ত্র প্রদান করাই ভারতে বৃটিশ শাসনের লক্ষ্য এবং ইহাই ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যাণ্ড রাষ্ট্রপুঞ্জ বর্তমানে স্বায়ত্ত-শাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভোগ করিতেছে। গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়া "ইহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, সমমর্যাদাসম্পন্ন, স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য-সমষ্টি। আভ্যন্তরীণ অথবা পররাষ্ট্র বিষয়ে কোন অবস্থায় ইহারা পরস্পরের অধীন নহে, যদিও ইহারা সকলেই বৃটিশ রাজানুগত্যের বন্ধনে ঐক্যবন্ধ এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্-এর সভ্য।" এইভাবে ইহারা গ্রেট বৃটেনের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের অধীন নহে। গ্রেট বৃটেনের সহিত ইহাদের সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

কার্যতঃ ডোমিনিয়নগুলি স্বাধীনভাবে স্ব স্ব শাসনকার্য পরিচালনা করে। আইনসভা, বিচারবিভাগ, সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী, পররাষ্ট্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে ইহারা বৃটেনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। ডোমিনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজা ডোমিনিয়নের

মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করেন, বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে নহে।

আইন অমান্য আন্দোলন ঃ ১৯৩০—বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কারনীতি ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিতে পারিবে না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে পুনরায় ঘোষণা করা হইল যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদ হইতে তাঁহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ডান্ডী অভিযান আরম্ভ করিয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করিলেন।

দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আন্দোলনের জোয়ারে ভাসিয়া গেল। এই বৎসরে পঞ্চাশ হাজার ভারতবাসী আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারারুদ্ধ হইল। তারপর প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের মধ্য দিয়া বৃটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গান্ধী-আরউইন চুক্তি হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু সেখানে স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গান্ধীজী আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দেন।

ইতিমধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড হিন্দু-মুসলমানসমস্যা সমাধানের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award) প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। ইহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যে ব্যবস্থা করা হয় তাহার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন করেন। পুণা-চুক্তিতে অনশন ভঙ্গ করেন ও বাঁটোয়ারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ১৯৩২ সালে লন্ডনে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় শাসনসংস্কার সম্পর্কে এক হোয়াইট পেপার (White Paper) বা সরকারী দলিল প্রকাশিত হয়। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যদের লইয়া গঠিত একটি কমিটি এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেণ্টে ভারতশাসন আইন (Government of India Act, 1935) পাশ হয়।

ভারতের রাজনীতিকগণ এই ভূয়া সংস্কারপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। এই আইনের সাহায্যেই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসনকার্য চলে। কেন্দ্রে একটি

ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন, প্রদেশে প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এই আইনের অংগীভূত হইলেও স্বৈরাচারী দেশীয় রাজন্যবর্গের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অর্পণ, গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের হাতে নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলী ও আইনসভার উপর প্রয়োজনবোধে ইচ্ছানুরূপ কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাদান, বিবিধ প্রকারের রক্ষাকবচ মারফৎ বৃটিশস্বার্থ পুরাপুরি বজায় রাখার বন্দোবস্ত এই আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই ইহাকে বর্জন করা হয়।

১৯৩৫ হইতে ১৯৪২—১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের ফলে ৭টি প্রদেশে ব্যবস্থাপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে।

বৃটেন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বৃটিশ সরকার এই যুদ্ধকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করিলেও ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন পরিবর্তন করিতে তাঁহারা অসম্মত হন। বৃটিশ সরকারের গণতন্ত্র-বিরোধী আচরণে ভারতবর্ষের জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

লর্ড জেটল্যাণ্ড ও মিঃ এমেরি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীর সংগে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব বর্জন করেন। বৃটিশ সরকার তখন ভারতবর্ষে দমননীতি প্রয়োগ করেন। যুদ্ধ-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সহস্র সহস্র কংগ্রেসপন্থী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থী, এমন কি ছয়জন প্রধানমন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রী পর্যন্ত কারারুদ্ধ হন।

বড়লাটের শাসনপরিষদের ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করায় কোন ফল হয় নাই।

ক্রিপ্‌স প্রস্তাব—১৯৪২ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আপোষ-আলোচনা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ক্রিপ্‌স-প্রস্তাবে দেশরক্ষাবিভাগের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়ায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার অকস্মাৎ ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব প্রত্যাহার করে ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা বন্ধ করিয়া দেয়।

কংগ্রেস ও "ভারত ছাড়" প্রস্তাব: ১৯৪২—১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে প্রখ্যাত "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার নিরঙ্কুশ দমননীতি চালাইতে

আরম্ভ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশব্যাপী এক ভয়ঙ্কর গণ-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে আর এত বড় গণ-অভ্যুত্থান দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণ অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যায় এবং মেদিনীপুর, সাতারা প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে জনসাধারণ বৃটিশ সরকারের অধীনতা ছিন্ন করিয়া নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। নির্বিচারে গুলীচালনা, গোরা সৈন্যদের অত্যাচার প্রভৃতি ভয়াবহ প্রচণ্ডতার মধ্যে জনসাধারণ বহুদিন সংগ্রাম চালাইয়াছিল। কিন্তু নেতৃত্বহীন আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রশমিত হইয়া যায়।

১৯৪৩ সালের ৩রা আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতশাসন আইনে মোট ৯৩৭০৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির পর পুনরায় রাজনৈতিক মীমাংসার ক্ষীণ আশার আলোক দেখা যায়, কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ফলে অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ—মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অমর বীরত্বকাহিনী জানিতে পারিল।

যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করা সত্ত্বেও দল-নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসী নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে মুক্তিসাধকরূপে অভিনন্দন জানাইল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকার সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন।

সাধারণ নির্বাচনে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সর্বত্র স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির অভিযান সুরু হয়।

মুসলিম লীগও পাকিস্থানের দাবী করিতে থাকে।

বিলাতের নির্বাচন ও শ্রমিকদলের জয়লাভ—বিলাতের পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে ও ভারতে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়।

ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করার ফলে প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেসই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

গণপরিষদ ও কংগ্রেস—দেশীয় রাজ্যগুলির ৯৩টি আসন থাকা সত্ত্বেও গণপরিষদের মোট ৩৮৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৭টি আসন লাভ করে। বিভিন্ন দলের সদস্যসংখ্যা এইরূপঃ—

কংগ্রেস—২০৭	স্বতন্ত্র মুসলমান—৩
মুসলিম লীগ—৭৩	শিখ—৪
স্বতন্ত্র (সাধারণ)—৯	

মোট ২১৬টি সাধারণ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৭টি লাভ করে এবং ৭৮টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৫টি হারায়।

শিখদের দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহারা গণপরিষদ বর্জন করে। এই গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে এবং ইহার মারফৎ প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নহে মনে করিয়া সোস্যালিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বামপন্থী দল ইহা বর্জন করে।

অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার—লর্ড ওয়াভেলের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য ও সহযোগিতার অভাবে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ইহা জাতীয় সরকারের মর্যাদা দাবী করিতে পারে নাই।

অতঃপর লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে গঠিত ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদিকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট, ডাক ও তারবিভাগের ধর্মঘট, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে জঙ্গী প্রজা-আন্দোলন, ভারতীয় নৌবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ইহার সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া এ কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে ভারতবর্ষে দমননীতির সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের শেষভাগে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প। তৎপর লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন।

The Mountbatten Plan—Partition of India

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাঃ ভারতবিভাগ—১৯৪৭ সালের ৩রা জুন নূতন পরিকল্পনা ঘোষিত হয়।

(১) ভারতবর্ষকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান—এই দুই অংশে বিভক্ত করা হইবে। সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ, আসামের শ্রীহট্ট জেলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল ও ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল।

এতদ্দ্বারা ক্যাবিনেট মিশনের সমগ্র ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। ভারতবর্ষের অখণ্ডতায় ও ভারতবাসীর একজাতিত্বে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে অবৈজ্ঞানিক, অভৌগোলিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাগ করা হইল।

মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা ঘোষণার পর আমাদের মাতৃভূমির লক্ষ লক্ষ জন-সাধারণ পিতৃপুরুষের ভিটামাটী হইতে উৎখাত হইয়াছে, আমাদেরই দেশের সহস্র সহস্র নারীর মর্যাদাহানি হইয়াছে। এই দুর্বিষহ লাঞ্ছনা ও অপমান অপেক্ষা সংগ্রামের ভিতর দিয়া আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির মূল্য দান করিয়া স্বাধীনতা অর্জন শ্রেয়ঃ ছিল এ কথা কেহ কেহ বলেন।

(২) *পাকিস্থানে যোগদান করিবে কি না এই সম্পর্কে* মতামত গ্রহণের জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

(৩) বাংলা ও পঞ্জাবে কোন গণভোটের ব্যবস্থা হয় নাই। এই দুই প্রদেশে ব্যবস্থাপরিষদগুলিকে বিভাগ সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর ভোট দিতে বলা হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হইলে সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্থানে যোগদানের বিপক্ষে ভোটদান করিত। বৃটিশ বিচারপতিকে মধ্যস্থ (arbiter) করিয়া গঠিত সীমানা কমিশন যে ভাবে বাংলা ও পঞ্জাবের ভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছেন, এই দুইটি প্রদেশেও সীমান্ত প্রদেশের মত গণভোটের ব্যবস্থা করা হইলে ফলাফল হয়ত অন্যরূপ হইত।

The Indian Independence Act, 1947

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনঃ ১৯৪৭—ভারত-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন নামে একটি বিল পেশ করেন ও বিলের সমস্ত অংশ অতি দ্রুত পাশ করাইয়া লন।

এই আইনবলে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এই দুই ডোমিনিয়ন স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা লাভ

করিল এবং তৎসঙ্গে ইহাদের উপর হইতে বৃটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব চিরদিনের জন্য অপসৃত হইল।

এই ডোমিনিয়নদ্বয়ের গণপরিষদ আইনসভার মর্যাদা লাভ করিল। স্থির হইল যে ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে সম্রাট গভর্নর জেনারেল বা রাষ্ট্রপাল এবং গভর্নর বা প্রদেশপাল নিয়োগ করিবেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও জনাব জিন্না যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্থানের রাষ্ট্রপাল নিযুক্ত হন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অবসর গ্রহণের পর চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ও জনাব জিন্নার মৃত্যুর পর জনাব নাজিমুদ্দিন যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্থানের রাষ্ট্রপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরবর্তী দিনগুলির ঘটনাপঞ্জী হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা কামনা করিয়াছিল ভারতীয় মন্ত্রিসভার হাতে তাহা সম্পূর্ণভাবে আসে নাই।

Independent, Sovereign Indian Republic

স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় সাধারণতন্ত্র—ভারতীয় গণপরিষদ নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গণপরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে একটি সার্বভৌম স্বাধীন ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের লক্ষ্য। আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে আগামী নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

দেশের সমস্যা ও আমাদের ভবিষ্যৎ—রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইংরাজকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করিয়া যাইবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে।"

আজ ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং ভারতবর্ষে জাতীয় সরকাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের জনগণের অভাব, দারিদ্র্য ও দৈন্যের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।

এই শোচনীয় দারিদ্র্যপীড়িত দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনসাধারণের জীবনের মানেব উন্নতি দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র ও সরকারকে বিচার করিতে হইবে।

সকল দল এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা ব্যতীত এই মহাদেশের পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রঃ শাসনবিভাগ

আমরা এখন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিব।

প্রদেশপাল শাসিত প্রদেশসমূহ, চীফকমিশনার শাসিত প্রদেশ সমূহ, দেশীয় রাজ্যমণ্ডল, অথবা স্বতন্ত্র দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন, সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হইবে। বহুবৎসর পর ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হইবে। ডোমিনিয়ন শাসনতন্ত্রের অবসান হইবে--ভারতবাসীর আনুগত্য ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি হইবে। বৃটিশরাজের প্রতি তাহার আর আনুগত্য থাকিবেনা।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী প্রত্যেকটি প্রদেশ, রাজ্য বা রাজ্যমণ্ডলকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সদস্য' বা 'রাষ্ট্র' বলা হইবে।

The President

রাষ্ট্রপতি ও সহ-রাষ্ট্রপতি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইবে। তিনি শাসনতন্ত্র ও দেশে প্রচলিত আইন-অনুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। সরকারের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলী রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হইবে।

ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক হইবেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন—(ক) ভারতীয় আইনসভার উভয় পরিষদের (রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও লোকপরিষদ) সদস্যবৃন্দ এবং (খ) রাষ্ট্রসমূহের আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের গোপন ভোটে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন।

কার্যকাল—রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসর কাল স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা—রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে হইলে প্রত্যেকের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, যথা—(১) তাঁহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের

নাগরিক হইতে হইবে, (২) তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৩৫ হওয়া চাই এবং (৩) তাঁহাকে লোকপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে।

একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বা যোগদানকারী কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন বেতনভুক সরকারী কর্মচারী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতি পদের সর্তাবলী—রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্য হইতে এবং কোন সরকারী বেতনভুক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা রাষ্ট্রপতির বেতন এবং ভাতা নির্ধারিত করিবে। তাঁহার কার্যকালে এই বেতন এবং ভাতা হ্রাস করা হইবে না।

শপথগ্রহণ—কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মুখে শপথ করিতে হইবে যে, তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ও আইন অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, সংরক্ষণ করিবেন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিয়া চলিবেন।

পদত্যাগ, অপসারণ এবং অভিযুক্ত করা—রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি এবং লোকপরিষদের স্পীকারের (বা মুখ্যের) নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্র দাখিল করিয়া তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন।

শাসনতন্ত্র অমান্য করিবার অভিযোগে তাঁহাকে অপসারিত করা যাইতে পারে।

ভারতীয় আইনসভার যে কোন পরিষদ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারেন। এইরূপ অভিযোগ করিতে হইলে পরিষদের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্যকে এই মর্মে একটি লিখিত প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হইবে যে, এই প্রস্তাবটি আলোচনার্থ বা গ্রহণার্থ তাঁহারা পরিষদে উত্থাপন করিতে চাহেন। পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হইলে অপর পরিষদ এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবে অথবা তদন্তের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ তদন্তকালে রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার প্রতিনিধির উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে।

এইভাবে তদন্তের ফলে অন্য পরিষদ যদি অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

পদ শূন্য হইলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন—রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সমাপ্ত হইবার পূর্বেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। মৃত্যু, পদত্যাগ, অথবা অপসারণজনিত কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতি

নির্বাচনকার্য সমাপ্ত করিতে হইবে। নূতন রাষ্ট্রপতিও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

The Vice-President

সহ-রাষ্ট্রপতি—কোন ব্যক্তি সহ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না—(ক) যদি তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হন, (খ) যদি তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৩৫ বৎসর না হয়, (গ) যদি তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতার অধিকারী না হন।

সরকারের অধীনস্থ কোন বেতন বা ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহঃ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। একমাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা যোগদানকারী কোন্ রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না।

কার্যাবলী—সহ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতিত্ব করিবেন।

মৃত্যু, অপসারণ, পদত্যাগ, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে সহ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

সহ-রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হইবে ৫ বৎসর।

সহ-রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বা অপসারণ—সহ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বহস্তলিখিত পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া পদত্যাগ করিতে পারেন। অযোগ্যতার নিমিত্ত অথবা আস্থা হারাইলে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের ভোটে তিনি অপসারিত হইতে পারেন। এইরূপ প্রস্তাব লোকপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা

(১) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে অপরাধীকে মার্জনা, মুক্তিদান, দণ্ডহ্রাস ও দণ্ডমকুব করা উল্লেখযোগ্য।

(২) তিনি সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক হইবেন।

(৩) সরকারের সমস্ত কার্যাবলী তাঁহার নামে পরিচালিত হইবে।

(৪) (ক) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে মন্ত্রিসভার সমস্ত শাসনকার্যসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ ও আইনসংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ জ্ঞাপন করিবেন।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অথবা আইন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবসমূহ জানাইবার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(গ) কোন মন্ত্রীর কার্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ইহা মন্ত্রিসভার সম্মুখে বিবেচনার্থ উত্থাপিত করিতে পারিবেন।

(৫) আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে আহ্বান করিবেন ও তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন।

(৬) তিনি প্রদেশের রাষ্ট্রপাল মনোনয়ন করিবেন। তিনি রাজ্যমণ্ডলের রাজপ্রমুখের নির্বাচন অনুমোদন করিবেন। যেখানে কোন রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্র হিসাবে থাকিবে সেখানে রাজার অভিষেক তাঁহার অনুমোদনসাপেক্ষ।

(৭) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহার হাতেই থাকিবে।

(৮) ভারতের রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন, অডিটর জেনারেল, এটর্ণি জেনারেল, চীফ ইলেকশন কমিশনার প্রভৃতি যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি লোক নিয়োগ করিবেন।

আপৎকালীন ঘোষণা—জরুরী ক্ষমতা Proclamation—emergency powers

(৯) গুরুতর শাসনসংকট কালে, যথা—ভারতবর্ষ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বা আক্রমণের আশু সম্ভাবনা থাকিলে বা দেশের মধ্যে গুরুতর অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বা তাহার আশংকা উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে লইতে পারিবেন।

পরবর্তী এক ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার অবসান হইয়াছে বলিয়া এই ক্ষমতাচ্যুত হইতে পারেন।

ঘোষণাপত্র ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে দাখিল করিতে হইবে এবং দুইমাস কাল গত হইলে জরুরী ঘোষণার মেয়াদ লোপ পাইবে। ভাবতীয় পার্লামেণ্ট ইতিমধ্যে জরুরী ঘোষণার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রথম দফায় তাহার মেয়াদ

হইবে ৬ মাস। আইনসভা প্রয়োজন মনে করিলে আরও ৬ মাস করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া অনধিক ৩ বৎসর কাল আপৎকালীন ব্যবস্থা বহাল রাখিতে পারিবেন।

লোকপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পর যদি জরুরী ঘোষণা হয় কিম্বা জরুরী ঘোষণার দুইমাসের মধ্যে যদি লোকপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং লোকপরিষদ তৎপূর্বে জরুরী ঘোষণা অনুমোদন না করে তাহা হইলে লোকপরিষদ পুনর্গঠিত হইয়া প্রথম অধিবেশনের ত্রিশ দিন পর্যন্ত জরুরী ঘোষণা বলবৎ থাকিবে। যদি এই ত্রিশ দিনের মধ্যে ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা অনুমোদন করেন, তবে জরুরী অবস্থার মেয়াদ ও রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার প্রয়োগ-কাল বর্দ্ধিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা—(১) রাষ্ট্রপতি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিবেন। সভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার ও লোকপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকারও তাঁহার থাকিবে।

(২) অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি পরিষদদ্বয়ের যুক্তসভায় বক্তৃতা করিবেন এবং আইনসভার অধিবেশন আহ্বানের কারণ বিশ্লেষণ করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি যে কোন পরিষদে অথবা উভয় পরিষদের যুক্তসভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন।

(৪) যে কোন বিল সম্পর্কে তিনি আইনসভার উভয় পরিষদে বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৫) সম্মতি (assent) —

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনসভায় গৃহীত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারিবে না। আইনসভায় গৃহীত কোন বিল তিনি অনুমোদন করিতে পারেন অথবা অনুমোদন স্থগিত রাখিতে পারেন অথবা অর্থ সম্বন্ধীয় বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল তৎসমীপে প্রেরিত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র পুনর্বিবেচনার জন্য কিংবা তৎকর্তৃক আইনসভায় প্রেরিত বাণী অনুযায়ী বিলের অংশবিশেষ সংশোধন করার জন্য বিলটিকে পুনরায় আইনসভার কাছে পাঠাইতে পারেন। ভারতীয় আইনসভায় সেই বিল পুনর্বার গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহার অনুমোদন জ্ঞাপন করিবেন।

(৬) আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকিলে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী আইনসংক্রান্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা—আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকার সময়ে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে মনে করিলে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন, এইরূপ অর্ডিন্যান্স আইনসভায় গৃহীত আইনের মতই ক্ষমতাশালী হইবে। কিন্তু (ক) এইরূপ প্রত্যেকটি অর্ডিন্যান্সকে আইনসভার উভয় পরিষদে উত্থাপিত করিতে হইবে। আইনসভার পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে অথবা অর্ডিন্যান্সটি আইনসভা অনুমোদন না করিলে তৎপূর্বেই ইহা বাতিল হইয়া যাইবে, (খ) এরূপ প্রত্যেকটি অর্ডিন্যান্স রাষ্ট্রপতি যে কোন সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এই অর্ডিন্যান্স মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমেই জারী হইবে।

রাষ্ট্রপতির অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা—(১) প্রত্যেক বৎসর রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের চলতি বৎসরের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত একটি বিবৃতি আইনসভায় উত্থাপিত করিবেন।

(২) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত আইনসভায় কোন খাতে অর্থমঞ্জুরের দাবী উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

(৩) আইনসভার ভোটে যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হইয়াছে তাহা এবং ভারতীয় রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ ব্যয় রাষ্ট্রপতির অধীন ভারতীয় তহবিল (Consolidated Fund of India) হইতে হইবে। একটি ব্যয়মঞ্জুরী বিলে (Appropriation Bill) এইসব ব্যয়মঞ্জুরী লিপিবদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহার উপর আইনসভায় কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে না।

(৪) লোকপরিষদের অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি ব্যয়বরাদ্দের একটি অতিরিক্ত বিবৃতি আইনসভার সম্মুখে উত্থাপিত করিবেন যদি ভারত সরকার লোকপরিষদ অনুমোদিত হিসাব মত ব্যয়বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করেন।

(৫) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত অর্থসংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। অর্থসম্বন্ধীয় বিলসমূহ রাষ্ট্রীয় পরিষদ ১৫ দিনের মধ্যে লোকপরিষদে তাঁহাদের সুপারিশ সহ ফেরৎ পাঠাইবেন। অর্থসম্বন্ধীয় বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয়পরিষদে ভোট লওয়া হইবে না।

The Council of Ministers

মন্ত্রিসভা—রাষ্ট্রপতির কার্যনির্বাহে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। প্রথামত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপরই মন্ত্রিসভার

কার্যকাল নির্ভর করিবে, কিন্তু কার্যতঃ লোকপরিষদ অনাস্থা জ্ঞাপন করা মাত্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভা সমবেতভাবে তাঁহাদের শাসননীতি ও কর্মপদ্ধতির জন্য লোকপরিষদের কাছে দায়ী থাকিবেন।

পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। পরিষদের সদস্য নহেন এরূপ ব্যক্তিকেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে যে কোন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে, অন্যথায় তাঁহার নিয়োগ বাতিল হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মন্ত্রীরই উভয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ ও বক্তৃতা দান করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু তিনি পরিষদের সদস্য না হইলে তাঁহার ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

আইনসভা মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করিবেন।

The Prime Minister

প্রধানমন্ত্রী—রাষ্ট্রপতি লোকপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেশানুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দিবেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি প্রধান সহকর্মী হিসাবে কাজ করিবেন।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা—শাসন সংক্রান্ত সকল কার্যে মন্ত্রিসভা লোকপরিষদের নিকট দায়ী থাকিলেও রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধানমন্ত্রীকে শাসন ও আইন-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সকল তথ্য তাঁহাকে জ্ঞাত করার জন্য বলিতে পারেন। বিভিন্ন শাসনবিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে সংবাদ তাঁহাকে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইবে। নূতন আইনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও তাঁহাকে জানাইতে হইবে। যদি কোন বিষয়ে তাঁহার মনে হয় যে, দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর বহন করা উচিত নয় তখন তিনি মন্ত্রিপরিষদে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনার পর সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য রাষ্ট্রপতিকে সকল প্রকার সাহায্য দান করা। জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে রাষ্ট্রপতির নিজের কোন ক্ষমতা নাই—নিজ দায়িত্বে তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। মন্ত্রীদের বিবেচনা ও পরামর্শ অনুসারে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তই তিনি মানিয়া লইবেন। কিন্তু শাসনকার্যে দোষত্রুটি যাহাতে না হয় সেজন্য তাঁহার পদাধিকারবলে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ দিবেন, সাহস দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সাবধান করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রঃ আইনবিভাগ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা রাষ্ট্রপতি ও দুইটি পরিষদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও লোকপরিষদ লইয়া গঠিত হইবে।

The Council of States

রাজসভা—রাষ্ট্রীয় পরিষদে ২৬০ জন সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে (ক) নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে বিশেষ জ্ঞান বা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১২ জন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেনঃ

(১) সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা।
(২) কৃষি, মৎস্যচাষ ও অনুরূপ বিষয়াবলী।
(৩) ইঞ্জিনীয়ারিং ও স্থাপত্য।
(৪) শাসনপদ্ধতি ও সমাজসেবা।

(খ) অবশিষ্ট সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন যোগদানকারী রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে নিম্নপরিষদই এইরূপ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। যে সব রাষ্ট্রে আইনসভা নাই সেই সব স্থানের প্রতিনিধি ভারতীয় আইনসভার নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী মনোনীত হইবেন।

The House of the People

লোকপরিষদ—লোকপরিষদের সদস্যসংখ্যা পাঁচ শতের বেশী হইবে না। এই সব সদস্য যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন অঞ্চলে ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহকে কতকগুলি আঞ্চলিক নির্বাচনকেন্দ্রে বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রের আসনসংখ্যা এরূপভাবে নির্ধারিত করা হইবে যে, অন্ততঃ জনসংখ্যার প্রত্যেক ৭,৫০,০০০ (সাড়ে সাত লক্ষ) একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে এবং জনসংখ্যার প্রত্যেক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) যাহাতে একাধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে না পারে।

লোকপরিষদের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে ২১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিককে ভোটারতালিকাভুক্ত করা হইবে।

নূতন আদমসুমারির সংখ্যানুযায়ী সময় সময় নির্বাচনকেন্দ্রের আসনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করা হইবে।

The Federal Parliament

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাতে দুইটি পরিষদ থাকিবে—(১) ২৬০ জন সদস্য সম্বলিত রাজসভা বা **রাষ্ট্রীয় পরিষদ**, (২) ৫০০ জন সদস্য লইয়া গঠিত **লোকপরিষদ**।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ—রাজসভা বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইবে।

সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। রাজসভা বা রাষ্ট্রীয় পরিষদের আয়ুর সীমা নাই, কিন্তু প্রত্যেক দ্বিতীয় বৎসরে ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন।

রাজসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। (১) ইহার ১২ জনের বেশী সদস্য সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইতে পারিবেন না, (২) প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্যমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যার হার হইবে এইরূপঃ প্রতি দশ লক্ষ হইতে পঞ্চাশ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একজন প্রতিনিধি, তদুপরি প্রত্যেকটি প্রদেশের কুড়ি লক্ষ লোকের একজন প্রতিনিধি; একটি প্রদেশ কুড়ি জনের অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের আসন পাইবে না। ভারতবর্ষের সহ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হইবেন।

সভাপতির কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্য নির্বাহ করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদ একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিবে। তাঁহাদের বেতন ও ভাতা আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

লোকপরিষদ—লোকপরিষদের আয়ুষ্কাল হইবে পাঁচ বৎসর। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তৎপূর্বেও লোকপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইলে রাষ্ট্রপতি ইহার আয়ু এক বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু জরুরী অবস্থার অবসান হওয়ার পর যে কোন পরিস্থিতিতে ইহার আয়ু ছয় মাসের বেশী বৃদ্ধি করা চলিবে না।

লোকপরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের আসনসংখ্যার হার এইরূপ হইবে যে, জনসমষ্টির প্রতি সাড়ে সাত লক্ষ লোক অন্যূন ১টি প্রতিনিধির আসন পাইবে।

আইনসভার অধিবেশন—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিষদসমূহের অন্ততঃপক্ষে বৎসরে দুইবার অধিবেশন হইবে। দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় কোন অবস্থায় ছয় মাসের বেশী হইতে পারিবে না।

রাষ্ট্রপতি পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন আহ্বান করিতে, অধিবেশনের তারিখ, সময় ইত্যাদি নির্দিষ্ট করিতে, পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে অথবা নিম্নপরিষদ ভাঙিয়া দিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতি ভারতীয় আইনসভায় বক্তৃতা করিতে অথবা আইনসভার বিবেচনার্থ উত্থাপিত যে কোন বিল সম্পর্কে বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির বাণীতে নির্দেশিত যে কোন বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র আলোচনা হইবে।

রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক অধিবেশনের প্রারম্ভে বক্তৃতা করিবেন। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে বর্ণিত বিষয়াবলীর আলোচনায় আইনসভা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিবে। প্রত্যেক মন্ত্রী এবং ভারতের এটর্ণী-জেনারেল যে কোন পরিষদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ বা বক্তৃতা দান করিতে পারিবেন, কিন্তু যে কোন পরিষদের সদস্য না হইলে উক্ত পরিষদের অধিবেশনে ভোটদান করিতে পারিবেন না।

The Speaker and the Deputy Speaker

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার—যে কোন পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ লইয়া কোরাম (quorum) গঠিত হইতে পারিবে।

লোকপরিষদ সদস্যদের মধ্য হইতে দুইজনকে যথাক্রমে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন। ডেপুটি স্পীকার স্পীকারের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য নির্বাহ করিবেন।

আইনসভার আইনানুযায়ী স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হইবে।

আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে স্পীকার একটি কাস্টিং ভোট (casting) দিতে পারিবেন।

আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি বা তৎমনোনীত কোন ব্যক্তির সম্মুখে রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিতে হইবে।

আসন শূন্য হয় কি ভাবে—কোন সভ্য পদত্যাগ করিলে অথবা পরিষদের অনুমতি ব্যতীত ৬০ দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিলে অথবা অন্য কোন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলে উক্ত সদস্যের সভ্যপদ শূন্য হয়। নিম্নলিখিত অযোগ্যতাসূচক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হইলেও কোন কোন সদস্যের আসন শূন্য হয়ঃ

(ক) যদি তিনি মন্ত্রীপদ ব্যতীত সরকারের অন্য কোন বেতনভুক পদে সমাসীন হন,

(খ) যদি কোন আদালত তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করে,

(গ) যদি তিনি দেউলিয়া এবং ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হন,

(ঘ) যদি তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করেন, অথবা কোন বিদেশী শক্তির প্রজা বা নাগরিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, অথবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রজা বা নাগরিক হন,

(ঙ) যদি আইনসভা কর্তৃক বা রাষ্ট্রের কোন আইন অনুযায়ী তিনি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন।

সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা—সদস্যরা নিম্নলিখিত সুযোগগুলি উপভোগ করেনঃ

(১) আইনসভায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা,

(২) আইনসভায় প্রদত্ত কোন বক্তৃতা বা আইনসভায় ভোটদানের নিমিত্ত অথবা আইনসভার কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপরোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশিত হইলে পর তাঁহাকে দেওয়ানী বা ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত করা চলে না।

(৩) ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সদস্যবৃন্দ বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভার সদস্যগণের প্রাপ্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

আইনসভায় সদস্যদের বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে সংবাদপত্রকে দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। সদস্যদের ব্যক্তিগত সুবিধা হইতে সংবাদপত্রসমূহ বঞ্চিত—আপত্তিকর বা মানহানিকর কোন বিষয় প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে পারেন। অনেকে মনে করেন এই ব্যবস্থায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বেতন ও ভাতা—আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত হারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দ বেতন ও ভাতা পাইবেন।

আইনসভার কার্যপদ্ধতি

আইনপ্রণয়ন—অর্থসংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল আইনসভার উভয় পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। দুইটি পরিষদে গৃহীত না হইলে কোন বিল পাশ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না।

আইনসভায় মুলতুবী কোন বিল আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকার জন্য বাতিল হইবে না। লোকপরিষদ ভাঙ্গিয়া গেলেও রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুলতুবী কোন বিল বাতিল হইবে না। লোকপরিষদে মুলতুবী অথবা লোকপরিষদে গৃহীত ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুলতুবী কোন বিল লোকপরিষদ ভাঙ্গিয়া গেলে বাতিল হইয়া যাইবে।

আইনপ্রণয়নের বিভিন্ন স্তর—কোন মন্ত্রী অথবা পরিষদের যে কোন বেসরকারী সদস্য বিল উত্থাপন করিতে পারেন। প্রথম স্থলে ইহা সরকারী বিল এবং দ্বিতীয় স্থলে ইহা বেসরকারী বিল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রথমবার বিলটি উত্থাপিত হইলে বিলের নাম ও উদ্দেশ্য পড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকে **বিলের প্রথম পাঠ বা প্রথম দফা আলোচনা** (first reading) বলে। **দ্বিতীয় পাঠ বা**

দ্বিতীয় দফা আলোচনার (second reading) সময় বিলের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়। সেই নীতি পরিষদে অনুমোদিত হইলে ও প্রয়োজন বোধ করিলে ইহাকে একটি **সিলেক্ট কমিটিতে** প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটি বিলের প্রত্যেকটি ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিটি কোন সংশোধন প্রয়োজন বোধ করিলে **রিপোর্টে** উল্লেখ করিয়া দেন। **অতঃপর বিলটির তৃতীয় পাঠ বা শেষ দফা আলোচনা** (third reading) আরম্ভ হয়। এই সময় সদস্যরা সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট ও সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ বিচার করার পর বিলের উপর ভোটদান করেন। পরিষদে সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হইলে বিলটিকে অনুমোদনের জন্য অপর পরিষদে প্রেরণ করা হয়। অন্য পরিষদেও একই ভাবে আলোচনার পর গৃহীত হইলে বিলটি আইনসভার অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। উভয় পরিষদে গৃহীত হওয়ার পর ইহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইবে। তিনি বিলটি অনুমোদন করিতে বা অনুমোদন স্থগিত রাখিতে অথবা পুনরায় বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারেন।

দুই পরিষদের যুক্ত-অধিবেশন—রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বোধ করিলে নিম্নোক্ত অবস্থা অনুযায়ী দুই পরিষদের যুক্ত-অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেনঃ

(১) যদি অর্থসম্বন্ধীয় বিল ব্যতীত অন্য কোন বিল একটি পরিষদে গৃহীত ও অন্য পরিষদ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

(২) যদি বিলের উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে পরিষদদ্বয়ের মতানৈক্য দেখা দেয়।

(৩) একটি পরিষদে গৃহীত হওয়ার পর অন্য পরিষদে বিলটি প্রেরণ করিবার তারিখ হইতে ছয় মাসকাল সময় উত্তীর্ণ হইবার পরও শেষোক্ত পরিষদ যদি বিলটি গ্রহণ না করেন।

Assent to Bills

বিলের অনুমোদন—আইনসভার পরিষদদ্বয়ে বিল গৃহীত হওয়ার পর অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা হইবে। অনুমোদন লাভ করিলেই বিল আইনে পরিণত হইবে। সরকারী গেজেটে প্রকাশিত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষণা হওয়ার পর আইন বলবৎ হইবে।

অর্থসম্বন্ধীয় বিল ব্যতীত অন্যান্য বিলের অনুমোদন রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখিতে পারেন অথবা বিলটি বা উহার কোন ধারা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য যথাসম্ভব সত্বর একটি বাণী সহ পুনরায় আইনসভায় প্রেরণ করিতে পারেন। যদি আইনসভা পুনর্বিবেচনার পর বিলটির পরিবর্তন করিয়া বা না করিয়া গ্রহণ করে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন।

Money Bills

অর্থসম্বন্ধীয় বিল—অর্থসম্বন্ধীয় বিল রাষ্ট্রীয় পরিষদে উত্থাপিত হইবে না এবং কেবলমাত্র লোকপরিষদেই বিলটি উত্থাপন করা চলিবে।

লোকপরিষদে গৃহীত ও সুপারিশের জন্য রাজসভা বা রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রেরিত অর্থসম্বন্ধীয় কোন বিল রাষ্ট্রীয় পরিষদ ৩০ দিনের বেশী আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন না।

লোকপরিষদ ইচ্ছানুযায়ী অর্থসম্বন্ধীয় বিলের উপর রাজসভার যে কোন সুপারিশ গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন।

রাজসভা অর্থসম্বন্ধীয় বিল ত্রিশ দিনের মধ্যে ফেরৎ না দিলে ধরিয়া লওয়া হইবে যে লোকপরিষদে যে আকারে বিলটি গৃহীত হইয়াছে, সেই আকারেই উভয় পরিষদ বিলটি গ্রহণ করিয়াছেন।

অর্থসম্বন্ধীয় বিলের সংজ্ঞা নির্দেশ—কেবল নিম্নোক্ত কোন একটি বিষয় অথবা সমস্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধীয় সর্তাদি সম্বলিত যে কোন বিলকে অর্থসম্বন্ধীয় বিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবেঃ

(ক) যে কোন কর ধার্য, রহিত, হ্রাস এবং পরিবর্তন করা অথবা কর সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা;

(খ) সরকারী ঋণ ও তৎসম্পর্কিত সরকারী কাগজ সম্বন্ধীয় আইন, ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আর্থিক চুক্তি বা দায় সম্পর্কিত আইন বা তাহার সংশোধন।

(গ) সরবরাহ।

(ঘ) ভারতের রাজস্ব ব্যয় (appropriation of revenues of India)

(ঙ) কোন ব্যয়কে ভারতের রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয় বলিয়া ঘোষণা করিলে বা সেই ব্যয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব (declaring any expenditure to be expenditure charged on the revenues of India or increasing the amount thereof)

(চ) ভারতীয় রাজস্ব খাতে গৃহীত অর্থ অথবা ভারতীয় হিসাব পরীক্ষা (receipt of money on account of Indian revenues or the audit of Indian accounts)

সংক্ষেপে বলিতে হয় ভারতবর্ষের মিলিত তহবিল বা অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত সকল বিলকে অর্থসম্বন্ধীয় বিল বলা হয়।

কোন বিল অর্থসম্বন্ধীয় বিল কি না এ সম্পর্কে লোকপরিষদের স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

The Budget

বাজেট—রাষ্ট্রপতি নিজ পদাধিকারবলে প্রতি বৎসর ভারত সরকারের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব সম্বলিত একটি বিবৃতি আইনসভার উভয় পরিষদে উত্থাপন করিবেন।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হইবেঃ **ভারতীয় রাষ্ট্রের মিলিত তহবিল** (Consolidated Fund of India) ও **ভারতীয় রাষ্ট্রের অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের তহবিল** (Contingency Fund of India)

(ক) প্রস্তাবিত ব্যয়নির্বাহের জন্য রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয়ের পরিমাণ।

(খ) ভারতবর্ষের রাজস্বের উপর দায়বন্ধ মোট ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে প্রস্তাব অন্যান্য ব্যয় হইতে পৃথক করিয়া দেখান হইবে।

নিম্নোক্ত ব্যয়বরাদ্দগুলি রাজস্ব হইতে করা হইবে এবং এই ব্যয়নির্বাহের জন্য ভারতীয় রাজস্ব দায়বন্ধ থাকিবেঃ

(১) রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা এবং তাঁহার অফিস সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়।

(২) রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং লোকপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

(৩) ভারতের ঋণ পরিশোধ।

(৪) (ক) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ও পেন্সন।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিদের পেন্সন।

(গ) হাইকোর্টের বিচারপতিদের পেন্সন।

ভারতীয় রাজস্ব হইতে যে সব ব্যয় দায়বন্ধ করা হইবে তাহা আইনসভায় উত্থাপিত করা হইবে না, অর্থাৎ আইনসভার এই প্রস্তাবের উপর ভোটদানের অধিকার থাকিবে না। এগুলি ভোটবহির্ভূত বিষয়। অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব আইনসভায় ভোটে দেওয়া হইবে। তন্মধ্যে যে কোন বিষয়ে ব্যয়বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করা, নামঞ্জুর করা, অথবা ব্যয় হ্রাস করার অধিকার লোকপরিষদের থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোন খাতে ব্যয়বরাদ্দের দাবী করা চলিবে না।

লোকপরিষদের ভোটের দ্বারা গৃহীত সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ ও ভারতীয় রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরী বিলে (Appropriation Bill) অন্তর্ভুক্ত হইবে। লোকপরিষদে এই বিলের কোন সংশোধনী প্রস্তাব করা যাইবে না। বিলটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থাজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন।

চলতি বৎসরের গৃহীত ব্যয়বরাদ্দ ছাড়া রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় পরিষদে **অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের বিবৃতি** উত্থাপিত করিতে পারেন। অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের ব্যাপারেও লোকপরিষদের সাধারণ ব্যয়বরাদ্দের মত কর্তৃত্ব থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত ভারতীয় রাজস্বের উপর কোন ব্যয় দায়বন্ধ করার প্রস্তাব আইনসভায় গৃহীত হইতে পারিবে না।

কার্যপদ্ধতি—প্রত্যেক পরিষদই স্ব স্ব কার্যপদ্ধতি বিধিবন্ধ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি ও লোকপরিষদের স্পীকারের সহিত আলোচনাক্রমে উভয় পরিষদের যুক্ত-অধিবেশনের কার্যপদ্ধতি স্থির করিবেন।

ভাষা—ভারতীয় আইনসভার ভাষা হিন্দী, হিন্দুস্থানী অথবা ইংরাজী হইবে এখনও স্থির হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা—আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারী অর্ডিন্যান্সকে আইনসভার উভয় পরিষদে উত্থাপিত করিতে হইবে। আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে এরূপ অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যাইবে। উভয় পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে এইরূপ অর্ডিন্যান্সের বিপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিলে ইহা ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বাতিল হইয়া যাইবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রের অডিটর জেনারেল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভারতের অডিটর জেনারেল নিয়োগ করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ যে পদ্ধতিতে এবং যে যে কারণে স্বীয় পদ হইতে অপসারিত হইতে পারেন সেগুলি অডিটর জেনারেলের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে।

অবসর গ্রহণের পর অডিটর জেনারেল আর কোন সরকারী পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। অডিটর জেনারেলের নিজ কর্মচারিবৃন্দের বেতন ও ভাতা তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সহিত আলোচনাক্রমে নির্ধারিত করিবেন। এই সমস্ত ব্যয় ভারতীয় রাজস্বের উপর দায়বন্ধ করা হইবে।

অডিটর জেনারেলের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভারত সরকারের হিসাবপত্র রক্ষিত হইবে এবং তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিসাবপত্র রাখা যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলির কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভারতীয় হিসাবপত্র সম্পর্কিত বিবরণী বা রিপোর্টসমূহ অডিটর জেনারেল রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিবেন এবং তাহা আইনসভার উভয় পরিষদে পেশ করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহঃ শাসনবিভাগ

রাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৯টি প্রদেশপালশাসিত প্রদেশ আছে—পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, পূর্বপঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম এবং উড়িষ্যা।

চীফ কমিশনার প্রদেশসমূহ—কুর্গ, আজমীর মারোয়াড়, দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও হিমাচল প্রদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ—প্রায় সমস্ত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ একক-ভাবে অথবা রাজ্যমণ্ডল (Union) হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। এরূপ প্রত্যেকটি যোগদানকারী রাজ্যকে নূতন শাসনতন্ত্রে 'রাষ্ট্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আমরা পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রদেশপাল—ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রদেশপাল নিয়োগ করিবেন।

নিম্নোক্ত সর্তসাপেক্ষভাবে প্রদেশপালের কার্যকাল ৫ বৎসর হইবে—

(১) যদি তিনি পদত্যাগ না করেন, (২) শাসনতন্ত্র অমান্য করার অভিযোগে রাষ্ট্রপতি দ্বারা যদি তিনি অপসারিত না হন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হইবার সমস্ত যোগ্যতার অধিকারী এবং অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কোন ব্যক্তি প্রদেশপাল পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

অবশ্য উক্ত পদপ্রার্থী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অধিবাসী না হইলেও চলিবে।

প্রদেশপাল ভারতীয় আইনসভা বা কোন রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্য অথবা কোন সরকারী বেতনভুক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। আইনসভার আইন অনুসারে প্রদেশপালের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হইবে।

রাষ্ট্রের প্রদেশপাল অপরাধীকে মার্জনা, দণ্ডহ্রাস, দণ্ডমকুব করার ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

যে সব বিষয়ে রাষ্ট্র আইনপ্রণয়ন করিতে পারে সেই সব বিষয়ের উপর শাসনবিষয়ক ক্ষমতাও থাকিবে।

শাসনতান্ত্রিকসংকটে গুরুতর অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব নিজদায়িত্বে লইতে পারিবেন এবং প্রদেশপাল মারফত শাসনকার্য চালাইবেন।

রাজপ্রমুখ—প্রদেশগুলির মত রাজ্যমণ্ডলগুলিও যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্র থাকিবে—এই রাজ্যমণ্ডলের রাজপ্রমুখের নির্বাচন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসাপেক্ষ। রাজ্যমণ্ডলের রাজন্যবর্গ নিজদের মধ্য হইতে রাজপ্রমুখ ও উপরাজপ্রমুখ নির্বাচন করিবেন।

রাজপ্রমুখ প্রদেশপালের মত স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্বপালনে মন্ত্রীদের দ্বারা চালিত হইবেন। কিন্তু শাসনসংকট উপস্থিত হইলে রাজপ্রমুখকে রাষ্ট্রপতির অধীনে শাসনের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করিতে হইবে।

মহারাজা—যে রাজ্য রাজ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্র হিসাবে যোগ দিবে সেই রাজ্যে মহারাজা নিয়মতান্ত্রিক প্রদেশপালের অনুরূপ শাসনক্ষমতা ও দায়িত্বে অভিষিক্ত হইবেন। তাঁহার অভিষেক রাষ্ট্রপতির অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে এবং সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে তাঁহাকে শাসন-কার্য চালাইতে হইবে। দায়িত্বহীন মহারাজার স্থান আজ ভারতবর্ষে নাই—স্বাধীন ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে রাজন্যবর্গের স্থান কোথায় ও কত দিন কে বলিতে পারে?

মন্ত্রিসভা—প্রদেশপালের কার্যনির্বাহে সাহায্য ও পরামর্শদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। মন্ত্রিসভা সমগ্রভাবে শাসননীতিব জন্য দায়ী থাকিবেন। অন্যদিকে প্রত্যেক মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে এক বা একাধিক বিভাগের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেশানুসারে প্রদেশপাল মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। আইনতঃ প্রদেশপালের ইচ্ছার উপরই তাঁহাদের কার্যকাল নির্ভর করে। কিন্তু কার্যতঃ যতক্ষণ মন্ত্রিসভা আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন থাকিবেন ততক্ষণই তাঁহাবা স্ব স্ব পদ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও উড়িষ্যাতে উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়ের একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকিবেন।

মন্ত্রীদিগকে অবশ্যই রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্য হইতে হইবে অথবা মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে।

প্রদেশগুলির ন্যায় রাজ্যমণ্ডল ও রাজ্যসমূহে মন্ত্রিসভা অনুরূপ ভাবে গঠিত হইবে ও তাঁহাদের ক্ষমতা একই প্রকার হইবে।

The Chief Minister

প্রধানমন্ত্রী—আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রদেশপাল সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাইবেন এবং তিনিই প্রধানমন্ত্রী নামে অভিহিত হইবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সহকর্মীদের একটি নামের তালিকা অনুমোদনের জন্য প্রদেশ-পালের কাছে পেশ করিবেন ও প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে প্রদেশপাল তাঁহাদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন।

মন্ত্রীরা যুক্তভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকিবেন ও আইনসভার ভোট দ্বারা তাঁহারা পদ হইতে অপসারিত হইতে পারিবেন।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার যাবতীয় সিদ্ধান্তসমূহ, রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ও আইনসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদেশপালকে জ্ঞাপন করিবেন। প্রদেশপাল কোন মন্ত্রীকে স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের সমস্ত শাসনবিষয়ক কার্য প্রদেশপালের নামে পরিচালনা করা হইবে।

রাও কমিটির মতে রাজ্যমণ্ডলের ও রাজ্যের শাসনকর্তা রাজপ্রমুখ বা মহারাজা জনতার ইচ্ছানুযায়ী শাসনদায়িত্বে অধিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার মারফত শাসনকার্য চালাইবেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক শাসন—প্রদেশ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে বা আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে কিম্বা প্রদেশে গুরুতর অশান্তি বা বিশৃংখলা দেখা দিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাল প্রদেশকে ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনের ও আইনপ্রণয়নের ভার সাময়িকভাবে নিজ হাতে লইতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ: আইনবিভাগ

রাষ্ট্র ও আইনসভা—প্রত্যেকটি যোগদানকারী রাষ্ট্রের জন্য একটি আইনসভা থাকিবে। এই আইনসভা প্রদেশপাল ও আইনসভার দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে অথবা যেখানে দুইটি পরিষদ নাই সেখানে প্রদেশপাল ও একটি পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পূর্বপাঞ্জাবে আইনসভা দ্বি-পরিষদ হইবে—অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রে আইনসভার একটি পরিষদ থাকিবে।

দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট আইনসভার দুইটি পরিষদ (ক) ব্যবস্থাপকসভা (The Legislative Council) ও (খ) ব্যবস্থাপরিষদ (The Legislative Assembly) নামে অভিহিত হইবে।

একটি পরিষদবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের আইনসভাকে ব্যবস্থাপরিষদ বলা হইবে।

প্রত্যেক ব্যবস্থাপরিষদের আয়ু হইবে পাঁচ বৎসর। অবশ্য প্রদেশপাল ইচ্ছা করিলে এই সময়ের পূর্বেই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপকসভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না। কিন্তু প্রতি তিন বৎসর অন্তর সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপকসভার সদস্যপদাভিষিক্ত হইবার ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২৫ ও ৩৫ বৎসর।

প্রদেশে বা রাজ্যমণ্ডলে উচ্চপরিষদের গঠনের বা বিলোপসাধনের ভবিষ্যৎকালীন ব্যবস্থা—আইনসভা দ্বি-পরিষদ হইলে উচ্চপরিষদের বা ব্যবস্থাপকসভার বিলোপসাধন কিম্বা একটি পরিষদ থাকিলে তাহাকে দ্বি-পরিষদ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রাদেশিক বা রাজ্যমণ্ডলের ব্যবস্থাপরিষদ উপস্থিত সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে যদি স্থির করেন যে পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা হইলে ভারতীয় পার্লামেণ্ট সেই প্রস্তাবকে আইন দ্বারা কার্যকরী করার সকল বিধি-ব্যবস্থা করিবেন। এই পরিবর্তনকে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

ব্যবস্থাপরিষদের গঠন—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। ২১ বৎসর বা তদূর্দ্ধ্ব বয়স্ক সমস্ত নাগরিক ভোট দিতে পারিবেন। অবশ্য অন্যান্য কারণ বশতঃ যে কোন ব্যক্তির ভোটদানের অধিকার বাতিল হইতে পারে।

প্রত্যেক এক লক্ষ জনসমষ্টির একজন প্রতিনিধি থাকিবেন।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য পাঁচশতাধিক হইতে পারিবে না। প্রত্যেক আদমসুমারির পর নির্বাচনকেন্দ্রসমূহের পুনর্বণ্টন হইবে। কোন পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৬০ জনের কম হইবে না।

ব্যবস্থাপকসভার গঠন—দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহে ব্যবস্থাপকসভার সদস্য-সংখ্যা ব্যবস্থাপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগের বেশী হইবে না।

কোন ব্যবস্থাপকসভার সদস্যসংখ্যা ৪০ জনের কম হইবে না। রাষ্ট্রসভার মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে (ক) অর্ধেক নিম্নোক্ত ভিত্তিতে মনোনীত হইবেঃ

(১) সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান। (৩) ইঞ্জিনীয়ারিং ও স্থাপত্য।
(২) কৃষি, মৎস্যোন্নয়ন ও অনুরূপ বিষয়। (৪) জনসেবা ও সমাজবিজ্ঞান।

উপরোক্ত প্রত্যেকক্ষেত্রে যতজন মনোনীত হইবেন তাহার দ্বিগুণসংখ্যক নাম প্রস্তাব করা হইবে।

(খ) একক পরিবর্তনশীল ভোটের (single transferable vote) দ্বারা আনুপাতিক নির্বাচনের (proportional representation) ভিত্তিতে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রসভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত করিবেন।

(গ) অবশিষ্ট প্রদেশপাল কর্তৃক মনোনীত হইবে।

সদস্যরা নয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। ব্যবস্থাপকসভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইবে—ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি তিন বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন।

অধিবেশন—রাষ্ট্রের আইনসভার প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইটি অধিবেশন হইবে। দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় ছয় মাসের বেশী হইতে পারিবে না।

প্রদেশপাল স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিবেন বা স্থগিত রাখিবেন অথবা ব্যবস্থাপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবেন। প্রদেশপাল আইনসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন অথবা আইনসভায় মুলতুবী কোন বিল সম্পর্কে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। এরূপ বিল সম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র বিবেচনা করা আইনসভার কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রদেশপাল ও মন্ত্রিবৃন্দের আইনসভায় বক্তৃতাদানের অধিকার—অধিবেশনের প্রারম্ভে প্রদেশপাল আইনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন। আইনসভা সর্বাগ্রে প্রদেশপালের ভাষণ সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

রাষ্ট্রের আইনসভার অধিবেশনে বক্তৃতাদানের ও অংশ গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক মন্ত্রীর ও এড্‌ভোকেট জেনারেলের থাকিবে। কিন্তু আইনসভার সদস্য না হইলে ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

রাজপ্রমুখ, মন্ত্রিসভা ও আইনসভা—প্রদেশের মত রাজ্যমণ্ডলে রাজপ্রমুখ মন্ত্রিসভা ও আইনসভার সহিত প্রদেশপালের অনুরূপ সম্পর্ক রক্ষা করিতেন।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার—ব্যবস্থাপরিষদ সদস্যদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও স্পীকারের অনুপস্থিতিতে কার্য নির্বাহের জন্য একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভা অনুরূপভাবে সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহের জন্য একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিবে। আইনসভার আইন অনুযায়ী তাঁহাদের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হইবে।

সভ্যদের সুযোগ-সুবিধা—রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যবৃন্দ ভারতীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দের অনুরূপ সকল সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিবেন।

আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি—রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নের পদ্ধতির অনুরূপ হইবে। ব্যবস্থাপকসভার শাসন বা আইনপ্রণয়নে বিশেষ কর্তৃত্ব থাকিবে না। মন্ত্রিসভা ব্যবস্থাপরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন। কোন বিল সম্পর্কে যদি ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপকসভার মধ্যে মতবিরোধ হয়, বিলটি ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইবার পর ব্যবস্থাপকসভা তিন মাসের অধিক বিলম্ব করেন এবং বিলটি ব্যবস্থাপরিষদে ফিরিয়া আসিলে পুনর্গৃহীত হয় তখন ব্যবস্থাপকসভা এক মাসের মধ্যে বিলটি পাশ না করিলে বিলটি উভয় পরিষদে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থসম্বন্ধীয় বিল ব্যবস্থাপরিষদেই উত্থাপিত হইবে।

অর্থসম্বন্ধীয় বিলের পদ্ধতি—প্রদেশপাল রাষ্ট্রের আনুমানিক বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত একটি বিবৃতি আইনসভায় উত্থাপিত করিবেন। ইহাকে বাৎসরিক অর্থসম্বন্ধীয় বিবৃতি (annual financial statement) বলে।

বিবৃতিতে (ক) রাষ্ট্রের রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয়, (খ) রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয় ব্যতীত অন্য যে সব বিষয়ে আইনসভার ভোটাধিকার আছে পৃথক করিয়া করিয়া দেখান হইবে।

আইনসভায় বাজেট গ্রহণের পদ্ধতি—প্রদেশপালের সুপারিশ ব্যতীত কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করা চলিবে না।

কোন ব্যয়মঞ্জুরের দাবী গ্রহণ, নামঞ্জুর বা হ্রাস করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপরিষদের থাকিবে।

প্রদেশের রাজস্বের উপর দায়বন্ধ এবং পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মোট ব্যয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়বরাদ্দের তপশীলভুক্ত করা হইবে। প্রদেশপাল ইহাতে স্বাক্ষর

করিলে ইহা বিধিসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইবে ও তৎপর ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করা হইবে। কিন্তু ব্যবস্থাপরিষদে ইহার উপর কোন আলোচনা বা ভোটগ্রহণ হইবে না।

প্রদেশপাল অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করিলে তাহার উপর ব্যবস্থা-পরিষদ ভোটদান করিতে পারে।

রাষ্ট্রের ভাষা—সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যবহৃত ভাষা বা ভাষাসমূহ অথবা ইংরাজী রাষ্ট্রের আইনসভার ভাষা হইবে। কোন সদস্য-রাষ্ট্রে অন্যূন শতকরা ২০ জন ভিন্নভাষাভাষী হইলে তাহাদের ভাষাকে সেই রাষ্ট্রের আইন-আদালতের ব্যবহার্য অন্যতম ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

প্রদেশপালের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা—আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকার সময় জরুরী অবস্থায় প্রদেশপাল অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ অর্ডিন্যান্সকে পরে আইনসভায় উত্থাপিত করিতে হইবে। আইনসভার পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে এইরূপ অর্ডিন্যান্স আপনাআপনি বাতিল হইয়া যাইবে। অথবা কোন গৃহীত প্রস্তাবে আইনসভা অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলে অর্ডিন্যান্স ছয় সপ্তাহের আগেও বাতিল হইয়া যাইতে পারে। প্রদেশের মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমেই প্রদেশপাল অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন।

জরুরী অবস্থাকালে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে এরূপ কোন জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণাবলে স্বহস্তে সরকারী শাসনকার্য গ্রহণ করিতে পারেন ও ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য চালাইতে পারেন। এই অবস্থায় একমাত্র হাইকোর্ট সংক্রান্ত আইন ব্যতীত শাসনতন্ত্রের অন্য সমস্ত আইন প্রদেশে সাময়িকভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

এই সংকটকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থাকালীন নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রধান হিসাবপরীক্ষক—অডিটর-জেনারেলের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি একজন প্রধান হিসাবপরীক্ষক Auditor-in-Chief নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রধান হিসাবপরীক্ষকের কার্যকাল ও চাকুরীর সর্তাবলী হাইকোর্টের বিচারপতির অনুরূপ হইবে। তাঁহার বেতন ও ভাতা রাষ্ট্রের রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয় বলিয়া পরিগণ্য হইবে। অবসর গ্রহণের পরও কোন প্রধান হিসাবপরীক্ষক ভারতীয় অডিটর জেনারেল অথবা অন্য কোন সরকারী দপ্তরের প্রধান হিসাবপরীক্ষক নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

রাষ্ট্রের হিসাবসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রধান হিসাবপরীক্ষক প্রদেশপালের নিকট পেশ করিবেন ও পরে উহা রাষ্ট্রের আইনসভায় পেশ করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বর্তমান ভারত সরকার

কেন্দ্রীয় সরকারঃ শাসনবিভাগ

অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকারের শাসনকার্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের "সাময়িক বিধানানুযায়ী" পরিচালিত হইবে।

বর্তমানে ভারতের শাসনকার্যের দায়িত্ব 'ভারত সরকার' নামে অভিহিত একটি কেন্দ্রীয় সরকারের।

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকর্তৃত্ব রাষ্ট্রপাল ও তাঁহার মন্ত্রিসভার হাতে এবং কেন্দ্রের আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপাল ও গণপরিষদের হাতে যুক্তভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে।

প্রাদেশিক সরকারসমূহ, প্রাদেশিক শাসনবিভাগ ও প্রাদেশিক আইনসভার সহিত পার্থক্য দেখাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ, কেন্দ্রীয় আইনসভা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ সর্বভারতীয়. প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে স্থানীয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সমস্যা বিজড়িত।

রাষ্ট্রপাল—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের নিয়ামক আইনে রাষ্ট্রপালের পদ প্রথম সৃষ্টি হয় ও ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম রাষ্ট্রপাল নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারীই ভারতের সর্বশেষ রাষ্ট্রপাল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুযায়ী বাংলার রাষ্ট্রপাল ভারতের রাষ্ট্রপাল পদাভিষিক্ত হন।

ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক ভারতের সার্বভৌম কর্তৃত্ব গ্রহণের পর রাষ্ট্রপাল রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় হন।

বৃটিশ মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা রাষ্ট্রপাল নিয়োগ করিতেন। নূতন শাসনতন্ত্রে তাঁহার এই ক্ষমতা লোপ হইবে এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার আমাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইবেন।

রাষ্ট্রপাল ও মন্ত্রিসভা—ভারতের চূড়ান্ত শাসনকর্তৃত্ব রাষ্ট্রপাল ও মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে।

ভারত সরকারের শাসনক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রপালকে দেওয়া হয় নাই, সপরিষদ রাষ্ট্রপালকে দেওয়া হইয়াছিল। কেবলমাত্র বিশেষ জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপাল ভারতশাসনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং কেবলমাত্র এই অবস্থায়ই তিনি শাসন পরিষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। এক কথায় একজন ব্যক্তি (রাষ্ট্রপাল) ভারতের শাসন পরিচালনা করিতেন না, একটি কমিটি (সপরিষদ রাষ্ট্রপাল) শাসন পরিচালনা করিতেন।

রাষ্ট্রপালের মন্ত্রিসভা—লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা ভারত শাসন চলে না, একটি কমিটির দ্বারা চলে। আজকাল রাষ্ট্রপাল কাষ্ঠপুত্তলিকা ছাড়া আর কিছুই নহেন। নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনানুযায়ী কোন কিছু করিবার অধিকার আজ তাঁহার নাই, তাঁহাকে কেবলমাত্র মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে হয়।"

ভারতীয় মন্ত্রিসভার গঠনবিধি—মন্ত্রিসভায় কতজন সদস্য থাকিবেন ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে তাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই।

ভারতীয় মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কর্তব্য—ভারতীয় সামরিক ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা কি নীতিতে পরিচালিত হইবে তাহা স্থির করাই ভারতীয় মন্ত্রিসভার কর্তব্য এবং এই নীতি স্থির করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিসভাকে দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যের উপর এক বা একাধিক দপ্তরের ভার থাকে। সাধারণতঃ মন্ত্রণাদান অপেক্ষা শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহারা বেশী ব্যাপৃত থাকেন। মন্ত্রীদের কার্য বণ্টন সম্পর্কিত নীতি প্রধানমন্ত্রীই স্থির করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত করা হয় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে, তবে বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মন্ত্রিসভার অধিবেশনের কার্য-বিবরণী গোপন রাখা হয়। সকল মন্ত্রীই মন্ত্রিসভার সদস্য নহেন। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভার নেতা এবং আইনসভার মধ্য হইতে তিনি তাঁহার সহকর্মীদের মনোনীত করেন। বর্তমানে গণপরিষদ আইনসভার কাজ করিতেছে।

মন্ত্রিসভার মধ্যে এমন কোন মন্ত্রী থাকিতে পারেন যাঁহার উপর কোন বিশেষ দপ্তরের ভার নাই। আবার কোন বিশেষ দপ্তরের শাসনকর্তা হইয়াও কোন মন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্য না হইতে পারেন।

রাষ্ট্রপাল মন্ত্রীদের নিয়োগ করিবেন। গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই হইবেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার কার্যকাল ততদিনই থাকিবে যতদিন তাঁহারা গণ-পরিষদের আস্থাভাজন থাকিবেন।

মন্ত্রিসভার অধিবেশন ও কার্যবিধি—মধ্যে মধ্যে—সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার মন্ত্রিসভার অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রপাল যদি কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন বা কোন মন্ত্রী যদি কোন বিষয় মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা করা উচিত বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে সেই সব বিষয় মন্ত্রিসভার অধিবেশনে আলোচনা হয়। কোন বিষয়ে তথ্যাদি জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী মন্ত্রিসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মানিয়া চলা হয়।

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর

পররাষ্ট্রবিভাগ—বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক, ভারতে বিদেশী দূতাবাস ও বিদেশে ভারতীয় দূতাবাস—এই সব বিষয়ে তত্ত্বাবধানই পররাষ্ট্র-বিভাগের কাজ।

বৃটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সহিত সম্পর্করক্ষা বর্তমানে পররাষ্ট্র-দপ্তরের কাজ।

স্বরাষ্ট্রবিভাগ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য স্বরাষ্ট্রবিভাগ দায়ী। ভারতীয় এড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্‌ সার্ভিস, আইন ও বিচার, পুলিশ, জেল, কয়েদী বসতি, আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। অসামরিক দেশরক্ষা-ব্যবস্থাও স্বরাষ্ট্রবিভাগের এলাকাভুক্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিভাগ পরিচালনা করেন।

অর্থবিভাগ—অর্থবিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা এই বিভাগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সমগ্র শাসনযন্ত্র এই বিভাগের উপর নির্ভরশীল। কারণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের বরাদ্দ করা এই বিভাগের দায়িত্ব। অর্থসচিব দেশের রাজস্বের তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহাকে সরকারের সকল বিভাগের ব্যয়ের উপরই দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আইনবিভাগ—সমস্ত নূতন আইনপ্রণয়ন ও বিলের খসড়া রচনার ভার এই বিভাগের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই বিভাগের কর্তা আইনসচিব। তিনি আইন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করেন।

বাণিজ্যবিভাগ—ভারতের বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানী বরাদ্দ, শুল্ক, বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ এই বিভাগের এলাকাভুক্ত।

শিল্প ও সরবরাহবিভাগ—শিল্পোন্নয়ন, শিল্প গবেষণা ও প্রদর্শনী, অসামরিক সরবরাহবিভাগ, যুদ্ধের উদ্বৃত্ত মালপত্রের বিধিব্যবস্থার ভার এই বিভাগের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে।

দেশীয় রাজ্যবিভাগ—যে সব দেশীয় রাজ্য বা রাজ্যমণ্ডল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়াছে বা দিবে সেগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বজায় রাখিবার দায়িত্ব এই বিভাগের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে।

সাহায্য ও পুনর্বসতিবিভাগ—ভারতে আগত আশ্রয়প্রার্থী ও দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত লোকজনের সাহায্য ও পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা এই বিভাগের দায়িত্ব।

কৃষিবিভাগ—বিভিন্ন প্রদেশের যুদ্ধোত্তর কৃষিপরিকল্পনা ও কৃষিনীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং কৃষিগবেষণার ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কর্তব্য। দেশে কৃষি-গবেষণা ও পরীক্ষা (experiment) ইত্যাদির ব্যবস্থাও ইহার কাজ।

খাদ্যবিভাগ—সারা ভারতের খাদ্যনীতি ও খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন এই বিভাগের পরিচালনাধীন। কৃষিবিভাগ ও খাদ্যবিভাগকে এক করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্যবিভাগ—জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরিচালনা করা এই বিভাগের কাজ। যুদ্ধোত্তর স্বাস্থ্য পরিকল্পনাও ইহার আওতায় পড়ে।

শিক্ষাবিভাগ—সমগ্র ভারতে শিক্ষানীতির জন্য দায়ী শিক্ষাবিভাগ। শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা প্রধানতঃ প্রাদেশিক সরকারের এলাকাভুক্ত। যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত ও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ইহার অন্যতম কর্তব্য।

দেশরক্ষাবিভাগ—ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর উপর এই বিভাগ কর্তৃত্ব করেন। দেশরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এই বিভাগ সম্পূর্ণ দায়ী। এই তিনটি বাহিনীরই একজন করিয়া সামরিক অধিনায়ক আছেন।

যানবাহনবিভাগ—যানবাহন চলাচলের সমস্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এই বিভাগের। রাস্তাঘাট, রেলপথ, জাহাজ চলাচল ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

যোগাযোগবিভাগ—ডাক, তার, টেলিফোন ও অসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কে যোগাযোগের যাবতীয় ব্যবস্থা করা এই বিভাগের দায়িত্ব।

শ্রমবিভাগ—শ্রমিকসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করা এই বিভাগের দায়িত্ব। কণ্ট্রোলার অব ষ্ট্যাম্পস্, স্টেশনারী এ্যাণ্ড প্রিণ্টিং প্রভৃতি কয়েকটি ছোট অফিসও এই বিভাগের অধীন।

খনি, পূর্ত ও বিদ্যুৎবিভাগ—পূর্ত, খনি, জল, বিদ্যুৎ ও সেচসংক্রান্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব এই বিভাগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

তথ্য ও বেতারবিভাগ—বেতার পরিচালনা, সংবাদপত্র ও ফিল্মের মধ্য দিয়া প্রচার, সংবাদপত্রের সংবাদ ও মতামত পরীক্ষা করা, সরকারের স্বপক্ষে জনমত গঠন প্রভৃতি এই বিভাগের কাজ।

সরকারী দপ্তরখানা ও বিভাগীয় সেক্রেটারী—প্রত্যেক বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনে একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী আছেন। সেক্রেটারীর অধীনে আছেন—জয়েণ্ট ও ডেপুটি সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী ও এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীবৃন্দ। প্রত্যেক বিভাগে রেজিস্ট্রার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেরাণী প্রভৃতি অধস্তন কর্মচারীরা আছেন। ভারত সরকারের যাবতীয় কার্য সরকারী দপ্তরখানার দ্বারা চালান হয়। মন্ত্রিসভা নীতি নির্ধারণ করেন এবং দপ্তরখানার কর্মচারিবৃন্দ এই নীতিকে কার্যে পরিণত করিয়া থাকেন।

বিভাগীয় সেক্রেটারীর পদমর্যাদা—ভারত সরকারের কোন বিভাগীয় কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর মর্যাদা অনেকটা ইংলণ্ডের স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারীর অনুরূপ। প্রত্যেকটি বিষয় সিদ্ধান্তের জন্য নিজের মতামত জানাইয়া তিনি মন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। সেক্রেটারীর নিজস্ব দপ্তর সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি মন্ত্রিসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন। কোন অবস্থায়ই তিনি পদমর্যাদায় ইংলণ্ডের স্থায়ী আণ্ডারসেক্রেটারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন।

সাধারণতঃ সেক্রেটারীর কার্যকাল চারি বৎসর।

রাষ্ট্রদূত—প্রধান প্রধান বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের সরকারী প্রতিনিধিরূপে একজন করিয়া রাষ্ট্রদূত আছেন। রাষ্ট্রদূতের অবর্তমানে সেই সব স্থানে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (charge d'affaires) রাখা হয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট দেশের ঘটনাবলী ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র দপ্তরে জানাইবেন ও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতি বর্ধন করিবেন। এইভাবে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে আদানপ্রদানই রাষ্ট্রদূতের কার্য। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, বেলজিয়াম, ইরাণ, মিশর, তুরস্ক, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ব্রেজিল, আর্জেণ্টাইন প্রভৃতি দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত আছেন। অনুরূপভাবে ঐ সব

দেশের রাষ্ট্রদূতেরাও ভারতবর্ষে আছেন। পররাষ্ট্রবিভাগের অধীনে ইঁহারা পরিচালিত হন।

বৃটেনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার—ভারতীয় হাইকমিশনার বৃটেনে ভারত সরকারের এজেণ্ট। তিনি ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁহার দপ্তরটির সঙ্গে ইণ্ডিয়া অফিসের কিছুমাত্র যোগাযোগ নাই। এই দপ্তরটি লণ্ডনস্থ আল্ডউইচে (Aldwych) অবস্থিত।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের ৩০২ ধারায় উল্লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রপাল (Governor-General) তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহার বেতন ও চাকুরীর সর্তাবলী ইত্যাদি নির্ধারিত করিবেন। ভারতবর্ষ সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইলে হাইকমিশনার অফিস উঠাইয়া দেওয়া হইবে ও তৎস্থলে দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হাইকমিশনারের কাজ—হাইকমিশনার (১) রাষ্ট্রপালের নির্দেশানুযায়ী ভারতবর্ষের ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিবেন ও রাষ্ট্রপালের নির্দেশানুযায়ী চুক্তি করিতে পারিবেন। (২) রাষ্ট্রপালের অনুমোদন লইয়া প্রদেশসমূহের পক্ষ হইতেও অনুরূপ কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

ভারতীয় স্টোরস্ বিভাগ ও ভারতীয় ছাত্রবিভাগ বর্তমানে হাইকমিশনারের অধীনে আছে। ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনার (The Indian Trade Commissioner) ও তাঁহার কর্মচারীদের অন্যতম। দুঃস্থ ও বিপন্ন ভারতীয়দেরও তিনি দেখাশুনা করিতে পারেন।

কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের জন্যও হাইকমিশনার নিযুক্ত হইয়ছেন। পররাষ্ট্র বিভাগের অধীনে তাঁহারা কাজ করিয়া থাকেন।

অষ্টম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকারঃ বর্তমান আইনসভা

ইতিপূর্বে আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা কেন্দ্রীয় আইনসভা—ভারতীয় আইনসভা সম্পর্কে আলোচনা করিব।

ভারতীয় আইনসভা—বর্তমানে ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপাল ও গণপরিষদের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্র চালু না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে ইহা সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন। নূতন আইনসভা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গণপরিষদই আইন প্রণয়নের অধিকার ভোগ করিবে।

ভারতীয় গণপরিষদ—গঠনবিধি (Composition) —ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যদের অধিকাংশ প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কিছু অংশ দেশীয় রাজ্যগুলি দ্বারা মনোনীত বা নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয় গণপরিষদের মোট সভ্যসংখ্যা ৩০৭; তন্মধ্যে মাদ্রাজ ৪৯, বোম্বাই ২১, পশ্চিমবাংলা ২১, যুক্তপ্রদেশ ৫৫, পূর্বপঞ্জাব ১৬, বিহার ৩৬, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১৭, আসাম ৮, উড়িষ্যা ৯, দিল্লী ৯, আজমীর ১, কুর্গ ১, হিমাচল প্রদেশ ১, কচ্ছ ৯, মহীশূর ৭, ত্রিবাঙ্কুর ৬, বরোদা ৩, কোচিন ১, জয়পুর ৩, যোধপুর ২, বিকানীর ১, মধ্যভারত ৭, সৌরাষ্ট্র ৪, মৎস্য ২, রাজস্থান ৪, বিন্ধ্যপ্রদেশ ৪, পাতিয়ালা ও পূর্বপঞ্জাব ৩, জুনাগড় ১, কোলাপুর ১, ময়ূরভঞ্জ ১, সিকিম ও কুচবিহার ১, ত্রিপুরা ও মণিপুর ১, রামপুর ও বেনারস ১, কাশ্মীর ৪, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ১৩।

গণপরিষদের কার্য—গণপরিষদকে দুইটি কাজ করিতে হইয়াছে (১) ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনা (২) আইন প্রণয়ন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পুরাতন ভারত শাসন আইনে পুরাতন কেন্দ্রীয় আইন সভাকে যে সব ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, বর্তমানে গণপরিষদ সেইসব ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিতেছে। ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বের সঙ্গে ইহা পুরাতন আইন সভার আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত এবং শাসন সংক্রান্ত

ক্ষমতা গুলি ভোগ করিতেছে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নূতন আইনসভা ও কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হইলে পর গণপরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে।

সদস্যবৃন্দ ও শূন্য আসন—প্রত্যেক সদস্যকেই আসন গ্রহণের পূর্বে রেজিস্টার স্বাক্ষর করিতে হইবে। তিনি সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া পদত্যাগ করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে পদত্যাগী সদস্যের নির্বাচকমণ্ডলী একক পরিবর্তনশীল ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (by means of proportional representation by single transferable vote) অন্য একজন সদস্য নির্বাচিত করিবেন। ভারতীয় নাগরিক ব্যতীত অন্য কেহ এই পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

সভাপতি—গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ একজন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। তিনি গণপরিষদের অধিকার সমূহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন, গণপরিষদের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসাবে কাজ করিবেন ও ইহার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হইবেন। পরিষদের সদস্যপদ হারাইবার বা ছাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সভাপতিত্বও বাতিল হইয়া যাইবে। গণপরিষদের কর্মসচিবের মারফত সদস্যদের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া সভাপতি পদত্যাগ করিতে পারেন।

সহঃসভাপতিগণ—মোট পাঁচজন সহঃসভাপতির মধ্যে দুইজন সদস্যদের মধ্য হইতে পরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

কোন সহঃসভাপতি পদত্যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে নূতন সহঃসভাপতি নির্বাচন করা হইবে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে তৎমনোনীত কোন সহঃসভাপতি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। কোন সহঃসভাপতি উপস্থিত না থাকিলে সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভার কর্ম চালাইবার জন্য সভাপতি (Chairman) নির্বাচিত করিবেন।

গণপরিষদের কার্যালয়—গণপরিষদের কার্যালয়ে দুইটি শাখা আছে—দপ্তর-সংক্রান্ত শাখা (Administrative Branch) ও উপদেষ্টা শাখা (Advisory Branch) সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টাই উপদেষ্টা বিভাগের প্রধান কর্মসচিব। দপ্তরের ভার একজন সেক্রেটারীর হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

কার্যপদ্ধতি—গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে সেক্রেটারী আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের কাছে ইহার অনুলিপি প্রেরণ করিবেন। এই তালিকা "দিনের কার্যাবলী" বা ("Orders of the Day") নামে অভিহিত।

ভাষা—হিন্দি বা ইংরাজীই গণপরিষদের ভাষা। ইংরাজী ও হিন্দীতে কার্য বিবরণী লিপিবন্ধ করা হইয়া থাকে।

আইনসভার ক্ষমতা—বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে আইনসভাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী—এবং শাসন বিভাগ সম্পূর্ণভাবে ইহার অনুগত ও অধীন। আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া গঠিত এবং ইহার মধ্য দিয়া জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কাজেই আইনসভার এই সর্বময় ক্ষমতা বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে শাসনবিভাগ সরকারী চাকুরীয়াদের লইয়া গঠিত। জনসাধারণের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্যই ইহাদের নিয়োগ করা হয়। ইহারা জনসাধারণের বেতনভুক সেবক ছাড়া অন্য কিছু নহে। কাজেই শাসনবিভাগের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়।

কাজেই ঐ সব দেশে আইনসভা কেবলমাত্র আইনপ্রণয়নের অপ্রতিম্বন্দ্বী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নহে, আইনসভার হাতে শাসনবিভাগ ও ব্যয়বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণেরও ক্ষমতা রহিয়াছে।

(ক) গণপরিষদের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা—গণপরিষদকে নিম্নলিখিত ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—

(ক) ভারতের সমুদয় ব্যক্তি, যাবতীয় বিচারালয়, সকল স্থান ও বস্তুর জন্য;

(খ) ভারতের যে সব প্রজা ও কর্মচারী ভারতের অন্যান্য অংশে বাস করে (যথা—দেশীয় রাজ্য);

(গ) ভারতে ও ভারতের বাহিরে বাস করে এ রকম ভারতীয় প্রজা;

(ঘ) ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিগণ (তাঁহারা যেখানেই কাজে নিযুক্ত থাকুন না কেন);

(ঙ) ভারতে বর্তমানে যে সব আইন প্রচলিত আছে তাহাদের যে কোন একটিকে বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য অথবা ভারতীয় আইনসভা যে সব ব্যক্তি সম্পর্কে আইনপ্রণয়নে অধিকারী তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য আইন বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য।

আইনসভার আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার সীমা—রাষ্ট্রপালের পূর্বলব্ধ অনুমতি ব্যতীত আইনসভা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন বিল উত্থাপন করিলে তাহা বেআইনী (unlawful) হইবেঃ—(১) ভারতীয় রাজস্ব বা সরকারী ঋণ, (২) ভারতীয় প্রজাদের ধর্মাচরণের অধিকার বা ধর্ম, (৩) ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনীর কোন অংশবিশেষ অথবা ইহাদের শৃঙ্খলারক্ষা, (৪) বৈদেশিক সম্পর্ক, (৫) যে প্রাদেশিক বিষয় সম্পর্কে ভারতীয় আইনসভাকে

আইনপ্রণয়নের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই এমন কোন প্রাদেশিক বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ, (৬) প্রাদেশিক আইনসভার কোন আইন বাতিল বা সংশোধন।

(খ) অর্থসম্বন্ধীয় ক্ষমতা—প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশেই রাষ্ট্রের অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জনসাধারণই কর দেয়। সুতরাং কর দান, কর আদায় ও ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে তাহাদের সম্মতি প্রয়োজন। আইনসভায় প্রতিনিধিদের মারফৎ জনসাধারণ মতামত ব্যক্ত করে।

বাজেট—প্রত্যেক বৎসরের আয়ব্যয়ের একটা আনুমানিক হিসাব এক বিবৃতির আকারে আইনসভায় পেশ করা হয়। এই হিসাবকেই বাজেট বলে।

(১) **রাজস্ব**—প্রধানতঃ রাজস্বের বেশীর ভাগ অর্থই কর হইতে আসে। কর-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলির নাম অর্থ-বিল (Money Bill)। করভার প্রবর্তনের পূর্বে আইনসভায় বিল পাশ করিতে হয়।

(২) **ব্যয়**—বৃটেন অথবা ফ্রান্সের মত ভারতবর্ষেও রাজস্বের উপর দায়বন্ধ সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী আইনসভায় ভোটে দিতে হইবে। আইনসভা এই সব ব্যয়বরাদ্দ স্বীকার করিতে পারে, নামঞ্জুর করিতে পারে অথবা হ্রাস করিতে পারে।

(গ) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—স্বাধীন দেশগুলিতে আইনসভা শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। শাসনবিভাগের কর্মকর্তারা জনসাধারণের বেতনভুক সেবক মাত্র। সুতরাং জনসাধারণের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন না করিলে তাঁহাদের স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার নাই। আইনসভাই জনগণের প্রতিনিধি। সুতরাং আইন-সভার হাতে ইঁহাদের নিয়োগ বা পদচ্যুত করার অধিকার থাকা সংগত ও প্রয়োজনীয়।

ভাবতবর্ষে বৃটিশ আমলে আমলাতন্ত্রই সর্বেসর্বা মনে হইত। জনসেবকরা জনতার প্রভুর মত ব্যবহার করিতেন। নূতন অবস্থায় আইনসভা শাসনবিভাগের উপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। অবশ্য আমলাদের মধ্য হইতে এখনও পুরাতন প্রভু মনোভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই।

ভারত সরকার শাসনকার্যের জন্য ভারতীয় আইনসভার কাছে দায়ী। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় আইনসভার আস্থা হারাইলেই সরকারকে পদত্যাগ করিতে হয়।

নবম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনবিষয় বণ্টন

ভারতশাসন আইন—১৯১৯

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে ভারতবর্ষের সামরিক ও বেসামরিক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনার দায়িত্ব স-পরিষদ রাষ্ট্রপালের হাতে ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রপাল ইংলণ্ডের ভারতসচিবের নির্দেশমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। তখন ভারত সরকার এককেন্দ্রিক (unitary) হইলেও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসনক্ষমতা ও দায়িত্ব বণ্টন করা হইয়াছিল। দেশরক্ষা, ডাক ও তারবিভাগ, মুদ্রা, শুল্ক, দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি সর্বভারতীয় স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, আইন ও শৃংখলারক্ষা ইত্যাদি বিভাগগুলি পরিচালনা করিতেন। অবশ্য প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কার্য পরিচালনা করিতে হইত।

১৯৩৫—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের সংগে সংগে পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধীয় বিষয়তালিকা সুস্পষ্টভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। স্থির হয় যে, (১) কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা; (২) কতকগুলি সম্পর্কে কেবল প্রাদেশিক আইনসভা; (৩) কতকগুলি সম্পর্কে উভয় আইনসভা আইনপ্রণয়ন করিতে পারিবেন। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal list), প্রাদেশিক (Provincial list), ও সমানাধিকার তালিকা (Concurrent list) প্রস্তুত করা হয়।

১৯৩৫ সালের আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ ভারতীয় জনমতের প্রবল বিরোধিতার ফলে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

নূতন শাসনতন্ত্রে বিষয় বিভাগ—নূতন শাসনতন্ত্রে বিষয় বিভাগ এইভাবে করা হইয়াছেঃ

Union or Federal Subjects

কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার

থাকিবে। এই সব বিষয়ে যোগদানকারী রাষ্ট্রের আইনসভার আইনপ্রণয়নের কোন অধিকার থাকিবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়তালিকা নিম্নলিখিতঃ

(১) সামরিকবিভাগ (দেশরক্ষাব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনী সহ);

(২) পররাষ্ট্র বা বৈদেশিকবিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, দূত-বিনিময়, বাণিজ্য প্রতিনিধিত্ব, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান;

(৩) যাজকীয় বিষয়;

(৪) মুদ্রাপ্রচলন ও প্রস্তুত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া;

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সরকারী ঋণ, পেন্সন;

(৬) ডাক ও তারবিভাগ, রেলপথ, জলপথ, পোত, বড় বড় বন্দর ও আলোক-স্তম্ভ;

(৭) বিদেশী বাণিজ্য, ভারতে স্থায়ী বসবাসের জন্য আগত বিদেশী;

(৮) আদমসুমারি, তথ্যবিভাগ, সার্ভে, কেন্দ্রীয় যাদুঘর ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহ:

(৯) ব্যাংকব্যবসায়, বীমা, চেক, নোট ও বিল অব্ এক্সচেঞ্জ;

(১০) যৌথ কারবার ও তাহার উপর কর;

(১১) কাশী, আলিগড় ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিশ্ববিদ্যালয়;

(১২) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মচারী নিয়োগ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন;

(১৩) কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন, পেটেণ্ট স্বত্ব ও ট্রেড মার্ক;

(১৪) পেট্রোলিয়াম, লবণ ও আফিম;

(১৫) ভারতীয় আইনসভার নির্বাচন;

(১৬) সর্বোচ্চ বিচারালয়;

(১৭) ভারতীয় আইনসভার সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন।

State or Provincial Subjects

রাষ্ট্রীয় তালিকা—কেবলমাত্র যোগদানকারী রাষ্ট্রের আইনসভা নিম্নোক্ত রাষ্ট্রীয় আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনপ্রণয়ন করিতে পারিবে

এবং রাষ্ট্র বা তাহার অংশবিশেষে এই আইন বলবৎ হইতে পারিবে। উল্লিখিত বিষয়-তালিকা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আইনপ্রণয়নের কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

(১) আইন ও শৃঙ্খলা;
(২) সর্বোচ্চ আদালত ব্যতীত অন্য সমস্ত বিচারালয় ও বিচার;
(৩) জেলখানা;
(৪) হাসপাতাল, আরোগ্যাগার ইত্যাদি জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ;
(৫) প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্মচারী নিয়োগ ও প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশন;
(৬) প্রাদেশিক পূর্ত বিভাগ;
(৭) প্রদেশের অর্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার ও যাদুঘর;
(৮) রাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচন;
(৯) জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থা;
(১০) শিক্ষা;
(১১) স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা;
(১২) কৃষি;
(১৩) বন;
(১৪) খনি;
(১৫) মৎস্যোন্নয়ন;
(১৬) দরিদ্রদের সাহায্য ও বেকার;
(১৭) সমবায় সমিতি;
(১৮) বাজী ও জুয়া;
(১৯) প্রাদেশিক তথ্যবিভাগ;
(২০) ভূমিরাজস্ব;
(২১) কৃষিআয়ের উপর কর-নির্ধারণ;
(২২) জমি, মৃত্যু ও উত্তরাধিকার কর;
(২৩) মাথাপিছু কর
(২৪) ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির উপর কর;

(২৫) ভোজ, আমোদপ্রমোদ, বাজী, জুয়া ও বিলাসদ্রব্যের উপর কর;

(২৬) গ্যাস ইত্যাদি।

Concurrent List of Subjects

সমানাধিকার তালিকা—নিম্নলিখিত সমানাধিকার তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও যোগদানকারী রাষ্ট্রের আইনসভা উভয়েরই আইনপ্রণয়নের অধিকার থাকিবেঃ

প্রথম অংশ

(১) ফৌজদারী আইন ও কার্যবিধি;

(২) দেওয়ানী কার্যবিধি;

(৩) সাক্ষ্য ও শপথ;

(৪) বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ;

(৫) চুক্তি;

(৬) দেউলিয়া অবস্থা বা ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য;

(৭) ছাপাখানা;

(৮) আইন, চিকিৎসা ও অন্যান্য পেশা;

(৯) বিষাক্ত ও বিপজ্জনক ঔষধপত্র।

দ্বিতীয় অংশ

(১০) স্বাস্থ্যবীমা;

(১১) বার্ধক্যের পেন্সন;

(১২) কারখানা আইন;

(১৩) শ্রমিককল্যাণ;

(১৪) শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিকমালিক-বিরোধ;

(১৫) বিদ্যুৎ;

(১৬) চলচ্চিত্র অনুমোদন;

(১৭) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা।

স্বাভাবিক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা যুদ্ধজনিত কারণ

হইতে সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেও আইন করিতে পারিবে।

অবশিষ্ট ক্ষমতা—তালিকায় উল্লেখ করা হয় নাই এরূপ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার তালিকাভুক্ত হইবে।

সমানাধিকার তালিকা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার আইনের মধ্যে অসংগতি দেখা দিলে প্রাদেশিক আইন বাতিল হইয়া যাইবে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ থাকিবে।

দশম অধ্যায়

প্রদেশসমূহ

পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ভারতের শাসনক্ষমতাভোগী ছিলেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রত্যেক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল।

মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রদেশগুলিকে ভিত্তি করিয়াই এ দেশে দায়িত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হইলে আইনপ্রণয়ন, শাসনসংক্রান্ত ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যথাসম্ভব বেশী স্বাধীনতা দিতে হয়। এইরূপ আত্মকর্তৃত্ব লাভকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যুক্তি—(১) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রদেশের অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও জাতিগত (racial) সংস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) ক্রমবর্ধমান প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ এই দাবীকে শক্তিশালী করিতেছে।

(৩) বর্তমানে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশসমূহ গঠিত হইতেছে। বাঙালী, পঞ্জাবী, অহমিয়া প্রত্যেকটি জাতিই স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে।

বর্তমান প্রদেশসমূহ

প্রদেশ	মন্ত্রিসভা	পরিষদের আসনসংখ্যা	প্রধানমন্ত্রী
আসাম	কংগ্রেস	৬৮	শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ
পশ্চিমবঙ্গ	কংগ্রেস	৮৪	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
বিহার	কংগ্রেস	১৫২	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ
বোম্বাই	কংগ্রেস	১৭২	শ্রী বি জি খের
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	কংগ্রেস	১১১	শ্রীরবিশঙ্কর শুক্ল
মাদ্রাজ	কংগ্রেস	২১২	শ্রী ও পি আর রেড্ডী
উড়িষ্যা	কংগ্রেস	৬০	শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতব
পূর্বপঞ্জাব	কংগ্রেস	৭৫	শ্রীভীমসেন সাচার
যুক্তপ্রদেশ	কংগ্রেস	২২৬	শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ

পাকিস্তান—পাকিস্তানে প্রদেশপালশাসিত প্রদেশ ৪টি—পূর্ববঙ্গ, সিন্ধু, পশ্চিমপঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ। কেবলমাত্র বেলুচিস্থানই চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ।

একাদশ অধ্যায়

বর্তমান প্রাদেশিক সরকারঃ শাসনবিভাগ

প্রদেশপাল—অস্থায়ী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী (ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭) ইংলণ্ডের রাজা ভারত সরকারের পরামর্শক্রমে প্রদেশপাল নিয়োগ করিতেন।

প্রদেশপালই প্রদেশের সর্বপ্রধান শাসনকর্তা (Chief executive)। নিয়োগকালে তাঁহার কার্যপরিচালনা সম্পর্কে একটি নির্দেশপত্র (Instrument of Instructions) দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে চলিতে হয়। তিনি প্রদেশের এড্‌ভোকেট জেনারেল (Advocate-General) নিয়োগ করিয়া থাকেন।

পুরাতন শাসনতন্ত্রে তিনি বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনকার্যের প্রকৃতপক্ষে সর্বময় কর্তা ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা ব্যতীত আর কিছু নহেন।

মন্ত্রিসভা—শাসনকার্যে প্রদেশপালকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। মন্ত্রীদের সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই।

প্রদেশপাল নিজ বিবেচনা অনুযায়ী আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া থাকেন। কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হইলে তাঁহাকে ৬ মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে।

প্রদেশপাল ও মন্ত্রিসভার সম্পর্ক—প্রাদেশিক সরকার প্রদেশপালের নামে মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। সর্বক্ষেত্রেই প্রদেশপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা-রূপে কাজ করিবেন।

মন্ত্রীরাই প্রকৃত শাসনকর্তা এবং আইনসভার কাছে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। সাধারণতঃ প্রত্যেক মন্ত্রী স্ব স্ব দপ্তরের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদেশপাল ইংলণ্ডের রাজার মত নিয়মতান্ত্রিক প্রদেশপাল থাকিবেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দিবেন।

মন্ত্রিমণ্ডলী ও আইনসভা—নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রদেশপাল মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। আইনসভার সদস্য নহেন এমন কোন ব্যক্তি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে ৬ মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে।

প্রদেশপাল আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন। মন্ত্রিসভার কার্যকাল আইনতঃ প্রদেশপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আইনসভার আস্থা হারাইলেই মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতির জন্য সমষ্টিগতভাবে আইনসভার কাছে দায়ী ও আইনসভারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

আইনসভার আইন অনুযায়ী মন্ত্রীদের বেতন নির্ধারিত হয় ও মন্ত্রীদের কার্যকালে ইহার পরিবর্তন হয় না। প্রাদেশিক শাসনের জন্য মন্ত্রীদের দায়িত্বকে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব (ministerial responsibility) বলে।

নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব কতটুকু প্রবর্তন করা হইতেছে?

প্রদেশসমূহে সরকারী নীতি ও শাসনের জন্য মন্ত্রীরা দায়ী থাকিবেন। আইন-শৃঙ্খলা সহ শাসনবিভাগ সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রদেশপালের ক্ষমতা

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—সরকারের সমস্ত কার্য প্রদেশপালের নামে পরিচালনা করা হইবে বটে কিন্তু কার্যতঃ মন্ত্রীরাই সমস্ত কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা—

(ক) **অর্ডিন্যান্স** (Ordinance)—আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রদেশপাল অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৬ সপ্তাহ পরে এরূপ অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যাইবে। আইনসভা এইপ্রকার অর্ডিন্যান্স তৎপূর্বেই বাতিল করিয়া দিতে পারেন। প্রধানতঃ মন্ত্রীরাই এইরূপ অর্ডিন্যান্সের জন্য দায়ী থাকিবেন। কারণ প্রদেশপাল তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারেই অর্ডিন্যান্স জারি করিবেন।

(খ) **ভেটো** (Veto)—প্রদেশপাল আইনসভার সমর্থিত কোন বিল অনুমোদন করিতে বা না করিতে পারেন অথবা বিলটি রাষ্ট্রপালের বিবেচনার জন্য রাখিতে পারেন। বিল নামঞ্জুর করাকে ভেটো (Veto) বলা হয়। প্রদেশপালের বিল নামঞ্জুর করার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে।

আশা করা যায় কোনদিন প্রদেশপাল এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না। কেননা তাহা হইলে প্রদেশপালের সহিত প্রদেশে নির্বাচিত আইন-সভার বিরোধ হইতে পারে। সেই বিরোধ গণতন্ত্রে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং সেই বিরোধের সমাধান একমাত্র এইভাবেই সম্ভব যে আইনসভায় অনুমোদিত বা সমর্থিত প্রস্তাব বা বিল প্রদেশপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে গ্রহণ করিবেন—নামঞ্জুর করিবেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য সময় লইতে পারেন, কিন্তু নামঞ্জুর করিলে গণতেন্ত্রর বিরোধিতা করা হয়।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা—প্রদেশপালের নামে প্রাদেশিক আইনসভায় সরকারী তহবিল হইতে অর্থব্যয়ের দাবী উপস্থিত করা হইবে—দাবী মঞ্জুরী, নামঞ্জুর বা হ্রাস করার ক্ষমতা আইনসভার থাকিবে। কিন্তু প্রদেশপালই অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। আইনসভা বাজেট পাশ করিলে প্রদেশপাল তাঁহার অনুমোদন জ্ঞাপন করিবেন।

নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদেশপাল—গণপরিষদ রচিত নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদেশপাল রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হইবেন। শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল তিনি প্রদেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন কিম্বা প্রাদেশিক আইনসভা রচিত চারিটি নামের এক তালিকা হইতে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

নব-শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি সরাসরি মনোনীত হইবেন—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের কোন্ ব্যবস্থা নাই।

প্রাদেশিক শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহে গণপরিষদ এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। যদি প্রদেশে মন্ত্রীদের শাসনে শাসনতান্ত্রিক সংকটের উদ্ভব হয় বা শাসনব্যবস্থায় কোন গুরুতর ত্রুটি বা প্রমাদ ঘটে যাহাতে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন রাষ্ট্রপাল শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নিজ হাতে সাময়িক-ভাবে লইবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বর্তমান প্রাদেশিক সরকারঃ আইনবিভাগ

প্রাদেশিক আইনসভা—প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশপাল ও ব্যবস্থাপরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে প্রদেশপাল এবং ব্যবস্থাপকসভা (the Legislative Council) ও ব্যবস্থাপরিষদ (the Legislative Assembly) এই দুইটি পরিষদ লইয়া আইনসভা গঠিত।

প্রাদেশিক আইনসভার গঠন—মন্ত্রিবৃন্দ সহ প্রাদেশিক আইনসভা সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। উচ্চ পরিষদের অল্পসংখ্যক সদস্য প্রদেশপাল কর্তৃক মনোনীত হন। তাহা ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই নির্বাচিত সদস্য।

ব্যবস্থাপরিষদের আসনসংখ্যা যুক্তপ্রদেশে ২২৬, মাদ্রাজে ২১২, রোম্বাইয়ে ১৭২, পশ্চিমবঙ্গে ৮৪, পূর্বপঞ্জাবে ৭৪, বিহারে ১৫০, মধ্যপ্রদেশে ১১১, আসামে ৬৮।

নির্বাচকমণ্ডলী—১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে শতকরা মাত্র ১৪ জন বা সাড়ে তিন কোটি লোকের ভোটাধিকার আছে। এই ভোটাধিকার সম্পত্তি, করদানের ক্ষমতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হইয়াছে। জনপ্রিয় সরকারকে 'প্রকৃত' জনপ্রিয় করিতে হইলে ভোটাধিকার যথাসম্ভব ব্যাপকতর হওয়া প্রয়োজন। নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে।

নির্বাচকমণ্ডলীকে সাধারণ নির্বাচন-কেন্দ্র ও বিশেষ নির্বাচন-কেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচন-কেন্দ্রের (অনুন্নত জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন সহ) ভোটদাতা প্রধানতঃ হিন্দু। মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টান—এই সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকের জন্য বিশেষ নির্বাচন-কেন্দ্র রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বাণিজ্য, শিল্প, খনি, চা-কর, জমিদার প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক, মহিলাদের জন্যও আসন সংরক্ষিত রহিয়াছে।

আইনসভার আয়ু ও অধিবেশন—প্রত্যেক ব্যবস্থাপরিষদের জীবনকালই ৫ বৎসর। তবে প্রদেশপাল ইচ্ছা করিলে আরও আগেই ব্যবস্থাপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

বৎসরে অন্ততঃ একবার ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশন হইবে। প্রদেশপাল ইচ্ছামত আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে, স্থগিত রাখিতে এবং ব্যবস্থাপরিষদ

আসন তালিকা

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
		সাধারণ আসন											মহিলাদের আসন				
প্রদেশ	মোট আসন সংখ্যা	মোট সাধারণ আসন	সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত সাধারণ আসন	অনুন্নত অঞ্চল ও জাতিগুলির জন্য সংরক্ষিত আসন	শিখ	মুসলমান	এ্যাংলোইণ্ডিয়ান	ভারতীয় খ্রীষ্টান	শিল্প, বাণিজ্য, খনি ও চা-কর	জমিদার	বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রমিক	সাধারণ	শিখ	মুসলমান	এ্যাংলোইণ্ডিয়ান	ভারতীয় খ্রীষ্টান
মাদ্রাজ	২১২	১৪৬	৮০	১	—	২৮	২	৮	৬	৬	১	৬	৬	—	১	—	১
বোম্বাই	১৭২	১১৪	১৫	১	—	২৯	২	৩	৭	২	১	৭	৫	—	১	—	—
যুক্তপ্রদেশ	২২৬	১৪০	২০	—	—	৬৪	১	২	৩	৬	১	৩	৪	—	২	—	—
বিহার	১৫০	৮৬	১৫	৭	—	৩৯	১	১	৪	৪	১	৩	৩	—	১	—	—
মধ্যপ্রদেশ	১১১	৮৪	২০	১	—	১৪	১	—	২	৮	১	২	৩	—	—	—	—
পশ্চিমবঙ্গ	৮৪	৪১	১৪	—	—	১৮	৩	১	৭	২	১	৮	১	—	১	১	—
পূর্ব্ব পাঞ্জাব	৭৫	৮০	৬	—	১৭	২১	—	—	১	২	১	২	—	১	—	—	—
আসাম	৬৮	৩৫	৪	৯	—	১৫	—	১	৪	—	—	৩	১	—	—	—	—
উড়িষ্যা	৬০	৪৪	৬	৫	—	৪	—	১	১	২	—	১	২	—	—	—	—

আসন তালিকা

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা

১	২		৩	৪	৫	৬	৭	
প্রদেশ	মোট আসন সংখ্যা		সাধারণ আসন	মুসলমান আসন	ভারতীয় খ্রীষ্টান	ব্যবস্থাপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যের আসন	প্রদেশপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্যের আসন	
মাদ্রাজ	অন্যূন	৫৩	৩৫	৭	৩	—	অন্যূন	৮
	অনধিক	৫৫					অনধিক	১০
বোম্বাই	অন্যূন	২৮	২০	৫	—	—	অন্যূন	৩
	অনধিক	২৯					অনধিক	৪
যুক্তপ্রদেশ	অন্যূন	৫৭	৩৪	১৭	—		অন্যূন	৬
	অনধিক	৫৯					অনধিক	৮
বিহার	অন্যূন	২৮	৯	৪	—	১২	অন্যূন	৩
	অনধিক	২৯					অনধিক	৪

ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি আইনসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন—প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদ সভ্যদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্বাচন করেন। তাঁহাকে স্পীকার বলা হয়। আইনসভা আইন দ্বারা তাঁহার বেতন নির্ধারণ করেন। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্যনির্বাহের জন্য সদস্যদের মধ্য হইতে একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয়।

কোরাম—মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-ষষ্ঠাংশ উপস্থিত হইলেই পরিষদের 'কোরাম' গঠিত হয় ও সভার কার্য চলিতে পারে।

আনুগত্যের শপথ গ্রহণ—প্রত্যেক সদস্যকেই আসন গ্রহণের পূর্বে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। কোন সদস্য কোন কারণে অযোগ্য* বলিয়া প্রমাণিত হইলে বা পদত্যাগ করিলে তাহার আসন শূন্য হয়।

সভ্যদের সুযোগ-সুবিধা—বাক্‌স্বাধীনতা, পরিষদের অনুমোদনক্রমে কাগজপত্র প্রকাশ, আইনসভায় সাক্ষী আহ্বান করার স্বাধীনতা সদস্যরা ভোগ করিয়া থাকেন।

আইনসভার গঠন—এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ২২২-২২৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

আইনসভার ক্ষমতা—

(ক) আইনসংক্রান্ত—প্রত্যেক প্রদেশের নিম্নপরিষদেরই অর্থসম্বন্ধীয় বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল উত্থাপন করিবার ও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। আইন-সভায় গৃহীত না হইলে কোন বিল পাশ হইতে পারে না।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক ও সমানাধিকার তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা আইন প্রণয়নের অধিকার পাইয়াছে। সমানাধিকার তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় গৃহীত বিল বা আইনের বিরোধী হইলে প্রাদেশিক বিল বা আইন বাতিল হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রপালের নির্দেশানুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা আইন প্রণয়ন সম্পর্কে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residual powers) প্রয়োগ করিতে পারেন।

---

* **অযোগ্যতা**—(১) মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন বেতনভুক সরকারী পদে অধিষ্ঠিত, (২) উন্মাদ, (৩)দেউলিয়া, (৪) ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী, (৫) নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিবৃন্দ সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইবেন।

ভারতের শাসনতন্ত্র, ভারতীয় আইনসভায় গৃহীত আইন, রাষ্ট্রপালের কোন অর্ডিন্যান্স, রাষ্ট্রপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী বা সৈন্য-বাহিনী সম্বন্ধীয় আইন সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা পূর্বাহ্নে রাষ্ট্রপালের অনুমোদন না লইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না।

বিল কি ভাবে আইনে পরিণত হয়—কেন্দ্রীয় আইনসভায় কি ভাবে বিল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আইনে পরিণত হয়, ইতিপূর্বে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। প্রাদেশিক আইনসভায়ও অনুরূপভাবে বিল আইনে পরিণত হয়।

প্রদেশপাল আইনসভায় গৃহীত কোন বিল অনুমোদন করিতে বা না করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপালের বিবেচনার জন্য রাখিয়া দিতে পারেন। তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে আইনসভার কাছে ফেরৎ পাঠাইতে পারেন।

(খ) অর্থ সম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা—অর্থসম্বন্ধীয় বিল একমাত্র সরকারপক্ষ হইতেই উত্থাপন করা চলে। প্রদেশপালের অনুমোদন ব্যতীত কোন অর্থ-সম্বন্ধীয় বিল উত্থাপন করা চলে না। ব্যয়বরাদ্দের ব্যাপারে রাষ্ট্রসভা বা উচ্চ-পরিষদের কোন হাত নাই। ব্যয়সম্পর্কিত সমস্ত প্রস্তাব ব্যয়বরাদ্দের দাবীর আকারে প্রদেশপালের অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপরিষদে উত্থাপন করা হইবে। ব্যবস্থাপরিষদ যে কোন ব্যয়সম্পর্কিত দাবী মঞ্জুর করিতে, বাতিল করিতে বা হ্রাস করিতে পারেন।

বাজেট— প্রদেশপাল বার্ষিক আয় ও ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত এক বিবৃতি ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপত করিবেন। ইহাকে বার্ষিক অর্থসম্বন্ধীয় বিবৃতি (annual financial statement) কহে। উহাতে (ক) প্রদেশপাল, মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, প্রদেশের ঋণ, শাসন প্রভৃতির ব্যয় রাজস্বের উপর দায়বন্ধ করা হইবে, (খ) অন্যান্য ব্যয়ের প্রস্তাবও পৃথকভাবে দেখান হইবে, (গ) রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয়কে অন্যান্য ব্যয় হইতে পৃথক করিয়া দেখান হইবে।

বাজেট বক্তৃতা—ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট উত্থাপন করিবার সময় অর্থ-সচিব বাজেটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা দিবেন। তৎপর সদস্যরা বাজেট সম্পর্কে ১৫ দিনের আলোচনা ও ভোটদান করিবেন। কোন একটি বিশেষ ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে দুইদিনের বেশী বিতর্ক হইবে না।

প্রদেশের রাজস্বের উপর দায়বন্ধ ব্যয় সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের কেবলমাত্র বিতর্কের অধিকারই আছে। কিন্তু ভোটদানের অধিকার নাই। অন্যান্য ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে পরিষদ আলোচনা ও ভোটদান করিবে। উচ্চপরিষদের কেবলমাত্র আলোচনা করার অধিকার আছে।

পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়ের তপশীল প্রদেশপাল কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলেই বিধিসঙ্গত বলিয়া পরিগণ্য হইবে।

(গ) **শাসন-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা**—মন্ত্রিসভা শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। আইনসভা কোন মন্ত্রীর কার্য বা মন্ত্রিসভার শাসননীতি অনুমোদন না করিলে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জিলার শাসনব্যবস্থা

একটি প্রদেশকে কয়েকটি বিভাগে (division) ভাগ করা হয়। এইরূপ বিভাগের শাসনকর্তাকে কমিশনার (Commissioner) বলে। আবার প্রত্যেকটি বিভাগকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি জেলায় একজন জেলা-শাসনকর্তা (District Officer) থাকেন। প্রত্যেক জেলাকে আবার কয়েকটি মহকুমায় (sub-division) ভাগ করা হয়।

কমিশনার—কমিশনার স্বীয় বিভাগে রাজস্ব আদায়কারী অফিসার ও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভূত কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁহার কোন বিচারক্ষমতা নাই। রাজস্বসংক্রান্ত মামলায় তিনি আপীল-আদালতের (court of appeal) মত কাজ করেন। জেলার কালেক্টরদের তিনি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। প্রাদেশিক সরকার ও জেলাকর্তৃপক্ষের মধ্যে তিনিই যোগসূত্র। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের উপরও তিনি অনেক কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

জেলার শাসনকর্তা—জেলার শাসনকর্তার নাম কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। রেগুলেশনবহির্ভূত অঞ্চলে তাঁহাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। কালেক্টর হিসাবে তিনি জেলার রাজস্বসংগ্রহ বিভাগের প্রধান কর্তা। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁহার কর্তব্য ফৌজদারী আদালতের ব্যাপারাদি পরিদর্শন ও পুলিশের কার্য পরিচালনা। জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার তিনিই কর্তা। তাঁহাকে সমাহর্তা বলা হয়।

জেলার খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় কালেক্টরের নখদর্পণে থাকে। তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে তিনি জেলার সমস্ত অঞ্চলেব সংবাদ সংগ্রহ করেন।

এতদিন তিনি জেলায় প্রাদেশিক সরকারের সর্বময় প্রতিনিধি ছিলেন। পুলিশ, জেল, হাসপাতাল, স্কুলবোর্ড, স্কুল, কলেজ, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, লোক্যালবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল।

রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও রেজিস্ট্রেশন, ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত ব্যাপার, ঋণগ্রস্ত জমিদারীর ব্যবস্থা, চাষীদের ঋণদান, সালিশী, দুর্ভিক্ষকালীন সাহায্য ইত্যাদি তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

জেলার প্রধান সহরে কালেক্টরের অফিস থাকে। জেলার বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্তাদের অফিসও এইখানেই। জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক্সিকিউটিভ

ইঞ্জিনীয়ার, সিভিল সার্জন, জেলার জেলব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও তিনি অল্পবিস্তর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

নূতন শাসনতন্ত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই সর্বময় কর্তৃত্ব অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে। বর্তমানে আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই জনগণের অভাব অভিযোগ সরকারের কর্ণগোচর করিয়া থাকেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলার সর্বময় কর্তা। তিনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী। কাজেই কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত হইলে তিনিই তজ্জন্য দায়ী। আবার তাঁহারই অধীনস্থ বিচারকারী অথবা তিনি নিজে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করেন। সুতরাং এই ব্যবস্থায় ন্যায়ের মর্যাদা পদদলিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কখনও কোনদেশে অভিযোগকারী বিচারকের আসন গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা গণতন্ত্রের নীতিবিরোধী। সুতরাং বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগকে পৃথক করার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্দশ অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য

রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—বৃটিশ ভারত এবং ভারতীয় ভারত।

বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষকে বৃটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজন্যবর্গশাসিত ভারতীয় ভারত বলা হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বৃটিশ সরকার ছলে, বলে, কৌশলে প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যের উপর কার্যতঃ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। 'বাধ্যতামূলক মৈত্রী'র ভিতর দিয়া ইংরাজ সরকার দেশীয় রাজ্যের শাসকবর্গের সহিত মিলিয়া ভারতের এক বিরাট অংশে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন চালাইয়া যায় এবং এইভাবে ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া রাখে। বৃটিশ আমলে দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ নামমাত্র শাসক ছিলেন, কার্যতঃ বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্টই ছিলেন প্রত্যেকটি রাজ্যের কর্তা।

১৫ই আগস্টের পর—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগে সংগে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বৃটিশ সরকারের সর্বময় প্রভুত্বের (paramountcy) অবসান হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল—(১) নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, (২) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তান যে কোন একটিতে যোগদান করা। ভারত সরকারের সম্মুখে ৫৬৬টি দেশীয় রাজ্যের বহুমুখী সমস্যা দেখা দেয়। এই সব দেশীয় রাজ্যকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ভারতবাসীর বহু দিনের লক্ষ্য। দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ ইহার জন্যই মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কয়েকটি দেশীয় রাজ্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। ভারতের শেষ ইংরাজ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল"।

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইবার পূর্বেই দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ও নূতনভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

আয়তন এবং জনসংখ্যা—দেশীয় রাজ্যগুলির মোট সংখ্যা ছিল ৫৬৬; ইহাদের মোট আয়তন সমগ্র ভারতের শতকরা ৪০ ভাগ; ইহাদের মোট জনসংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ ছিল।

অন্তর্ভুক্তি—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বর্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলির কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবেঃ—

স্বতন্ত্রভাবে যোগদানকারী রাজ্য	**অস্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত**	**কেন্দ্রের শাসনাধীন§**	**বিভিন্ন রাজ্য লইয়া গঠিত ইউনিয়ন বা রাজ্যমণ্ডল**
(ক) *কাশ্মীর, মহীশূর, মণিপুর, ত্রিপুরা, খাসিয়া পাহাড় (খ) †বরোদা, জুনাগড়, কোলাপুর, বিকানীর ইত্যাদি	হায়দ্রাবাদ‡	হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, ভোপাল, বিলাসপুর, বারাণসী, কুচবিহার	(১) পূর্বপঞ্জাব ও পাতিয়ালা (২) বৃহত্তর রাজস্থান¶ (৩) বিন্ধ্যপ্রদেশ (৪) মধ্যভারত (৫) সৌরাষ্ট্র (৬) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন

উপরোক্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত সরকার অতি দ্রুত কি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বৃটিশ সরকারের মুখপাত্ররাই প্রায়ই গর্ব করিয়া প্রচার করিতেন, দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে সমগ্র দেশের সর্বনাশ হইবে। সেই উক্তি আজ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

---

* কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (UNO) ভারত ও পাকিস্তানের জন্য জাতিপুঞ্জের কমিশন (UNCIP) নামে একটি কমিশন প্রেরণ করেন। নীতিগতভাবে ভারত ও পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরে গণভোটের নীতি মানিয়া লইয়াছেন। কমিশনের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন সর্বসম্মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা হয় নাই।

† অনেক দেশীয় রাজ্যই স্বতন্ত্রভাবে যোগদান করে; কিন্তু পরে সন্নিহিত প্রদেশে বা কোন রাজ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

‡ হায়দ্রাবাদে অস্থায়ী সামরিক সরকার ভোটারতালিকা প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ভারত সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত গণপরিষদ গঠিত হইবে ও গণপরিষদ হায়দ্রাবাদের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

§ কেন্দ্রের শাসনাধীন প্রদেশসমূহ শীঘ্রই দিল্লীর মত চীফ কমিশনারশাসিত প্রদেশে পরিণত হইবে।

¶ ১৯৪৮ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে গঠিত মৎস্য এবং রাজস্থান রাজ্যমণ্ডলদ্বয় বৃহত্তর রাজস্থান—রাজ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মোট ২১৪টি দেশীয় রাজ্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের আয়তন ১,০৬,০৮৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৭৫ লক্ষ।

২৫টি দেশীয় রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আসিয়াছে। ইহাদের আয়তন ২৭,৩২৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৮ লক্ষ।

৩০৪টি দেশীয় রাজ্য ৬টি রাজ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের আয়তন ২,৩৬,৩৬০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৭৬ লক্ষ।

শাসনপদ্ধতি—দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া অগ্রগামী ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ, বরোদা, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানীর ও জয়পুরের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল।

অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তিত ছিল। অনেক রাজ্যের শাসকবর্গ অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহারা প্রজার মঙ্গল সাধনের পরিবর্তে রাজস্বকে নিজেদের বিলাসভূষণ ও আড়ম্বরকার্যে ব্যয় করিতেন। যতদিন তাঁহারা বৃটিশ সরকারের অনুগত থাকিতেন, ততদিন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে বৃটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। অবশ্য মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি কয়েকটি সুশাসিত রাজ্যও ছিল। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী, বরোদা রাজ্যে বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজেও অগ্রসর হইয়াছেন। যে সব দেশীয় রাজ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলিতে প্রদেশের গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যসমূহের শাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় আইনসভা দায়ী।

বিভিন্ন রাজ্যমণ্ডল ও স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের জন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদের ৭ জন সদস্য লইয়া শ্রীযুক্ত বি এন রাওয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রদেশসমূহের মর্যাদা ও দায়িত্বই দেশীয় রাজ্যসমূহের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার পর প্রদেশ, স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্য ও রাজ্যমণ্ডলের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। প্রদেশের মত ইহারাও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সমমর্যাদাসম্পন্ন 'রাষ্ট্র' বা ইউনিট বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা—বর্তমানে কাশ্মীর, মহীশূর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের 'রাজা' বা 'নবাব'রা নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে কাজ করেন।

প্রত্যেক রাজ্যমণ্ডলে একজন রাজপ্রমুখ এবং উপরাজপ্রমুখ রহিয়াছেন। ইঁহারা আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

সর্বাঙ্গীন প্রগতি—বর্তমানে অন্তর্ভুক্তির কার্য সমাপ্তপ্রায়। ভারতের মানচিত্র নূতনভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলিতে সম্পদবৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও মহীশূর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একক রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে। অন্যগুলি প্রদেশ বা রাজ্যমণ্ডলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' ওঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইংগিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজস্থান।
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তা'রে তৃণসম দহে।"

"ন্যায়দণ্ড"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্দশ অধ্যায়

বিচার বিভাগ

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে শাসকবর্গ কোনদিন সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা চিন্তা করেন নাই। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য ইংরাজী আইন অনুসারে বিচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টে বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েকটি বিধান ছিল। ঐ বৎসর বাঙ্গলায় একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন বিচারপতিকে লইয়া একটি সর্বোচ্চ আদালত স্থাপিত হয়। ১৮৩১ সালে মান্দ্রাজে ও ১৮০৩ সালে বোম্বাইয়েও অনুরূপ আদালত স্থাপন করা হয়। ফৌজদারী মামলার বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে কার্যবিধি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে লিপিবদ্ধ করা আছে। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন পরে প্রণয়ন করা হয়। দেওয়ানী মামলার বিচারপদ্ধতি এই আইনে আছে। এই সব আইন যাহাতে অচল ও অব্যবহার্য না হইয়া যায়, সেজন্য মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। আরও অনেক আইন, নিয়মকানুন, রায় ও নজির অবলম্বন করিয়া বিচারব্যবস্থা চলে। ইয়োরোপীয়দের জন্য প্রধানতঃ ইংরাজী আইন প্রচলিত ছিল। এদেশের বিচারপদ্ধতি হিন্দু ও মুসলমান আইনের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, শাসনবিভাগের কাজ ও বিচার বিভাগের কাজ অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটদের সাথে পুলিশের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বৃটেনের প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত কমিটি ভারতের

বিচার ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণ-তন্ত্র হইলে পর ইহার অবসান ঘটিবে।

সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট

নব শাসনতন্ত্রে ভারতে একটি সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ও আরও কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়া সর্বোচ্চ আদালত গঠিত হইবে। মোট কতজন বিচারপতি থাকিবেন, তাহা ভারতীয় আইনসভায় আইন দ্বারা স্থির করা হইবে। তবে প্রধান বিচারপতি বাদে তাঁহাদের সংখ্যা ৭ জনের কম হইবে না।

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের সাথে পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করিবন। বিচারপতিরা ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিবেন।

সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি যিনি হইবেন, তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর হাইকোর্টের বিচারপতি বা অন্ততঃ দশ বৎসর হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে।

সর্বোচ্চ আদালতের কোন বিচারপতি যদি অকর্মণ্য বা অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হন এবং ভারতীয় আইনসভা যদি রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানান, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। আবেদনে উপস্থিত সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকা চাই।

সর্বোচ্চ আদালতের কোন বিচারপতি অবসর গ্রহণের পর কোন আদালতে ব্যবহারজীবী-পেশা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ভারতীয় আইন সভায় আইন করিয়া সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। রাষ্ট্রপাল প্রধান বিচারপতিকে ও

তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ করার জন্য অন্য একজন বিচারপতিকে নিয়োগ করিবেন।

সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত কোথায় স্থাপিত হইবে ও তাহার অধিকার কি হইবে—

সর্বোচ্চ আদালতের অধিবেশন হইবে দিল্লীতে। প্রধান বিচারপতি যদি রাষ্ট্রপালের সম্মতি নিয়া অন্য কোথাও নির্দেশ দেন, তাহা হইলে সেখানেও অধিবেশন হইতে পারে।

সর্বোচ্চ আদালতের একটি আদিম বিভাগ ও একটি আপীল বিভাগ থাকিবে।
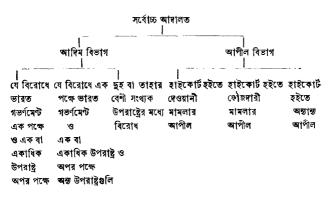
আদিম বিভাগ

কোন চুক্তি, সনদ বা ঐ জাতীয় কোন দলিল নিয়া যদি কোন বিরোধ হয়, তাহা হইলে ইহা সর্বোচ্চ আদালতের আদিম বিভাগের বিচার্য বিষয় হইবে না। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যেসব বিরোধ দেখা দিবে, সর্বোচ্চ আদালতের আদিম বিভাগে সেগুলির বিচার হইবে।

আপীল বিভাগ

(১) কোন মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সুপারিশ জানায় যে, ঐ মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহা হইলে সর্বোচ্চ আদালতে ঐ মামলার আপীল হইবে। হাইকোর্ট যদি কোন মামলা সম্পর্কে এই সুপারিশ করিতে অস্বীকার করেন ও সর্বোচ্চ আদালত যদি বুঝিতে পারেন যে, ঐ মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহা হইলে সর্বোচ্চ আদালত ঐ মামলার আপীল দায়ের করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট যদি কোন মামলা সম্পর্কে এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, সেই মামলায় জড়িত বিষয়সম্পত্তির মূল্য ২০,০০০ টাকার কম নয়, বা মামলাটা আপীলের যোগ্য, তাহা হইলে হাইকোর্টের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করা চলিবে।

(৩) ফৌজদারী মামলায় আপীল গ্রহণ করা হইবে, যদি হাইকোর্ট সে আপীল ন্যায়সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করেন।

যেখানে হাইকোর্ট নিম্নআদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দিয়াছেন, সেখানেও আপীল গ্রহণ করা হইবে।

ভারতের যে কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যালের যে কোন রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার বিশেষ অনুমতি দিবার অধিকার সর্বোচ্চ আদালতের থাকিবে।

আইনের ব্যাখ্যা

কোন উপরাষ্ট্রের হাইকোর্টে যদি এমন মামলা দায়ের করা হয়, যাহাতে কেন্দ্রীয় আইনসভার বা অপর কোন উপরাষ্ট্রের আইনসভার কোন আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহা হইলে সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য

সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতে উত্থাপন করিবে এবং সর্বোচ্চ আদালত এইরূপ বিষয় উত্থাপনের জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

অধিকার বৃদ্ধি

ভারতীয় আইনসভা আইন করিয়া সর্বোচ্চ আদালতের অধিকার বাড়াইয়া দিতে পারে।

কেন্দ্রীয় আইনসভা শাসনতন্ত্রের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আইন করিয়া সর্বোচ্চ আদালতকে অধিকতর ক্ষমতা ও অধিকার দিতে পারে।

রাষ্ট্রপাল কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপন

জনস্বার্থের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন আইনগত প্রশ্নের উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রপাল তাহার মীমাংসার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে উত্থাপন করিতে পারিবেন।

ভারতের শাসনবিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় সমস্ত কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ আদালতের সহায়তা করিবেন ও সর্বোচ্চ আদালতের আদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ—হাইকোর্ট

কেন্দ্রে যেমন সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে, তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাইকোর্টগুলিতে একজন করিয়া প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি থাকিবেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগ করিবেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার সময় রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রদেশপালের সঙ্গে ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করার সময় ভারতের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রের গভর্ণর ও সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিচার-

পতিরা স্বপদে বহাল থাকিবেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁহারা ভারতের কোন আদালতে ব্যবহারাজীবীর পেশা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অধিকার

যেসব এলাকা হাইকোর্টের অধিকারের মধ্যে থাকিবে, তাহার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত আদালতের উপর হাইকোর্ট কর্তৃত্ব করিবে। কেন্দ্রীয় আইনসভা এই অধিকার কমাইয়া বা বাড়াইয়া দিতে পারেন।

বিচারপতিদের বেতন

হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন মাসিক ৩৫০০৲, প্রধান বিচারপতির বেতন ৪০০০৲। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বেতন ৪৫০০৲, প্রধান বিচারপতি ৫০০০৲ পাইবেন। এই বেতন ও ভাতা আবশ্যিক সরকারী ব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে।

হাইকোর্টের কর্তব্য ও অধিকার

হাইকোর্টগুলি প্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ আপীলের আদালত। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের হাইকোর্টে আপীল বিভাগ ছাড়াও একটা আদিম বিভাগ আছে।

প্রদেশের নিম্নতম আদালতগুলির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবার ও তাহাদের কাজের তদারক করিবার অধিকার হাইকোর্টগুলির আছে।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে হাই-কোর্টগুলির একটা করিয়া আদিম বিভাগ আছে। ঐ তিনটি প্রেসিডেন্সী সহরের কতকগুলি মামলা সরাসরি হাইকোর্টে দায়ের করা হয়।

সমস্ত হাইকোর্টেরই আপীল বিভাগ আছে। প্রদেশের যে কোন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা চলে।

আপীল করা না হইলেও সুবিচারের জন্য প্রয়োজন হইলে হাইকোর্ট-গুলি নিম্ন আদালতের রায় পুনর্বিবেচনা করিতে পারে।

নিম্নতন সকল আদালতের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার হাইকোর্টের আছে। হাইকোর্ট যে কোন মামলা এক আদালত হইতে অন্য আদালতে স্থানান্তর করার আদেশ দিতে পারে। হাইকোর্ট কাজের হিসাব চাইতে পারে। নিম্ন আদালতগুলিতে কিভাবে কাজ চলিবে, হাইকোর্ট তাহা স্থির করিয়া দেয় ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করে।

জেলায় দেওয়ানী বিচার

জেলা ও দায়রা জজ

জেলার ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় মামলা দায়ের করার উচ্চতম আদালত হইল জেলা ও দায়রা জজের এজলাস। জেলা ও দায়রা জজের কাছে জেলার সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে।

জেলা জজের অধীনস্থ দেওয়ানী আদালত

দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য জেলা জজের অধীনে কয়েকজন জজ ও মুন্সেফ আছেন। জেলা জজ তাঁহাদের কাজ তদারক করেন ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করেন।

ছোট আদালত

ছোট ছোট দেওয়ানী মামলার বিচার করার জন্য প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে একটি করিয়া ছোট আদালত আছে। মফঃস্বলেও ছোট আদালত আছে; কিন্তু সেগুলি একটু ভিন্ন ধরণের। সাধারণতঃ ছোট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না।

ইউনিয়ন আদালত

ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে কোন কোন সময় খুব ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

জেলায় ফৌজদারী মামলার বিচার

দায়রা জজ

ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য এক বা একাধিক জন দায়রা জজ থাকেন। আগেই বলা হইয়াছে, একই ব্যক্তি জেলা ও দায়রা জজরূপে কাজ করেন। দায়রা জজ জুরীর সাহায্য নিয়া গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করেন। দায়রা জজ জেলার সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করেন। দায়রা জজ আইনে বিহিত যে কোন শাস্তি দিতে পারেন, তবে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিলে হাইকোর্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে সেই আপীল হাইকোর্টে দায়ের করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট

প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। ইহাদের বিরুদ্ধে কেবল হাইকোর্টে আপীল করা চলে।

নিম্নতন ম্যাজিষ্ট্রেট

প্রত্যেক জেলায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ বেতন পান না। তাঁরা সকলেই দায়রা জজের অধীন। তাঁহাদের রায়ের বিরুদ্ধে দায়রা জজের আদালতে আপীল করা চলে ও দায়রা জজ তাঁহাদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন। ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য বেঞ্চকোর্ট আছে।

জুরীর বিচার

ভারতে কেবলমাত্র দায়রা আদালতের মামলাগুলিতেই জুরীর বিচার করা হয়। দেওয়ানী মামলায় ও যে সব মামলার শুনানী দায়রা আদালতে হয় না সে সব মামলায় জুরীর বিচার হয় না। দেশের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে জুরীর বদলে এ্যাসেসর নিয়োগ করা হয়। তবে বিচারপতি এ্যাসেসরদের রায় মানিতে বাধ্য নন। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে জুরীর বিচারের ক্ষেত্র কিছুটা সীমাবদ্ধ।

জেলার দায়রা আদালতে দায়রা জজ কয়েকজন জুরীর সাহায্য নিয়া বিচার করেন। জুরীর সংখ্যা পাঁচজনের কম হয় না, নয়জনের বেশী হয় না। অধিকাংশ জুরী যে মত দেন, তাহা মানিয়া নিতে বিচারপতি বাধ্য, তবে যদি তিনি মনে করেন যে, জুরীর রায় অন্যায়, তাহা হইলে তিনি মামলা হাইকোর্টের নির্দেশের জন্য পাঠাইতে পারেন।

হাইকোর্টের মামলায় নয়জন জুরী থাকেন। জুরীর সকলে একমত হইয়া যে রায় দেন, তাহার সঙ্গে বিচারপতির মতভেদ হইলেও সেই রায় তাঁহাকে মানিয়া নিতে হয়। জুরী যদি একমত না হন, তাহাহইলে তাঁহাদের অধিকাংশের মত মানিয়া নিতে বিচারপতি বাধ্য নন। অধিকাংশ জুরীর রায়ের সাথে বিচারপতির মতভেদ হইলে তিনি সেই জুরী বাতিল করিয়া অন্য একজন বিচারপতিকে দিয়া নূতন জুরীর সাহায্যে সেই মামলার পুনবিচার করাইতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই জুরীর রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ দেওয়া যায় না।

সাধারণ বিচারবহির্ভূত বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তিগণ

রাষ্ট্রপাল ও প্রদেশপালকে তাঁহাদের পদের জন্য যেসব কাজ করিতে হইবে, সে সম্পর্কে কোন কোর্টে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা চলে না। হাইকোর্ট ও সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণও এইসব সুবিধা ভোগ করেন।

বিভিন্ন আদালতের তালিকা

দেওয়ানী আদালত।	ফৌজদারী আদালত।
১। সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট।	১। সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট।
২। হাইকোর্ট চীফ কোর্ট	২। হাইকোর্ট, চীফ কোর্ট
৩। জেলা জজের আদালত	৩। দায়রা আদালত
৪। সাবজজের আদালত—প্রথম শ্রেণী।	৪। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।
৫। সাবজজের আদালত—দ্বিতীয় শ্রেণী।	৫। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।
৬। ছোট আদালত	৬। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।
৭। মুন্সেফদের আদালত	৭। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।
৮। ইউনিয়ন কোর্ট	৮। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী।
	৯। বেঞ্চ কোর্ট।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সরকারী চাকুরী সংক্রান্ত ব্যবস্থা

বৃটেনে একটি মাত্র কর্তৃপক্ষ সমস্ত অসামরিক সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা হয় না।

কতকগুলি চাকুরীতে লোক সংগ্রহ করেন ভারত গভর্ণমেণ্ট, আবার কতকগুলি চাকুরীতে লোক নিয়োগ করেন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি।

দেশরক্ষী বাহিনী

ভারতের দেশরক্ষা সচিবের উপর দেশরক্ষার সকল ভার ন্যস্ত করা আছে।

সর্বাধিনায়ককে এখন আর শাসন কর্তৃপক্ষের একজন বলিয়া ধরা হয় না। তবে তিনি ভারতীয় সেনাদলের সর্বোচ্চ অধিনায়ক। তিনি রণনীতি, রণপ্রস্তুতি ও যুদ্ধ পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়ে রাষ্ট্রপালকে পরামর্শ দিবেন। তাহা ছাড়া, ভারতীয় নৌ-বহর ও বিমান বহরের একজন করিয়া অধিনায়ক থাকিবেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে এখন সমস্ত ভারতবাসীই সৈন্যদলে যোগ দিতে পারে।

দেশরক্ষী বাহিনীতে লোক নিয়োগ, ও চাকুরীর সর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ভারত গভর্ণমেণ্টের আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী

হিসাব সঙ্কলন ও পরীক্ষা, শুল্ক, আয়কর, রেলপথ এবং ডাক ও তার বিভাগের চাকুরী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বভারতীয় চাকুরীসমূহে বহুলোক নিয়োজিত আছেন।

অন্যান্য চাকুরী

আর কতকগুলি সরকারী চাকুরী আছে, যেগুলি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন।

এই ধরণের চাকুরীর তিনটি শ্রেণী আছে—সর্বভারতীয় চাকুরী, প্রাদেশিক চাকুরী ও অধস্তন চাকুরী।

নূতন শাসনতন্ত্রে সিভিল সার্ভিস

ভবিষ্যতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবেন রাষ্ট্রপাল ও প্রাদেশিক সরকারের চাকুরীগুলিতে লোক নিয়োগ করিবেন প্রদেশপাল।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান অডিট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েজ্, পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ, ইণ্ডিয়ান কাষ্টম্স্ সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিশে লোক নিয়োগ করিবেন। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এই সব চাকুরীর প্রার্থীদের পরীক্ষা নিবেন ও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের সাক্ষাৎ করিতে ডাকিবেন।

সর্বভারতীয় চাকুরীসমূহ

পূর্ব্বে সর্বভারতীয় চাকুরীতে প্রায় সমস্ত লোক নিয়োগ করিতেন ভারত সচিব। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যাঁহাদের নিয়োগ করা হইত, তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত্তাবলী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ভারত সচিব তাঁহাদের সাথে চুক্তি করিতেন। এই জন্য এই সব চাকুরীকে চুক্তিবদ্ধ চাকুরী (Covenanted Services) বলা হইত। তাঁহারা যে প্রদেশে বহাল হইতেন, সাধারণতঃ সেই প্রদেশেই সমস্ত জীবন কাটাইতেন। কিন্তু ভারতের যে কোন্ জায়গায় তাঁহাদের বহাল করা যাইতে পারিত।

অন্যান্য সর্বভারতীয় চাকুরী ছিল ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স, ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস। বর্ত্তমানে আর নূতন লোক নিয়োগ করা হইতেছে না। এই সব চাকুরীতে বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই লোক নিয়োগ করিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী

ইণ্ডিয়ান অডিট এ্যাণ্ড এ্যাকাউণ্টস সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়েজ, ইণ্ডিয়ান পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ, ইণ্ডিয়ান কাষ্টমস্ সার্ভিস এইগুলিকে সেণ্ট্রাল সার্ভিস বলা হয়। সেণ্ট্রাল সার্ভিসগুলিতে সমস্ত লোক নিয়োগ করেন, ভারত গভর্ণমেণ্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ মত এবং এইগুলি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন।

অল ইণ্ডিযা ও সেণ্ট্রাল সার্ভিসগুলিতে আগে ইয়োরোপীয়রা সংখ্যায় অত্যন্ত বেশী ছিল। এখন ভারতীয়রাই ইঁহাদের স্থান নিয়াছেন।

প্রাদেশিক সরকারী চাকুরী

প্রদেশের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে লোক নিয়োগ করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর প্রাদেশিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম। শিক্ষা, পূর্ত্ত, বন, স্বাস্থ্য বিভাগেই প্রধানতঃ এইসব কর্ম্মচারী আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের নিয়া সাধারণতঃ প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস গঠিত হইয়াছে। প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, সিভিল সার্ভিস, এডুকেশন্যাল সার্ভিস, এগ্রিকালচার্যাল সার্ভিস, ফরেষ্ট সার্ভিস ও ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসগুলির মধ্যে পড়ে।

প্রাদেশিক সরকার সাধারণতঃ প্রদেশবাসীদের মধ্য হইতে এই সব কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। উচ্চ শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান যুবকদের মধ্য হতে এই সব কর্মচারী বাছাই করা হয়। বেতন ও

সরকারী পদমর্যাদার দিক দিয়া তাহারা সেণ্ট্রাল সার্ভিস ও অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসের লোকদের তুলনায় নীচে।

অধস্তন সরকারী চাকুরী

নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়া অধস্তন সরকারী চাকুরী বা সাবর্ডিনেট সার্ভিস। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের মত ইহাতেও লোক নিয়োগ করেন প্রাদেশিক সরকার। তবে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের মধ্য হইতে এই সব কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়।

সরকারী কর্মচারিগণ সম্পর্কিত সমস্যা

সরকারী বিভাগগুলির কর্মক্ষমতা বাড়াইতে হইলে কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। সেগুলি এই :—

(১) লোকসংগ্রহ

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে লোকসংগ্রহ করা উচিত। তাহাতে চাকুরী প্রার্থীদের মধ্য হইতে সবচেয়ে ভাল লোক বাছাই করা যাইবে।

(২) পদোন্নতি

পদোন্নতির সময় চাকুরীর কাল ও যোগ্যতা দুই দিকই বিবেচনা করা উচিত। কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচারে পদোন্নয়ন করিয়া রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। সেখানে যোগ্যতা থাকিলে তরুণ বয়স্কদেরও উচ্চতম পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(৩) বেতন

নিয়োগকর্তা হিসাবে গভর্ণমেণ্টকে আদর্শস্থানীয় হইতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই সরকারী কর্মচারীদের ভাল বেতন দেওয়া হয়। তবে ভারতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের যেমন বেশী হারে বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়, তাহার কোন যৌক্তিকতা নেই।

(৪) শৃঙ্খলা

প্রত্যেক আধুনিক দেশেই এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতি ও দলীয় কলহের উর্ধে রাখা উচিত। তাঁহারা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা উচিত এবং কোনরূপ ভয় বা প্রলোভন তাঁহাদের কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই জন্যই সরকারী কর্মচারীদের পদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে রাখা হইয়াছে।

সরকারী কর্মচারীরা যে দলের গবর্ণমেণ্টের অধীনেই কাজ করুন না কেন, মন্ত্রীদের প্রতি তাঁহাদের অনুগত থাকিতে হইবে এবং তাঁহাদের সব সময়েই মন্ত্রীদের নীতি অনুযায়ী বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

শাসনতন্ত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ছাড়া প্রদেশগুলিতেও পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য প্রদেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনকেই ব্যবহার করিতে পারে বা দুই বা তাহার বেশী সংখ্যক প্রদেশের জন্য একটি পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠন করিতে পারে।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কাজ

পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কর্তব্য হইল সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, পদোন্নতি ও শাস্তিবিধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া। বেতন, ভাতা, পেন্সন সাধারণভাবে চাকুরী সংক্রান্ত তাহাদের সমস্ত অধিকার যাহাতে বজায় থাকে, সেদিকে নজর রাখাও পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কাজ। কোন অফিসারের চাকুরী সম্পর্কিত ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকিলে সেই অভিযোগ দূরীকরণের জন্য তিনি রীতিমত পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কাছে আবেদন করিতে পারেন।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের কার্যকারিতা

পাব্লিক সার্ভিস কমিশন রাখার প্রধান সুবিধা এই যে ইহাতে শাসন বিভাগের সততা বজায় থাকে এবং সরকারী কর্মচারীদের কার্য্যে শাসন বিভাগ বা আইনপ্রণয়ণবিভাগের অন্যায় হস্তক্ষেপের ভয় থাকে না।

ষোড়শ অধ্যায়

পুলিশ ও কারাগার

ভারতে পুলিশ ও কারা ব্যবস্থার সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা বহু দিন যাবৎ অনুভব করা যাইতেছে।

পুলিশ

ঠিকভাবে বলিতে গেলে ভারতীয় পুলিশ বলিয়া কিছু নাই। যে পুলিশ আছে, তাহা ১৮৬১ সালের বৃটিশ ভারতীয় পুলিশ আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক ভিত্তিতে গঠিত ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রদেশগুলিতে প্রত্যেক জেলায় পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। জেলা পুলিশ বাহিনীর প্রধান হইলেন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাঁহার অধীনস্থ পুলিশ বাহিনীকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাইতে পারেন। সেইজন্য শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর কর্তৃত্ব করেন। আবার পুলিশবাহিনীর ভিতরকার সংগঠন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্তৃপক্ষ হইলেন ডি আই জি, আই জি ও পুলিশ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

পুলিশের কাজ হইল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধ নিবারণ করা, অপরাধীর সন্ধান করা ও অপরাধীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা।

ভারতে পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। প্রদেশের মধ্যে পুলিশের প্রধানকর্তা হইলেন ইনস্পেক্টর জেনারেল। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে একটি স্বতন্ত্র পুলিশবাহিনী গঠন করা হইয়াছে। এই পুলিশবাহিনীর কর্তৃত্ব করেন একজন করিয়া পুলিশ কমিশনার।

পুলিশের কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি রেঞ্জে

বিভক্ত করা হয়। সাধারণ পুলিশ ছাড়া রেলওয়ে পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ আছে। প্রত্যেক রেঞ্জের জন্য একজন করিয়া ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল আছেন। কয়েকটি জেলা নিয়া একটি পুলিশ রেঞ্জ গঠিত হয়।

প্রত্যেক জেলায় পুলিশের কর্তৃত্ব করেন, একজন ডিষ্ট্রিক্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন অতিরিক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন। জেলার প্রধান মহকুমাগুলিতে একজন করিয়া সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকেন। তাহাকে মহকুমা পুলিশ অফিসার বলা হয়। মহকুমায় একটি বা দুটি সার্কেল থাকে। প্রত্যেক সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত একজন সার্কেল ইনস্পেক্টর আছেন। প্রত্যেক সার্কেলে কয়েকটি থানা আছে। প্রত্যেক থানার অধীনে কয়েকটি গ্রাম আছে। থানায় একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত দারোগা থাকেন।

ভারতীয় পুলিশে লোক নিয়োগ করার জন্য পাব্লিক সার্ভিস কমিশন হইতে পরীক্ষা লওয়া হয়। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক। ইন্‌স্পেক্টররা পদোন্নতি লাভ করিয়া ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে পারেন, আবার সরাসরি লোকসংগ্রহ করিয়াও ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োগ করা যাইতে পারে। ইন্‌স্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টর হইলেন নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসার।

গ্রামে সাধারণতঃ চৌকিদাররা পুলিশের কাজ চালায়। চৌকীদার-দের প্রধান হইল দফাদার। পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ড হইতে চৌকীদার ও দফাদার নিয়োগ করা হয় ও তাহাদের বেতন দেওয়া হয়।

কারাগার

কোন অপরাধের অভিযোগে কোন লোককে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ তাহাকে আদালতে আনিয়া হাজির করে। বিচারে যদি সে

অপরাধী সাব্যস্ত হয় ও তাহাকে যদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে আদালত কারাকর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করে। এই কারণে, কারাবিভাগ যদিও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, তবু ইহার সঙ্গে পুলিশ ও আদালতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

কারাগারগুলি দেখাশুনা করার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া ইনস্পেক্টর জেনারেল আছেন। কয়েদীদের কাজ, স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে তদারক করাই তাঁহার কাজ।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া প্রেসিডেন্সী জেল আছে। প্রত্যেক বিভাগের সদরে সাধারণতঃ একটি করিয়া সেণ্ট্রাল জেল থাকে। সেণ্ট্রাল জেলগুলিতে সাধারণতঃ গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত লোকদের আটক করিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট জেল আছে। সিভিল সার্জ্জেন হইতেছেন ডিষ্ট্রিক্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রধান পরিদর্শক। মহকুমগুলিতে সাব-ডিভিসনাল জেল আছে।

মেয়ে কয়েদীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়।

কিশোর অপরাধীদের জন্য পৃথক্ কারাগার আছে। কিশোর অপরাধীরা যাহাতে ভবিষ্যতে দাগী অপরাধী না হইয়া সৎভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিখে, সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে কিছু কিছু চেষ্টা করা হইতেছে। এইজন্য তাহাদের শিল্প শিক্ষা দেবার ও কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তাহাদের দেখা শুনা করবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেসব কয়েদীরা অপরাধপ্রবণ হয় না, তাহাদের সৎপথে আনার জন্য 'বোরষ্টাল ইনষ্টিট্যুশন' স্থাপন করা হইতেছে।

কারারুদ্ধ অবস্থায় অসুখ করিলে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল আছে। পুরাতন পাপীরা যাহাতে নতুন অপরাধীদের সাথে মিশিবার সুযোগ বেশী না পায়, সেজন্য তাদের যথাসম্ভব পৃথক করিয়া রাখা হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

হাটবাজার, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে স্থানীয় প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। সাধারণতঃ সেই অঞ্চলের লোকেরা মিলিত হইয়া এই সব ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া নেয়। ইহাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। দেশের প্রত্যেক অধিবাসী কোন না কোন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ সেখানকার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করে। পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ড লোক্যাল বোর্ডের অধীন। লোক্যাল বোর্ডগুলি আবার জেলা বোর্ডের অধীন। জেলার সমস্ত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করে জেলা বোর্ড।

বড় সহরগুলির অধিবাসীদের জন্য কর্পোরেশন ও অন্যান্য সহরের অধিবাসীদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে মন্ত্রীরা এই ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস

ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে পঞ্চায়েৎ প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। প্রধানতঃ সামাজিক ব্যাপারে বিধান দিবার জন্য ও স্থানীয় কলহ মীমাংসা করার জন্য এইসব পঞ্চায়েৎ গঠিত হইত। এই দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে পঞ্চায়েৎগুলির মধ্য দিয়া গ্রামের ও সহরের লোকের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রে এইসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করিত।

ব্রিটিশ আমলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করা হয় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে।

তারপর ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রসার করিতে উদ্যোগী হন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা ও জনসাধারণ যাহাতে নিজেরা নিজেদের শাসন চালাইতে পারে, তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া। স্থানীয় লোকেরা যদি নিজ নিজ এলাকার শাসনে মনোযোগী না হয়, তাহা হইলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নয়। তাছাড়া নিজেদের কাজ নিজেরা করিলে আত্মনির্ভরতা আসে এবং লোকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন চালাইবার শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

আমাদের দেশে জাতির জীবন সব সময়েই গ্রামগুলির মধ্য

দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আজও এই দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে ও গ্রামের কথাই চিন্তা করে। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ শহরের লোকেরাই দেশের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছে। ফলে সাধারণভাবে গ্রামগুলি উপেক্ষিত হইতেছে। জাতির জীবন প্রবাহের উৎস যাহাতে শুকাইয়া না যায়, সেজন্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রসার ও বিকাশের দিকে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের যে বিভাগ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপের উপর নজর রাখে তাহাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ বলা হয়। ১৯১৯ সাল থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ একজন মন্ত্রীর পরিচালনাধীনে চলিয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রধান প্রধান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হইল :—

(ক) শহর এলাকায়—(১) কর্পোরেশন (২) মিউনিসিপ্যালিটি (৩) টাউন কমিটি বা ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড।

(খ) পল্লীএলাকায়—(১) জেলা বোর্ড, (২) লোক্যাল বোর্ড (৩) ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েৎ।

স্থানীয় সবয়ত্তশাসন ব্যবস্থার সাফল্যের পথে বাধা

নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যাগুলি সকলে মিলিয়া সমাধান করিবার ব্যাপারে স্থানীয় লোকেরা যত আগ্রহ প্রকাশ করিবে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তত বেশী হইবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোক অনেক সময় তাহাদের পৌরশাসন ব্যাপারে উদাসীন থাকে। এই ঔদাসীন্য খুব বিপজ্জনক। কারণ ইহার ফলে শাসকরা দুর্নীতিপরায়ণ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কিভাবে সফল হইতে পারে

আমাদের দেশে যদি শুধু স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হয়, জাতিগঠনের প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসাবে ইহাকে যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে স্বাধীন ও সৎভাবে চলিতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হইবে। সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকদের এই সব প্রতিষ্ঠান চালাইবার ভার লইতে হইবে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে। কর্মনিষ্ঠ, যোগ্যতাসম্পন্ন ও বেতনভুক কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। জনসাধারণেরও উপযুক্ত শিক্ষা থাকা চাই, প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের সম্পূর্ণ সচেতন থাকা চাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শহর এলাকায় স্বায়ত্তশাসন

আজকাল আমাদের জাতীয় জীবনে শহরগুলির প্রাধান্যই বেশী। সেইজন্য নাগরিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে লোকের দৃষ্টি ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতেছে।

ভারতে শহরে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা সর্বত্র একরকম নয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কর্পোরেশন আছে। যুক্তপ্রদেশের পাঁচটি সহরে কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সব শহরে একজন করিয়া বেতনভোগী মেয়রও নিযুক্ত করা হইবে। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। ক্যাণ্টনমেণ্ট (সেনানিবাস) এলাকায় সামান্য পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা আছে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ডের মধ্যে।

মিউনিসিপ্যালিটির কাজ

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কর্তব্য দুই ধরণের :—

(১) বাধ্যতামূলক, (২) ইচ্ছাধীন

প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি আইন অনুসারে কতকগুলি কাজ করিতে বাধ্য। এইগুলি হইল, রাস্তায় আলো দেওয়া, জল সরবরাহ করা, আবর্জনা পরিষ্কার করা প্রভৃতি। পার্ক ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা, যাদুঘর ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রভৃতি কাজ ইচ্ছাধীন।

কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, টাউন কমিটি প্রভৃতি নাগরিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেকটা এক ধরণের। তফাৎ কেবল ক্ষমতার ও গঠনবিধির। কর্পোরেশনগুলিকে সময় সময় এমন সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, যেগুলি ছোট সহরে দেখা দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাজে কাজেই, কর্পোরেশনগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটি-

গুলির চেয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেই রকম, মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিকে আবার টাউন কমিটির চেয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কর্পোরেশন

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই, এই তিনটি শহরে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান হইতেছে কর্পোরেশন। এই তিনটি শহরের কর্পোরেশন পৃথক্ পৃথক্ আইন অনুসারে গঠিত হইয়াছে। কাউন্সিলরদের সংখ্যা তিনটি সহরে সমান নয়। বোম্বাইয়ে কাউন্সিলরদের সংখ্যা ১১৬ ও মাদ্রাজে ৬১। সামান্য কয়েকজন সরকার মনোনীত কাউন্সিলর ছাড়া আর সব কাউন্সিলরই নির্বাচিত। বোম্বাই সহরের অধিবাসীদের "নাগরিক শাসন ব্যাপারে কর্পোরেশনের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে। কর্পোরেশনের উপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সর্বত্র একরূপ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রধান কর্মকর্তা উভয়েই নির্ব্বাচিত, কিন্তু মাদ্রাজ কর্পোরেশনে কর্মকর্ত্তা নিযুক্ত করেন সরকার।

কলিকাতা কর্পোরেশন বা পৌর প্রতিষ্ঠান

ভারতের নাগরিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের শহরগুলির মধ্যে কলিকাতার লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৫০ লক্ষাধিক) এবং ইহার বাৎসরিক আয় (প্রায় ২॥ কোটি টাকা) সমগ্র বাঙ্গলার রাজস্বের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ। ১৯৩২ সালে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মিউনিসিপ্যাল আইন করেন, তাহাতে কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং সেই আইনের বিধানেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়ররূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকা বাড়াইয়া শহরতলীর কয়েকটি অঞ্চলকে ইহার সাথে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৩২ সালে সংশোধন করা হয়। সেই সংশোধনের ফলে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

কলিকাতা কর্পোরেশন ঠিকমত কাজ চালাইতে না পারায় ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট একজন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহার উন্নতির উপায় সম্পর্কে সুপরামর্শ করার জন্য একটি কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা হইবে।

কার্য পরিচালনা

কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করেন প্রধান কর্মকর্তা। তিনি কর্পোরেশন কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিধানানুযায়ী নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীরা হইলেন সহঃপ্রধান কর্মকর্তা। চীফ ইঞ্জিনীয়ার, চীফ এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট, হেল্‌থ্‌ অফিসার, কর্মসচিব প্রভৃতি সকলেই কাউন্সিলর-দের দ্বারা নিযুক্ত হইতেন। তবে ইঁহাদের নিয়োগ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

প্রধান কর্মকর্তার কার্যে সাহায্য করার জন্য কর্পোরেশন প্রতি বৎসর ১০টি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিয়োগ করিতেন।

কর্পোরেশনের কর্তব্য

কর্পোরেশনের কর্তব্যগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নাগরিকদের সুবিধা ও শিক্ষা।

পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহ করা, ময়লা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা ও মেরামত করা, উদ্যান, গৃহনির্মাণ করা ও তদারক করা, খেলার মাঠ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলি দেখাশুনা করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা, বস্তীগুলির উন্নতি-সাধন করা, সহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা ও আলোর ব্যবস্থা করা, কারখানা, বাজার, কশাইখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা—এই সব কর্পোরেশনের কার্যের মধ্যে পড়ে।

এছাড়া খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, দুগ্ধ সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা, মৃতের সংকার করা ও লোকগণনা করা—এইসব কার্যও কর্পোরেশনকে করিতে হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কাজও গ্রহণ করিয়াছেন।

আয়

কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় বর্ত্তমানে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। এই টাকা পাওয়া যায় :—(১) বাড়ীর বা জমির উপর কর হইতে। সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রতি বৎসর কর হিসাবে দিতে হয়। চারটি কিস্তীতে টাকা আদায় করা হয়। (২) গাড়ী ও জীব জন্তুর উপর কর, (৩) পেশা বা ব্যবসায়, বা বৃত্তির উপর কর, (৪) ঠেলা গাড়ীর উপর কর ও (৫) কর্পোরেশনের সম্পত্তি (বাজার প্রভৃতি) হইতে আয়। গাড়ীর উপর ধার্য কর আজকাল পুলিশ আদায় করে এবং পরে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট টাকাটা প্রদেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দিয়া দেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কার্যসূচী

কলিকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কর্পোরেশনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব কার্যসূচী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই কার্য-

সূচীতে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থা করার কথা ছিল:—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, সস্তায় খাবার ও দুধ সরবরাহ, পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, বস্তীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, দরিদ্রদের বাসস্থান, দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়, প্রসূতি-আগার, দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ সরবরাহ, শহরতলীর উন্নয়ন, শহরের যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও নগরের কার্য পরিচালনার ব্যয় সংকোচ।

মিউনিসিপ্যালিটি

গঠনবিধি

প্রেসিডেন্সী শহরগুলির কর্পোরেশন ছাড়া ভারতে ৭৮০টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির সদস্যদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ নির্বাচিত। ভোটাধিকার এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কাজ

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রধান কাজ হইল গৃহনির্মাণের নিয়মকানুনগুলি যাহাতে মানা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা, আবর্জনা পরিষ্কার ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা করা, জল সরবরাহ করা, রাস্তায় আলো দেওয়া, খাদ্য ও ঔষধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, বাজারগুলি দেখাশুনা করা, সমাধিস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করা, জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা ও অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা করা।

মিউনিসিপ্যালিটির কার্য পরিচালনা

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চালান। কোথাও কোথাও চেয়ারম্যানের কিছু কিছু ক্ষমতা একজন ভাইস-চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত করা হয়।

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান বেতন পান। মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান

প্রধান কর্মচারী হইলেন সেক্রেটারী, ইঞ্জিনীয়ার, হেল্‌থ্‌ অফিসার এ্যাসেসর ও কালেক্টর। কোন মিউনিসিপ্যালিটির আয় এক লক্ষাধিক টাকা হইলে গবর্ণমেণ্ট সেখানে একজন প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশ দিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যালিটির আয়

প্রধানতঃ বাড়ীর উপর, জন্তু জানোয়ার ও গাড়ীর উপর কর বসাইয়া ও রাস্তা, পুল এবং খেয়া ব্যবহারের জন্য কর আদায় করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিগুলি অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি হইতে যে আয় হয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় ও অন্যান্য বিবিধ সূত্রে যে টাকা পাওয়া যায়, সেগুলি সমস্ত মিলিয়া মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশী হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয় হইয়াছিল মোট ৪১ কোটি টাকা।

মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটি

মধ্যপ্রদেশে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে অন্ততঃ পাঁচজন সদস্য থাকা চাই এবং তাঁহাদের অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হওয়া চাই। নির্বাচিত সদস্যগণ আরও কয়েকজন সদস্য মনোনীত করেন। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজন মুসলমান, একজন হিন্দু ও একজন স্ত্রীলোক থাকা চাই। মাদ্রাজে কাউন্সিলররা সকলেই নির্বাচিত হন।

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যালিটি

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সকল সদস্যই নির্বাচিত। হরিজন ও স্ত্রীলোকদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। মুসলমানরা ইচ্ছা করিলে পৃথক্ নির্বাচন প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে।

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (পরে সংশোধিত) অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এইগুলির মোট সদস্যের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ নির্বাচিত, বাকী এক চতুর্থাংশ মনোনীত। হাওড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা মোট সদস্যসংখ্যার চার পঞ্চমাংশ। করদাতারা কমিশনার নির্বাচন করেন। তাঁহাদের কার্যকাল চার বৎসর। কেবলমাত্র করদাতারা ভোট দেন ও যুক্ত নির্বাচন প্রথায় ভোট গ্রহণ করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সমস্ত কাউন্সিলরই নির্বাচিত। এই দিক দিয়া মাদ্রাজ বাঙ্গলাদেশের অগ্রবর্তী। বাঙ্গলায়ও শীঘ্রই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সদস্য মনোনয়নের প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইবে। প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাঙ্গলার মিউনিসি-প্যালিটির প্রসার ও বিকাশ হইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন গৃহীত হয়।

ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড

কোন শহরের যে এলাকায় সেনানিবাস আছে, সেই এলাকাকে ক্যাণ্টনমেণ্ট বলা হয়। ক্যাণ্টনমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চলে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ডের মারফৎ। বোর্ডের সদস্যরা অধিকাংশ নির্বাচিত। তবে তার সভাপতি হইলেন একজন সরকারী কর্মচারী। "ক্যাণ্টনমেণ্টের শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ভারত গবর্ণমেণ্টের সেনাবিভাগের হাতে।"

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কাজ কি ভাবে চলে

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কাজের গণ্ডী আইন দ্বারা মোটামুটি স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জলসরবরাহ প্রভৃতি কতকগুলি কাজ করিতে তাহারা বাধ্য, আবার শিশুকল্যাণ, প্রসূতিকল্যাণ প্রভৃতি কতকগুলি কাজ করা তাহাদের ইচ্ছাধীন।

কাউন্সিলররা প্রায় সকলেই নির্বাচিত এবং তিন বৎসর তাঁহারা স্বপদে বহাল থাকেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে মেয়র বা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কেউই বেতন পান না। ইংলণ্ডের মেয়রদের মত এদেশেও চেয়ারম্যান বা মেয়ররা বিশেষ সম্মান লাভ করেন, কিন্তু আমেরিকার মেয়রদের মত ক্ষমতা এদেশের মেয়র বা চেয়ারম্যানদের নেই।

সদস্যদের কয়েকটি কমিটি (ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি) প্রকৃত কাজ চালায়। সকল কাউন্সিলর বা সদস্য মিলিয়া কাজ চালান না। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, বাজার ও রাস্তাঘাট সংক্রান্ত নানা জটিল কর্তব্য পালন করা সম্ভব নয়। কমিটিগুলি কার্যের পরিকল্পনা করে। বস্তুতঃ বতর্মানকালে শাসন-পদ্ধতির ভিত্তিই এই কমিটি প্রথা।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞদের কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মচারীদের মধ্যে প্রধানতম যিনি, তিনি কর্মকর্তা বা কর্মসচিব। সমস্ত শাসনক্ষমতা তাঁহার হাতে যায় এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও পদমর্যাদার দরুণ প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহার সাথে পরামর্শ করা হয়। মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর এবং বেতনভোগী কর্মচারী ছাড়া স্বাস্থ্য, ময়লা জল নিষ্কাশন শিক্ষা, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন লোক থাকেন। তাঁহারা কাউন্সিলরদের এইসব বিষয়ে উপদেশ দেন।

কাউন্সিল সাধারণতঃ কেবলমাত্র কার্য পরিচালনার মোটামুটি নীতিটা স্থির করিয়া দেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পল্লী এলাকায় স্বায়ত্তশাসন

শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনগুলি যে কাজ করে, পল্লী এলাকায় সেই কাজগুলি করে জেলাবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ। শহরের সীমাবদ্ধ এলাকায় ও বিস্তৃত পল্লী অঞ্চলে কাজের পদ্ধতি একরকম হয় না। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে, দুই অঞ্চলেই সমস্যাগুলি প্রায় এক ধরণের। অবশ্য কতকগুলি সমস্যা আছে, যেগুলি কেবল শহরেই দেখা যায়. গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় না, আবার কতকগুলি সমস্যা আছে, যেগুলি গ্রামেরই সমস্যা, শহর এলাকায় সেগুলি দেখা যায় না।

পল্লী এলাকার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন

এদেশে পল্লী সমাজগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পল্লীর অত্যন্ত দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। আমলাতন্ত্রের যে প্রতিভূ সেখানে থাকেন, তিনি বহির্জগতের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। জমিদার সাধারণতঃ তাঁহার জমিদারীতে থাকেন না। শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসেন। দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা গ্রামে পড়িয়া থাকে।

গ্রামবাসীদের আজ সাহায্যের প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহাদের সংঙ্ঘবদ্ধ করা। তাহাদের শিক্ষা ও খাদ্য চাই—তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আসিবে।

কিন্তু গ্রামীন সভ্যতা ও সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রাষ্ট্রের সাহায্য ও আইনের বল চাই।

এইসব গ্রামীন সমাজ হইতে সুসংবদ্ধ গ্রাম্যজীবন ও নাগরিক চেতনা আমাদের জাতি গঠনের কার্যকে অনেক সহায়তা করিবে। গ্রামের স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার মধ্য হতে আসিবে এই চেতনা।

গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রথা

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় প্রথমেই নাম করিতে হয় জেলাবোর্ড। সকলের নীচে রহিয়াছে পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে লইয়া লোক্যাল বোর্ড গঠিত। সমস্ত মহকুমা লোক্যাল বোর্ডের এলাকার মধ্যে পড়ে। লোক্যাল বোর্ডগুলির উপরে থাকে জেলাবোর্ড। জেলাবোর্ড হইতেছে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রধানতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। শহরগুলি বাদে সমস্ত জেলাই জেলাবোর্ডের এলাকাধীন।

১৯৩৮—৩৯ সালে ভারতে মোট ৩৯৮টি জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড ছিল। তাদের মোট বার্ষিক আয় ছিল ১৭ কোটি টাকা অর্থাৎ সমগ্র লোক সংখ্যার হিসাবে মাথা পিছু ৷৵০ আনারও কম। এত সামান্য আয়ের দরুণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি পল্লীবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ কিছু কাজ করিতে পারে নাই। আংশিকভাবে সরকারী সাহায্য না পাইলে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়।

জেলা বোর্ড

আসাম ছাড়া ভারতের আর সর্বত্র প্রায় প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলাবোর্ড আছে। মিউনিসিপ্যালিটির মত জেলা বোর্ডগুলিতেও নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাই বেশী এবং প্রায় সর্বত্রই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার যতটুকু ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের আছে, জেলাবোর্ডগুলি নিয়ন্ত্রণেরও ততটুকু ক্ষমতা তার আছে। অব্যবস্থার দরুণ গবর্ণমেণ্ট জেলাবোর্ড বাতিল করে দিতে পারেন।

বাঙ্গলা দেশে জেলাবোর্ডগুলির সদস্য সংখ্যা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া থাকেন। কোন জেলাবোর্ডের সদস্য সংখ্যা নয়জনের কম হইতে পারে না। বাস্তবক্ষেত্রে জেলাবোর্ডগুলিতে সাধারণতর ১০ থেকে ৩৩ জন সদস্য থাকেন। সদস্যদের মধ্যে কিছু অংশ নির্বাচিত, আর কিছু অংশ মনোনীত। দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচন করে লোক্যাল বোর্ডগুলি। লোক্যাল বোর্ড না থাকিলে ভোটদাতারা সরাসরি ভোট দিয়ে তাঁদেরকে নির্বাচিত করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে যোগ দেবার অধিকার যাঁদের আছে তাঁরাই এই নির্বাচনে যোগ দিতে পারিবেন। জেলা বোর্ডের সদস্যরা চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯২১ সাল থেকে জেলা বোর্ডগুলিকে নিজ নিজ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাঙ্গলা সরকার জেলা বোর্ড়গুলির মেয়াদ বাড়িয়ে চার বৎসরের জায়গায় পাঁচ বৎসর করার প্রস্তাব করিয়াছেন। কর্মসচিব, জেলা ইঞ্জিনীয়ার ও জেলার হেল্‌থ অফিসারকে জেলা বোর্ড নিয়োগ করেন। তাঁরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অধীনে কাজ করেন।

বোম্বাইয়ের জেলা বোর্ড

বোম্বাইয়ে জেলা বোর্ডের সদস্যরা সকলেই নির্বাচিত। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার যাঁদের আছে তাঁরাই জেলা বোর্ডের নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। প্রত্যেক জেলা বোর্ডের মেয়াদ ৩ বৎসর।

মধ্যপ্রদেশের জেলা সংস্থা

মধ্যপ্রদেশের জেলা সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা স্থির করে দেন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট। জেলা সংস্থার অধীনস্থ লোক্যাল বোর্ডগুলি চার পঞ্চমাংশ সদস্য নির্বাচন করেন, আর এক পঞ্চমাংশ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয়। জেলা সংস্থাগুলি নিজেদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন ও কর্মচারী নিয়োগ করেন।

জেলা বোর্ডের কাজ

জেলার স্থানীয় প্রয়োজনগুলি মিটাইবার ভার জেলা বোর্ডগুলিকে গ্রহণ করিতে হয়। জেলা বোর্ডের কাজ এই ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়), (২) চিকিৎসা (ঔষধালয় ও চিকিৎসালয় (৩) পূর্ত (রাস্তা ঘাট ও যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি ও মেরামত করা) (৪) খোঁয়াড ও খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা (৫) জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা (গ্রামের জল সরবরাহ ব্যবস্থা সমেত) (৬) টিকা দেওয়া, (৭) আদমসুমারি (৮) দুভিক্ষে সাহায্যদান (১০) বাজার ও মেলাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা।

জেলা বোর্ডের আয়-ব্যয়

পূর্ব্বে জমির উপর কর, নানারূপ জরিমানা এবং ফেরি ও খোঁয়াড় থেকে জেলা বোর্ডগুলির অর্থাগম হত। কিন্তু বর্তমানে এই সকল কর আদায় করেন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং জেলা বোর্ডগুলির জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট টাকা বরাদ্দ করিয়া দেন। এই কারণে আজকাল জেলা বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন আয়ের পথ নেই,

তাহাদিগকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ টাকার উপর। জেলা বোর্ডগুলি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মারফৎ কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিল থেকেও কিছু টাকা পায়। ঋণ করিয়াও জেলা বোর্ডগুলি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

প্রধানতঃ এই সব কার্যের বাবদ অর্থ ব্যয় হয়ঃ—প্রাথমিক শিক্ষা, জলসরবরাহ চিকিৎসা এবং রাস্তাঘাট, বাড়ী, সেতু প্রভৃতি তৈয়ারী ও মেরামত করা।

গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে জেলা বোর্ডের হিসাব পরীক্ষা করেন।

অবিভক্ত বাঙ্গলায় ২৬টি জেলা বোর্ডের মোট আয় ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রতি লোক পিছু ।/০ আনারও কম।

ব্যয় হইয়াছিল মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যয় হয়েছে নির্মাণাদির কাজে, এক চতুর্থাংশ জন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বাবদ। শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ ব্যয় হইয়াছে শিক্ষার বাবদ।

লোক্যাল, তালুক বা সার্কল্ বোর্ড

সরকারী বিজ্ঞপ্তি দিয়া মহকুমার জন্য লোক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। জেলা বোর্ডের যে সমস্ত কাজ লোক্যাল বোর্ডগুলিকে করিতে দেওয়া হয় লোক্যাল বোর্ডগুলি সেই সমস্ত কাজ করে। ইহার মধ্যে প্রধান কাজগুলি হইল, মহকুমার রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং খোঁয়াড় ও ফেরিগুলি দেখাশুনা করা। লোক্যাল বোর্ড, তালুক বোর্ড বা সার্কল্ বোর্ডগুলি জেলা বোর্ডের মহকুমা প্রতিনিধিরূপে কাজ করে। জেলা বোর্ডের মত লোকাল বোর্ডেও একজন করিয়া নির্বাচিত বে-সরকারী চেয়ারম্যান আছেন এবং অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত ও বে-সরকারী লোক। লোক্যাল বোর্ডের নিজস্ব কোন কোন অর্থভাণ্ডার নাই। জেলা বোর্ডের সাহায্যের উপরই তার নির্ভর করিতে হয়।

পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে লোক্যাল বোর্ড বা তালুক বোর্ড নেই। আসামে আবার লোক্যাল বোর্ডগুলিই জেলা বোর্ডের কাজ করিয়া থাকে।

বাঙ্গলা দেশে লোক্যাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দেন। প্রত্যেক লোক্যাল বোর্ডে অন্ততঃ ছয়জন সদস্য থাকেন। সদস্যদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ নির্বাচিত। অবশিষ্ট সদস্যদেরকে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া থাকেন। ইউনিয়ন বোর্ডে ভোট দেবার অধিকার যাঁদের আছে তাঁহারাই লোক্যাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন। ১৯৩৬ সালের স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী বাংলা সরকার সংশ্লিষ্ট জেলা বোর্ডের সম্মতি নিয়ে কোন লোক্যাল বোর্ড বাতিল করিয়া দিতে পারেন। এই আইনের বিধানে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, লোক্যাল বোর্ডগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইলে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনে ভোট দেবার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা সরাসরি ভোট দিয়া জেলা বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই রকম ক্ষেত্রে, জেলা বোর্ড লোক্যাল বোর্ডগুলির কাজ হাতে লইবে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ সেই কাজগুলি করিবে।

ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েৎ—গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

গ্রামের মাতব্বরদের লইয়া গঠিত পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে আছে। ১৯১৯ সালের ইউনিয়ন বোর্ড আইনে পঞ্চায়েৎগুলিকে পুলিশের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। সেগুলির নূতন নাম রাখা হয় 'ইউনিয়ন বোর্ড', তাদের কর্ম ক্ষেত্রও প্রসারিত করা হয়।

১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ইউনিয়নের অধিবাসীদের মধ্যে হইতে ইউনিয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হইত। সদস্য সংখ্যা ৫ জনের কম হইত না, ৯ জনের বেশী হইত

না। কমিটিগুলি জেলা বোর্ডের অধীন ছিল এবং গ্রামের রাস্তা, পুল, খোঁয়াড়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি কমিটিকে দেখাশুনা করিতে হইত। জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা করা, আবর্জনা পরিষ্কার ও নর্দমা কাটার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজ কমিটিকে করিতে হইত।

ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ সাধারণতঃ নির্বাচিত হন, কখনও কখনও দু-একজন মনোনীত সদস্যও থাকেন। সভাপতিও নির্বাচিত। একটি বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি এলাকা ইউনিয়ন বোর্ডের শাসনাধীনে থাকে।

ইউনিয়ন বোর্ডগুলি জেলা বোর্ডের প্রতিনিধিরূপে ও জেলা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে। সাধারণতঃ সার্ক্‌ল্ অফিসার কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের উপর নজর রাখেন।

ইউনিয়ন বোর্ড

বাঙ্গালা দেশে ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে ছয় থেকে দশজন সদস্য থাকে। সদস্যদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের কার্যকাল ৪ বৎসর।

কাজ

পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কার্য হইল গ্রামে শান্তিরক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রামে চৌকীদার রাখিতে হয়।

ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যায় :—

(১) গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল

(২) খোঁয়াড়

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৪) ঔষধালয়

(৫) গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, আবর্জনা পরিষ্কার, ও ময়লা জল নিষ্কাশণ, বাজার ও মেলা পরিদর্শন।

(৬) জন্মমৃত্যুর হিসাব

(৭) গ্রামের জলসরবরাহ

(৮) সামান্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার

(৯) জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার ব্যবস্থা করা।

আয়ব্যয়

ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয়ের পথ হইল—(১) চৌকিদারী কর (২) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বা জেলা বোর্ডের আর্থিক সাহায্য (৩) খোঁয়াড় হইতে আয় ও জরিমানা (৪) ইউনিয়ন আদালত থেকে আয়।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান ব্যয় হয় চৌকিদারের বেতনে। সার্ক্‌ল্‌ অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাব পরীক্ষা করেন।

পশ্চিম বাঙ্গলায় বর্তমানে ২০৪৬টির বেশী ইউনিয়ন বোর্ড আছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয় হইয়াছিল মোট ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। চৌকীদারী খাতেই অধিক ব্যয় হইয়াছিল। রাস্তাঘাট, পুল, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় জলসরবরাহ প্রভৃতি বাবদ মাত্র এক চতুর্থাংশ ব্যয় হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ের পঞ্চায়েৎ

মধ্যপ্রদেশে পঞ্চায়েতগুলির সদস্যসংখ্যা ৯ থেকে ১৫। পঞ্চায়েৎগুলি নিজেদের সভাপতি বা সরপঞ্চ নির্বাচন করে। পঞ্চায়েৎগুলির বিচার করার ক্ষমতা আছে।

বোম্বাইয়ে পঞ্চায়েৎগুলির সমস্ত সদস্য নির্বাচিত। পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার সেই এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী মাত্রেরই আছে। মুসলমান ও হরিজন স্ত্রীলোকদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। সদস্যসংখ্যা সাতজনের কম হয় না ১১ জনের বেশী হয় না। পঞ্চায়েতের মেয়াদ তিন বৎসর এবং এক বা একাধিক গ্রাম এর শাসন এলাকার মধ্যে থাকে।

বিংশ অধ্যায়

শহর ও পল্লীশাসন সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি ধরণের কাজ করিতে হয় সেবিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা আমরা সকলে সব সময় উপলব্ধি করি না। অথচ বাস্তবিক পক্ষে আমাদের নিত্যকার জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থার ভার এই প্রতিষ্ঠানগুলিরই হাতে। এরাই ব্যবস্থা করে আমাদের পানীয় জল, আমাদের আহার ও বাসস্থান।

আমরা সকলে এই কথাটি ভালভাবে বুঝিতে পারি না যে, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আজিকার শিশুদের উপর। আজকাল দেখি আমাদের দেশের শিশুরা স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভের সুযোগ পায় না তারা পেটভরে খেতে পায় না, তাহাদের পরণে কাপড় নাই, শিক্ষা নাই। ইহাদের মধ্য ইহতে একটা সুস্থ, সবল, প্রতিভাশালী জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এখন আমরা শহর ও পল্লী এলাকার কতকগুলি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিব।

মিউনিসিপ্যালিটি

যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইল প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশে শহরগুলি এরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হয় নাই। শহরের রাস্তা ও বাড়ীঘর পরিষ্কার করিবার জন্য নানারকম চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি মিউনিসিপ্যাল আইন

ও জনস্বাস্থ্য আইন করা হইয়াছে। এই সব আইনে নর্দমা তৈয়ারী, জলসরবরাহ, খাদ্য ও ঔষধ পরীক্ষা ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, আবর্জনা পরিষ্কার, আপত্তিকর ব্যবসায় ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিচার বিধি দেওয়া হইয়াছে। রাস্তা, বাজার ও কসাইখানা, উদ্যান ও খেলার মাঠ, কারখানা প্রভৃতি সম্পর্কে বিধানও এইসব আইনে আছে।

সুপরিকল্পিতভাবে নগর ও গ্রাম পত্তনের আজ বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শহরের স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত গৃহসংস্থানের সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে, শহরবাসীদের স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির কারণ বাসস্থনের অভাব।

গৃহসমস্যা

আজকাল দেশের একটা বিরাট সমস্যা হইতেছে লোকের আশ্রয়ের সমস্যা। বিশেষ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিজ নিজ বাস্তু ছাড়িয়া আসিয়া পড়ায় সমস্যা আরও বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশের শহরগুলিতে বাসস্থানের সমস্যা সব সময়েই ছিল। কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, কোন শ্রেণীর লোকেরই একটা উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ সংগ্রহ করা ক্ষমতায় কুলায় না। কলিকাতায় একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া বলা যায়, অন্ততঃ দশ লক্ষ বাড়ীতে অতিরিক্ত লোক বাস করে। চাহিদা মিটাইতে হইলে আরও দশলক্ষ নূতন বাড়ী তৈয়ারী করা উচিত। বোম্বাইয়ে অবস্থা এই দিক হইতে কলিকাতার চেয়েও খারাপ। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মকানুনগুলির দিকে কোন রকম নজর না দিয়াই বাড়ীগুলিতে লোক ভর্তি করা হয়। নাগপুর, আমেদাবাদ, কানপুর প্রভৃতি শিল্পপ্রধান সহরগুলির অবস্থাও কোন অংশে ভাল নয়।

বড় বড় শিল্পপ্রধান সহরের বস্তীগুলি একপ্রকার কলঙ্কবিশেষ। এইসব বস্তীর ছোট চালাবাড়িগুলিতে কোনদিন আলোহাওয়া

প্রবেশ করে না। খোলা নর্দমাগুলি কচিৎ পরিষ্কার করা হয়। অনেকগুলি বাড়ীর জন্য একটিমাত্র জলের কল—তাহা হইতে সকলকে জল নিতে হয়।

একটা পরিকল্পনা নিয়া বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা না করিলে এখানকার এই ভীড় থাকিয়া যাইবে।

নগর পরিকল্পনা

গৃহ সংস্থান ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নগর পরিকল্পনার দ্বারা। কোন সহর যখন বাড়িতে থাকে, তখন সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি যদি একটি পরিকল্পনা দিয়া নগরপত্তন করে, তাহা হইলে প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যকর গৃহনির্মাণ করা যায় ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়। শুধু তাই নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এলাকা ও বসবাসের এলাকা পৃথক করিয়া জায়গায় জায়গায় পার্ক ও খোলা মাঠের ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র নগরকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখা যায়। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, "যে সব ব্যাধি নিবারণ করা যায় সেগুলি নিবারণ করা, মানুষের আয়ুবৃদ্ধি করা, ও মানুষের জীবনকে আরও সুখী ও কার্যক্ষম করিয়া তোলা।" গৃহ সংস্থানের বিষয়ে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, "সভ্য সমাজে প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম কতকগুলি আরামভোগ করার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে।"

হেল্‌থ্ অফিসারকে খাদ্য ও জল সরবরাহের উপর নজর রাখিতে হইবে। শুধু তাই নয়, আবর্জনা যাহাতে পরিষ্কার করা হয়, তাঁহাকে সেদিকে নজর রাখিতে হইবে, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, যৌনব্যাধি প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সম্প্রতি আমাদের দেশে হেল্‌থ্ অফিসাররা প্রসূতি কল্যাণ ও শিশুকল্যাণের কাজে হাত

দিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যাহাতে এই কাজে হাত দেয়, সেজন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন হইয়াছে এবং অবশেষে তাহারা এই কাজে হাত দিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, মায়েদের স্বাস্থ্যের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

নগরের উন্নতি

কলিকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও দিল্লী প্রভৃতি সহরের উন্নতির জন্য একটি করিয়া ট্রাষ্ট গঠন কয়া হইয়াছে। পুরাতন সহরগুলি নূতন করিয়া পত্তন করা হইতেছে এবং নূতন নগর পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দুইদিকেই নজর রাখা হইতেছে।

কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

কলিকাতা শহরের উন্নতির জন্য, শহরের আকার বাড়াইয়া জনবহুল এলাকায় ভীড় কমাইবার জন্য, নূতন রাস্তা তৈয়ারী করার জন্য এবং উদ্যান, খেলার মাঠ ও খোলা ময়দানের ব্যবস্থা করার জন্য ১৯১২ সালের জানুয়ারীতে আইন করিয়া কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বোম্বাইয়ে কলিকাতার পূর্ব্বে ইম্‌প্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছে। পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলার ও নূতন বাড়ী তৈয়ারী করার অধিকার ট্রাষ্টের আছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সস্তায় থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ট্রাষ্ট বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারে। ট্রাষ্ট বস্তী পরিষ্কারের সাথে সাথে মজুর শ্রেণীর লোকদের থাকার জন্য বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে।

কলিকাতায় বর্তমানে ১৫০০ একর খোলা মাঠ আছে (ময়দানের আয়তন হইতেছে ১০০০ একর)। ইহার মধ্যে ২৫০ একর খোলা মাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট দ্বারা। খোলা মাঠের দিক হইতে এখন কলিকাতাকে লণ্ডনের সাথে তুলনা করা চলে।

কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান ও

দশজন সদস্য আছেন। গভর্ণমেণ্ট চেয়ারম্যানকে নিয়োগ করেন। দশজন সদস্যের মধ্যে চারজন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত, তিনজন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা তাঁহাদের মধ্যে একজন হওয়া চাই) বাকী দুইজনের মধ্যে একজন বঙ্গীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধি, আর একজন বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধি।

বোম্বাইয়ের ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

বোম্বাই ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের পূর্বে গঠিত হয়। বোম্বাই শহর সমুদ্রসৈকত বলিয়া তথাকার ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাজটা প্রথমে অপেক্ষাকৃত বেশী কঠিন ছিল। এখন সেখানে সমুদ্রগর্ভ হইতে জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং সহরটিকে প্রাচ্যের সুন্দর সুন্দর শহরগুলির অন্যতম করিয়া তোলার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৩৩ সালে বোম্বাই ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত করা হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের ডকে যে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে একটা বিরাট এলাকায় বহু বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্য হইতে লাভ হইয়াছে এই যে, নূতন পরিকল্পনা লইয়া বোম্বাই নগরীর পুন নির্মান হইবে।

নাগপুর ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

নাগপুর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টও শহরের উন্নতির জন্য বেশ কাজ করিয়াছে। একটা দ্রুত উন্নতিশীল প্রদেশের রাজধানীরূপে সহরটি ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে ও নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই একটা আধুনিক শিল্প প্রধান সহরের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাগপুর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে নগরোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরী করিতে হইতেছে।

বন্দর পরিচালনা

কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি করিয়া পরিচালকমণ্ডলী বা পোর্ট ট্রাষ্ট আছে। সরকারী প্রতিনিধি, ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বণিক সমিতির প্রতিনিধি স্থানীয় কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি এবং ঐ বন্দর ও দেশের ব্যবসায় প্রধান অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগকারী যেসব রেলপথ আছে, সেইসব রেলপথের প্রতিনিধিদেরে লইয়া পোর্ট ট্রাষ্ট গঠিত হয়।

পোর্ট ট্রাষ্টের কাজ হইল, বন্দরের কাজ চালানো, বহির্গামী বা বহিরাগত জাহাজগুলিকে বন্দরের সুবিধাদি দেওয়া, মালপত্র গুদামজাত করা। জাহাজগুলি হইতে মাশুল আদায় করিয়া ও গুদামের ভাড়া হইতে পোর্ট ট্রাষ্টের প্রচুর আয় হয়।

খাদ্য সরবরাহ

শহরে যাহাতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসে ও সেগুলি যাহাতে বিশুদ্ধ হয় সেদিকে নজর দেওয়া মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অন্যতম কর্তব্য।

মিউনিসিপ্যাল আইন এবং খাদ্য ও ঔষধ আইন অনুযায়ী খাদ্য পরিদর্শকদের প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পরিদর্শক বা বিশ্লেষক যদি মনে করেন, কোন খাদ্যে ভেজাল আছে বা অন্য কোন কারণে মনুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয় এবং বিক্রেতাকে মোটা রকম জরিমানা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের চেয়ে জনসাধারণের উপরই বেশী নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, লোকে এখনও ঢাকা না দেওয়া খাবার ও মাছি বসা খাবার খাওয়ার অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং খাবার খোলা রাখিয়া বিক্রী করিলে যে সংক্রামক রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহাও

বোঝে না। দুধের উপর মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বিশেষ ভাবে নজর রাখা উচিত। এইজন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উচিত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করা। এইসব পরিদর্শককে ভাল বেতন দিয়া সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা উচিত।

দুগ্ধ সরবরাহ

আমাদের দেশের শহরগুলিতে, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরগুলিতে দুগ্ধ সরবরাহের সমস্যাটা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। এই সমস্ত শহরে যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই খাঁটি হয় না এবং রোগ বীজাণু ভর্তি থাকে। অথচ দুগ্ধ শিশুদের প্রধান খাদ্য এবং সকল বয়সের লোকদের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর। দুগ্ধ আবার ভেজাল বা মিশ্রিত হইলে টাইফয়েড, উদরাময়, আমাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বিস্তারের কারণ হইতে পারে। সেজন্য অল্প মূল্যে যাহাতে প্রচুর দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেইদিকে যেমন নজর দেওয়া দরকার, তেমনি কি ভাবে সে দুগ্ধ বিক্রয় হইতেছে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

ঘী, তৈল

দুগ্ধের সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করিয়া ঘী, তৈল প্রভৃতি সম্পর্কেও সে কথা বলা যায়। এইসব অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়া দূষিত করিয়া দিবার আশঙ্কা খুব বেশী।

মৎস্য

সম্প্রতি তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার মৎস্যের কারবার ২২ জন আড়ৎদারের একচেটিয়া এবং তাহারা পাঁচ গুণ লাভ রাখিয়া মৎস্য বিক্রয় করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই একচেটিয়া কারবার বন্ধ

করিয়া দিতে পারিলে প্রায় সমস্ত প্রকার মৎস্তের দরই ।৷০ বা ।৷৵০ সেরের বেশী পড়িবে না। বর্তমানে মৎস্তের অত্যধিক মূল্যের জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা একটি প্রধান ও পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

সমবায় পদ্ধতিতে মৎস্তের চাষের প্রবর্তন করিলে মৎস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং মূল্যও কমিতে পারে। তাহা হইলে জনসাধারণ সাধ্যায়ত্ত মূল্যে পর্য্যাপ্ত মৎস্ত পাইতে পারে। এই মৎস্ত রাখিবার ও শীঘ্র চালান দিবারও ব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া মৎস্তধরা জাহাজের সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্ত ধরিয়া অভাবটা কিছুটা দূর করা যাইতে পারে।

গ্রামের সমস্যা

গ্রামগুলির প্রধান সমস্যা হইলে জল সরবরাহ, নর্দমা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি ও গ্রামশিল্পের উন্নতি।

জল সরবরাহ

আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে জলের সমস্যাটা খুব বেশী। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া যায় না এবং গ্রামবাসীদের বহু দূর হইতে জল নিয়া আসিতে হয়।

কাজেই গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। পুকুর কাটা খুব ব্যয়সাধ্য এবং পুকুরের জল সহজেই দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজে কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে প্রচুর পানীয় জল সরবরাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে নলকূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

একবিংশ অধ্যায়

শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশে একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা এতই কম যে, অধিকাংশ লোকের অক্ষর জ্ঞানও নাই।

জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে সম্প্রতি উপলব্ধি করা হইয়াছে। ভারতে এখনও শিক্ষার সমস্যা একটা বড় রকমের সমস্যা। ইহার প্রধান কারণ, ভারতের আর্থিক দুর্গতির সাথে এই সমস্যা জড়িত আছে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

কেন্দ্রীয়

যে সমস্ত অঞ্চল প্রাদেশিক শাসনের অধীন নয়, সে সমস্ত অঞ্চলের (কুর্গ ছাড়া) শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ভারত সরকারের। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গবেষণাগার সমূহ ভারত গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে চলে।

উপরন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ সমগ্র ভারতের শিক্ষানীতি পরিচালনা করেন।

প্রাদেশিক

শিক্ষা প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য, প্রাদেশিক মন্ত্রীরা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা কর্তৃত্ব করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা কর্তৃত্ব করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত গ্রামগুলি।

স্থানীয় কর্মচারিগণ

প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী কর্মচারীদের প্রধান ইহলেন 'ডাইরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসান' (Director of Public Instruction)। তিনি শিক্ষা সচিবের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। তাঁহার অধীনে পরিদর্শক কাজ করেন। সরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও অধ্যাপকগণও প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতে ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী নাগপুর, অন্ধ্র, আগ্রা, আন্নামালাই, ত্রিবাঙ্কুর, হাদরাবাদ, মহীশূর, আসাম, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল, সাগর, রাজপুতানা, গৌহাটী, পূর্ব পাঞ্জাব ও উৎকল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। পরীক্ষা গ্রহণ, উপাধি ও সার্টিফিকেট দানই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণাগার খোলা হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ইতিহাসে হাণ্টার কমিশন (১৮৮২), বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২), স্যাডলার কমিশন (১৯১৭), ও রাধাকৃষ্ণন কমিশনের (১৯৪৮) কথা উল্লেখযোগ্য। কলেজসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমানে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করে ও উপাধিদান করে। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে এখানে স্নাতকোত্তর (post graduate) শিক্ষাদান করা হয়।

বাংলার প্রদেশপাল পদাধিকার বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার (Chancellor)। চ্যান্সেলার ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ করেন। ভাইস-চ্যান্সেলার সিণ্ডিকেটের সভাপতি এবং সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করেন। রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। সিণ্ডিকেট (Syndicate) আবার সিনেটের (Senate) পরিচালনাধীন। সিনেটের অধিকাংশ সদস্যই চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক মনোনীত হন, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটরা কতিপয় সভ্য নির্বাচিত করেন।

কলেজ

ভারতবর্ষে তিন শতাধিক কলেজ আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কলেজসমূহে মোট ১২৮,৮১৪ জন ছাত্র ছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসরে কলেজের শিক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ২০,৫০২ জন পরীক্ষার্থী বি, এ, ও বি, এস, সি, পরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে ৯,৩১৭ বা শতকরা ৪৬ জন অকৃতকার্য হয়। ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ও বি, এস্, সি, তে যথাক্রমে শতকরা ৪৫ ও ৪৬ জন কৃতকার্য হইয়াছে। আই, এ, ও আই, এস্, সি, তে

অকৃতকার্য্যের হার আরও অনেক বেশী। পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশী সংখ্যক ছাত্র অকৃতকার্য হয় না।

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব্ববঙ্গের কলেজসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইয়াছে। গৌহাটিতে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আসামের কলেজ সমূহ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর কলেজ সমূহে বি, এ ও বি, এস্, সি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজসমূহে আই, এ ও আই, এস্, সি পর্যন্ত পড়ান হয়। কতকগুলি কলেজ সম্পূর্ণভাবে সরকারী টাকায় চলে, কতকগুলি সরকারী সাহায্য পায় এবং কতকগুলি ছাত্রবেতন ও জনসাধারণের দানে চলে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী পরিচালনাধীন রহিয়াছে।

শিক্ষকদের বাঁচিবার মত বেতন দেওয়া হয় না, ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে, পাঠ্যতালিকা নানারূপ ত্রুটিপূর্ণ, এই সমস্ত নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। বর্তমানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় নামমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার তদারক করেন। কার্যত পরীক্ষা গ্রহণই এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সামাজিক প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া না তুলিলে শিক্ষার কার্যকরী ফল পাওয়া যাইবেনা। যে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের মিল একেবারেই কম, তাহা সমাজকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারে না।

বাঙ্গালাদেশে ও বাহিরে তিন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে—

মধ্য বাঙ্গলা, মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী। প্রায় সব বিদ্যালয়েই প্রাথমিক শ্রেণীও আছে। মধ্যম পর্যায়ে মাত্র দুইটি ও উচ্চ পর্যায়ে চারটি শ্রেণী আছে।

সম্প্রতি অনেকে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে, উপাধি শ্রেণীতে যোগ দিবার আগে ছাত্রদেরে মোট ১২ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল হইবে চার বৎসর। মাধ্যমিক শিক্ষার আগে পাঁচ বৎসর প্রাথমিক বনিয়াদী ও তিন বৎসর উচ্চ বনিয়াদী বা প্রাক মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতের বর্ত্তমান অবনতির একটি প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, এখানকার কোটি কোটি অধিবাসী নিম্নতম প্রাথমিক শিক্ষাও পায় নাই।

যে রাষ্ট্রে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়, সে রাষ্ট্র কোথাও বড় হইয়া পারে না। কারণ সেই শিশুরা যখন বড় হইয়া উঠিবে, তখন তাহাদের সামান্য অক্ষর জ্ঞানও থাকিবে না। তাহাদের পক্ষে দেশের কোনরকম খবর রাখা সম্ভব হইবে না, নাগরিক হিসাবে তাহারা কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না। এই জন্য ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

আজকাল এই সমস্যার গুরুত্ব প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেন। এখন আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ভারতের অগনিত জনসাধারণের মধ্যে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষায় প্রধান উদ্দেশ্য হইবে, জনসাধারণকে জাতীয়

জীবনের অংশ নিতে ও সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ করিয়া তোলা।

হিসাব করা হইয়াছে যে, ভারতের সর্বত্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে মোট ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট দিল্লীতে পরীক্ষা মূলকভাবে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। এই শিক্ষা বনিয়াদী পদ্ধতিতে চলিবে। প্রথম বৎসর ৬ থেকে ৭ বৎসরের সমস্ত শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষা দেওয়া হইবে ৬ হইতে ৮ বৎসর বয়সের সমস্ত শিশুকে। এই ভাবে পাঁচ বৎসরে ছয় হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবে। তার পরে এই শিক্ষা ১১ বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অন্যান্য স্থানেও এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টও ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এই ধরণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

বনিয়াদী শিক্ষা

বৃটিশ আমলের আগে আমাদের দেশে যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, বৃটিশ শাসনের সময় তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তাহাও আমাদের বিশেষ উপকারে আসে নাই। এতদিনের বৃটিশ শাসনের পর দেশে এখনও এক শত জনের মধ্যে ৮৫ জনের অক্ষর জ্ঞান নেই। অগণিত জনসাধারণের এই নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা দেশের একটা বিরাট বোঝা।

এই জন্য ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনার অংশরূপে সার্জেণ্টকমিটি রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ৬ হইতে ১৪ বৎসর

বয়স্ক শিশুদেরকে বাধ্যতামূলক বনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই বনিয়াদী শিক্ষা বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা প্রথমতঃ মহাত্মা গান্ধীর উদ্ভাবিত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাকির হুসেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল হাতের কাজের মধ্য দিয়া একটা প্রাণবন্ত শিক্ষা দেওয়া। সুতাকাটা, কাপড় বোনা, ছুতারের কাজ, বাগান করা বা এই ধরণের কোন কাজকে অবলম্বন করিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ সম্পর্কে উপায় ও পথ নির্দ্ধারণের জন্য ভারত সরকার মাননীয় শ্রীযুক্ত বি, জি, খেরের সভাপতিত্বে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, দুইটি পঞ্চবার্ষিক ও ষড় বার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে ১৬ বৎসরের মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই শিক্ষার শতকরা ৭০ ভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার এই শিক্ষার শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় বহন করিবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বিগত জানুয়ারী মাসের (১৯৪৯) অধিবেশনে সামান্য সংশোধন করিয়া এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু কেন্দ্রে ও প্রদেশের আর্থিক অনটনের জন্য সমগ্র পরিকল্পনায় হাত না দিয়া আংশিকভাবে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। বনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষকদের ট্রেণিংএর নিমিত্ত প্রদেশসমূহের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ভারত সরকার শ্রীযুক্ত মোহনলাল শকসেনার সভাপতিত্বে আরেকটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১২ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের শতকরা ৪০ জনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে

অবিলম্বে এক সর্ব্বোদয় শিক্ষার (social education) কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্র ও প্রদেশ সমানভাবে এই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ডের জানুয়ারী (১৯৪৯) অধিবেশনে অল্পবিস্তর সংশোধনসহ এই সুপারিশও গৃহীত হয়। এই ভাবে ১৯৪৯ সালের প্রথম ভাগে পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র পরিকল্পনায় হাত দেন নাই। তবে সামাজিক শিক্ষার কাজ আরম্ভের জন্য প্রদেশসমূহকে এক কোটি টাকা দেওয়া হইবে। সেই অর্থানুকুল্যে বয়স্ক নারীদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

নিরক্ষরতা—বয়স্ক শিক্ষা

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশে পাঁচ বৎসরের উপরে যাহাদের বয়স হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪'৬ জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। একমাত্র কেরল ছাড়া আর সর্বত্র স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার অনেক বেশী।

অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের মধ্যেও অনেকে আবার চর্চার অভাবে কিছু দিনের মধ্যেই এই সামান্য শিক্ষাও ভুলিয়া যায়। হার্টগ কমিটির তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা যে হারে বাড়িয়াছে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের হার সেই অনুপাতে বাড়ে নাই; তাহার কারণ অধিকাংশ ছাত্রই প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির নিম্নতম কয়েকটী শ্রেণীর উপরে আর বেশী পড়ার সুযোগ পায় না। এই স্বল্প শিক্ষা লইয়া তাহারা ক্ষেতের কাজে লাগিয়া পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই অক্ষর জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। শিক্ষার দিক দিয়া ও অর্থব্যয়ের দিক

দিয়া ইহা এক বিরাট অপচয়। এই জন্য হার্টগ কমিটী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্তটাই অপচয় আর নিরর্থক।

এই নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যেমন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন রূপ দিতে হইবে। বালকবালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে, তেমনি বয়স্কদের মধ্যেও বস্তুতঃ পক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে বয়স্কশিক্ষা একটী প্রধান অস্ত্র। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও জাতিহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়া কাজে নামা উচিত।

বয়স্কশিক্ষা বিস্তারের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা বোর্ডের একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রম স্থির করিয়াছেন। এই কার্যক্রম অনুযায়ী আগামী তিন বৎসরের মধ্যে দেশের অন্ততঃ অর্ধেক লোককে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করিয়া তোলার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অক্ষর জ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা একই সাথে চলিবে। তবে সাধারণ শিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে এই উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় সেজন্য সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করা হইবে। সাধারণ কাজ করার জন্য বা কেবলমাত্র অবসর সময়ে কাজ করার জন্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হইবে। কলকারখানায় মালিকদের তাহাদের শ্রমিকদের পরিবারের লোকদের শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত শ্রমিককে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করিয়া তুলিতে মালিকদের বাধ্য করিবেন। রেডিও, ফিল্ম, নাটক প্রভৃতির সাহায্যও এই কাজে গ্রহণ করা হইবে।

লোকে যাহাতে শিক্ষা ভুলিয়া না যায়, সেজন্য ক্লাব, আলোচনাসভা প্রভৃতির দ্বারা তাদের আগ্রহ জাগাইয়া রাখা হবে।

'সামাজিক শিক্ষা বোর্ড' নামে একটি বোর্ড এই কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ও সামঞ্জস্য বিধান করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশে

ও রাজ্যমণ্ডলে গভর্ণমেণ্টগুলিকে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে বলা হয়। যদি এইসব পরিকল্পনা ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করে তাহা হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করিবেন। শিক্ষার দিক দিয়া অনগ্রসর বা দরিদ্র অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রের এই অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে, ছাত্রগণকে, সরকারী কর্মচারীদের ও অন্যান্য শিক্ষিত লোকদিগকে বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে সমস্ত প্রদেশে ও রাজ্যমণ্ডলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট দিল্লীতে বয়স্ক শিক্ষার একটি কার্যক্রম হাতে লইয়াছেন। এই কার্যক্রম ফিল্ম, ম্যাজিক, লণ্ঠন, রেডিও, নাটক প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। বয়স্ক বিদ্যালয় গুলিকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে সুষ্ঠু সমাজজীবন গড়িয়া উঠিতে পারে সেইজন্য নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ, নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শিক্ষার ব্যয়ভার

ভারতে বর্তমানে শিক্ষা বাবদ ব্যয় হয় মোট প্রায় ৩০ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট দেন ১৭॥ কোটি টাকা। সার্জেণ্ট কমিটির রিপোর্টে শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১৫ গুণেরও বেশী বাড়াইবার সুপারিশ করা হইয়াছে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৩১৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট দিবেন ২৭৭ কোটি টাকা।

অন্যান্য বিভাগে ব্যয় কিছু কিছু কমাইয়া এবং কর ধার্য করার নূতন পথের সন্ধান করিয়া শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হইবে।

সমস্যাটা এত বিরাট যে রাষ্ট্রকে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

হার্টগ কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, শিক্ষাকে কেন্দ্রায়ত্ত করিতে হইবে অর্থাৎ শিক্ষানীতি পরিচালনা করাটা ভারত গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব হইবে। তাহা হইলে বর্তমান ব্যবস্থার অপচয় অনেকটা কমানো যাইতে পারে।

শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা

সার্জেণ্ট কমিটির রিপোর্ট

সার্জেণ্ট কমিটির সুপারিশগুলি এই :—

(ক) ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক সমস্ত বালকবালিকার জন্য বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়া ভারতের অন্যস্থানগুলির জন্য এই বাবদ ব্যয় হইবে বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা।

(খ) বনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ।

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার—উচ্চ বিদ্যালয় দুই ধরণের থাকিবে—সাধারণ ও কারিগরী। যে সকল ছাত্রের সাধারণ শিক্ষা লাভ করিলে লাভ হইবে তাহারা সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হইবে। নিজেদের টাকা না থাকার দরুণ তাহাদের উচ্চশিক্ষার পথে বাধা চলিবে না। প্রত্যেক পাঁচজনের মধ্যে একজন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি-হইবে। প্রয়োজনক্ষেত্রে সরকারী অর্থসাহয্য করা হইবে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইণ্টারমিডিয়েট হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে (যেমন দিল্লীতে আছে)। উচ্চ বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র আরও শিক্ষা গ্রহণ করিলে ভাল হইবে বলিয়া মনে হইবে, তাহারা কলেজে ভর্তি হইবে। কলেজে তিন বৎসর পড়ার পর উপাধি পরীক্ষা নেওয়া হইবে।

(চ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজন সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহায্যদানের সুপারিশ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় বরাদ্দ কমিটি (University Grants Committee) গঠন করা হইবে।

(ছ) শিক্ষকদের আরও বেশী বেতন দিতে হইবে এবং তাঁহাদের মর্য্যাদা ও দায়িত্ব উন্নত করিতে হইবে। ৫ কোটি ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ১৮ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন, তজ্জন্য আরও বেশী সংখ্যায় শিক্ষয়িত্রী ও ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন।

(জ) শারীরিক শিক্ষার উপর আরও গুরুত্ব দিতে হইবে।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত নিয়োগ কেন্দ্রের (Employment Bureau) সাহায্যে শিক্ষিত বেকারদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনা (যুদ্ধপূর্ব্ব লোকসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী):

	লক্ষ টাকা
বনিয়াদী শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)—	২০০,০০
প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা·······················	৩,২০
টেক্‌নিক্যাল ও কমার্সিয়াল·················	১০,০০
বয়স্কদের শিক্ষা···························	৩,০০
শিক্ষকদের ট্রেনিং·························	৬,২০

বোম্বাই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রাক্-যুদ্ধ হারে ৮৬ কোটি টাকা প্রয়োজন, বর্ত্তমানে ব্যয় ৩০০% গুণ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ৩৪৪ কোটি টাকা লাগিবে।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা—বনিয়াদী শিক্ষা

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যস্মৃতির সহিত বিজড়িত। এই পরিকল্পনা অনেকাংশে তাঁহার আদর্শানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের

সুপারিশ করিয়াছে। জাকির হুসেন কমিটি এই পরিকল্পনাকে রূপ দিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রম, বাস্তব জীবন ও পুথিগত শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার অবসান করিয়া বাস্তব জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ইহার উদ্দেশ্য। আরও ব্যাপক ভাবে বলিতে গেলে—ভারতবর্ষে গ্রাম ও নগরের মধ্যে ব্যবধান দূর করাও এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষার আদর্শের সহিত মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনেক মিল রহিয়াছে। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, কর্ম্মজীবনে প্রয়োগের জন্য শিক্ষাদান, হাতে কলমে কাজ করার মধ্য দিয়া শিক্ষা-গ্রহণ, সকলের সেবার জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শ্রমের সদ্ব্যবহার এবং এক সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনই মহাত্মাজীর শিক্ষার মূলনীতি।

কিন্তু সোভিয়েট শিক্ষা-ব্যবস্থা ধর্ম-নিরপেক্ষ। রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার ব্যয় বহন করে। সেখানে সকল পর্যায়ে সকল বিষয়ে ছেলে-মেয়েদের একত্র পড়িবার ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় ৮ হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের স্কুলের শিক্ষা দেওয়া হয়, এই পর্যায়ে কোনরূপ পরীক্ষা গ্রহণ বা শাস্তিদান করা হয় না। কেবল তাহাই নহে, তিন বৎসর হইতে ৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেশের সকল ছেলেমেয়েদের প্রাক্-স্কুল শিক্ষাদান করা হয়।

১৮ বৎসর হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণ তরুণীদের কার্যকরী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা (vocational scientific training) দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশগুলিতে মুষ্টিমেয় ছাত্র বৃত্তি ও ভাতার সাহায্যে এই শিক্ষা গ্রহণ করে। সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রত্যেকটি সক্ষম তরুণ তরুণীর জন্য এইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। মার্কিন রাষ্ট্রে, ফ্রান্সে ও বৃটেনেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ক) জাতীয় শিক্ষা

বৃটিশ রাজত্বে জাতীয় শিক্ষার দাবী ও আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এই আন্দোলনই বাংলার জাতীয় শিক্ষা সভার (National Council of Education) জন্ম দিয়াছে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষা-দানের জন্য দেশের নানা স্থানে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী, হরিদ্বারে গুরুকুল, হাকিম আজমল খাঁর জাতীয় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ জাকির হুসেনের জামিয়া মিল্লিয়া (Jamia Millia) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহের নিদর্শন।

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা

যে শিক্ষা মানুষকে জীবিকার জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, যে শিক্ষার সাহায্যে কোন বৃত্তি (occupation) সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করা যায়, তাহাই বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational Education)।

গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষা সাধারণ জীবনের কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে প্রায় কিছুই সাহায্য করে না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের অসন্তোষও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে। তজ্জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার দাবী প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হইতেছে।

উড এ্যাণ্ড এ্যাবট রিপোর্টে (১৯৩৭) এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কুটির শিল্পের দক্ষ

কারিগর ও যোগ্য পরিচালক প্রভৃতির প্রয়োজন আমাদের দেশেই সবচেয়ে বেশী, এইজন্য এইসব বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের যে সুযোগ বর্তমানে আছে তাহা বহু গুণে বৃদ্ধি করা দরকার।

ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, ও পশ্চিম ভারতে চারটি বড় বড় কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপন করা হইবে। ইহার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের শিক্ষালয় দুইটির স্থান নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি কলিকাতা হইতে ৭৩ মাইল দূরে বাঙ্গালা-বিহারের সীমান্তে হিজলীতে এবং দ্বিতীয়টি বোম্বাইয়ের নিকট উত্তর কুরলায় স্থাপিত হইবে। এই দুইটিতে ৩ হাজার করিয়া ছাত্র ভর্তি হইতে পারিবে এবং প্রত্যেকটির জন্য ব্যয় হইবে এককালীন ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক ৪৪,৬১,০০০ টাকা। বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা দিবার জন্য বর্তমানে এই সব প্রতিষ্ঠান আছে :—

পুনায়, নাগপুরে ও কয়ম্বাটুরে কৃষি কলেজ আছে। ইহা ভিন্ন সকল প্রদেশে কৃষি বিদ্যালয় ও দিল্লীতে কৃষি গবেষণাগার আছে।

বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান গবেষণাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিবপুর, রুড়কী, বারাণসী, পুনা, মাদ্রাজ ও পাটনায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে। যাদবপুর কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল আছে।

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে ৪৫টি শিক্ষালয় আছে।

আইন শিক্ষা দিবার জন্য ১৫টির বেশী শিক্ষালয় আছে, আইন শিক্ষালয় আর প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিল্প শিক্ষালয় আছে। তবে এইগুলির সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, আর কয়েকটি জনসাধারণের টাকায় চলে। বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইনষ্টিট্যুট, কাণপুরের ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং জামসেদপুরের ইনষ্টিটিউট অব মেটালারজি নামকরা

প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ে ও অন্যান্য কারখানায়ও কাজ শিক্ষার কিছু কিছু সুযোগ দেওয়া হয়। ধানবাদে বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষা লাভের সুযোগও এখন বাড়িয়াছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও নানারকম হাতের কাজ শিখাবার জন্যও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানে সামান্যসংখ্যক ছাত্রেরই স্থান হয় এবং এইসব শিক্ষাও ব্যয়সাধ্য।

কৃষি, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আমাদের দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবেশেচ্ছু ছাত্রদের স্থান না পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

স্ত্রীশিক্ষা

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হওয়ায়, বাল্য-বিবাহের প্রচলন কমিয়া যাওয়ায় ও পর্দ্দার কড়াকড়ি হ্রাস পাওয়ায় স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনও বাড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় নিতান্ত কম।

চিন্তা করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দেওয়া পুরুষদের চেয়ে বেশী প্রয়োজন; কারণ স্ত্রীলোকের শিক্ষার অর্থ মাতার শিক্ষা। কাজেই সমগ্র দেশের কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে একটি বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা একটি বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা চেয়ে সমাজের দিক হইতে বেশী লাভজনক।

ভারতবর্ষে মেয়েদের জন্য পৃথক কয়েকটি কলেজ মাত্র আছে। বাঙ্গালাদেশে এই ধরণের কলেজের সংখ্যা ১২টি। তাছাড়া, ১৪টি কলেজে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও পড়িতে পারে। প্রধানতঃ অর্থাভাবের দরুণ বর্ত্তমানে বেশী সংখ্যায় মেয়েদের কলেজ স্থাপন করা

সম্ভব হইতেছে না; কাজেই ছেলেদের কলেজে আরও বেশী সংখ্যায় তাদেরকে স্থান দেওয়া হচ্ছে।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক জেলায়ই একটি করিয়া উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষালাভের সুযোগ খুব কম।

শারীরিক শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ আমাদের ছাত্রছাত্রীগণকে শারীরিক শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বেশী করিয়া অনুভব করা যাইতেছে এবং প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চ্চার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করার দাবী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল প্রত্যেক প্রদেশেই একজন করিয়া বেতনভোগী কর্ম্মচারী আছেন শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য। কলিকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার জন্য ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শারীরিক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

ছাত্ররা যাহাতে সমরবিদ্যা ও অস্ত্রচালনা শিখিতে পারে সেজন্য জাতীয় সমরশিক্ষার্থী বাহিনী গঠন করা হয়েছে ও স্থানে স্থানে রাইফেল ক্লাব স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রদেশসমূহে শিক্ষার প্রগতি

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আসাম প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে ৩০টি অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। প্রদেশের প্রত্যেক মহকুমায় নির্দ্দিষ্ট দুইটি অঞ্চলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এইভাবে

প্রদেশের এক পঞ্চমাংশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও ১১৫০টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপজাতীয় অঞ্চলেও শিক্ষা বিস্তারের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাস হইতে এখন পর্য্যস্ত ৬টি বনিয়াদী ট্রেণিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিহারে ৬ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যস্ত বালকবালিকাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করিয়া আইন পাশ হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন বোম্বাই সরকার ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে কার্য্যকরী করিয়াছেন। এই আইন আংশিক শাসন-বহির্ভূত এলাকায়ও প্রযোজ্য হইবে। বর্ত্তমানে আরও তিনটি ট্রেণিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৪৫১টি শিবির স্থাপন করা। ৪১,২৭৪ জন পুরুষ ও ২০,৯২৪ জন নারী শিক্ষালাভ করিতেছে।

মাদ্রাজে প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযোগী ৭০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৫ লক্ষ স্কুলে যাইতেছে। বাকী ৩৫ লক্ষ আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে স্কুলে যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ফলে মাদ্রাজে ৬ বৎসর হতে ১১ বৎসর বয়সের প্রত্যেক বালকবালিকা স্কুলে যাইবে এবং অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করিবে।

গত সাত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

"ভারতের জনস্বাস্থ্য একটী খুব বড় সমস্যা। জন্ম, মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ভয়ঙ্কর রকমের বেশী। ইহার প্রধান কারণ জনসাধারণের দারিদ্র্য, বাল্য বিবাহ প্রথা, মায়েদের নিরক্ষরতা, সন্তান জন্মের সময় চিকিৎসার অভাব, খাদ্যের অভাব, প্রসব মুহূর্ত পর্যন্ত মায়েদের শারীরিক শ্রম।"

জনস্বাস্থ্য—প্রাদেশিক শাসনাধীন বিষয়

জনস্বাস্থ্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির শাসনাধীন বিষয়। তবে এবিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেরও কতকগুলি দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বগুলি হইতেছে, "প্রধানতঃ গবেষণা সম্পর্কে সাহায্য ও পরামর্শ দান, সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত যেসব কাজ হয় তাহাতে যোগ দেওয়া।" মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট সহর ও পল্লী অঞ্চলের জন্য স্বাস্থ্য কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড এ্যাসোসিয়েশন, সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট ও অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিট্যুট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্‌থের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রদেশগুলিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা পরিচালনা করার ভার প্রাদেশিক মেডিক্যাল সার্ভিসের কোন কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে। বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই পদের নাম সার্জন জেনারেল, অন্যান্য প্রদেশে

তাঁহাকে ইনস্পেক্টর জেনারেল অব সিভিল হস্‌পিটাল্‌স্‌ বলা হয়। প্রদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা দুইই তাঁহার তত্ত্বাবধানে চলে।

জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ দেখাশুনা করেন ডিরেক্টর অব পাব্লিক হেল্‌থ্‌। ইহারা দুইজনই বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীন।

প্রত্যেক জেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত একজন করিয়া সিভিল সার্জন আছেন। তাঁহারা সার্জন জেনারেলের অধীন। সিভিল সার্জনকে সহায়তা করার জন্য সদর ও মহকুমা সরকারী হাসপাতালগুলিতে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন ও সাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন আছেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ হাসপাতাল ও ঔষধালয় পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করাও সিভিল সার্জনের কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেখাশুনা করার কাজে ডিরেক্টর অব পাব্লিক হেল্‌থ্‌কে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর আছেন। তাছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মচারীরাও তাঁহার কাজে সহায়তা করেন।

সার্জন জেনারেলের কাজ হইল—রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর ডিরেক্টর অব পাব্লিক হেল্‌থের কাজ হইল রোগ নিবারণ সংক্রান্ত। পূর্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করিলে যেসব রোগ সহজেই নিবারণ করা যায়, সেসব রোগেও আমাদের দেশে অনেক লোক মারা যায়। ডিরেক্টর অব পাব্লিক হেল্‌থ্‌কে এই সমস্যার দিকে নজর দিতে হয়। তাই তাঁহার কাজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য কয়েকটি সরকারী চিকিৎসালয় আছে। পশুদের চিকিৎসার জন্যও কয়েকটি পশু চিকিৎসালয় আছে।

বড় বড় শহরগুলিতে সরকারী হাসপাতাল ব্যতীত জনসাধারণের দানে চালিত বহু হাসপাতাল আছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র ও পশুচিকিৎসা বিদ্যাতে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে কয়েকটি কলেজ ও স্কুল আছে। প্রায় সবগুলি স্কুল কলেজই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ভোর কমিটি

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করার জন্য ভোর কমিটি নামে পরিচিত যে কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে দেশের বর্ত্তমান অকিঞ্চিৎকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করার সুপারিশ করা হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে—জনস্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে এই সব ব্যবস্থা হওয়া চাই—স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক, উপযুক্ত পুষ্টি, যতই ব্যয় হউক সকল লোকের যাহাতে রোগে চিকিৎসা হয় ও রোগ নিবারণের ব্যবস্থা হয়।

ডাঃ জে, বি, গ্র্যাণ্টের হিসাবে প্রকাশ, ভারতে মাত্র ৬৫০০ ঔষধালয় ও হাসপাতাল আছে। দেশের অগণিত জনসাধারণ কোনরকম চিকিৎসার সুযোগ না পাইযাই মারা যায়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল লেঃ জেনারেল জে বি হ্যান্সের মতে প্রতি ১৭০০ লোকের জন্য ১জন ডাক্তার প্রয়োজন। এই হিসাবে ভারতে ৩ লক্ষ ডাক্তার থাকা দরকার (বর্ত্তমান সংখ্যা মাত্র ৪০,০০০)। প্রতি ৫০ জন লোকের জন্য ১জন হিসাবে শুশ্রূষাকারিণী চাই মোট ৭,৭৮,০০০ জন (বর্ত্তমানে আছে মাত্র ৭,০০০), স্বাস্থ্য পরিদর্শক চাই ৭০,০০০ জন (বর্ত্তমানে আছে মাত্র ১০০০ জন), ধাত্রী চাই ৯০,০০০ জন (বর্ত্তমানে আছে মাত্র ৫,০০০ জন) কম্পাউণ্ডার দরকার ১,০০,০০০ জন দাঁতের ডাক্তার চাই ১,২০,০০০ (বর্ত্তমানে আছে মাত্র ১,০০০)।

জনস্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা

ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহা হইতেই এদেশের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে জানা যায়। ভারতে স্বাস্থ্যের মান অত্যন্ত নীচু। ১৮৮১ সালে ভারতবাসীদের গড় আয়ু ছিল ৩০ বৎসর, ১৯৩১ সালে সেটা কমিয়া ২৭ বৎসর হইয়াছে। অথচ ইংলণ্ডে ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকদের আয়ু গড়ে যথাক্রমে ৬৩ ও ৬৭ বৎসর।

১৯৩১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৪১ সালে সেটা বাড়িয়া হইয়াছে ৪০ কোটি।

পুষ্টি ও জনসংখ্যা

বৎসর বৎসর এত বেশী সংখ্যায় লোক বাড়িতে থাকায় এবং মৃত্যুর হার এত বেশী হওয়ায় আমাদের দেশে চিন্তাশীল লোকেরা খাদ্য সরবরাহ ও জনসাধারণের পুষ্টি সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতে মৃত্যুর হার গড়ে প্রতি হাজারে ২১.৮, ইংলণ্ডে ১২.৪, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১১.২, অষ্ট্রেলিয়ায় ৯.৪।

মাথা পিছু খাদ্য বরাদ্দ খুব অল্প করিয়া ধরিলেও দেখা যায়, ১৯৩৯-১৯৪৩ সালে গড় বার্ষিক উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ২২½ ভাগ কম হইয়াছে।

শিশু মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যু

ভারতে শিশু মৃত্যুর হার অত্যধিক বেশী। ইহার প্রধান কারণ ধাত্রীদের অজ্ঞানতা। ভারতে শতকরা ২৪.৩টি শিশু এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই মারা যায়। এই বয়সের শিশু ইংলণ্ডে মারা

যায় শতকরা ৬'৮টি। ভারতে প্রতি বৎসর ২ লক্ষ স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। ধাত্রীবিদ্যায় উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে মহামারীতে লোকক্ষয়

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এদেশে ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কলেরা রোগে মারা গিয়াছে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোক, প্লেগে মারা গিয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক, ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গিয়াছে ১ কোটি ৪০ লোক, ম্যালেরিয়ায় ৩ কোটি লোক। যে সব রোগ নিবারণ করা যায়, কেবল সেইসব রোগেই মারা যায় বৎসরে আনুমানিক ৫০,৬০ লক্ষ লোক। রোগের দরুণ শ্রমিকদিগকে বৎসরে গড়ে তিন সপ্তাহ কাজে অনুপস্থিত থাকিতে হয়। পুষ্টির অভাব ও রোগের দরুণ তাহাদের কর্মক্ষমতা শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া যায়।

কলেরা, প্লেগ ও বসন্ত

কলেরা রোগের বীজাণু জলের মধ্য দিয়া ছড়ায়। কাজেই জল বীজাণুমুক্ত করিলে এই রোগ ছড়াইবার আশঙ্কা বেশী থাকে না। বিনা-মূল্যে প্রতিষেধক টিকা নিলে, পুকুর, কুয়া; ও স্নানের ঘাটগুলিকে বীজাণুমুক্ত করিয়া দিলে এই রোগ নিবারণ করা সহজ হয়। বসন্ত অত্যন্ত মারাত্মক ও সংক্রামক রোগ। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টিকা নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রচার কার্য হওয়ায় লোকে এখন ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ রোগে এখনও এদেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে।

ম্যালেরিয়া

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলগুলিতে ম্যালেরিয়াই প্রধান রোগ। জাতিসংঘের ম্যালেরিয়া কমিশনের এক হিসাবে প্রকাশ, পৃথিবীর সমগ্র লোক-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এই রোগে ভোগে।

বাঙ্গলাদেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাবল্য খুব বেশী। প্রত্যেক বৎসর এখানে এই রোগে সাড়ে তিন চার লক্ষ লোক মারা যায়। ভারতে প্রতি বৎসর ১ কোটি লোক এই রোগে ভোগে ও ১০ লক্ষ লোক মারা যায়।

ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত লোকেরা দুর্ব্বল, প্রাণহীন ও শক্তিহীন হইয়া যায়। এই রোগ আমাদের জাতির অভিশাপস্বরূপ, এই রোগ আমাদের প্রাণশক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কৃমি রোগও দেশের বহু লোকের শারীরিক ও মানসিক জড়তার জন্য দায়ী। কালাজ্বরের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় এই রোগ আজকাল আয়ত্তে আসিয়াছে।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মারোগ সম্প্রতি ভয়ঙ্কর বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ইহা ভারতের একটা বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে সহরবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭ জন, কারখানা এলাকার লোকদের মধ্যে শতকরা ৪ জন ও পল্লীবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬জন যক্ষ্মারোগে ভোগে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, ভারতে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে প্রাণ হারায়।

ভারতে জনস্বাস্থ্যের ভবিষ্যৎ

জনস্বাস্থ্যের সমস্যা বস্তুতঃপক্ষে ভারতের সবচেয়ে জরুরী সমস্যা। এবিষয়ে অনেক অগ্রগতি হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোকের বৈষয়িক

অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ও এদেশের স্ত্রীলোকরা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি না করা পর্যন্ত এদিক দিয়া অবস্থার আর বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

গত ৮০ বৎসরে ইংলণ্ড এই দিকে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। ভারতে জনমত উদ্বুদ্ধ হইলে, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইনকানুনগুলি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করিলে, কেন্দ্রীয় সাহায্যবোর্ড গঠন করিলে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলির দিকে আরও মনোযোগ দিলে ও আরও অর্থব্যয় করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনেকটা সহায়তা হইবে।

বিশুদ্ধ খাদ্য

জনস্বাস্থ্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ, খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ ভাবে আটা, ময়দা, তেল, ঘী ও দুধে ভেজাল দেওয়া। অন্য কোন সভ্য দেশে এত ব্যাপকভাবে ভেজাল দেওয়া হয় না এবং ভেজাল দিয়া শাস্তিও এড়াইয়া যাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ খাদ্য ও ঔষধ সংক্রান্ত আইন আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার।

বিশুদ্ধ জল

কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময় ও আমাশয় রোগের বীজাণু ছড়ায় প্রধানতঃ জলের মধ্য দিয়া। স্নান করিয়া কাপড় কাচিয়া, মৃতদেহ ফেলিয়া প্রায়ই জল দূষিত করা হয়। সহরগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় এইসব রোগের বিস্তার বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। মফঃস্বলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে জেলাবোর্ডগুলি হাজার হাজার নলকূপ বসাইতেছে। পানীয় জলের পুকুর আলাদা করিয়া রাখা হইতেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব খুব বেশী এবং সেই কারণ মহামারী আকারে রোগ দেখা দেয়।

গ্রামাঞ্চলের জনস্বাস্থ্য

ভারতের শতকরা ৮০ জনেরও বেশী লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। কাজেই জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনায় গ্রামের দাবী অগ্রগণ্য।

আমাদের স্বাস্থ্যহানির মূলে জনসাধারণের যে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে পারে একমাত্র দেশের গভর্ণমেণ্ট। অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে, জনসাধারণের এবিষয়ে উদ্যোগী হইবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে একথা সত্য যে, প্রকৃত সমাধান যদি করিতে হয়, তাহা সামান্য বেসরকারী সামর্থ্যের উপর ভরসা করিয়া থাকিলে চলিবে না, গভর্ণমেণ্টকেই প্রধানতঃ উদ্যোগী হইতে হইবে।

২। ময়লা জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা

গ্রামাঞ্চলে ময়লা জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করার প্রশ্নটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বর্তমানে এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইতেছে না। এই ব্যবস্থা করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে সাধারণতঃ এত অর্থ থাকে না, যাহা দিয়া তাহারা রীতিমত ব্যবস্থা করিতে পারে। অথচ, এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে করিতে পারার উপর ম্যালেরিয়া নিবারণ ও কৃষির উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

সমগ্র প্রদেশের ময়লা জল নিষ্কাষণের সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত এবং এতদুদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করা উচিত।

৩। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে যথেষ্ট টাকা না থাকায় এই বিষয়টা উপেক্ষিতই হইতেছে।

গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা করিলে তাহার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাসীদের মধ্যে জনস্বাস্থ্যের সম্পর্কে চেতনা জাগাইয়া তোলা, প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, ম্যালেরিয়া কৃমি ও কলেরা প্রভৃতি জলাগত রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করা।

গ্রাম ও সহর উভয় অঞ্চলেরই আর একটী বড় সমস্যা হইতেছে শিক্ষাসমস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার আশু দায়িত্ব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির।

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি নির্দেশ

১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারী ভারতীয় গণ-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, "এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিবার এবং উহার ভবিষ্যৎ শাসন-পরিচালনার জন্য একটী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার দৃঢ় ও সুপবিত্র সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে; যদ্দারা বৃটিশ ভারত, ভারতীয় রাজ্যসমূহ এবং অন্যান্য যে সকল এলাকা স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতীয়রাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সকলের সমবায়ে একটী যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে; এবং উল্লিখিত এলাকাসমূহ তাহাদের বর্তমান সীমানা-অনুযায়ী অথবা এই গণ-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা-অনুযায়ী এবং ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে অ-নির্দেশিত বিষয়-সম্পর্কিত অধিকারসহ, স্বায়ত্ত-শাসনশীল গভর্ণমেণ্টের সমস্তবিধ ক্ষমতা সম্ভোগ করিবে এবং শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি অনুষ্ঠান করিবে; কেবল ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে স্বতই যে সমস্ত ক্ষমতা বর্তাইবে বা দেওয়া হইবে বা উহা হইতে উদ্ভূত হইবে সেই সকল ক্ষমতা সম্ভোগ করিতে পারিবে না; এবং এই স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষে ও উহার সহিত সংযুক্ত স্ব-শাসিত এলাকাসমূহে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হইবে জনসাধারণ; এবং যদ্দারা ভারতের সমস্ত নরনারী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে ন্যায়-বিচার, ও সমান মর্যাদা, সুযোগ এবং আইনগত সাম্য ভোগ করিতে এবং সাধারণ নীতিবোধ ও আইনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহারা বাক্যে ও কার্যে, চিন্তায়, বৃত্তিতে, সভাসমিতি করিবার অধিকারে, ধর্মবিশ্বাসে ও

উপাসনায় স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবে ; যদ্বারা সংখ্যালঘুদের, অনুন্নত ও উপজাতিসমূহের, এবং নির্যাতিত ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের স্বার্থরক্ষার জন্য যথেষ্ট সংরক্ষণ-ব্যবস্থা থাকিবে ; এবং যদ্বারা সভ্য জাতিসমূহের বিধান ও ন্যায়ানুবর্তিতার আদর্শ অনুযায়ী জলে, স্থলে ও আকাশপথে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও উহার সার্বভৌম অধিকার রক্ষা করা হইবে ; এবং যদ্বারা এই সুপ্রাচীন মহাদেশ পৃথিবীতে তাহার যথাযোগ্য গৌরবের আসন গ্রহণ করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার কল্যাণকল্পে স্বেচ্ছায় পূর্ণ সহযোগিতা করিবে।"

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুবিচার ও সমানাধিকার লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনা করা হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিকের **মৌলিক অধিকারসমূহ** এইরূপ :

ধর্ম, জাতি, বর্ণ অথবা স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে রাষ্ট্র সকল নাগরিক সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করিবে।

প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ স্বীকৃত হইবে :

(ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ;

(খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সভা সমিতি করার অধিকার ;

(গ) সঙ্ঘ গঠনের অধিকার ;

(ঘ) ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গতিবিধির স্বাধীনতা ;

(ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে ভারতীয় নাগরিকের স্থায়ী বসবাসের স্বাধীনতা ;

(চ) সম্পত্তি লাভ, ভোগ এবং বিতরণের অধিকার ;

(ছ) যে কোনরূপ চাকুরী বা ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইবার যথাযোগ্য অধিকার।

ধর্মসম্পর্কিত অধিকার—প্রত্যেক নাগরিকই বিবেকের স্বাধীনতা পোষণের অধিকারী এবং প্রত্যেকেরই ধর্মমত পোষণ, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মমত প্রচারের অধিকার আছে। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় বা অংশ (ক) ধর্মকার্য ও দাতব্য উদ্দেশ্যে কোন প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, এবং (ঘ) ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে নিজেরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। (গ) স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার ও ভোগ করিতে পারিবেন।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অধিকার—ভারতের নাগরিকদের যে কোন অংশে যদি নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি থাকে, তবে তাহা সংরক্ষণের অধিকার তাহাদের আছে।

ধর্ম, ভাষা বা সম্প্রদায় ভিত্তিতে যাহারা সংখ্যালঘু, তাহাদের সরকারী বিদ্যায়তনে প্রবেশাধিকার থাকিবে।

সম্পত্তির অধিকারী—আইনসম্মত ব্যবস্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তিচ্যুত করা হইবে না।

ভারতের বৈদেশিক নীতি

ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্য জাতি। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতবর্ষের বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

ভারতবর্ষ সকল দেশের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের বিশ্বাসী।

ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ এশিয়ায়, য়ুরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের সহিত নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

কমনওয়েলথ ও ভারত

ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণের জন্য ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। কমনওয়েলথের সদস্য থাকিয়াও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেকে সার্বভৌম, স্বাধীন, সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্তের ফলে যে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয় তাহা সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল। অন্যান্য ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রের মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলেই নূতন মর্যাদা-সম্পন্ন স্বাধীন, সার্বভৌম ভারতবর্ষের সদস্যপদ মানিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষও ইংলণ্ডের রাজাকে কমনওয়েলথের স্বাধীন সদস্যদের স্বেচ্ছাকৃত মিলনের যোগসূত্রের প্রতীক এবং তাঁহাকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

কমনওয়েলথের সদস্যদের এক যুক্ত ঘোষণাতে বলা হয় :

(১) ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে সর্বপ্রকার বাণিজ্যসংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করিতে থাকিবে,

(২) "ডোমিনিয়ন" শব্দ পরিত্যাগ করা হইবে ও সরকারীভাবে ব্যবহার করা হইবে না ;

(৩) কমনওয়েলথের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকরা পূর্বের মতই সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন ;

(৪) ভারতবর্ষ সাধারণতন্ত্র হওয়ার পর রাষ্ট্রপাল আর রাজার প্রতিনিধি থাকিবেন না। তিনি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইবেন।

ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্য থাকিলেও আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে কার্যত সম্পূর্ণ স্বাধীন।

রাজা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন, ইহা স্থির যে রাজার কোন কাজ নাই, একটি বিশেষ মর্যাদা মাত্র আছে।

ভারতের বামপন্থী দলগুলির মতে এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও আদর্শের বিরোধী এবং সার্বভৌম স্বাধীন ভারতবর্ষের মর্যাদা ও পূর্ণ স্বাধীনতার পরিপন্থী।

ধনবিজ্ঞান

মিহিরকুমার সেন, এম, এ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ;
লেকচারার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হিন্দুস্থান পাবলিকেশনস্ লিঃ

৫০ লেক প্লেস, কলিকাতা ২৯

হিন্দুস্থান পাব্লিকেশন লিমিটেডের পক্ষে ৫০ লেক প্লেস হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ৫ চিন্তামণি দাস লেনস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ধনবিজ্ঞান

ভারতীয় অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

সংজ্ঞা—যে সমাজ-বিজ্ঞান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সম্পদ-আহরণ এবং সম্পদভোগ সম্বন্ধীয় কার্যাবলী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া থাকে তাহাকে **অর্থশাস্ত্র** বলা হয়। (Economics is a social science which studies the every-day life of man in his wealth-getting and wealth-spending activities)

অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী প্রতিশব্দ economics ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে গৃহস্থালী পরিচালনার ব্যবস্থা বুঝায়। শব্দটির প্রচলিত অর্থ হইতেছে অপচয়-নিবারণ—জীবনযাত্রার উপকরণগুলির উপযুক্ত ব্যবহার।

অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়—আমাদের জীবনে প্রতিদিন যাহা ঘটিয়া থাকে অর্থনীতিবিদগণ তাহার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যহ আমরা দেখি যে, মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করিতেছে; ভবিষ্যতে যাহাতে জীবিকা অর্জন করিতে পারা যায় সে উদ্দেশ্যে বালক বালিকারা স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই কতকগুলি প্রয়োজন বা অভাব রহিযাছে। যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি। এই সকল অভাব মিটাইবার জন্য আমরা সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া থাকি। মানুষেব এই অভাব এবং ইহা মোচন করিবার জন্য তাহাকে যে পরিশ্রম করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করাই অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অভাব, পরিশ্রম এবং পরিশ্রম দ্বারা অভাবমোচন বা সন্তুষ্টি এই তিনটি বিষয় লইয়া মানুষের বৈষয়িক জীবন গঠিত এবং এইগুলিই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান সমাজে সব সময় নিজ পরিশ্রমে নিজের অভাব সোজাসুজি মেটে না। মুচি তোমার জুতা সারাইলে তুমি তাহাকে খাদ্য বা বস্ত্র না দিয়া পয়সা দাও। এই পয়সা দিয়া মুচি তাহার অভাব মোচন করিয়া থাকে; খাদ্য এবং বস্ত্র ক্রয় করে। শ্রম এবং সন্তুষ্টির মধ্যে যোগসূত্র হইল অর্থ উপার্জন এবং ইহাও অর্থশাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

পরলোকগত অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের কার্যকলাপ অর্থাৎ তাহার অর্থাগম এবং অর্থব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করাই

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। (Political economy or economics is a study of man's actions in the ordinary business of life, it enquires how he gets his income and how he uses it)

অর্থশাস্ত্র সমাজ-বিজ্ঞানের অংশ—অর্থশাস্ত্র সমাজ-বিজ্ঞানের অংশ। ইহা সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের কার্যাবলী আলোচনা করিয়া থাকে। হিমালয়বাসী তপস্বী বা নির্জন দ্বীপবাসী রবিনসন ক্রুশোর কার্যকলাপের আলোচনা এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত নয়। আত্ম-কেন্দ্রিক কোন মানুষের স্থান ইহাতে নাই।

অর্থশাস্ত্র সমাজ-বিজ্ঞানের অংশ. সমাজবদ্ধ মানুষের সমষ্টি লইয়া জাতি গঠিত হয়। মূলতঃ এই জাতির কার্যকলাপ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য অর্থাৎ কি করিয়া জাতি সামান্য সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকে—তাহাই অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হয়। এই অর্থে ইহা একপ্রকার জাতীয় সম্পদ-বিজ্ঞান। যাহাদের লইয়া জাতি গঠিত তাহাদের সকলের অভাবমোচন বা সন্তুষ্টির উপরই জাতির কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করে।

সমষ্টির কল্যাণ সাধনের উপকরণ অতি অল্প। আমাদিগকে সতর্কতার সহিত সেগুলি ব্যবহার করিতে হইবে—অপচয় নিবারণে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। অতএব যথাসম্ভব কম সম্পদ হইতে যথাসম্ভব বেশী সন্তুষ্টিলাভের উপায় সম্পর্কিত আলোচনাও অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থশাস্ত্র কুবেরের নীতি নহে—কার্লাইল (Carlyle) এবং রাস্কিনের (Ruskin) সময় অর্থশাস্ত্রকে কুবেরের নীতি বলিয়া মনে করা হইত। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পেন্সন (Penson) যথার্থই বলিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত বিচার্য বিষয় হইল মানুষ—সম্পদ বা বিত্ত নহে। সমাজে ধনের প্রভাব প্রবল সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষই এই বিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মানুষ নিজ অভাব মোচন করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং সেই অর্থ ব্যয় করে। অর্থশাস্ত্র প্রধানতঃ মানুষের এই সব বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়তঃ যে সম্পদ দ্বারা মানুষ নিজ অভাব দূর করে, যাহাকে সে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করে এবং পরিশেষে যে সম্পদের এক অংশ সে উপার্জন করে সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া থাকে।

অধ্যাপক মার্শাল বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে অর্থশাস্ত্রের এক দিক হইতেছে অর্থের আলোচনা এবং অপেক্ষাকৃত বেশী গুরুত্বপূর্ণ অপর এক দিক হইতেছে মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা—তাহার জীবনের একটি দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিশ্লেষণ। (It is on the one side a study of wealth and, on the other and more important side, a part of the study of man)

অর্থের সাহায্যে মানুষের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ—অর্থশাস্ত্রের এই অতি প্রয়োজনীয় দিকটি প্রথম যুগের অর্থনীতিবিদগণ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মানুষের কল্যাণ সাধনেই অর্থের সার্থকতা। জীবন সংগ্রামে অর্থ সহায়ক মাত্র—মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানই হইতেছে চরম লক্ষ্য।

মানুষের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থনীতিবিদগণকে বর্তমান সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে।

রশার (Roscher) যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্র আলোচনার আরম্ভে মানবজীবন এবং আমাদের লক্ষ্যও মানবকল্যাণ। (the starting-point and goal of our science is man).

জাতীয় সম্পদ কি ভাবে ব্যবহার করিলে সমাজের কল্যাণ হইবে অর্থশাস্ত্র সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া থাকে। আমরা অর্থাগমের নানা উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও কি উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন করি সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নাই। ব্যক্তির নিজ সুবিধা এবং অসুবিধার সহিত জাতি বা মানবসমাজের কল্যাণ যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অনেক সময় তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

প্রণালী—তর্কশাস্ত্রের আগম এবং নিগম (Deductive and Inductive) সূত্রের মধ্যে কোন্‌টি অর্থশাস্ত্রে অনুসরণ করা উচিত তাহা লইয়া এক সময়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

নিগম-সূত্রানুসারে আমরা কোন প্রতিজ্ঞা হইতে সত্যে উপনীত হই। অন্যদিকে আগম সূত্রানুসারে সত্য হইতে আমরা কোন প্রতিজ্ঞায় উপনীত হই।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে উভয় সূত্রই নির্ভুল এবং সমপ্রয়োজনীয়। কোন ক্ষেত্রে আরোহপ্রণালী কার্যকরী, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবরোহ-প্রণালী কার্যকরী। প্রত্যেকটিরই কতকগুলি সুবিধা এবং অসুবিধা রহিয়াছে। অবরোহ প্রণালীর আলোচনা বিশ্লেষণাত্মক ও তত্ত্বমূলক, আরোহ প্রণালীর আলোচনা তুলনামূলক, ইহা বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাস অনুসরণ করিয়া চলে।

অর্থশাস্ত্রের সূত্র—অর্থশাস্ত্র একটি বিজ্ঞান। তথ্যের দ্বারা সমর্থিত কতকগুলি সূত্র যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাহাকে বিজ্ঞান বলা হয়। যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি জল, বায়ু বা বিদ্যুতের ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা

করে এবং কোন বিশেষ অবস্থায় ইহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি ধরণের হইবে সে সম্পর্কে কতকগুলি বিধি বা সূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করে। কোন বিশেষ অবস্থায় মানুষ কিভাবে আচরণ করিবে অর্থশাস্ত্র তাহা বলিয়া দেয়।

অর্থশাস্ত্র একটি সমাজ বিজ্ঞান। মানুষের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করা ইহার উদ্দেশ্য। স্বভাবতই ইহার সিদ্ধান্তগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মত সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হইতে না পারে। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মোটামুটিভাবে মিল থাকিলেও অনেক বিষয়ে একজনের সহিত অন্য জনের বহু পার্থক্য রহিয়াছে। নানাপ্রকারে মানুষ প্রভাবান্বিত হয় বলিয়া অর্থশাস্ত্রের বিধি বা সূত্র সকলের পক্ষে সমান বা নির্ভুল হইতে পারে না। দুইজন সর্ববিষয়ে পরস্পর এক হইতে পারে না। কাজেই একই অবস্থায় দুইজন মানুষ সম্পূর্ণ এক রকম আচরণ করিবে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

"অর্থশাস্ত্রের সূত্রকে জোয়ার ভাঁটার নিয়মের সহিত কিছুটা তুলনা করা চলে; মাধ্যাকর্ষণের নির্ভুল নিয়মের সহিত ইহার তুলনা করা চলে না।"

অর্থশাস্ত্রের পরিধি—উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক অর্থশাস্ত্রের পরিধি বুঝিতে পারিবেন। অর্থশাস্ত্র শুধু বিজ্ঞান নয়; ইহা কলাশাস্ত্রও বটে।

অর্থশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান—এই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গতি না থাকিলে সেইগুলি নিছক বুদ্ধির কসরৎ বা অস্পষ্ট নীতিমাত্রে পর্যবসিত হয়। অর্থশাস্ত্রের সূত্রগুলি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিবে; কারণ ঘটনাগুলিই এই সূত্রেরই উদাহরণ।

অর্থশাস্ত্র এবং কলাশাস্ত্র—ছন্নছাড়া, কৃপণ বা অমিতব্যয়ী ব্যতীত আমরা প্রত্যেকেই অর্থনীতির বিজ্ঞান না জানিলেও বিষয়ী লোক হিসাবে আমরা সকলেই অর্থশাস্ত্রের ব্যবহারিকরূপ বা কলারূপের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত আছি। বিবেচনা করিয়া ব্যক্তি বা সমাজের আয় ও ব্যয়ের ব্যবহার মধ্যেই অর্থশাস্ত্র পাঠের সার্থকতা। অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বিভিন্ন নীতি বা সূত্রের পর্যালোচনা করে; আর অর্থনৈতিক কলাশাস্ত্র এই সকল নীতি বাস্তবে রূপায়িত করিবার পন্থা নির্দেশ করে। অবশ্য নীতির বিরুদ্ধাচারণ করিলে ব্যবহারিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হইবে না।

অর্থশাস্ত্র আলোচনা প্রসঙ্গে কেবলমাত্র আমাদের বর্তমান অথনৈতিক জীবন নয়—অতীতে ইহা কিরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতে কিভাবে ইহা আমাদের কল্যাণসাধন করিবে তাহাও আলোচনা করিব।

অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ—অর্থশাস্ত্র নিম্নলিখিত কয়েকটিভাগে বিভক্তঃ—

(১) **উৎপাদন**—সম্পদ সৃষ্টির অপর নাম উৎপাদন। উৎপাদন নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদ (land), শ্রম (labour), মূলধন (capital), ও সংগঠন (organisation) এবং ইহাদের সম্মিলিত কর্মদক্ষতার উপর। উৎপন্ন সম্পদ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাটচাষী পাটের বিনিময়ে অন্ন ও বস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

(২) **মূল্য এবং বিনিময়**—ইহার পরে সম্পদের বিনিময় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পুরাকালে এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের বিনিময়প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে বা ধারে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করা হয়।

(৩) **মুদ্রা**—বিনিময়ে কি পরিমাণ মুদ্রার বা অর্থের প্রয়োজন তাহা দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভর করে। অর্থের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করা হয় এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করা হয়। এইজন্য অর্থ সম্পর্কে আলোচনা অর্থশাস্ত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

(৪) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য**—অর্থশাস্ত্রের আর একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বর্তমানে কোন জাতিই অপর জাতির সহিত অর্থনৈতিক-সম্পর্করহিত অবস্থায় টিকিতে পারে না। এই জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। ফলে এক জাতির অভাব অন্য জাতি সহজে দূর করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন্ নীতি অনুসরণ করিবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি নিজেদের স্বার্থে কিভাবে এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তাহা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৫) **বণ্টন**—বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদ বিভিন্ন দেশে বিনিময় হইবার পর তাহা বিভিন্ন উৎপন্নকারীদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। জাতির মোট সম্পদ কাহার অংশে কতখানি পড়িবে অর্থশাস্ত্রে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।

(৬) **সম্পদ ভোগ**—উৎপন্ন সম্পদ বণ্টন করিয়া দিবার পর বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ অংশ ভোগ করিয়া থাকে। মানুষের অভাব এবং উপার্জনের দ্বারা এই অভাব মোচনের পর সন্তুষ্টি—ইহা অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বিচার্য বিষয়।

(৭) **সরকারী আয়-ব্যয়**—বর্তমান যুগে অর্থশাস্ত্রে সরকারী আয়-ব্যয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজ্যরক্ষা ব্যতীত আধুনিক রাষ্ট্রকে আরও বহু গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, বিনাব্যয়ে শিক্ষাদান, চিকিৎসা, বৃদ্ধ বয়সে অর্থসাহায্য, বেকারদের সাহায্য ইত্যাদি। এই সকল কার্যের জন্য প্রভূত

অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলিই (Governments) সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। সরকারী আয়ব্যয়ের মূল তত্ত্বগুলির সহিত পরিচয় থাকিলে সাধারণ নাগরিক কর-নির্ধারণ, সরকারী ব্যয় এবং ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বুঝিতে এবং বিচার করিয়া দেখিতে পারিবে।

অর্থশাস্ত্র পাঠের সার্থকতা—অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন নিরর্থক নহে। ইহা নিছক কল্পনা বিলাস বা বুদ্ধির খেলা নয়। নিঃসন্দেহে ইহা সাধারণ পাঠকের মনের প্রসারতা বাড়াইয়া বিভিন্ন বিষয়ে তাহার মনে আগ্রহের সঞ্চার করে। ইহা অপেক্ষা বড় কথা এই যে, বর্তমানযুগে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনে অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান বিশেষ কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই গুরুতর সামাজিক সমস্যাগুলির সহিত অর্থশাস্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্বভাবতঃই মার্শালের মত তাঁহার মনেও প্রশ্ন জাগিতে পারে—"সম্পদের এই প্রাচুর্যের মধ্যেও দারিদ্র্য—ইহা কি অনিবার্য?"

আজিকার ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে কারখানার মালিক, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, দেশসেবক বা একজন সাধারণ মানুষ যাহাই হউক না কেন, ছাত্রজীবনে অর্থশাস্ত্রের যে জ্ঞান সে অর্জন করিবে তাহা পরবর্তী জীবনে প্রতিপদে তাহাকে সাহায্য করিবে। ইহাই তাহার অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নের চরম সার্থকতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ

প্রথম যুগের সহজ সরল অর্থনৈতিক জীবন কিভাবে বর্তমানের জটিল অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তরিত হইল তাহা এখন আলোচনা করিব।

(ক) সরল অর্থনৈতিক জীবন—প্রধান বিশেষত্ব ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা নিজ অভাব মোচন।

(১) **প্রথম যুগ**—প্রত্যক্ষ শ্রমের যুগ—এই যুগে মানুষ পরিশ্রম করিয়া সরাসরি আপনার অভাব মোচন করিত।

(২) **দ্বিতীয় যুগ**—পরোক্ষ শ্রমের যুগ—এই যুগে মানুষ পরিশ্রম করিয়া পরোক্ষভাবে অভাব মোচন করিত।

(খ) জটিল অর্থনৈতিক জীবন—প্রধান বিশেষত্ব অভাব মোচনের জন্য সকলের সমবেত শ্রম।

(১) **তৃতীয় যুগ**—এই যুগে সমবেত শ্রমের দ্বারা পরোক্ষভাবে অভাবমোচন করা হইত (মিলিত উৎপাদন, উৎপন্ন সম্পদ বিনিময় ও বণ্টন)।

(২) **চতুর্থ যুগ**—এই যুগে অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

প্রথম পর্যায় : ব্যক্তিগত শ্রমের যুগ—

(ক) সরল অর্থনৈতিক জীবন—প্রত্যক্ষ শ্রমের যুগ।

আদিম মানুষ খাদ্য এবং আশ্রয়ের সন্ধানে পশুর মত বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। অনেক পরিশ্রম করিবার পর খাদ্য বা আশ্রয় মিলিত। ক্রমে মানুষ তীর-ধনুক তৈয়ারী করিয়া আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিতে লাগিল; বসবাসের জন্য কুটির নির্মাণ করিতে শিখিল। ক্ষুধা পাইলেই সে পশুপক্ষী শিকার করিত এবং বাসস্থানের প্রয়োজন মনে হইলে নিজেই কুটির নির্মাণ করিত। দেখা যাইতেছে যে এই যুগে মানুষ নিজে পরিশ্রম করিয়া নিজ অভাব দূর করিত।

দ্বিতীয় পর্যায় : পরোক্ষ শ্রমের যুগ—ক্রমশঃ মানুষ উপলব্ধি করিল যে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি যাবতীয় অভাব দূর করা একলার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন শিকারী সারাদিন কেবলমাত্র শিকার করিতে লাগিল, গৃহনির্মাতা কেবলমাত্র গৃহনির্মাণে এবং কর্মকার কেবলমাত্র অস্ত্রনির্মাণে আত্মনিয়োগ করিল।

সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া শিকারী মাংস সংগ্রহ করিয়া আনিত। এই মাংসের কিছু অংশ কর্মকারকে দিয়া সে তাহার নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিত। এইভাবে পণ্যের সহিত পণ্যের বিনিময় আরম্ভ হইল।

অস্ত্র সংগ্রহের জন্য শিকারী এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য কর্মকার যে পরিশ্রম করিল তাহা ব্যক্তিগত হইলেও পরোক্ষ পরিশ্রম।

(খ) জটিল অর্থনৈতিক জীবন—সমবেত শ্রমের যুগ—ক্রমশঃ মানুষ জীবন-ধারণের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে একাকী পরিশ্রম না করিয়া সকলে মিলিত হইয়া একযোগে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে প্রাচীনকালের সরল অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর ঘটিয়া বর্তমানকালের জটিল অর্থনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইল।

তৃতীয় পর্যায় : সমবেত শ্রমের যুগ—দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজে শ্রমবিভাগ সহজ এবং সরল ছিল। তখন গৃহনির্মাতাকে একাকী ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ছাদ পর্যন্ত গৃহনির্মাণের যাবতীয় কার্য করিতে হইত। তৃতীয় পর্যায়ে একক পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণ একটি গৃহনির্মাণের অসুবিধা সকলেই উপলব্ধি করিল। ফলে শ্রম বিভাগ আরও বিস্তৃত হইল। সকলের সহযোগিতায় আরব্ধ কার্য সহজে ও পূর্বাপেক্ষা কম সময়ে সম্পন্ন হইতে লাগিল। একদল কর্মী সমবেত হইয়া গৃহনির্মাণে রত হইল। কেহ মাটি সংগ্রহ করিল, কেহ কাঠের কাজ করিল, কেহ আবার অন্যান্য কাজগুলি সম্পন্ন করিল। এই সকল লোকের প্রত্যেকেরই কিন্তু গৃহের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই খাদ্য, বস্ত্র বা অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকেই পরোক্ষভাবে নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার জন্য একযোগে পরিশ্রম করিয়াছে। সকলের সমবেত শ্রমের ফলে নির্মিত গৃহটির বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া গেল। এখন এই সকল দ্রব্য বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দিল। সকলের শ্রমে যখন গৃহটি নির্মিত হইয়াছে তখন সেই সম্পত্তিতে ও তাহার বিনিময়ে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিতে সকলের অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু কে কতখানি অধিকার করিবে? কেহ কেহ বলিতে পারেন সকলেই যখন পরিশ্রম করিয়াছে তখন সকলেরই ইহাতে অংশ থাকা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয়ত সকলেই সমান পরিশ্রম করে নাই। কেহ কোন কঠিন কাজ করিয়াছে, কেহ বা বেশী সময় কাজ করিয়াছে, আবার কেহ বা কাজে অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। এইভাবে সমাজে সম্পদ বণ্টনেব সমস্যা দেখা দিল। ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং সংসার জীবনের নানা সমস্যার মধ্যে এই বণ্টনের প্রশ্ন জড়িত আছে।

চতুর্থ অধ্যায় : অর্থ ব্যবহার আরম্ভ—দ্রব্য বিনিময় প্রথার যুগে এই সম্পদ বণ্টন করিয়া দেওয়া অতি কঠিন হইয়া উঠিল। পূর্বের উদাহরণে গৃহনির্মাতাদের মধ্যে কাহারও প্রয়োজন খাদ্য, কাহারও বস্ত্র, আবার কাহারও বা অলঙ্কার। কি উপায়ে তাহাদের অভাব দূর করা যায়? সব জিনিষের মূল্য সমান নয় এবং মূল্যের তারতম্যের জন্য সব জিনিষ ভাগ করাও চলে না। সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিল।

অর্থের ব্যবহার আরম্ভ হইবার ফলে বিনিময় প্রথার অনেক অসুবিধা দূর হইয়া সম্পদ বণ্টন সহজসাধ্য হইয়া উঠিল।

চতুর্থ অর্থাৎ বর্তমান যুগে সর্বপ্রকার আয়ের পরিমাপ করা হয় অর্থের হিসাবে।

অর্থের সাহায্যে ক্রয় ও বিক্রয় দ্রব্য-বিনিময়ের স্থান গ্রহণ করিল।

সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই এখন অন্যের সহিত সমবেতভাবে কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। সমবেত শ্রমে উৎপন্ন এই দ্রব্য কিছু অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থে সকলের অধিকার আছে। এই সমবেত আয় হইতে উৎপাদনকারীরা নিজ নিজ অংশ ভাগ করিয়া নেন এবং নিজের অংশের অর্থদ্বারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করেন। এই দ্রব্য আবার অন্য একদল কর্মী সমবেতভাবে উৎপন্ন করিয়াছে।

বস্তুতঃ বর্তমান কালে পূর্বাপেক্ষা বেশী পরোক্ষভাবে অভাব মোচন হইয়া থাকে। বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও ব্যাপক শ্রম বিভাগের মধ্যে এই পরোক্ষভাবে প্রয়োজন সাধনের বিশেষত্ব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশ—আদিম যুগে বন্য অবস্থায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবন কোন বিশেষ আকার গ্রহণ করে নাই। মানুষ তখন বনে বাস করিত এবং আহার্যের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করিত বা পশুপক্ষী শিকার করিত।

শিকার বা মাছ ধরার যুগ—যাযাবর জীবন—কিছুকাল পরে মানুষ ভেড়া, ছাগল, গরু ইত্যাদি প্রাণীদের পোষ মানাইতে শিখিল। এইভাবে তাহারা শিকারের পরিবর্তে পশুপালন বৃত্তি অবলম্বন করিল।

এই সময় মানুষ গরু ভেড়া ইত্যাদি পশুর পাল সঙ্গে লইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। সমাজে সে সময় কোন স্থাবর সম্পত্তি বা শ্রম বিভাগ ছিল না।

মানুষ প্রথমে প্রস্তর ও অস্থিদ্বারা নির্মিত অস্ত্র লইয়া শিকার করিত। ক্রমে তামা, ব্রোঞ্জ এবং লৌহ দ্বারা অস্ত্র নির্মাণ করিতে সক্ষম হইল। প্রস্তর যুগ হইতে লৌহ যুগে উপনীত হইতে মানুষের বহু সহস্র বৎসর সময় লাগিয়াছে।

কৃষির যুগ—ক্রমশঃ যাযাবর মানুষ খাদ্য হিসাবে শস্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করিল। তখন তাহারা জমি সংগ্রহ করিয়া গ্রামে বসবাস করিতে লাগিল। জমির উপর সর্বসাধারণের মালিকানা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল এবং শ্রমবিভাগেরও প্রাথমিক সূত্রপাত দেখা দেয়। এইভাবে ভালমন্দ লইয়া আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন হয়।

হস্তশিল্প—অতঃপর হস্তশিল্পের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থায় কৃষিকার্য ছিল জীবিকানির্বাহের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। প্রত্যেকটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চল হিসাবে গড়িয়া উঠে, গ্রামের কৃষক ও কারিগররা এইরূপ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করিতে থাকে। নগর বা শহরের তখন উদ্ভব হয় নাই, একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন হইত, সরল ও অনুন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প হারে উৎপাদন করিয়া উৎপাদকরা স্থানীয় বাজারেই তাহা বিক্রয় করিত।

শিল্প-বিপ্লব—শিল্প-বিপ্লব মানব-ইতিহাসে উৎপাদনব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। উৎপাদন-প্রথার নব নব যন্ত্র আবিষ্কার ও যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে মানুষের শ্রম ও সময় বহুল পরিমাণে বাঁচিয়া যায়, অন্যদিকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বহুল পরিমাণ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইংলণ্ড হইতে ইহা ইউরোপে ও পরে সমগ্র জগতে বিস্তার লাভ করে। এই পরিবর্তনের নাম শিল্প-বিপ্লব। শিল্পবিপ্লব হস্তশিল্প যুগের অবসান করিয়া তৎস্থলে আধুনিক জটিল অর্থনৈতিক যুগের সূচনা করে। বড় বড় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপক হারে উৎপাদন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুবিস্তৃত শ্রমবিভাগ, উৎপাদন যন্ত্রের উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর মালিকানা ও পুঁজিপতি কর্তৃক শিল্পে শিল্পে শত শত মজুরী-ভোগী শ্রমিক নিয়োগ শিল্পবিপ্লবের অপরিহার্য ফল। **ব্যক্তিগত সম্পত্তি** এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথা। উৎপাদন যন্ত্রের মালিক পুঁজিপতি শ্রেণী। প্রধানতঃ মুনাফার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শ্রেণী বিভিন্ন শিল্পে মূলধন খাটান, শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং উৎপাদন চালাইয়া যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স,

জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা উন্নতির চরম পর্যায়ে পেঁৗছিয়াছে। ভারতবর্ষ ও চীনে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা আংশিক বিকাশলাভ করিয়াছে। এই ধনবাদী মুনাফালোলুপ উৎপাদনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে গণ-বিপ্লব সাফল্য লাভ করিয়াছে। রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যক্তিগত পুঁজিসঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগ প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে। সোভিয়েট সমাজে সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কেবলমাত্র উৎপাদন করা হয়। ব্যক্তিগত মুনাফাবাদী উৎপাদনব্যবস্থা রাশিয়ায় লোপ পাইয়াছে।

ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—

ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এই ঃ

(ক) ব্যক্তিগত সম্পত্তি;

(খ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার;

(গ) জমি, খনি, কারখানা, বন, ব্যাংক প্রভৃতি উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদনগুলির উপর পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত মালিকানা;

(ঘ) মুনাফার জন্য উৎপাদন। মুনাফা না হইলে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া, সমাজের প্রয়োজনেও মুনাফা না হইলে উৎপাদন বন্ধ রাখা;

(ঙ) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি, একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণাধীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবর্তন।

(চ) পুঁজিপতি ও শ্রমিক—এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী বৃহৎ শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ;

(ছ) আয় ও সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান অসাম্য ও অসঙ্গতি, বেকারসংখ্যার বৃদ্ধি ও শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ক্রমপ্রসার।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাদন

অভাব, পরিশ্রম এবং সন্তুষ্টি—এই তিনটি বিষয় লইয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গঠিত, যেহেতু বিনা পরিশ্রমে অভাব মোচন হয় না, সেই হেতু এখন আমরা অভাব মোচনের জন্য মানুষের পরিশ্রম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

অভাব মোচনের জন্য মানুষের শ্রমের নিয়োগকে অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলা হয়।

কি উৎপন্ন হয়?—মানুষ কোন নূতন দ্রব্য উৎপন্ন করে না। মানুষ কেবল দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিয়া তাহা জীবনযাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলে।

কাঠ হইতে চেয়ার তৈয়ারী হয়। কোন ছুতার মিস্ত্রি কাঠ উৎপন্ন করে না। ইহা বনজ সম্পদ। কাঠ হইতে চেয়ার তৈয়ারী করিয়া ছুতার কেবল ঐ কাঠের এক নূতন উপযোগিতা অর্থাৎ ইহা দ্বারা মানুষের এক অভাবমোচনের ক্ষমতা সৃষ্টি করিল। পেনসন ইহা নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

চেয়ারের উপযোগিতা
হইতে বাদ দাও
কাঠের উপযোগিতা } =ছুতার কর্তৃক সৃষ্ট নূতন উপযোগিতা।

সামগ্রী কাহাকে বলে?—যাহা কিছু মানুষের অভাবমোচনের সহায়তা করে তাহাকেই অর্থনীতির ভাষায় সামগ্রী বলা হয়, অর্থাৎ উপযোগী জিনিষমাত্রই সামগ্রী।

বায়ু, সূর্যরশ্মি প্রভৃতি যে কয়েকটি জিনিষ প্রকৃতি অফুরন্তভাবে দান করে, সেখানে মিতব্যয়িতার কোন প্রশ্নই উঠে না। দুষ্প্রাপ্য এবং যেসব সামগ্রীর সরবরাহ সীমাবদ্ধ, কেবলমাত্র সেগুলিই অর্থশাস্ত্রের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে অধিকাংশ সামগ্রী অপ্রচুর। সুতরাং পরিমিত সামগ্রী অতি সাবধানে এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে সেইগুলির দ্বারা আমাদের যথাসম্ভব বেশী অভাব মোচন করিতে পারা যায়।

সম্পদ—ব্যাপক অর্থে কল্যাণের এক নামই সম্পদ।

অর্থশাস্ত্রে ব্যাপক এবং সীমাবদ্ধ উভয় অর্থেই সম্পদ কথাটি ব্যবহৃত হয়।

চ্যাপম্যানের (Chapman) অনুসরণে নিম্নলিখিতভাবে সম্পদকে ভাগ করা যায়ঃ—

চ্যাপম্যান—ব্যাপক অর্থে যাহা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানুষের অভাব-মোচনে সহায়তা করে তাহাই সম্পদ। এই অর্থে সম্পদ বলিতে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী বুঝায়।
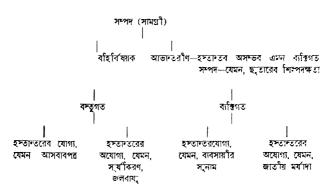
পেনসন—পেনসনের সংজ্ঞা অনুসারে সম্পদ বলিতে সীমাবদ্ধ অর্থে মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী বুঝায়।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য—নিম্নলিখিত গুণসমন্বিত দ্রব্যকে সম্পদ বলা হয়ঃ—

(১) ইহা উপযোগী হওয়া চাই;

(২) ইহা দুষ্প্রাপ্য হওয়া চাই;

(৩) ইহা হস্তান্তরযোগ্য হওয়া চাই;

(৪) ইহা মানুষের ব্যবহারিক জীবনোপযোগী হওয়া চাই।

উদাহরণ—বায়ু, জল মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ; কিন্তু ইহারা প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ—মানুষের সৃষ্ট সম্পদ নয়। যখন এই বায়ু এবং জল দুষ্প্রাপ্য এবং উপযোগী হইবে, তখন এইগুলি সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

যেসব জিনিষের কোন উপযোগিতা নাই, তাহা সম্পদ নয়। পরিশ্রমের দ্বারা উৎপাদিত কোন জিনিষ যদি মানুষের উপকারে না আসে, তবে তাহাকে কখনই সম্পদ বলা যায় না।

এখন দেখা যাউক সম্পদ বলিতে ঠিক কি বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ একটি কলেজের ছাত্রের প্রয়োজনের উল্লেখ করিতেছি। ছাত্রের প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি। এই অভাব দূর করিবার জন্য তাহাকে অথবা তাহার অভিভাবককে পরিশ্রম করিতে হয়। অতএব এইগুলি সম্পদ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সম্পদ দুই প্রকার—বস্তুগত এবং বস্তুবহির্ভূত।
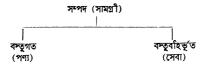
উৎপাদনের উপাদান—সম্পদ উৎপাদনে সাহায্যকারী বস্তুসমূহই উৎপাদনের উপাদান। সাধারণতঃ কোনও কিছু উৎপাদন করিতে অন্ততঃ তিনটি জিনিষ দরকার। যথাঃ—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ—মাটি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ;

(২) পরিশ্রম—শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম;

এবং (৩) মূলধন—উৎপাদনে সহায়ক কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি।

উদাহরণঃ—জালে-ধরা মাছ জেলের সম্পদ। এই সম্পদ লাভ করিতে অর্থাৎ মাছ ধরিতে তাহাকে কয়েকটি জিনিষের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, যেমন—

(১) নদী বা পুকুরে মাছ থাকা চাই (প্রাকৃতিক সম্পদ);

(২) মৎস্যশিকারে তাহার নিজ দক্ষতা এবং পরিশ্রম (শ্রম);

(৩) নৌকা, জাল ইত্যাদির ব্যবহার (ব্যবহারিক সাহায্য বা মূলধন)।

সামাজিক জীবন জটিলতর হওয়ার জন্য এবং শ্রমবিভাগ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ার জন্য মানুষ ভূম্যধিকারী, পুঁজিবাদী এবং শ্রমিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই তিন শ্রেণীর পরিশ্রম উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। উৎপাদনের উদ্যোগ এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি সংগঠনের মধ্যে পড়ে।

অতএব, সংক্ষেপে উৎপাদনের উপাদান হইল—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ;

(২) পরিশ্রম;

(৩) মূলধন;

(৪) সংগঠন।

পেনসন ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

(ক) মানুষের কাজ;

(খ) বাহিরের সাহায্য।

ক: মানুষের কাজ:—

(১) পরিশ্রম

(২) সংগঠন

(৩) উদ্যোগ

খ: বাহিরের সাহায্য:—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ

(২) মূলধন

উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে অপর একটি মত—সমাজতন্ত্রীগণ 'মূলধন'কে উৎপাদনের উপাদানরূপে স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে একরাশি টাকা-কড়ি কোন কিছু উৎপন্ন করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কারখানা এবং শিল্প সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানই উৎপাদনের প্রকৃত সহায়ক। সেইজন্য তাঁহারা উৎপাদনকে নিম্নলিখিত দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন:—বস্তুগত উপকরণ এবং বস্তুবহির্ভূত উপকরণ।

অতএব সমাজতন্ত্রীগণের মতে উৎপাদনের চারিটি উপাদান হইল:—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদ;

(২) পরিশ্রম;

(৩) বস্তুগত উপকরণ—যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ;

(৪) বস্তুবহির্ভূত উপকরণ—শিল্প এবং ব্যবসা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা।

সুতরাং প্রথমতঃ প্রচুর এবং উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতীত অধিক উৎপাদন অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, সুস্থ এবং শক্তিশালী মানুষ বেশী উৎপাদন করিতে সক্ষম।

তৃতীয়তঃ, বস্তুগত উপকরণ অধিক উৎপাদনে অপরিহার্য। যন্ত্রের সাহায্যে যত বেশী হইবে, উৎপাদনও তত বেশী হইবে।

চতুর্থতঃ, বস্তুবহির্ভূত উপকরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। গভীর জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-সম্মত কার্যপ্রণালী অধিক উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আপেক্ষিক উপযোগিতা—বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিশ্রম, মূলধন এবং সংগঠন—এই চারিটি উপাদানই অপরিহার্য।

আদিম যুগে যখন মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে সক্ষম হয় নাই, তখন প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রকৃতিকে ক্রমে বশীভূত করিয়া

মানুষ শারীরিক শ্রমের তাৎপর্য উপলব্ধি করিল। ক্রমে যন্ত্রের প্রচলনে এবং শ্রম বিভাগের ফলে মূলধন প্রধান স্থান অধিকার করিল। ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ার ফলে দায়িত্ব ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়া গেল, তখন সংগঠনেরও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

উৎপাদন করে মানুষ এবং প্রকৃতি সহযোগে।

প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধন উৎপাদনে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে বলিয়া জিদ্ (Gide) ইহাদিগকে উৎপাদনের উপাদান রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রমকে উৎপাদনকর্তা রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ—প্রকৃতিদত্ত যে সমস্ত জিনিষ বা শক্তি মানুষের অভাব মোচনের জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থশাস্ত্রে সেগুলিকেই প্রাকৃতিক সম্পদ বলা হয়। যথা—নদী, সমুদ্র, খনি, বন, বায়ুশক্তি প্রভৃতি।

উৎপাদনে ভূমির ব্যবহার

(ক) উৎপাদনে-রত মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভূমি।

(খ) মাটিতে এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা কৃষিকার্যে গাছের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে। মাটির এই গুণের নাম উর্বরতা।

(গ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে কয়লা, লৌহ, তৈল ইত্যাদি প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

প্রাকৃতিক সম্পদের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ—

(১) ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ—মোটরগাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ বাড়ান সম্ভব, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিসীম পাওয়া সম্ভব নহে।

(২) প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র প্রযোজ্য।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্র—মানুষ জমি চাষ করিয়া খাদ্য উৎপাদন করে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু জমির পরিমাণ অনির্দিষ্টরূপে বাড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। কাজেই একই জমি হইতে আরও বেশী ফসল পাইবার আশায় অধিকতর শ্রম, অধিকতর পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করা হয়।

এই অবস্থায় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের সূত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। মার্শাল সূত্রটিকে এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"অন্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে জমির চাষে নিযুক্ত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি করা হয়, উৎপাদনবৃদ্ধি সাধারণতঃ তদপেক্ষা কম হারে হইয়া থাকে।"

চাষী যখন উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে তাহার জমিতে আরও বেশী শ্রম ও আরও বেশী মূলধন নিয়োগ করে।

সাধারণতঃ এই অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে তাহার ফসলের উৎপাদন বেশী হয়; কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ সে যে হারে বাড়ায়, উৎপাদনবৃদ্ধির হার তদপেক্ষা কম হয়। যেটুকু বেশী ফসল সে পায়, তাহার জন্য তাহাকে অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যয় করিতে হয়; অন্যভাবে বলিতে গেলে, পূর্বেকার সমান ব্যয় করিয়া সে অপেক্ষাকৃত কম ফসল পায়। ইহার অর্থ এই যে, জমির উৎপাদনের হার ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। জমির উর্বরতাশক্তির একটা সীমা আছে বলিয়াই এইরূপ হয়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই এই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্র স্থির করা হইয়াছে। অন্যথায় প্রত্যেক চাষী নিজ নিজ জমিতে অধিকতর শ্রমনিয়োগ ও অর্থব্যয় করিয়া উৎপাদন ইচ্ছামত বাড়াইতে পারিত এবং কোন চাষী তাহার সমস্ত জমি ছাড়িয়া দিয়া কেবল একটিমাত্র জমিতে সমস্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া সকল জমিতে উৎপন্ন ফসলের সমপরিমাণ ফসল লাভ করিতে পারিত।

যতই অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা যায়, ততই ফসলের পরিমাণ বাড়িলেও এই বৃদ্ধির পরিমাণ আগেকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত ফসলের পরিমাণ অপেক্ষা কম। কাজেই এই সূত্র কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে প্রযোজ্য, মূল্যের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

উদাহরণঃ—কোন চাষীর ২ বিঘা জমি আছে। সে উক্ত জমিতে ধান চাষ করিবার জন্য ২০৲ ব্যয় করিল। বৎসরের শেষে ২০ মণ ধান উৎপন্ন হইল। পরবৎসর ঐ জমিতে সে চাষের জন্য আরও ২০৲ ব্যয় করিল। এবার ধান মাত্র ১০ মণ বেশী উৎপন্ন হইল। পরবৎসর আবার সে আরও ২০৲ বেশী ব্যয় করিল, চাষের জন্য (মোট ব্যয় দাঁড়াইল ৬০৲)। এই বৎসর মাত্র ৫ মণ ধান বেশী উৎপন্ন হইল।

এই দৃষ্টান্তটি তালিকাকারে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ—

একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর চাষ হইতেছে। বলদ, লাঙ্গল, বীজসংগ্রহ, মজুরের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা শ্রমিক ও মূলধন বাবদ ব্যয় বলিয়া ধরা হইতেছে।

	যে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে	বাৎসরিক মোট ফসল	টাকা পিছু গড় উৎপাদন
১ম বৎসর	২০৲ টাকা	২০ মণ	১ মণ
২য় ”	৪০৲ টাকা (২০৲+২০৲)	৩০ মণ (২০+১০)	৩০ সের
৩য় ”	৬০৲ টাকা (৪০৲+২০৲)	৩৫ মণ (৩০+৫)	২৩⅓ সের

অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যয় বাড়ান হইলেও আয় ব্যয় অনুপাতে অনেক কম হইতেছে।

প্রথম বারে ২০৲ ব্যয়ে ২০ মণ ধান উৎপন্ন হইল। ১৲ টাকায় ১ মণ ধান উৎপন্ন হইল।

দ্বিতীয় বারে ৪০৲ ব্যয়ে ৩০ মণ ধান উৎপন্ন হইল, টাকায় ৩০ সের ধান উৎপন্ন হইল।

তৃতীয় বারে ৬০৲ ব্যয়ে ৩৫ মণ ধান উৎপন্ন হইল। টাকায় ২৩⅓ সের ধান উৎপন্ন হইল।

দেখা যাইতেছে যে, শ্রমিক ও মূলধন বাবদ ব্যয় দফায় দফায় বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে গড় উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে।

ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, উৎপাদনের হার কমিয়া যাইতে থাকিলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে ফসলের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ অতিরিক্ত ব্যয় পোষাইয়া যাইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্র—নিয়মের ব্যতিক্রম—মার্শালের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত "সাধারণতঃ' কথাটি হইতে বুঝা যায় যে, ইহার ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমগুলি এইঃ—

(১) ক্রমহ্রাসমান পর্যায়ে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত কোন জমিতে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। কোন অলস চাষী তাহার জমি হয়ত ভালভাবে চাষ করে নাই। সেক্ষেত্রে ইহা কোন দক্ষ চাষীর হাতে পড়িলে, অধিকতর শ্রম ও মূলধন নিয়োগের সাহায্যে সে প্রথম প্রথম এই জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে, এমনকি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়াইতে পারে। কিন্তু এই বৃদ্ধির একটা সীমা আছে; যাহার পরে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ফসল আনুপাতিক বা ক্রমবর্ধমান হারে না বাড়িয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাইবে। যথোপযুক্ত চাষ না হইলে কোন জমিতে প্রথম প্রথম এই নিয়ম কার্যকরী না হইলেও শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইবেই।

(২) দেশে মূলধনের প্রসার, সেচকার্য, যাতায়াতব্যবস্থা প্রভৃতি কৃষিব্যবস্থার নানারূপ উন্নতির ফলে কিছুকালের জন্য এই সূত্র প্রয়োগ বন্ধ থাকিতে পারে।

(৩) প্রচলিত কৃষিপ্রণালী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উন্নতির ফলে অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা সাময়িকভাবে ইহার প্রয়োগ বন্ধ রাখা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের মত প্রাচীন দেশে এই নিয়ম বলবৎ হইতেছে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িকভাবে এই সূত্রকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে।

বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু

এই নিয়ম খনি ও মৎস্যচাষ সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র নৈসর্গিক পদার্থ-বিষয়ক শিল্পে নয়, অন্যান্য শিল্পেও ইহার প্রয়োগ হয়।

জমির উৎপাদনক্ষমতা—জমির উৎপাদনক্ষমতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) প্রাকৃতিক গুণ, (২) সামাজিক পরিবেশ, (৩) অর্থনৈতিক অবস্থা।

(১) প্রাকৃতিক গুণাবলী—জমির উর্বরতা, জলসরবরাহ, জলবায়ু ইত্যাদি নৈসর্গিক বিষয়ের উপর উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে।

(২) সামাজিক পরিবেশ—বিক্রয়কেন্দ্রের সুবিধা, ক্রেতার সমাবেশ, যানবাহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি নানা সামাজিক পরিবেশের উপর জমির উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে।

(৩) অর্থনৈতিক অবস্থা—জমির উন্নতির জন্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয়। জলাভাবে অনুর্বর কোন জমিতে নলকূপ, খাল ইত্যাদি খনন দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করিয়া সেই জমিকে উর্বর করা যায়। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে এইভাবে জমিকে উর্বর করিয়া উৎপাদন করা হইতেছে।

জলশক্তি—প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক জলশক্তি। জলশক্তির প্রচলন অনেক দেশেই ছিল। এখনও উত্তর-ভারতে জলশক্তি দ্বারা শস্যচূর্ণ ও তৈল নিষ্কাষণের প্রথা আছে।

অধুনা কারখানায় যন্ত্র ঘুরাইবার জন্য এই শক্তির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কমব্যয়ে জল হইতে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া বর্তমানে জলশক্তির ব্যবহার খুব বেশী।

ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। প্রবলবেগে প্রবাহিত ভারতের নদীসমূহে এক বিরাট শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ভারত সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষে কাষ্ঠ, কয়লা, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য। সেইজন্য উৎপাদনকার্যে জল হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিকশক্তি ব্যবহারের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাকে ব্যবহার করিলে ভারতীয় সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে। জলবিদ্যুৎ প্রচলনে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে নগরে ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হইয়াছে, ফলে কলকারখানাসমূহ পূর্ণবেগে চলিতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রম

অর্থনীতিতে শ্রম বলিতে কেবলমাত্র মানুষের পরিশ্রমকেই বুঝায়। 'জীবিকা-নির্বাহের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করিতে হয়' একথার অর্থ এই যে, স্ব স্ব অভাব মোচনের জন্য মানুষ তাহার শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করে। সুতরাং শ্রম বলিতে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমই বুঝায়।

ফলপ্রসূ ও নিষ্ফল শ্রম—

প্রাচীন ধারণা—শ্রম সম্পর্কে প্রাচীন অর্থনৈতিক মতবাদ নিম্নোক্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যাইবেঃ

"ধর্মযাজক, আইনজ্ঞ, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, শিল্পী, চিত্রকর, ভৃত্য, খেলোয়াড়, সংগীতজ্ঞ, বীণাবাদক, নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি সমাজের বিশিষ্ট উপকারী ব্যক্তিবৃন্দকেও অনুৎপাদক শ্রমিকের একই পর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে।"

(আদম স্মিথ)

আদম স্মিথের মত সকল অর্থনীতিবিদ্‌রাই এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, কেবলমাত্র ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী বা উৎপাদনে সাহায্যকারী মানুষের পরিশ্রমই উৎপাদক শ্রম, আর অবশিষ্ট সকল মানুষের পরিশ্রমই অনুৎপাদক শ্রম। এইভাবে দৃশ্যমান ও হস্তান্তরযোগ্য বস্তুর উৎপাদনে সাহায্যকারী মানুষের শ্রমকেই তাঁহারা উৎপাদক শ্রম বলিয়া স্বীকার করিতেন। ডাক্তার, আইনজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ প্রমুখ ব্যক্তিদের পরিশ্রমের ফল উৎপাদনের সংগে সংগে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই তাঁহারা এই পরিশ্রমকে উৎপাদক শ্রম বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কিন্তু বর্তমানে এই প্রাচীন ধারণা বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে।

বর্তমান মতবাদ—আদম স্মিথ কেবলমাত্র জড়বস্তু উৎপাদনকারী মানুষের শ্রমকেই উৎপাদক শ্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে কোন জড়বস্তু উৎপাদনের শক্তি মানুষের নাই। প্রকৃতিদত্ত বস্তুপুঞ্জকে সে এক পরমাণুও বাড়াইতে পারে না।

উৎপাদন বলিতে বস্তুর নব নব উপযোগিতা সৃষ্টি বুঝায়। যে শ্রমের দ্বারা কোন না কোন উপযোগিতা সৃষ্টি হয়, তাহাই উৎপাদক শ্রম।

কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করে, সূত্রধর কাঠ হইতে চেয়ার তৈয়ারী করে, এইভাবে ইহারা বস্তুর উপযোগিতা সৃষ্টি করে, অথবা বস্তুকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উপযোগী করিয়া তুলে। ইহাদের পরিশ্রম যেভাবে উৎপাদক শ্রম, তেমনি কোন ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, সাংবাদিক বা সাহিত্যিকের শ্রমও উৎপাদক শ্রম। ইঁহারা সকলেই উৎপাদক। দেখিতে হইবে যে, মানুষ শ্রম দ্বারা যাহা করিতেছে, তাহার কোন উপযোগিতা আছে কি না। এইভাবে পণ্য ও সেবাকার্য—মানুষের কাছে উভয়েরই উপযোগিতা আছে। কাজেই পণ্যউৎপাদনকারী ও সেবারত—দুই শ্রেণীর মানুষের শ্রমই উৎপাদক শ্রম।

যে শ্রম দ্বারা কিছুমাত্র উপযোগিতা সৃষ্টি হয় না, তাহাকে অনুৎপাদক শ্রম বলে।

মনে করা যাক, বিপুল অর্থব্যয় করিয়া একটি বাড়ী নির্মাণ করা হইল। বাড়ীটি ধ্বসিয়া পড়িল, কাহারও কাজে লাগিল না। অথবা একটি কূপ অর্ধেক খনন করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কূপটি কোন কাজে লাগিল না। এরূপক্ষেত্রে বাড়ীনির্মাণ বা কূপ খননের জন্য যে শ্রম নিয়োগ করা হইল, তাহার কোন উপযোগিতা নাই, কাজেই তাহা অনুৎপাদক শ্রম। যাহারা এইসব করিয়াছে, তাহারা অনুৎপাদক শ্রম করিয়াছে বলা যায়।

অনাথ ভিক্ষাজীবি, চোর, বাটপাড়, পকেটমার শ্রেণীর ব্যক্তিরা সমাজের পরগাছা-স্বরূপ। ইহাদের শ্রমের কোন উপযোগিতা নাই, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণভাবে অনুৎপাদক শ্রম।

কিন্তু উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রমের মধ্যে কোন সূক্ষ্ম সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। উপযোগিতাই যদি উৎপাদকশ্রমের আবশ্যিক লক্ষণ হয়, তাহা হইলে একথা বলা চলে যে, সকল শ্রমেরই কোন না কোন উপযোগিতা আছে। ক্ষেত্রভেদে তাহা কমবেশী হইতে পারে। কাজেই, উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রমের সূক্ষ্ম ব্যবধান বর্তমানে কম উৎপাদক ও বেশী উৎপাদক এই দুই ভাগে রূপান্তরিত হইয়াছে।

"এইভাবে কোন শ্রম উৎপাদক বা অনুৎপাদক, তাহা বিচার করার চেয়ে বাস্তব-ক্ষেত্রে কোন শ্রম বেশী উৎপাদক বা অনুৎপাদক—ইহা বিচার করাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।" অর্থাৎ মানুষের শ্রমজনিত চেষ্টা কম পরিমাণ বা বেশী পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচনার বিষয়।

শ্রমসরবরাহ—প্রত্যেক দেশে (১) জনসংখ্যা এবং (২) শ্রমদক্ষতার উপর শ্রম-সরবরাহ নির্ভর করে।

জনসংখ্যা—জনসংখ্যা বর্ধিত হইলে শ্রমসরবরাহও বর্ধিত হইবে। এখানে জনসংখ্যা বলিতে ১৫ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক কর্মক্ষম নরনারীকে বুঝায়। শিশু, বৃদ্ধ, অলস-ধনী, কিংবা গৃহকর্মে রত কর্তব্যপরায়ণা কুলবধূ এই পর্যায়ভুক্ত নয়।

শ্রমদক্ষতা—একজন মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই সে স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে না। কাজেই বর্তমান যুগে কেহ একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে না, প্রত্যেকের শ্রমই একটা বিশেষ ধরণের সংগঠনের মধ্য দিয়া উপযোগিতা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হয়। কাজেই শ্রম বর্তমানে ব্যক্তির নয়, সমষ্টির। শ্রমদক্ষতা সর্বত্র সমান নহে। দেশভেদে, শিল্পভেদে ইহার পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাপানী সুতাকলের শ্রমিকের দক্ষতা বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশী।

শ্রমদক্ষতার মূল কারণ—

এই শ্রমদক্ষতা নির্ভর করে—(১) শ্রমিকের নিজস্ব দক্ষতা, (২) শিল্পে তাহাদের নিয়োগ ও পরিচালনাব্যবস্থা, এক কথায় নিয়োগকারীর দক্ষতার উপর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল।

১। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিতে হয়ঃ—

(ক) **অনুকূল জলবায়ু**—শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ সম্ভব নয়।

(খ) **জীবনধারণ ও শ্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের সুব্যবস্থা**—শ্রম-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন—পুষ্টিকর ও পরিমিত খাদ্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা।

(গ) **শিক্ষা—সাধারণ এবং শিল্পসম্বন্ধীয়**—শিক্ষা মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং মনের প্রসারে সহায়তা করে। এইসব গুণ ব্যতীত কোন শ্রমিক সুদক্ষ হইতে পারে না। বর্তমান যুগে জটিল শিল্পব্যবস্থায় শ্রমিকের দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয়।

(ঘ) সাধুতা, কর্মনিষ্ঠা ও চরিত্রসংযম প্রভৃতি নৈতিক গুণ ছাড়া কোন শ্রমিকের পক্ষে দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। চরিত্র রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। অমিতাচারী শ্রমিকদের দক্ষতা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

(ঙ) **আশাবাদী, স্বাধীন ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশ**—স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে না দিলে শ্রমিকেরা দক্ষতা অর্জন করিতে পারে না।

(চ) **গুণগ্রাহিতার ব্যবস্থা**—পুরস্কারের আশায় উৎসাহী শ্রমিক অধিক উৎসাহে কাজ করে।

(ছ) **কার্যকাল**—অধিক সময় কাজ করিতে হইলে শ্রমিকের দক্ষতা হ্রাস পায়।

২। সুনিয়ন্ত্রিত নিয়োগ এবং পরিচালনব্যবস্থার উপরও শ্রমদক্ষতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

নিজের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান পরিচালনব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ অন্যতম প্রধান বিষয়। পরবর্তী আর এক অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এইভাবে মূলধন অর্থাৎ যথোপযুক্ত যন্ত্র ও মেসিন শ্রমিককে তাহার কার্য-সম্পাদনে অধিক সাহায্য করে।

জনসংখ্যা সম্পর্কিত মতবাদ—জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কাজ করার উপযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ইহাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকিলে সকলের প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত সম্পদ উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সহযোগিতা ও পরিকল্পনা যদি না থাকে, তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হইত না। কারণ, প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে পুষ্টির অভাবে লোকে যে কেবল অসুস্থ হইয়া পড়িবে তাহা নহে, উপরন্তু অনাহারে ও দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু হইবে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে এবং উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি না করিলে জন্মের ও মৃত্যুর হার বাড়িবে; ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি হইবে ও দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিবে।

ম্যালথাসের মতবাদ—টমাস ম্যালথাস নামক জনৈক ইংরেজ অর্থনীতিবিদের মতে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে বা জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ইত্যাদি) এবং খাদ্যসরবরাহ গাণিতিক হারে বা সমান্তর হারে (১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি) বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা খাদ্য সরবরাহ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই দ্রুতবর্ধিত জনসংখ্যা রোধ করিবার জন্য তিনি দুইটি উপায় উল্লেখ করিয়াছেন:—

(১) **প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ**—মহামারী, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

(২) **পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ**—আত্মসংযম, পরিণত বয়সে বিবাহ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। নিজ পরিবারের ভরণপোষণে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত দরিদ্রের বিবাহ করা উচিত নয়।

ভারতবর্ষে যে সময়ে খাদ্যদ্রব্য ১—৭ হারে বাড়িয়াছে, সেই সময়ে জনসংখ্যা ১—৬৪ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯৩১ সালে ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ (১০ বৎসরে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি), ১৯৪১ সালে ৪০ কোটি (পরবর্তী দশ বৎসরে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ অর্থাৎ ফ্রান্সের জনসংখ্যার সমান লোক বৃদ্ধি)। ভারত ভাগ হওয়ার পর সমস্যা আরও গুরুতর হইয়াছে।

কিন্তু ভারতে খাদ্যোৎপাদনের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য মান্ধাতা আমলের চাষপদ্ধতি ও বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত অনগ্রসর কৃষিনীতিই মুখ্যতঃ দায়ী। ভারতীয় জনসাধারণের নির্মম দারিদ্র্য ও নিদারুণ অজ্ঞতা জনসংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বৃটিশ সরকার দুনিয়ার সম্মুখে প্রচার করিতেন যে, ভারতের লোকসংখ্যাই ভারতের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী, ইহা সত্য নহে।

তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, লোকবৃদ্ধির জ্যামিতিক সূত্রের আবিষ্কারক ম্যালথাস সাহেব মানুষের যে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে। অনেক দেশে লোকবৃদ্ধি খাদ্যবৃদ্ধির চেয়ে বেশী হয় নাই, আবার অনেক দেশে লোকবৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যবৃদ্ধি বেশী হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহামারী অপরিহার্য নহে। সুস্থ, সবল, সচেতন, জ্ঞানবান মানবসমাজে সৃষ্টি ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থা দ্বারা দারিদ্র্যের অবসানই এই সমস্যা সমাধানের পথ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূলধন

মূলধনও উৎপাদনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণ শিল্প বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে মূলধন বলে। কিন্তু টাকাই মূলধন নহে, আসল মূলধন হইল যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রভৃতি জিনিষ, যাহার দ্বারা আমরা উৎপন্ন করিতে পারি। প্রচলিত অর্থে মূলধন বলিতে টাকাই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন বলিতে টাকা বুঝায় না, টাকা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। টাকা দ্বারা আমরা জিনিষ ক্রয়বিক্রয় করিতে পারি, মানুষের সেবার বা সামগ্রীর বিনিময়ে তাহাকে টাকা দিতে পারি। শিল্পে নিয়োজিত মূলধন আমরা টাকার হারে নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু টাকা মূলধন নহে। কোন দেশে টাকা বাড়িলেই মূলধন বাড়ে না। যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির ফলে লোকের হাতে আগের চেয়ে অনেক বেশী টাকা জমিয়াছে, কিন্তু ইহাতে দেশের মূলধন বাড়ে নাই।

মূলধনের সংজ্ঞা—

যে সব জিনিষের দ্বারা আমরা অন্য জিনিষ উৎপাদন করিতে পারি, তাহাই মূলধন।

মূলধনের গোড়ার কথা—মূলধন সঞ্চয়বৃত্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। সঞ্চয় করিতে হইলে আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের চেয়ে আরও বেশী উৎপাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ অতিরিক্ত উৎপাদন করিতে হইবে। এই অতিরিক্ত অংশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করা যায়, বিনষ্ট করা যায় অথবা সঞ্চয় করা যায়। এই সঞ্চয় করিয়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিয়োগ করিলেই মূলধনে পরিণত হয়।

সম্পদ ও মূলধন—মানুষের সম্পদের যে অংশ অধিকতর আয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তাহাই মূলধন। সমস্ত সামগ্রীই মূলধন নহে, আবার সকল সম্পদও মূলধন নহে।

দেশের সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতি যে সব জিনিষ আমরা আশু প্রয়োজনে ব্যবহার করি বা উপভোগ করি, (২) কল-কারখানা প্রভৃতি জিনিষ, যাহা আমরা অবিলম্বে ব্যবহার না করিয়া আয়ের উদ্দেশ্যে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করি। সাধারণতঃ এই সম্পদই মূলধন।

আবার একই জিনিষ ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে সম্পদও হইতে পারে,

মূলধনও হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি মোটর গাড়ী ব্যক্তিগত ভোগের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে তাহা হইবে শুধু সম্পদ। কিন্তু কোন ডাক্তার মোটর গাড়ীকে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ব্যবহার করিলে তাহা হইবে মূলধন। কারণ ইহাদ্বারা ডাক্তার অনেক রোগী পরিদর্শন করিয়া অধিকতর আয় করিতে পারেন। কোন বাড়ী ব্যক্তিগত বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিলে তাহা হইবে শুধু সম্পদ আর কারখানা বা কারখানার শ্রমিকের ব্যসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিলে তাহা হইবে মূলধন। আদম স্মিথের কথায়, "মানুষের সঞ্চয়ের সেই অংশের নামই মূলধন, যাহা সে আয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে"।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ—বিভিন্নভাবে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে।

উৎপাদকের মূলধন ও ভোগ্য মূলধন—

কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল প্রভৃতি অধিক সম্পদ উৎপাদনের কার্যে লাগে, ইহাদিগকে উৎপাদকের মূলধন বা সহায়ক মূলধন বলে।

আবার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতিও মূলধন। ইহা উৎপাদনে পরোক্ষভাবে কাজে লাগে, কারণ ইহা দ্বারা মানুষের অভাব প্রত্যক্ষভাবে মিটে। ইহাদের ভোগ্য বা ব্যবহার্য মূলধন বলে।

বন্ধ মূলধন ও চল্‌তি মূলধন—আবার মূলধনকে (১) বন্ধ ও (২) চল্‌তি এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী প্রভৃতি যেসব মূলধন পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত সম্পদ উৎপাদন কার্য চালান যায়। তাহাদের স্থির মূলধন বা আবদ্ধ মূলধন বলে। এই সব মূলধন একবার ব্যবহারে নিঃশেষ বা রূপান্তরিত হইয়া যায় না।

আর কাঁচামাল প্রভৃতি যেসব জিনিষ প্রথমবার ব্যবহারের সংগে সংগে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া স্বতন্ত্র জিনিষে পরিণত হয়, তাহাকে চল্‌তি মূলধন বলে। তুলা যন্ত্রে দিলে সূতায় পরিণত হয়। আবার সূতা বয়নযন্ত্রে দিলে কাপড়ে পরিণত হয়। এইভাবে তুলা ও সূতা একবার মাত্র ব্যবহারের সংগে সংগে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র জিনিষে পরিণত হয়।

তাহা ছাড়া বর্তমানে (১) স্থায়ীভাবে নিয়োজিত মূলধন,—টাটা কোম্পানির লৌহচুল্লী, (২) রূপান্তরশীল মূলধন—এই দুইটি বিভাগের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

টাটার লৌহচুল্লী একই স্থলে আবদ্ধ থাকিয়া একই কাজে ব্যবহৃত হইবে। তাই ইহা স্থায়ীভাবে নিয়োজিত মূলধন; আবার চিরদিনের জন্য নিয়োজিত হয় নাই

এরূপ লৌহকে রেলপথ, রেলগাড়ির কামরা, ইঞ্জিন প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা চলে। ইহাকে রূপান্তরশীল মূলধন বলে।

অবশ্য রেলওয়ে সেতু প্রভৃতিতে ব্যবহৃত লৌহকে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত মূলধনও বলা যাইতে পারে।

উৎপাদনে মূলধনের ব্যবহার—মূলধন উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। অন্য দুইটি উপাদান প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিশ্রমের সাহায্যে মূলধন উৎপন্ন হয়। মূলধনের গুরুত্ব দুই দিক হইতে—প্রথমতঃ উৎপাদনের জন্য মূলধন প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের দ্বারাই মূলধনের সৃষ্টি।

পুঁজিপতিগণ কেবলমাত্র অধিক আয়ের উদ্দেশ্যেই সঞ্চিত অর্থ বা পুঁজি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কি করিয়া আয় বাড়ান যায়। ব্যবসায়ীগণের কাছে ইহা এক অমূল্য সম্পদ। ইহা তাহাদের উৎপাদনকার্যের অপরিহার্য সহায়। এইরূপ ব্যবহারে ইহা আমাদের উৎপাদনক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

মূলধনের তিনটি প্রধান কার্য--

(১) সুযোগ্য ব্যবহারে কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদনে সাহায্য করা;

(২) মানুষকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইতে সহায়তা করা;

(৩) শিল্পক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে ঝুঁকি গ্রহণে সাহায্য করা।

মূলধনের কার্যকারিতা—শুধুমাত্র মূলধন দ্বারা কোন কার্য করা যায় না। ব্যবহারের আগে প্রথমে দেখিতে হইবে ইহা সেই কার্যের উপযুক্ত কিনা এবং উপযুক্ত হইলে সুচিন্তিত উপায়ে ইহা কার্যে খাটাইতে হইবে।

১। একটি ছোট বাজারের জন্য একটি বিরাট কারখানার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন ব্যবসায়ী তাহার মূলধনের বেশীর ভাগ অংশই কারখানা-গৃহে ব্যয় করেন তবে পরে তাহাকে কাঁচামাল বা অন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য টাকার অভাবে কষ্ট পাইতে হইবে।

২। অধিক উৎপাদন উন্নত যন্ত্র বা বিরাট বাড়ীর উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে এই যন্ত্র বা বাড়ীর যথাযথ ব্যবহারের উপর। সুদক্ষ পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে সুদক্ষ শ্রমিকগণ এইসব যন্ত্রের সুব্যবহার করিয়া অধিক এবং উন্নত উৎপাদন করিতে সক্ষম হন।

মূলধন সঞ্চয় করা সম্ভব কোথায়?

সম্পদ এবং মূলধনের উৎপত্তি—মূলধনের উৎপত্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে সম্ভব হইয়াছে।

১। **ম্ল কারণ—সঞ্চয়ক্ষমতা।** অভাবমোচনের পর যদি সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা সঞ্চয় করা হয়।

২। **ব্যক্তিগত কারণ**—সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা।

(ক) **ভবিষ্যৎদৃষ্টি বা দ্রদৃষ্টি**—ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা বা দুর্দিনের জন্য সাধারণতঃ মান্‌ষ অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল না বলিয়াই আদিম মান্‌ষের পক্ষে কোন সঞ্চয় সম্ভব হয় নাই।

অন্য দুইটি মানসিক কারণঃ—

(খ) **পারিবারিক স্নেহ**—সমাজের উন্নতির ফলে মান্‌ষ নিজ সংসারের প্রতি সচেতন হইয়া পারিবারিক স্নেহবশতঃ অর্থ সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে এই স্নেহ অত্যন্ত প্রবল। এখানে মান্‌ষ প্রধানতঃ নিজ পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ সঞ্চয় করে।

(গ) **গৌরব বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা**—ক্ষমতা বা খ্যাতির জন্য অনেকে অর্থ সঞ্চয় করে।

৩। **বাহ্য কারণ**—উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও কয়েকটি বাহ্য কারণ আছে যাহার দর্‌ণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। এইগ্‌লি হইলঃ—

(১) **ধন ও প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা**—কোন বিশৃঙ্খল দেশে যখন এই নিশ্চয়তা দৃঢ় হয়, তখন মান্‌ষ সঞ্চয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে।

(২) **অর্থ-প্রচলন**—বিনিময়প্রথার সময়ে নষ্ট হইবার ভয়ে কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা সম্ভব ছিল না।

(৩) **নিরাপদে এবং লাভে টাকা খাটানোর স্‌বিধা**—সেভিংস ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি, সমবায় সমিতি প্রভৃতি অর্থ সঞ্চয়ে মান্‌ষকে উৎসাহিত করে।

(৪) **স্‌দের হার**—প‍্ঁজিবাদের দেশে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ স্‌দের হারের উপর নির্ভর করে। মার্শাল বলিয়াছেন, স্‌দের হার বর্ধিত হইলে অর্থের পরিমাণও বর্ধিত হইবে। অধিক স্‌দের আশায় মান্‌ষ অধিক সঞ্চয় করিয়া থাকে। স্‌দের হার বাড়ান হইলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও বাড়িবে।

ম্লধন এবং সমাজ—উৎপাদনকার্যে ম্লধন অপরিহার্য হইলেও ব্যক্তিগত ম্লধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ম্লধন কয়েকজন ভাগ্যবান (কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্য) ধনিকের হাতে থাকিবে? না, ইহা জাতীয় সম্পত্তি হইবে? —আধ্‌নিক এই গভীর ও জটিল সমস্যা লইয়া পরে আলোচনা করিব।

সপ্তম অধ্যায়

সংগঠন

বর্তমানে উৎপাদনকার্য খুব শৃঙ্খলার সহিত চলিয়া থাকে। সহজ, সরল জীবনযাত্রা হইতে আমরা এখন এক জটিলতর সমাজব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছি। আগে মানুষ নিজের জমি নিজেই চাষ করিত এবং জমির সম্পদ সে নিজেই ভোগ করিত। এই সম্পদ ছিল একান্তভাবে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ। এখন জমির মালিক চাষীকে জমি বন্দোবস্ত দেয়। চাষী আরও শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিয়া সেই জমিতে ফসল উৎপন্ন করে। এইভাবে কৃষক, মূলধন নিয়োগকারী মহাজন এবং চাষীর মিলিত প্রচেষ্টায় জমিতে ফসল ফলে। সুতরাং এ সম্পদ এই তিনজনের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

এইরূপে আজকাল সম্পদ উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত আছে। একদল মূলধন খাটাইতেছে ও একদল অর্থ ও পরিশ্রমকে সংগঠিত করিতেছে।

নিষ্পাদক—বর্তমানে জটিল ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য একজন সুদক্ষ বুদ্ধিমান কর্মসচিবের প্রয়োজন। ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যাবতীয় করণীয় কার্য তাঁহাকে নির্ধারণ করিতে হইবে (কি উৎপন্ন হইবে, কি পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন)। তাঁহাকে ব্যবসা পরিচালনা ও সর্বপ্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হইবে। নিষ্পাদকের কার্য এতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁহাকে উৎপাদনের চতুর্থ সহায়ক বলা হইলে কোনরূপ অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাকে শিল্পের সংগঠক, সর্বাধিনায়ক, প্রধান কর্মসচিব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

নিষ্পাদকের কার্যাবলী—তাঁহার কার্য প্রধানতঃ দুইটি ঃ—

(১) ব্যবসা পরিচালনা, (২) ঝুঁকি গ্রহণ।

ব্যবসা পরিচালনা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) উৎপাদনকার্য পরিচালনা, (খ) বণ্টনকার্য পরিচালনা।

কার্যপন্থা নির্ধারণ প্রধান কার্য নয়, প্রধান কার্য হইতেছে—সেই পন্থানুযায়ী **ব্যবসা পরিচালনা** করা। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও শ্রম নির্দিষ্টপন্থায় নিয়োগ করিয়া কোন দ্রব্য উৎপাদন করিবেন ও তাহা বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

উৎপাদনে সাহায্যকারী প্রত্যেকের পারিশ্রমিক, খাজনা, সুদ ইত্যাদি যথাযথ বণ্টন করা হইতেছে তাঁহার দ্বিতীয় কার্য। এইসব দেয় শোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই হইল নিষ্পাদকের প্রাপ্য বা লাভ।

(২) **ঝুঁকি গ্রহণ**—কোন জিনিস বাজারে সরবরাহ করিবার বহু পূর্বেই তাঁহাকে ঐ জিনিস প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সময় নানা কারণে তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাঁচামালের সরবরাহ কমিয়া যাইতে পারে। যন্ত্র বিকল হইতে পারে, রুচি পরিবর্তনের ফলে জিনিসের চাহিদা কমিতে পারে। এইসব ক্ষতি স্বীকারের ঝুঁকি লইয়াই নিষ্পাদককে কার্যে ব্রতী হইতে হয়।

বর্তমান সময়ে নিষ্পাদকের প্রয়োজনীয়তা—কার্লাইল তাঁহার 'পাস্ট ও প্রেজেণ্ট' নামক গ্রন্থে ইঁহাকে 'শিল্পের কর্ণধার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সুব্যবস্থা ও কর্মদক্ষতার উপর ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এক কারখানার সহিত অন্য কারখানার, এক শিল্পের সহিত অন্য শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করাই নিষ্পাদকের কাজ। যে শিল্প-কর্ণধার উৎসাহ, শক্তি ও দক্ষতার সহিত অগ্রসর হইতে পারেন, ব্যবসাক্ষেত্রে তিনিই জয়লাভ করেন।

নিষ্পাদক ও উৎপাদন—আধুনিক যুগে ব্যবসায়ের সাফল্য অনেক পরিমাণে নিষ্পাদকের উপর নির্ভরশীল। তিনি উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার চতুর্দিকে উৎপাদনযন্ত্র আবর্তিত হইতেছে। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ বাণিজ্যিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে সেখানকার শিল্পপতিগণের শিল্পপ্রতিভা। অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, সুদক্ষ ও কর্মঠ শ্রমিক এবং প্রভূত সঞ্চিত অর্থ—এই তিনটিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করিয়া আমেরিকার শিল্পপতিগণ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষেও অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিরাট জনবল ও প্রভূত পুঁজি রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলি ব্যবহারের জন্য নিপুণ নিষ্পাদকের অভাবে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্ভব হয় নাই। উল্লেখযোগ্য ভারতীয় নিষ্পাদক হিসাবে টাটা, বিড়লা, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রমুখ কয়েকজনের নাম করা যাইতে পারে।

নিষ্পাদকের গুণাবলী—(১) ব্যবসা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান, (২) মানুষ চিনিবার ক্ষমতা এবং (৩) দূরদৃষ্টি প্রভৃতি গুণাবলী থাকা নিষ্পাদকের পক্ষে অপরিহার্য।

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদন সংগঠনের বিবিধ সমস্যা

বর্তমান যুগে উৎপাদনব্যবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হওয়ার ফলে উৎপাদন সংগঠনে অনেকগুলি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে।

সমস্যাগুলি এইরূপঃ—

(১) শ্রমসংগঠন—শ্রমবিভাগ;

(২) মূলধন সংগঠন—উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহার;

(৩) ভৌগোলিক শ্রম বিভাগ এবং শিল্পের একদেশতা;

(৪) সংগঠনের প্রসার ঃ বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন বনাম ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন;

(৫) শিল্প-নিয়ন্ত্রণ—শিল্প-পরিচালনার বিভিন্ন পদ্ধতি।

১। শ্রম-বিভাগ

১। **শ্রম-বিভাগ—**শ্রম-বিভাগের উপর উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। শ্রম-বিভাগের অর্থ উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ সহযোগিতা।

আদিম সমাজে শ্রম-বিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। প্রত্যেককেই নিজ নিজ অভাব মোচনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত। একই মানুষকে শিকার, মাছ ধরা, বস্ত্র বুনন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করিতে হইত।

সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক একজন এক এক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। শ্রম-বিভাগের প্রসার লাভের ফলে উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। এইভাবে কোন একটি বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষ দক্ষতা অর্জন করে; ফলে অন্য বিষয়ের জন্য তাহাকে পরনির্ভরশীল হইতে হয়।

শ্রম-বিভাগের বিশেষত্ব—ব্যক্তির দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে শ্রম-বিভাগের অর্থ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন; সমাজের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার অর্থ সহযোগিতা। কিন্তু কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে বাস করিয়াই ব্যক্তি পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে; অন্যথায় নহে। একশ্রেণীর মানুষ আহার্য এবং আশ্রয়ের সংস্থান করে বলিয়াই অন্য শ্রেণীর মানুষ উৎপাদনকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারে।

এইভাবে কাজ বা বৃত্তির ভাগ হয়। কালক্রমে এই বিভাগ আরও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে প্রতিটি কাজকে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জুতা প্রস্তুত প্রণালী ১২০টি অংশে বিভক্ত। সুতরাং একজন শ্রমিক সেখানে একটি জুতার ১/১২০ অংশ প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রতিদিন একই প্রকার কাজ করিবার জন্য শ্রমিক আপন কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে; যেমন, জুতার সোল তৈয়ারি, ফিতা পরান ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত একটি সম্পূর্ণ জুতা প্রস্তুত করিতে হইলে ১২০টি শ্রমিককে একযোগে কাজ করিতে হইবে। ফলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

শ্রম-বিভাজনের প্রকারভেদ—পেনসনের মতানুসারে বিভিন্ন প্রকার শ্রম-বিভাগ হইল—

(১) শিল্প, ব্যবসা এবং বৃত্তিতে শ্রম-বিভাগ।

সমাজের শৈশবে এইরূপ শ্রম-বিভাগ বিদ্যমান ছিল। তখন কেহ কৃষিকার্য করিত, কেহ বা শিকার করিয়া বেড়াইত। প্রাচীন হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমধর্ম একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বৃত্তি অনুসারে মানুষকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), রাজা এবং যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়), বণিক এবং ধনী (বৈশ্য), সাধারণ শ্রমিক (শূদ্র)।

(২) স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে শ্রম-বিভাগ।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেহ বা পশুচারণ বৃত্তি অবলম্বন করিল; কেহ বা মৃতপশুর চামড়া তৈয়ারী করিতে লাগিল আবার কেহ বা ঐ চামড়া হইতে জুতা তৈয়ারী করিতে লাগিল।

(৩) সম্পূর্ণ কাজের ভগ্নাংশে শ্রম-বিভাগ।

শিল্পের অগ্রগতির এবং উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে প্রত্যেকটি কাজ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এখন আর মুচি একলা জুতা তৈয়ারী করিতে পারে না। আধুনিক কোন জুতার কারখানায় কেহ বিভিন্ন মাপে চামড়া কাটে, কেহ সোল তৈয়ারী করে, কেহ বা ফিতা লাগায়। প্রত্যেকটি কাজই অসম্পূর্ণ। সকলের কাজ শেষ হইলে সম্পূর্ণ এক জোড়া নূতন জুতা তৈয়ারী হইবে।

(৪) চতুর্থ প্রকার শ্রম-বিভাগ হইল ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ। উদাহরণ, ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জের কয়লাখনি, বাংলার পাটশিল্প, বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং নাগপুর অঞ্চলের বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি।

শ্রম-বিভাগের সুবিধা—শ্রম-বিভাগের সুবিধা বহুবিধ।

(১) কার্যে অধিকতর দক্ষতা অর্জন—শ্রমিকদের কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি সারা জীবন কেবলমাত্র পেরেক তৈয়ারী করিতেছে, যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকার অপেক্ষা সে ভাল পেরেক তৈয়ারী করিতে পারিবে। অভ্যাসের ফলেই মানুষ যে কোন বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারে। যে একটিমাত্র কাজ করে, সে সেই কাজ নিঃসন্দেহে অন্যের চেয়ে ভাল-ভাবে করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পায়। শ্রম-বিভাগে প্রত্যেক পুরুষ, নারী, কিশোর বা কিশোরীকে স্ব স্ব উপযোগী কাজে নিয়োগ করা সম্ভব। ফলে শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা এবং পারদর্শিতা অনুসারে শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা সহজ হয়। যে কাজে চিন্তা করিতে হইবে তাহা মেধাবী ব্যক্তিকে, যে কাজে শক্তির প্রয়োজন তাহা কোন বলিষ্ঠ শ্রমিককে এবং লঘুশ্রমের কাজ নারী ও শিশুদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় কবি, সংগীতজ্ঞ, ঔপন্যাসিক বা বিজ্ঞানীকে স্ব স্ব আহার্য বা পরিধেয় উৎপাদনের জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হইবে না।

(৩) শ্রম-বিভাগের ফলে অল্প সময়ে বেশী কাজ করা চলে ও সময় উদ্বৃত্ত থাকে। একই ব্যক্তি দিনের পর দিন একই কাজ করিতে থাকিলে সে ইহা অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতে পারিবে। একই জায়গায় বসিয়া একই প্রকার যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজ করে বলিয়া তাহার সময়ের অপব্যয় হয় না। অধিকন্তু শ্রম-বিভাগের ফলে প্রত্যেক কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়। সমগ্র কাজটি না শিখিলেও কোন ক্ষতি হয় না। একটি কাজের ক্ষুদ্র অংশ শিখিতে বেশী সময় লাগে না, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যেকে নিজের কাজ শিখিয়া লইতে পারে। এইভাবেও প্রচুর সময় বাঁচিয়া যায়।

(৪) শ্রম-বিভাগের ফলে মানুষের পরিশ্রম হ্রাস পাইয়াছে। উৎপাদনপদ্ধতি সরল হইয়া যাওয়ায় যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করা সম্ভব। অতি সহজে কাজ হইয়া যায়।

(৫) শ্রম-বিভাগের ফলে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়াছে।

(ক) যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) ইহাতে মানুষের শারীরিক কষ্ট অনেক লাঘব হইয়াছে। শত শত মণের ভারী বোঝা বা মালপত্র মানুষকে আর বহন করিতে হয় না। ক্রেনের সাহায্যে ইহাদিগকে কারখানার অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হয়।

(গ) যন্ত্র ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কার্যপদ্ধতি সহজ হইয়াছে এবং কর্ম-প্রাপ্তির যথেষ্ট সুযোগ বাড়িয়াছে। সূতাকলের কোন শ্রমিক বেকার হইলে সে সহজেই পাটকলে কাজ সংগ্রহ করিতে পারে। অল্প সময়ে কাজ শিখিবার ব্যবস্থা থাকায় সে নূতন কাজও শিখিতে পারে।

(৬) শ্রম-বিভাগের ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবিষ্কারের সুবিধা হইয়াছে। সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছে। সাধারণতঃ শ্রমিক প্রতিদিন একই কাজ করে। নিজের শ্রম লাঘবের জন্য সে সর্বদা চিন্তা করে। ইহার ফলে অনেক সময় নানা আশ্চর্যজনক আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

(৭) শ্রম-বিভাগের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা আছে। প্রত্যেক মানুষ যেমন প্রত্যেক কাজের উপযুক্ত নয়, তেমনি পৃথিবীর সব দেশে সর্ব-প্রকার দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব নয়। কয়েকটি দেশে অন্য দেশ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজে এবং সস্তায় দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বৃটেনের শিল্প-অঞ্চলে যেমন স্পেনের মত আঙ্গুর চাষ সম্ভব নয়, তেমনি স্পেনের আঙ্গুর ক্ষেতে বৃটেনের লৌহশিল্পের কারখানা বসান সম্ভব নয়। সম্ভব হইলেও কোন দেশের পক্ষেই ইহা লাভজনক হইবে না। এই-প্রকার শ্রম-বিভাগের নাম **ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ**।

(৮) ইহা শারীরিক শ্রম লাঘব করিয়া উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করে।

(৯) সর্বশেষে, শ্রম-বিভাগের ফলে জিনিষের দাম পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ফলে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে পারিতেছে। মানুষের সুখসুবিধা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রম-বিভাগের অসুবিধা—এত সুবিধা সত্ত্বেও কতকগুলি অসুবিধার জন্য শ্রম-বিভাগকে বেশী দূরে প্রসারিত করা যায় না।

শ্রম-বিভাগের ফলে শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপকতার জন্য ব্যবসা সংগঠন বা পরিচালনা করা খুব কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এই অসুবিধা ব্যতীত আরও কয়েকটি অসুবিধা আছে। যেমনঃ—

(১) একঘেয়ে কাজ। প্রতিদিন যদি কোন মানুষকে একই কাজ করিতে হয় তবে ঐ কাজে তাহার কোন আগ্রহ বা উৎসাহ থাকিতে পারে না। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত সে তাহার কাজ করিয়া যায়। ফলে মানুষের কাজ একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর হইয়া পড়ে।

(২) মনের সংকীর্ণতা—প্রতিদিন একই কাজ করিবার ফলে শ্রমিকের মন সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। পূর্বে মুচি অন্যের সাহায্য বিনা নিজেই জুতা তৈয়ারী করিত। ইহাতে সে নিজের রুচিমত কাজ করিতে পারিত। বর্তমানে তাহাকে জুতার একটি অংশ মাত্র তৈয়ারী করিতে হয় বলিয়া তাহার মানসিক বৃত্তিগুলি বিকাশ লাভের সুযোগ পায় না।

(৩) সাধারণ কর্মদক্ষতা হ্রাস—শ্রমিককে প্রতিদিন একই কাজ করিতে হয় বলিয়া কোন একটি বিষয়ে তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি পাইলেও তাহার সাধারণ কার্যদক্ষতা হ্রাস পায়। মানসিক, সামাজিক এবং বস্তুগত গুণগুলি বিসর্জন দিয়া শ্রমিক তাহার কর্মে নিপুণতা অর্জন করে।

(৪) শ্রম-বিভাজন অতিরিক্ত হওয়ার ফলে শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। সমাজে তাহার পৃথক সত্ত্বা আজ নাই। যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রমিকসমাজে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, বহুদিন পূর্বেই কার্ল মার্ক্স সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যন্ত্রচালিত জীবন যাপনের ফলে মানুষ পশুর স্তরে উপনীত হইয়াছে। তাহার মনুষ্যত্ব আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। তাহার চরিত্র বিকাশের কোন সুযোগ নাই। ব্যাপক শ্রম-বিভাগের ফলে নারী ও শিশুগণকেও এখন কারখানায় নিয়োগ করা হইতেছে। ফলে মানুষের পারিবারিক জীবনও ধ্বংসের পথে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, নারী ও কিশোর শ্রমিককে পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বলিয়া নারী ও কিশোর শ্রমের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিল্পপতিরা লাভবান হইবার চেষ্টা করেন।

গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ শহরে ভিড় করিতেছে। তাহাদের জীবনে কোন আনন্দ নাই, কোন উৎসাহ নাই। যন্ত্রচালিত জড়পদার্থবৎ দিনগত পাপক্ষয় করিয়া কোনমতে তাহারা দিন কাটাইতেছে।

শ্রম-বিভাগের ফলে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। পূর্বে শ্রমিকেরা মালিকের নিজ তত্ত্বাবধানে কাজ করিত। এখন মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। উভয়ের মাঝে রহিয়াছেন কর্মসচিব, সর্দার, পরিদর্শক প্রভৃতি অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ। শ্রমিকের কাছে তাহার কাজ এখন এক দুর্বিষহ ভারবিশেষ।

শ্রম-বিভাগ এবং সমাজ—শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে। মানুষের শ্রম লাঘব হওয়ার জন্য সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে।

অধিক উৎপাদনের জন্য জিনিষের দাম কম হওয়ায় সাধারণ মানুষ প্রয়োজনমত জিনিষ ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রম-বিভাগের যুগে শিল্পপতিদের কার্যের জন্য মানুষের দুঃখদুর্দশা বাড়িয়াছে। অল্প বেতনে কাজ করার জন্য মানুষের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পে নারী ও শিশুশ্রমিক নিয়োগের ফলে মানুষের পারিবারিক জীবনও ক্রমশঃ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে।

ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রম-বিভাগ আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হইল মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। শ্রমিক তথা সমগ্র মানবসমাজের সময়ের সদ্ব্যবহার ও শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে লাভবান হইব। নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীবিশেষের পরিবর্তে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ এবং সুখ-সুবিধার প্রতি আমাদের সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। উৎপাদন কার্যে যন্ত্র ব্যবহার

২। উৎপাদন কার্যে যন্ত্র ব্যবহার—আমাদের পূর্বপুরুষগণ হস্তশিল্পে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ তখনও যন্ত্র উদ্ভাবন হয় নাই। কালক্রমে কাজের সুবিধার জন্য তাঁহারা ছোট ছোট যন্ত্র তৈয়ারী করিলেন। বুদ্ধিবলে মানুষ ক্রমে বড় বড় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এবং ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিল।

যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা এবং সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের কার্যক্ষমতা আশাতীতরূপে বর্ধিত হইয়াছে।

এত ক্ষমতাসত্ত্বেও যন্ত্র মানুষের শ্রমকে নিষ্প্রয়োজন করে নাই। মানুষ বুদ্ধিবলে যন্ত্র আবিষ্কার এবং যন্ত্রনির্মাণ প্রণালী স্থির করে এবং পরিশ্রম করিয়া সেই প্রণালী অনুসারে যন্ত্র নির্মাণ করে। আবার বিকল হইলে যন্ত্র সারাইতে বা

বদলাইতে হয়। যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করিয়া অধিক উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেও উৎপাদন কার্যে শ্রমিকের প্রয়োজন কখনই শেষ হইয়া যাইবে না।

যন্ত্র—শ্রম বিভাগের ফলে যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; আবার ব্যাপকভাবে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রম-বিভাগ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে যে গুলি অনায়াসেই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায়।

'যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা', শ্রমিক শ্রেণীর উপর যন্ত্রের প্রভাব

(১) প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারে শারীরিক শ্রম অনেক লাঘব হইয়াছে। যন্ত্র সাহায্যে বায়বীয়, বৈদ্যুতিক এবং জলীয় শক্তি আয়ত্ত করিয়া বর্তমানে মানুষ অনায়াসেই কঠিন এবং শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিতেছে।

(২) উৎপাদনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। আলপিন কারখানার কোন শ্রমিক একদিনে পনের লক্ষ আলপিন তৈয়ারী করিতে পারে।

(৩) যন্ত্র ব্যবহারের ফলেই ব্যাপকভাবে সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত শিল্পকার্য সম্ভব হইয়াছে। যেমন, ঘড়ি, তুলাদন্ড ইত্যাদি।

(৪) ব্যবহার করিবার পূর্বে যন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধিমান শ্রমিকেরা সহজেই ইহা আয়ত্ত করিতে পারে। এইভাবে যন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ করিতে গিয়া শ্রমিকদের বুদ্ধির বিকাশ ও চরিত্রের উন্নতি হইয়াছে।

(৫) সহসা যন্ত্রের প্রচলনে বেকার সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ আমরা আশু এবং চরম ফলাফলের পার্থক্য বিচার করিয়া দেখিব। কুটিরশিল্পের পরিবর্তে যন্ত্রশিল্পের আকস্মিক প্রবর্তনের ফলে বেকার-সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মানুষের দুঃখকষ্টও বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় অধিক সম্পদ উৎপন্ন হইবে। এই সম্পদ যথাযথ বিতরণ করা হইলে সকলেই উপকৃত হইবে। ইহার ফলে শ্রমিকদের আয়ও যেমন বাড়িবে তেমনি তাহারা ব্যয়ও বেশী করিবে। ফলে তাহাদের নূতন অভাব দূর করিবার জন্য আরও শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে। প্রথম যন্ত্র প্রচলনের সময় যে সব শ্রমিক বেকার হইয়াছিল তাহারা পুনরায় কাজে নিযুক্ত হইবে। সুতরাং যন্ত্র প্রচলনের সময় সাময়িকভাবে কর্মচ্যুতি ঘটিলেও পরিশেষে আরও বেশী কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৬) যন্ত্র একপ্রকার পাপবিশেষ। ইহা শ্রমিকের দাসত্বের নিদর্শন বলিয়া মহাত্মা গান্ধী যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

(৭) যন্ত্র ব্যবহারের ফলে বর্তমান যুগে শ্রমিকদের নৈতিক অবনতি ও মানসিক দৈন্য ঘটিয়াছে এবং শারীরিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছে।

সিদ্ধান্ত—বর্তমান সমাজে যন্ত্র ব্যবহারের অসুবিধাগুলি বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিলেও ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। মানুষের সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অসুবিধাগুলি দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বস্তুতঃ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মানুষের পরিশ্রম লাঘব হইয়াছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩। শিল্পের একদেশতা—আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ

সাধারণতঃ এক একটি স্থানে এক একটি বিশেষ শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠে। যেখানে যে শিল্পের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে সেইখানেই সেই শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। ইহারই নাম শিল্পের স্থানীয়করণ।

কলিকাতার বইএর দোকান গোলদীঘির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের পাটকল, জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ইত্যাদি এই প্রকার শিল্পের একদেশতার উদাহরণ—

শিল্পের স্থানীয়করণের কারণ—কয়লা বা বৈদ্যুতিক শক্তি, ক্রেতার সান্নিধ্য, কাঁচামাল, শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য, যানবাহনের সুবিধা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কারণে ব্যবসাবাণিজ্য কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। যেমন বাংলার পাটশিল্প, বিহারের লৌহ কারখানা এবং মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইএর বস্ত্রশিল্প।

প্রাকৃতিক এবং জলবায়ুর প্রভাবেও কোন কোন শিল্প নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। যেমন বাংলা এবং আসামের পাট এবং চা শিল্প।

আবার ঢাকায় মসলিন শিল্প এবং প্রাচীন তীর্থ কাশীতে রেশম এবং তাম্র শিল্পের একদেশতার জন্য তৎকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী।

কোনও একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান একস্থানে গড়িয়া উঠিলে তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও সেইখানে ভীড় করে। এইভাবে কোন একটি স্থানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। ইংরাজীতে ইহাকে শিল্পের জড়তা বলা হয়। প্রথম শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর সেই অঞ্চলে এমন

কতকগুলি বিশেষ সুবিধা হয় যাহাতে সেই শিল্পের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইখানে একত্রিত হয়। আবার এমনও হয় যে নেহাৎ অভ্যাসবশেই সমব্যবসায়ীরা একই অঞ্চলে আসিয়া সমবেত হয়।

বর্তমান যুগে জনস্বাস্থ্য, দেশরক্ষা বা লোকের ভিড় কমানোর প্রয়োজনে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নূতনভাবে স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

৪। বৃহৎ পরিমাণ বা বহুল উৎপাদন এবং স্বল্প পরিমাণ উৎপাদন

বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদনব্যবস্থা বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য। শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্র ব্যবহারের ফলেই বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। স্বল্প পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থা অপেক্ষা এই প্রকার উৎপাদনব্যবস্থা অধিকতর লাভজনক। সুতাকল বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থার এবং হস্তচালিত তাঁত স্বল্পপরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত।

বৃহৎ পরিমাণ বা বহুল উৎপাদনব্যবস্থার সুবিধা—এককথায় "কম খরচায় বেশী উৎপাদন" এইপ্রকার উৎপাদনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা।

(ক) এই প্রকার উৎপাদনব্যবস্থায় অধিক উৎপাদনের জন্য জিনিষের দাম কমিয়া যাওয়ায় সাধারণ লোকের খুব উপকার হইয়াছে।

(খ) শ্রমিকদের শারীরিক শ্রম লাঘব হইয়াছে।

(গ) উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মালিকেরাও উপকৃত হইয়াছে।

বহুল পরিমাণ এবং স্বল্প পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধা—বহুল এবং স্বল্প উভয় প্রকার উৎপাদনব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা এবং অসুবিধা রহিয়াছে।

বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদনকার্যে মালিকের সুবিধাঃ—

(১) ক্রয় সুবিধা—এককালীন অনেক জিনিষ কেনার জন্য জিনিষের দর কম হইয়া থাকে।

(২) যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা—ব্যবসাক্ষেত্রের প্রসারতার জন্য মালিকগণ একই যন্ত্র অধিকবার ব্যবহার করিতে পারেন।

(৩) শ্রম-বিভাগের সুবিধা—বহুল উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিককে তাহার উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা সহজ এবং সম্ভব হয়। অপর পক্ষে অল্প পরিমাণ উৎপাদনব্যবস্থায়

সুদক্ষ বুদ্ধিমান শ্রমিককে অনেক সময় তাহার অনুপযোগী কাজে অকারণ সময় নষ্ট করিতে হয়।

(৪) উৎপাদনপদ্ধতি উন্নত করিবার জন্য বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদনকারী মালিক গবেষণা কার্যে অর্থব্যয় করিতে পারেন। মূলধনের অভাবে স্বল্প পরিমাণ উৎপাদনকারীর পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে।

(৫) বৃহৎ উৎপাদনব্যবস্থায় আনুষঙ্গিক উৎপাদন ও তাহার বহুবিধ সুবিধা। যেমন বাটার জুতার কারখানায় রবার সোলের বাড়তি টুকরা হইতে রবারের বেলুন ও খেলনা তৈয়ারি হয়।

(৬) বিক্রয় সুবিধা—বৃহৎ ব্যবসায়ী বাজারে মাল শীঘ্র সরবরাহ করিতে পারেন, ধারে বিক্রয় করিতে পারেন। আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিয়া অধিক বিক্রয় করিতে পারেন।

স্বল্প পরিমাণ উৎপাদনকারীর সুবিধা—স্বল্প পরিমাণ উৎপাদনকারীর প্রধান সুবিধা এই যে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করেন। সাক্ষাৎভাবে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করাই হইল তাহার প্রধান সুবিধা।

শিল্পক্ষেত্রে ক্রমশঃ বহুল উৎপাদনকারিগণ স্বল্প উৎপাদনকারীদের পরাভূত করিয়াছেন। এখন যে শিল্পে বৈচিত্র্য বা সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে এবং যাহার চাহিদা কম সেই সব শিল্পে স্বল্প উৎপাদনকারিগণ টিকিয়া আছেন।

(ক) ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি বিভাগের প্রতিটি কাজ মালিকগণ পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ফলে শ্রমিকগণ অলসভাবে সময় নষ্ট করিতে পারে না।

(খ) খরিদ্দারগণের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী ইঁহারা ব্যবস্থা করিতে পারেন। যেমন, দরজি পরিচ্ছদ তৈয়ারী করেন, নাপিত চুল ছাঁটাই করেন। যে ব্যবসায়ে খরিদ্দারগণের সন্তুষ্টির উপর সফলতা নির্ভর করিতেছে সেখানে শিল্পিগণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। কুটিরশিল্পের বহুবিধ জিনিষ এই পর্যায়ে আসে।

(গ) বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং চারুকলা বিষয়ক শিল্পে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। উদাহরণ, শাল আলোয়ান তৈয়ারী, অলঙ্কার নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পে শিল্পদৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত কর্মকুশলতার জন্য এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

বহুল উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য নষ্ট হইয়া দ্রব্যসমূহ এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

৫। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান

বর্তমান যুগে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

(১) ব্যক্তিগত ব্যবসা—সমাজে এইপ্রকার ব্যবসা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত। এই নীতি অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে তাহার ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। অতি সহজে কার্য সম্পাদন করা হয়। অধিক লাভের আশায় মালিকগণ ব্যবসার উন্নতির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন, একজন মালিকের পক্ষে বিরাট উৎপাদনব্যবস্থায় অধিক অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব নহে বলিয়া এই ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা ব্যবস্থা বর্তমানে অচল হইয়া পড়িয়াছে। বিত্তশালী মালিকগণও বর্তমান অনিশ্চয়তার যুগে ব্যবসার ঝুঁকি গ্রহণ করিতে রাজী নহেন।

(২) অংশীদার প্রথা—এই প্রথা অনুযায়ী পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি কোন ব্যবসা একযোগে পরিচালনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারকেই ব্যবসার দায়িত্ব এবং ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। ব্যবসায়ে দেনা হইলে মহাজন যে কোনও অংশীদারের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। অংশীদারদের এই সীমাহীন দায়িত্বের জন্য অংশীদারপ্রথা তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

(৩) যৌথ ব্যবসা—বর্তমানে যৌথ ব্যবসা নামক এক নূতন ব্যবসা পরিচালন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সম্মিলিত ব্যবসায় সমিতি নামে পরিচিত। সমিতির প্রত্যেক সদস্য বা অংশীদার একযোগে ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করেন এবং ব্যবসায়ের মালিক হিসাবে সমস্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেন। কর্মপরিচালনার সুবিধার জন্য অংশীদারগণ নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করিয়া একটি পরিচালন সমিতি গঠন করেন। একজন বেতনভোগী কর্মসচিব এবং পরিদর্শকও নিযুক্ত হন।

সুবিধা—যৌথ কারবারের জন্য ব্যবসায়ে অধিক মূলধন নিয়োগ সম্ভব হইয়াছে। সাধারণ লোকও ব্যবসায়ে টাকা খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে। মালিকের পরিবর্তে অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালন সমিতি এইরূপ ব্যবসা পরিচালনা করেন। অংশীদারগণ প্রয়োজনমত নিজের অংশ হস্তান্তরিত করিতে পারেন। অংশীদারদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। ঋণ পরিশোধে সকলেরই দায়িত্ব আছে।

সীমাবদ্ধ দায়িত্ব ও অংশ হস্তান্তরের সুবিধার জন্য বহুল উৎপাদনের পক্ষে যৌথব্যবসা বিশেষ উপযোগী। বহুল উৎপাদনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বহুল পরিমাণে অর্থ অতি সহজেই যৌথভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম থাকায় সাধারণ লোকে সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে খাটাইতে ভরসা পায়।

অসুবিধা—যৌথ-ব্যবসা প্রথার অসুবিধাও রহিয়াছে। এইরূপ ব্যবসার পরিচালকগণ অসাধু হইলে তাহারা সহজেই অংশীদারদিগকে প্রতারিত করিতে পারে। ঝুঁকি কম হওয়ায় কখনও কখনও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অনিশ্চিত কাজে হাত দেওয়া হয়। অংশীদার, পরিচালকবর্গ এবং বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় সকলেরই দায়িত্ববোধ কমিয়া যায়। ব্যবসায়ে অব্যবস্থা দেখা দিবার বা ইহা অসাধু লোকের করতলগত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও বর্তমান যুগে শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যৌথ-ব্যবসা অপরিহার্য।

(৪) **শিল্প-সমবায়**—কখনও কখনও দুই বা ততোধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া ব্যবসা পরিচালনা করে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হইয়া যে সব সময় সম্পূর্ণ এক হইয়া যায় বা একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তাহা নহে। নানা প্রকার চুক্তির ভিত্তিতে শিল্প-সমবায় গঠিত হয়। কেবল দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে চুক্তি হইতে পারে; আবার শ্রমিকের মজুরী, উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছু সম্বন্ধেও চুক্তি হইতে পারে। চুক্তিবহির্ভূত অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

যখন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের একটি মূল্য নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লয় ও সেই মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তখন সেই প্রকার শিল্প-সমবায়কে কার্টেল (Kartel) বলা হয়। উদাহরণ, ভারতবর্ষে সিমেণ্ট মার্কেটিং বোর্ড, টাটা স্কব ইত্যাদি। আর যেখানে মূল্য, উৎপাদন ও উৎপাদনপদ্ধতি সব কিছুই চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেইরূপ শিল্প-সমবায়কে ট্রাস্ট (Trust) বলা হয়। উৎপাদন হ্রাস করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিবাব জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ট্রাস্ট উহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দান করিতে পারে।

একই পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হইয়া শিল্প-সমবায় গঠন করিতে পারে (যেমন নিউ ইয়র্কের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোং); আবার একই পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় প্রভৃতি) নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিও মিলিত হইতে পারে। শিল্পপতিরা একজোট হওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী লাভ করে।

(৫) **সমবায় পরিচালন-পদ্ধতি**—সমবায় পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল পুঁজিপতিদের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য উৎপাদনব্যবস্থা

পরিচালনা করা, শ্রমিক এবং ক্রেতা নিজেরাই মূলধন সংগ্রহ করিয়া সমবেতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতাই হইল ইহার মূল ভিত্তি।

(৬) **সরকারী পরিচালনা**—ডাক, তার, জলসরবরাহ এবং অন্যান্য জনসাধারণের প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ সরকার বা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। মূলতঃ জনসাধারণই এইরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক; কিন্তু পরিচালনার দায়িত্ব একদল বেতনভোগী কর্মচারীর উপর অর্পিত।

উৎপাদনের সূত্রাবলী

অধ্যাপক মার্শালের মতানুসারে উৎপাদনব্যবস্থায় প্রকৃতি যে অংশ গ্রহণ করে তাহাতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্র প্রযোজ্য; এবং মানুষ যে অংশ গ্রহণ করে তাহাতে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সূত্র প্রযোজ্য। কৃষি, খনি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র কার্যকরী। শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি কার্যে যেখানে মানুষকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয় সেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সূত্র কার্যকরী।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সূত্র—অন্য সকল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে সাধারণতঃ পরিচালনব্যবস্থা উন্নত হয় এবং মূলধন ও শ্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

উৎপন্ন বস্ত্র (গজের হিসাবে)	বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় (প্রতি গজ)
১,০০০	।৵০
১০,০০০	।/১০
৫০,০০০	।/০

উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগ ও বহুল উৎপাদনের সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। বৃহৎ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস, বিক্রয়ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় গড়ে ব্যয় হ্রাসের ফলে ব্যবসায়ে আয় বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ শিল্পে যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন হয়, সেখানে এই সূত্র বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

সমানমান উৎপাদন সূত্র—সমানমান উৎপাদন সূত্রটি হইল এই যে, উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিকের পরিমাণ বর্ধিত করিলে উৎপাদনও আনুপাতিক হারে বর্ধিত হইবে।

শ্যাম ১০,০০০ টাকা লগ্নী করিয়া ১,০০০ টাকা আয় করিতেছে। তাহার আয়ের হার শতকরা ১০ টাকা। সে আরও ১০,০০০ টাকা লগ্নী করিয়া আরও ১,০০০ টাকা আয় করিল। ইহা সমানমান উৎপাদন সূত্রের উদাহরণ। যে উৎপাদনকার্যে কৃষি ও শিল্পের দান সমান সেখানেই সাধারণতঃ সমানমান উৎপাদনের হার দেখা যায়।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র—"প্রাকৃতিক সম্পদ" শীর্ষক অধ্যায়ে এই সূত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে (পৃষ্ঠা—১৭)।

উৎপাদনে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক ব্যয় হ্রাস—শিল্পের উন্নতি শিল্পের প্রসারের ও একদেশতার জন্য হয়। ইহা হইতেই বহির্বিষয়ক ব্যয় হ্রাস পায়।

বিক্রয়ব্যবস্থায় উন্নতি, যোগাযোগের উন্নতি—এই সব কারণে বহির্বিষয়ক ব্যয় হ্রাস পায়।

প্রধানতঃ শ্রমবিভাজন এবং বহুল উৎপাদনব্যবস্থার সুবিধার জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস পায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি এবং সুসংবদ্ধ কার্যকলাপের জন্যই এইরূপ ব্যয় হ্রাস পায়।

নবম অধ্যায়

মূল্য ও বিনিময়

সূচনা—বর্তমান যুগে কেহ কোন জিনিষ ক্রয় করিতে হইলে টাকা নিয়া বাজারে যায়। দাম অনুযায়ী টাকা খরচ করিলেই অনায়াসে দরকারী জিনিষ কিনিতে পারা যায়। সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক সমাজে টাকার ব্যবহার না জানা পর্যন্ত এই ক্রয় বিক্রয় অত্যন্ত জটিল ব্যাপার ছিল। তখন সমাজে মূল্যমান বা টাকা বলিয়া কিছু ছিল না। ফলে ক্রয়বিক্রয় খুবই কম হইত। এই অধ্যায়ে আমরা ক্রয়বিক্রয়ের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বিনিময়—'ক' এর একটি ইলিশ মাছ ও 'খ' এর একসের লবণ আছে। 'ক' এর দরকার লবণ ও 'খ' এর দরকার মাছ।

'ক' ও 'খ' দুইজনেই নিজের জিনিষ অপরের সহিত বিনিময় করিবে। কারণ (১) উভয়েই অন্যের জিনিষটি পাইতে ইচ্ছা করে, (২) উভয়েই অন্যের জিনিষটি পাওয়ার জন্য নিজের জিনিষটি অপরকে দিতে ইচ্ছুক, (৩) উভয়েই মনে করে যে, অন্যের জিনিষটি তাহার নিজের জিনিষ অপেক্ষা বেশী কাজে লাগিবে।

বিনিময়ের পর দুইজনের প্রত্যেকেই মনে করিল যে, সে লাভবান হইয়াছে। সামগ্রী বিনিময় প্রথার আমলে মানুষ এইভাবে নিজের দরকারী জিনিষ সংগ্রহ করিত।

বিনিময় দুই প্রকার—(১) সামগ্রী বিনিময়, (২) ক্রয়বিক্রয়।

(ক) বিনিময়—সভ্যতার প্রথম যুগে সামগ্রী বিনিময় প্রথা প্রবর্তিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্যের সহিত দ্রব্য বিনিময় হয়। কিন্তু এই প্রথায় অনেকগুলি অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধা সম্পর্কে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। একটি ক্ষুধার্ত কর্মকারের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল এবং একটি শিকারীর প্রয়োজন ছিল বস্ত্র। দ্রব্য বিনিময়ের যুগে ক্ষুধার্ত কর্মকার আহার্য পাইলনা কারণ শিকারীর প্রয়োজন ছিল বস্ত্র অস্ত্র নয়। সুতরাং কর্মকার উপবাসী রহিল এবং শিকারী বস্ত্রহীন থাকিল।

বিনিময় প্রথার অসুবিধা—

(১) **সামঞ্জস্যের অভাব**—সামগ্রী বিনিময়ের যুগে ক্ষুধার্ত কর্মকার এমন এক শিকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার প্রয়োজন অস্ত্রের, আর শিকারীকে খাদ্যাভাবগ্রস্ত কোন কর্মকারকে সন্ধান করিতে হইবে।

(২) **মূল্য নির্ধারণে অসুবিধা**—যেখানে টাকা নাই, সেখানে বিনিময়ের মাধ্যম বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং কি হারে কোন দ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্য বিনিময় করা হইবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

(৩) **ভাগাভাগির অসুবিধা**—আর একটি গুরুতর অসুবিধা এই যে, মানুষ ভাগ করার অক্ষমতার দরুণ অনেক সময় দ্রব্য বিনিময় করিতে পারে না। ধরা যাউক, একটি মানুষের একটি ঘোড়া আছে। তাহার এক মণ চাউল প্রয়োজন। ঘোড়াটির মূল্য এক মণ চাউলের মূল্যের দশগুণ। যে ব্যক্তির চাউল আছে, সে ঘোড়াটির এক-দশমাংশের বিনিময়ে এক মণ চাউল দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং ঘোড়ার মালিক বিভাগজনিত অসুবিধার দরুণ চাউল পাইল না।

(৪) **সঞ্চয়ের অসুবিধা**—বিনিময় প্রথার যুগে জিনিষপত্র শীঘ্র নষ্ট হইবে বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা সম্ভব হইত না।

(খ) **ক্রয়বিক্রয়**—এই সকল অসুবিধার জন্য মানুষ সামগ্রী বিনিময় প্রথা পরিত্যাগ করে। এবং ক্রমে দাম দিয়া ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হয়।

বাজার—চলতি ভাষায়, যে স্থানে মানুষ সমবেত হইয়া বেচাকেনা করে সেই স্থানকেই বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলিতে অন্য জিনিষ বুঝায়। এই অর্থে বাজার বলিতে কোন বিশেষ স্থানকে বুঝায় না, কোন একটি বিশেষ পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বুঝায়। এই ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে।

সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে 'বাজার' বলিতে সাধারণতঃ কোন স্থানকে বুঝায় না, কোন পণ্য এবং সেই পণ্যের প্রতিযোগিতাশীল ক্রেতা বিক্রেতাকে বুঝায়। এই ভাবে চায়ের বাজার, লোহার বাজার ইত্যাদি বলিলে কোন বিশেষ স্থানকে বুঝায় না। স্থানীয় বাজার ও পৃথিবীব্যাপী বাজার আছে। চায়ের বাজার পৃথিবীব্যাপী। কারণ পৃথিবীব্যাপী মানুষ চা ক্রয়ের ব্যাপারে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। আবার লণ্ডন, বার্লিন ও অন্যান্য স্থানেও চা-এর বাজার আছে।

বাজার সম্প্রসারণের কারণ—বর্তমান জগতে বাজার প্রশস্ততর করিবার একটা সাধারণ ঝুঁকি বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে বাজার ছিল সংকীর্ণ ও স্থানীয়-ভাবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতির ফলে দেশকালের সীমারেখা ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং আধুনিক যুগে পৃথিবীর দুই দূরবর্তী প্রদেশে বসবাস করিয়াও মানুষ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে পারে।

প্রত্যেকটি পণ্যেরই প্রশস্ত বাজার নাই। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে পণ্যের বাজারের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

(১) **ব্যাপক চাহিদা**—যে পণ্যের যত বেশী চাহিদা, সেই পণ্যের বাজার তত বেশী সম্প্রসারিত হইবে।

(২) **সহজে চেনা**—দূরদেশ হইতে নমুনা বিচার করিয়া যদি জিনিষের গুণাগুণ চিনিতে পারা যায়, তবেই ঐ জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে জিনিষের বাজার সম্প্রসারিত হইবে।

(৩) **সহজে পাঠান যায়**—যেসব জিনিষের অল্প আয়তনে মূল্য বেশী এবং যাহাদিগকে অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায়, সেই সব জিনিষের বাজার পৃথিবীর সর্বত্র আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু পৃথিবীর সব বাজারেই দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প মূল্যের জন্য ইটের বাজার সীমাবদ্ধ। কারণ, ইট এক দেশ হইতে আর এক দেশে সহজে রপ্তানী করা বা পাঠান সম্ভব নয়।

(৪) **স্থায়িত্ব**—মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী জিনিষের বাজার ব্যাপক। মাছ, ফল-মূল, শাকসব্জী প্রভৃতি যেসব জিনিষ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় সেগুলিকে সাধারণতঃ স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করা হয়। আজকাল তাপ-নিয়ন্ত্রিত-আধারে এগুলিকে রক্ষা করিয়া বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

প্রতিযোগিতা—একজন অপরজনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিক্রেতারা যখন নিজ নিজ সামগ্রী বিক্রয়ের চেষ্টা করে এবং ক্রেতারাও যখন নিজ নিজ জিনিষ কিনিতে চেষ্টা করে, তখনই বাজারে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

সুনিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া উঠে। প্রতিযোগিতার ফলে বাজারের সর্বত্র একই দামে জিনিষ ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুবিধা—প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনকারিগণ সুদক্ষ ও কর্মতৎপর হইয়া উঠে। অন্যায়ভাবে বেশী দাম দিয়া ক্রেতাদের জিনিষ কিনিতে হয় না।

অসুবিধা—প্রতিযোগিতা অন্যায় হইলে ব্যবসায়ে অসাধুতা ও দুর্নীতি দেখা দেয়।

দশম অধ্যায়

মূল্যতত্ত্ব

মূল্য কথাটি আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া ব্যবহার করি, শিক্ষার মূল্য, নীতির মূল্য, গৃহের মূল্য ইত্যাদি কত কথাই না বলিয়া থাকি। প্রত্যেকের অর্থ ভিন্ন হইলেও এক বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মিল আছে—প্রত্যেকটিই কোন কিছুর উপকারিতা বা উপযোগিতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ মূল্য শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, (১) কোন বস্তুর উপযোগিতা এবং (২) সেই বস্তুর ক্রয়ক্ষমতা। প্রথমটি হইল ব্যবহার-মূল্য এবং দ্বিতীয়টি হইল বিনিময়-মূল্য।

যে বস্তুর ব্যবহারমূল্য খুব বেশী তাহার বিনিময়মূল্য প্রায় থাকে না; আবার যে বস্তুর বিনিময়মূল্য বেশী তাহার ব্যবহারমূল্য প্রায় থাকে না।

জল এবং বায়ু জীবনধারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু ইহাদের বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক মূল্য খব বেশী হইলেও ইহাদের বিনিময়-মূল্য একেবারেই নাই।

অপরপক্ষে, স্বর্ণ বা হীরকের ব্যবহারিক মূল্য কিছুই নাই; কিন্তু ইহাদের বিনিময়মূল্য খুব বেশী।

প্রথমেই ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, অর্থনীতিবিদগণ কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া থাকেন।

মূল্য—অর্থশাস্ত্রে কোন বস্তুর ক্রয়-ক্ষমতাকে সেই বস্তুর মূল্য বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ কোন বস্তুর উপযোগিতাকে অন্য বস্তুর হিসাবে প্রকাশ করার নামই হইল প্রথমোক্ত বস্তুর মূল্য।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা টাকার অঙ্কে জিনিষের মূল্য প্রকাশ করিয়া থাকি। টাকায় বস্তুর মূল্য প্রকাশ করার নাম হইল দাম।

এখন আমরা বিস্তৃতভাবে মূল্য বা দাম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক জোড়া জুতার দাম ১৬৲ কি করিয়া স্থির হয়? কয়েক বৎসর পূর্বে হয়ত ঐ জুতার

দাম আরও কম ছিল, এখন তাহা বাড়িবার কারণ কি? নিম্নলিখিত বিষয়টি মনোযোগ দিয়া পড়িলে দাম বেশী বা কম হওয়ার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিবে।

কি করিয়া মূল্য নির্ধারিত হয়?—প্রত্যেক জিনিষের লেন দেন ব্যাপারে দুইটি পক্ষ থাকে—ক্রেতা এবং বিক্রেতা। ক্রেতা-পক্ষকে 'চাহিদা'র দিক এবং বিক্রেতা-পক্ষকে 'সরবরাহ'-এর দিক বলা হইয়া থাকে।

ক্রেতার উদ্দেশ্য—(১) ক্রেতা সাধ্যমত তাহার মূল্যের উচ্চতম ক্রয়মান স্থির করিয়া থাকে। ইহার বেশী সে ব্যয় করিতে রাজী নয়; কারণ তাহার সাধ্যাতীত (২) সে কিন্তু সর্বদাই যথাসম্ভব নিম্নমূল্যে নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিতে চেষ্টা করে।

অপর দিকে বিক্রেতার উদ্দেশ্য হইলঃ—(১) সে খরিদ দরে নিজ মূল্যের নিম্নতম বিক্রয়মান স্থির করিয়া থাকে। ইহার নিম্নে সে বিক্রয় করিতে রাজী নয়, কারণ তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। (২) সে সর্বদাই যথাসম্ভব উচ্চ মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে।

ক্রেতা সর্বদাই অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে চেষ্টা করে; এবং বিক্রেতা সর্বদাই উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। 'চাহিদা' এবং 'সরবরাহ'—এই দুইটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই জিনিষের দাম নির্ধারিত হয়।

চাহিদা—কোন জিনিষের চাহিদা বলিতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে সেই জিনিষ যে পরিমাণে ক্রয় করা যাইবে সেইটুকু বুঝায়।

ইচ্ছা এবং চাহিদা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ, চাহিদা বলিতে অর্থশাস্ত্রে কার্যকরী চাহিদা বুঝায়, (১) কোন বস্তু ক্রয় করিবার ইচ্ছা; (২) তাহা ক্রয় করিবার জন্য টাকা বা সঙ্গতি থাকা; এবং (৩) তাহা ক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা—এই তিনটি গুণ ব্যতীত কোন চাহিদা কার্যকরী হইতে পারে না।

কোন ব্যক্তির মোটরগাড়ীর ইচ্ছা আছে; কিন্তু উহা ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই। কৃপণের ইচ্ছা এবং সঙ্গতি দুইই আছে, কিন্তু ঐ সঙ্গতি সে ব্যয় করিতে রাজী নয়, কাজেই এই দুইটি ক্ষেত্রেই চাহিদা কার্যকরী হইল না।

চাহিদার সূত্র—মনে রাখিতে হইবে যে মূল্যের সঙ্গে চাহিদার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। দামের উপর চাহিদা অনেকাংশে নির্ভর করে। অন্য সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে দাম কম হইলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম বেশী হইলে চাহিদা হ্রাস পাইবে।

উদাহরণ, আমের দাম যখন কম তখন বেশী আম ক্রয় করে, আবার আমের দাম যখন বেশী তখন আমের চাহিদা অনেক কমিয়া যায়—বিত্তশালী ভিন্ন কেহ তখন আম ক্রয় করে না।

ম‍ূল্য	চাহিদা
প্রতিটি এক টাকা	১০০
" আট আনা	১০০০
" চার "	২৫০০
" দ‍ুই "	৬০০০
" এক "	১০,০০০

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে ম‍ূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আমের চাহিদা ব‍ৃদ্ধি পাইতেছে। ম‍ূল্যব‍ৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমের চাহিদা হ্রাস পাইতেছে।

চাহিদার পরিবর্তনশীলতা

সামান্য ম‍ূল্য পরিবর্তনের ফলে যে সকল জিনিসের (যথা, মোটর গাড়ী, রেডিও প্রভৃতি) চাহিদা অত্যন্ত হ্রাস বা ব‍ৃদ্ধি পায় সেই সকল জিনিসের চাহিদাকে পরিবর্তনশীল চাহিদা বলা হয়।

সাধারণতঃ বিলাস এবং ব্যসন দ্রব্যসম‍ূহের চাহিদা বিশেষ পরিবর্তনশীল। ঘড়ি বা রেডিওর দাম কম হইলে ক্রেতার সংখ্যা ব‍ৃদ্ধি পাইবে, আবার দাম বাড়িলে ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

সাধারণতঃ ম‍ূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তন হইলেও সব সময়েই যে এইর‍ূপ হইবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই, ম‍ূল্যের পরিবর্তন হইলেও জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষগ‍ুলির চাহিদা সব সময় সমান থাকে। ম‍ূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে যদি চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয় তবে ঐ ক্ষেত্রে চাহিদাকে অপরিবর্তনশীল চাহিদা বলা হয়।

ঘড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি যে সব জিনিষ আমাদের দেশে বিলাস দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয় সেগ‍ুলির চাহিদা পরিবর্তনশীল।

যখন চাউলের দর মণপ্রতি পনের টাকা তখন কোন সংসারে একমণ চাউল খরচ হয়। চাউলের দর কমিয়া দশটাকা হইলেও চাউলের খরচ একই থাকিবে, আবার দর ব‍ৃদ্ধি পাইয়া সতের টাকা হইলেও ঐ একই খরচ হইবে।

এই চিত্রে OY এই লম্বমান রেখাটি হইল দামের পরিমাপ রেখা। দাম পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা OX রেখায় প্রকাশ করা যাইবে। DD′ হইল চাহিদার রেখা।

চাহিদার রেখা
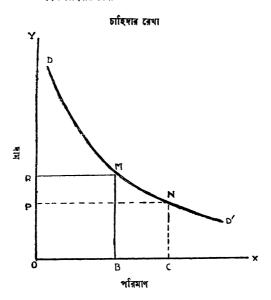
দাম MB বা OR (MB=OR) হইলে চাহিদা হইবে OB। দাম কমিয়া NC বা OP (NC=OP) হইলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া OC হইবে। অন্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে দাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা হ্রাস পাইবে।

এক্ষণে মূল্যনিরূপণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা যাউক। সামগ্রীর মূল্য ইহার প্রান্তীয় মূল্যের অর্থাৎ যে মূল্যে মজুত মালের শেষ জিনিষটি বিক্রয় হইবে তাহার উপর নির্ভরশীল। এই মূল্য অনুসারেই বাজার দর স্থির হয়।

সরবরাহ—একটি নির্দিষ্ট মূল্যে কোন জিনিষের যে পরিমাণ বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাকে সেই জিনিষের সরবরাহ বলা হইয়া থাকে।

সরবরাহ এবং মজুত এক জিনিষ নহে, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত মোট পরিমাণকে বলা হয় মজুত এবং কোন নির্দিষ্ট মূল্যে যতটুকু বিক্রয় করা যাইবে তাহাকে বলা হয় সরবরাহ।

বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঁচ হাজার আম আছে। ইহা হইল মজুত আম। কিন্তু এই আমের জন্য ক্রেতারা যদি শতকরা আড়াই টাকার বেশী দাম দিতে রাজী না হয়; এবং সেই দামে বিক্রেতার পক্ষে যদি বিক্রয় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অর্থনীতির ভাষায় বলা হইবে যে ঐ দামে আমের কোন সরবরাহ নাই।

সরবরাহের রেখা
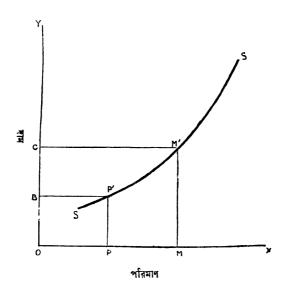
অতএব দাম ভিন্ন সরবরাহের কোন কথাই উঠিতে পারে না। সাধারণতঃ দাম বাড়িলে লাভ বেশী হইবে; বিক্রেতারা অধিক বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে। ফলে সরবরাহ বাড়িবে। আবার দাম কমিয়া গেলে লাভও কমিয়া যাইবে, বিক্রেতারা কম জিনিষ বিক্রয় করিবে, ফলে সরবরাহ কম হইবে।

সরবরাহ তালিকা—বিভিন্ন দামে বিক্রেতারা কত জিনিষ বিক্রয় করিতে রাজী হইবে তাহার তালিকাকে বাজারে সরবরাহ তালিকা বলা হয়। বিভিন্ন বিক্রেতার সরবরাহ তালিকা যোগ করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

দাম	বিক্রেতারা বিক্রয় করিবে
প্রতিটি এক টাকা	১০,০০০ আম
" আট আনা	৬,০০০ "
" চার "	২,০০০ "
" দুই "	১,০০০ "
" এক "	৫০০ "

মূল্য নির্ণয়

আগের পৃষ্ঠায় OY রেখাটি হইল দামের পরিমাপ রেখা এবং দাম পরিবর্তনের সঙ্গে সরবরাহের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা OX রেখায় প্রকাশ করা যায়।

SS′ হইল সরবরাহ রেখা। দাম MM′ বা OC (MM′=OC) হইলে সরবরাহ হইল OM, দাম কমিয়া OB (PP′=OB) হইলে সরবরাহও কমিয়া OP হইবে। অন্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে দাম কমিলে সরবরাহ হ্রাস পাইবে এবং দাম বাড়িলে সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে।

দাম কাহাকে বলে—জিনিষের মূল্য যখন টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয় তখন উহাকে দাম বলা হয়।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মূল্য নির্ধারণ

অন্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকিলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং সরবরাহ বৃদ্ধি হইলে দাম হ্রাস হইবে।

একটি নির্দিষ্ট দামে সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা যদি বেশী হয় অর্থাৎ সকলেই যদি ঐ বস্তু সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকে তাহা হইলে জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাইবে, বর্দ্ধিত মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা বেশী লাভ করিয়া থাকে। আবার চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী হইলে বিক্রেতারা তাড়াতাড়ি জিনিষ বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে, ফলে জিনিষের দাম হ্রাস পায়।

এক কথায়, মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ইহার ফলে দর উঠা নামা করিতে করিতে এমন এক

সময় উপস্থিত হয় যখন চাহিদা এবং সরবরাহ দুইই সমান থাকে। যে সময়ে চাহিদা এবং সরবরাহ সমান হয় সেই সময়ের প্রচলিত ম্ল্যকে স্থিরীকৃত ম্ল্য বলা হয়।

ক্যামেরার চাহিদা	প্রতিটি ক্যামেরার ম্ল্য	ক্যামেরার সরবরাহ
১০০	৫০ টাকা	৫০০
২০০	৪০ "	৪০০
[৩০০	৩০ "	৩০০]
৪০০	২০ "	২০০
৫০০	১০ "	১০০

ক্যামেরার দাম যখন প্রতিটি ৫০৲ তখন ৫০০টি ক্যামেরা সরবরাহ করা হইল; কিন্তু ক্রয় হইল মাত্র ১০০টি, বাকী বিক্রয়ের জন্য দাম কমান হইল। দাম যখন প্রতিটি ৪০৲ তখন ক্রয় বেশী (২০০) হইলেও সরবরাহ কমিয়া গেল (৪০০), দাম যখন প্রতিটি ৩০৲ তখন আরও ক্রয় হইলেও (৩০০) সরবরাহ আরও কমিয়া গেল (৩০০), এই সময় চাহিদা এবং সরবরাহ সমান সমান হইল। প্রতিটি ২০৲ দাম হইলে চাহিদা বাড়িয়া ৪০০ হইল কিন্তু সরবরাহ খুবই কমিয়া গেল (মাত্র ২০০)।

৩০৲ দামের সময় চাহিদা এবং সরবরাহ সমান হইয়াছে, এই দামই স্থিরীকৃত দাম। বাজারদর এই স্থিরীকৃত দামের কিছু এদিক ওদিক হইয়া থাকে।

কাঁচির উপর বা নীচের একটি মাত্র ফলা দ্বারা যেমন কোন কাজ করা যায় না তেমনি কেবলমাত্র চাহিদা বা সরবরাহ দ্বারা বিচার করিয়া স্বাভাবিক দাম স্থির করা সম্ভব নয়। কাজের সময় যেমন কাঁচির উভয় ফলা এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয় তেমনি চাহিদা এবং সরবরাহের পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ম্ল্য স্থির হয়। সেই ম্ল্যে যে পরিমাণ জিনিষ সরবরাহ করা হইবে ঠিক সেই পরিমাণে চাহিদা থাকায় সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হইয়া যাইবে। এই দামই হইল স্বাভাবিক দাম।

পরপৃষ্ঠায় চিত্রে চাহিদার রেখা DD' এবং সরবরাহ রেখা SS' পরস্পর P' বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P' বিন্দু হইল সাম্যের বিন্দু এবং $P'P$ হইল সাম্যে স্থিরীকৃত ম্ল্য।

ম্ল্য OM হইলে সরবরাহ হইবে MM^2। ম্ল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সরবরাহও বৃদ্ধি পাইবে। ম্ল্য $P'P$ হইলে সরবরাহ হইবে OP এবং ম্ল্য NN' হইলে সরবরাহ হইবে ON। $SM^2P'N'S'$ রেখাটি ঊর্ধ্বাভিমুখী—ম্ল্য বৃদ্ধির সঙ্গে

সরবরাহ ধাপে ধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে। চাহিদার রেখা কিন্তু বিপরীত গতিতে চলিয়াছে। $DM'P'N^2D'$ রেখাটি নিম্নাভিমুখী চলিয়াছে—মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে
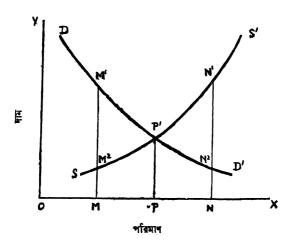
চাহিদা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। পরস্পরবিপরীতমুখী চাহিদা এবং সরবরাহ রেখা P' বিন্দুতে সাম্যে মিলিত হইবে। চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে PP' হইল সাম্যে স্থিরীকৃত মূল্য। P' বিন্দুতে চাহিদা যে পরিমাণ হইবে সরবরাহও সেই পরিমাণ হইবে। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পাইবে, কিন্তু সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে। আবার সরবরাহ বেশী হইলে মূল্য কমিয়া যাইবে। মূল্য কমার ফলে সরবরাহ কমিবে এবং মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া P' বিন্দুতে PP' মূল্যে সাম্য হইবে।

সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা—যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা বাজারদর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকেন এবং যখন ক্রেতা ইচ্ছামত যে কোন বিক্রেতার নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় করিতে পারেন বা বিক্রেতা যে কোন ক্রেতার নিকট ইচ্ছামত পরিমাণে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারেন। তখন বুঝিতে হইবে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজারে একটি নির্দিষ্ট দর প্রচলিত থাকে।

ক্রেতা এবং বিক্রেতা বা উভয়েই যখন বাজার দর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকেন অথবা যখন তাহাদের ইচ্ছামত জিনিষ বেচা-কেনার স্বাধীনতা থাকে না, তখন তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা হয়।

নীট ব্যয় এবং দাম—উৎপাদন ব্যয় এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বা নীট ব্যয় বিচার করিয়া দ্রব্যমূল্য নিরূপিত হয়। দ্রব্যের উপযোগিতা বা চাহিদাও মূল্য নির্ধারণের সময় অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। মূল্য কখনই নীট ব্যয়ের কম হইতে পারে না; অন্ততঃপক্ষে নীট ব্যয় এবং মূল্য সমান সমান হওয়া উচিত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় মূলধনের সুদ এবং কিছু লাভ বাদ দিয়া মূল্য নির্ধারিত হয়।

বাজার দর এবং স্বাভাবিক দর—কোন নির্দিষ্ট দিনে চাহিদা এবং সরবরাহের সাময়িক অবস্থা অনুসারে জিনিষের বাজার দর স্থির করা হয়। পরিশেষে চাহিদা ও সরবরাহের সাম্যে যে দর স্থির করা হয় তাহাকেই স্বাভাবিক দর বলা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে মূল্য নির্ধারণ—মূল্য নির্ধারণের পূর্বোক্ত নিয়মসকল কেবলমাত্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে (অর্থাৎ যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা পরস্পরেব সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া থাকেন) কার্যকরী। কিন্তু যেখানে কোন জিনিষের ব্যবসা একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের অধীন সেখানে কোনরূপ প্রতিযোগিতা না থাকায় অর্থাৎ একচেটিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে এইরূপ মূল্যনির্ধারণ নীতি কার্যকরী হইবে না।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর শক্তির মূল হইল যে বাজারে সরবরাহ সমস্তটাই তাহার উপর নির্ভর করিতেছে—তাহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী নাই। বাজারে সামগ্রী কত আসিবে এবং কখন আসিবে কি মূল্যে আসিবে সমস্তটাই তাহার উপর নির্ভর করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কিন্তু চাহিদার উপব কোন ক্ষমতা নাই। তাহারা মোট উৎপাদনের পরিমাণ এমনভাবে স্থির করেন অর্থাৎ এমনভাবে সরবরাহ করেন যাহাতে তাহারা যথাসম্ভব বেশী লাভবান হইতে পারেন।

মার্শালের ভাষায় "একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিকগণ চাহিদা অনুযায়ী এমনভাবে উৎপাদন করিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহারা সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হইতে পারেন।"

সাধারণ লোকের ধারণা যে একচেটিয়া ব্যবসায়ীগণ সর্বদা চড়া দামে মাল বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য হইল কি উপায়ে বেশী লাভ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে সময় সময় তাহারা বাজার অপেক্ষা চড়া দামে অল্প পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করে; কিন্তু সময় সময় অল্প দামে প্রচুর পরিমাণ জিনিষও বিক্রয় করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অল্প দামের জন্য জিনিষ-

প্রতি লাভ কম হইলেও বিক্রয় বেশী হওয়ার জন্য গড়ে মোট লাভ বেশী হইবে। চাহিদার পরিবর্তনশীলতা এবং উৎপাদনব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধার উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ের দ্রব্যমূল্য নির্ভর করিতেছে। যদি উৎপাদনব্যয় সমান থাকে এবং চাহিদা পরিবর্তনশীল হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ী জিনিষের দাম কমাইয়া দিবে। উৎপাদনব্যয় সমান এবং চাহিদা অপরিবর্তনশীল হইলে জিনিষের দাম বাড়িবে। আবার উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান লাভ সূত্র কার্যকরী হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দাম সাধারণতঃ কম হইবে এবং ক্রমহ্রাসমান লাভসূত্র কার্যকরী হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দাম বেশী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী ইচ্ছামত কাহারও কাছে বেশী দাম ও কাহারও কাছে কম দাম লইতে পারেন। সচরাচর এরূপ হয় না। কারণ ইহাতে তাহার নিজেরই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঐ সকল অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তি ঐ জিনিষ কম দামে বিক্রয় করিয়া তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে। আবার কাহারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইলে জনসাধারণ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবে।

বিদেশের বাজারে মাল চালু করিবার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও এইরূপ ব্যবসায়ী নিজ দেশে চড়া দামে এবং বিদেশে কম দামে জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Dumping বলা হয়। ভারতবর্ষে জাপানী শিল্পদ্রব্যের প্রচলন এইভাবে হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়

মুদ্রা

মুদ্রার উৎপত্তি এবং ব্যবহার সম্বন্ধে আদম স্মিথ লিখিয়াছেন, "কশাইয়ের কাছে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু মাংস আছে। মদ্যব্যবসায়ী ও রুটিওয়ালা কিছু মাংস কিনিতে চাহে। কিন্তু মদ্যব্যবসায়ী মদ ভিন্ন এবং রুটিওয়ালা রুটি ভিন্ন আর কিছু দিতে পারে না। অথচ ইংরাজ কশাইয়ের প্রয়োজন মত মদ ও রুটি আছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে বিনিময় হইতে পারে না। কশাই তাহার মাংস মদ্যব্যবসায়ী বা রুটিওয়ালার কাছে বিক্রয় করিতে পারে না। উহারাও তাহার খরিদ্দার হইতে পারে না।"

মুদ্রা ব্যবহার কি করিয়া আরম্ভ হইল—সামগ্রী বিনিময়ের অসুবিধাগুলির প্রতিকারের নিমিত্ত মানুষ এমন একটি জিনিষের সন্ধান করিল, যাহা প্রত্যেকেই শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিবে। এইরকম ভাবে বহু জিনিষ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। আদিম সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সেইজন্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কোন মুদ্রা ছিল না।

মুদ্রার প্রাচীন রূপ—সামগ্রী বিনিময় প্রথার এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য মানুষ স্ব স্ব উৎপাদনদ্রব্যের এমন একটি বিনিময়ের মাধ্যম খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল, যাহা সকলেই বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করিবে।

গবাদি পশু এইভাবে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইত। কারণ এইগুলি সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। কোন জিনিষের বিনিময়ে কতগুলি গরু পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা কোন জিনিষের মূল্য নিরূপণ করা হইত। মহাভারতে এবং হোমারের কাব্যে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার লবণকে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত আছে। ভার্জিনিয়ায় তামাক ও নিউফাউন্ডল্যান্ডে কড্ মাছ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। ভারতে বহুদিন পর্যন্ত কড়ির মাধ্যমে দ্রব্য-বিনিময় হইত।

এই বিনিময়ের মাধ্যমগুলি সকলের পক্ষেই প্রয়োজন ছিল বা সকলের কাছে সমাদৃত ছিল বলিয়া বিক্রেতা তাহার জিনিষের পরিবর্তে এই মাধ্যমগুলি লইতে দ্বিধা করিত না। কারণ সে জানিত তাহার কোন জিনিষ ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইলে অন্য লোক এই বিনিময়ের মাধ্যমকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিবে।

এইভাবে প্রাচীনকালের অধিকাংশ মুদ্রারই গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু এইগুলির প্রকারভেদ ও অস্থায়িত্বের জন্য কালক্রমে অচল হইয়া পড়ে।

কোন জিনিষের দাম হিসাবে যদি দুই হাজার গরু দিতে হইত, তাহা হইলে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিত। ইহাদের মধ্যে কোনটি ভাল, আবার কোনটি মন্দ। তাহা ছাড়া অনেকক্ষেত্রে মাধ্যম অল্পকাল স্থায়ী ছিল। যেমন, গরুর আয়ুষ্কালের স্বল্পতা আরেকটি বড় সমস্যা ছিল।

অধ্যাপক মার্শাল এই জন্য বলিয়াছেন, "চলতি কারবারের জন্য যে মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত, সহজে ব্যবহার্য ও সকলের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য কোন বিনিময় মাধ্যম হওয়া চাই।"

মুদ্রারূপে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ব্যবহার—ক্রমে মানুষ উপলব্ধি করিল যে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধাতুই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। আরও পরে দেখা গেল, লৌহ ও তাম্র প্রভৃতি স্বল্পমূল্যের ধাতু অপেক্ষা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান ধাতু মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য সুবিধাজনকঃ—

(১) **সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা**—মুদ্রার প্রথম লক্ষণ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। প্রাত্যহিক লেন-দেন ব্যাপারে মানুষ বিনা দ্বিধায় মুদ্রা গ্রহণ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, দেশে প্রচলিত মুদ্রার উপর মানুষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ব্যতীত মুদ্রার কোন সার্থকতা থাকে না।

(২) **মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার স্থিরতা**—মুদ্রার দ্বিতীয় লক্ষণ হইল মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতার স্থিরতা। মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা সাধারণতঃ একরকম থাকা চাই। প্রতিদিন বা প্রতি বৎসর ইহার ক্রয়ক্ষমতার তারতম্য ঘটিলে মুদ্রা তাহার কাজ ভালভাবে করিতে পারে না।

(৩) **স্থায়িত্ব**—স্বর্ণ বা রৌপ্য গবাদি পশু বা তামাক হইতে, এমন কি লৌহ বা তাম্র হইতেও অধিক দীর্ঘস্থায়ী।

(৪) **সহজে বহনযোগ্যতা**—মুদ্রা সহজে ব্যবহার্য হওয়া চাই। এই কারণে এমন জিনিষকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা চাই যাহার অল্প অংশও বিশেষ মূল্যবান। অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা স্বর্ণ বা রৌপ্যের এই গুণ বেশী আছে। শস্য বা গবাদি পশুর মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মূল্য দেওয়া রীতিমত কঠিন ব্যাপার—বিশেষতঃ দূরদেশে।

(৫) **বিভাজ্যতা এবং সমজাতীয়তা**—যে দ্রব্যে মুদ্রা তৈয়ারী হইবে, তাহা এমন হওয়া চাই যে তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা চলে। কারণ ইহা

না হইলে খুচরা খরচ করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে প্রত্যেকটি অংশ যেন সমান মূল্যবান হয়। হীরক মূল্যবান জিনিষ। কিন্তু ইহাকে ভাগ করা চলে না (ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশের দামও অনেক বেশী) এবং ইহার সব অংশের মূল্য সমান নহে। বিভাজ্যতা যেমন মুদ্রার লক্ষণ বা গুণবিশেষ, সমজাতীয়তাও সেই রকম মুদ্রার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। চল্‌তি মুদ্রা ব্যবহারে এক মুদ্রা অপর মুদ্রার সকল বিষয়ে সমজাতীয় হওয়া প্রয়োজন।

(৬) **সহজে পরিচয়**—সহজে চেনা যায় এমন জিনিষকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিতে হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই গুণটি বিশেষভাবে আছে।

(৭) **দ্রবনীয়তা ও ঘাতসহনীয়তা**—এমন জিনিষকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করিতে হয় যাহা সহজে গালান যায় ও যাহার উপরে রাষ্ট্রের প্রতীক এবং মুদ্রার অঙ্ক মুদ্রিত করা যায়। কারণ তাহা হইলে উহা দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারের মুদ্রা তৈয়ারী করা সম্ভব হয়।

মুদ্রার কাজ—মুদ্রার নিজস্ব কোন মূল্য নাই। মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যসামগ্রী ও সেবা পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার গুরুত্ব। মানুষ মুদ্রাকে ভোগ করিতে পারে না, মুদ্রার বিনিময়ে সেবা ও সামগ্রী ভোগ করিয়া থাকে।

মুদ্রার সার্থকতা কোথায়? মুদ্রার কাজে—নীচে একটি ছড়ার মধ্যে মুদ্রার কার্যাবলী বলা হইয়াছে—

চতুর্বিধ কর্ম অর্থ সাধিবে নিশ্চয়,
মাধ্যম ও **পরিমাপ** করিবে নির্ণয়,
অর্থ দ্বারা **মূল্যমান** নির্ধারিত হয়,
সকলে করিতে পারে **অর্থ সঞ্চয়**।

(১) **মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম**—মুদ্রার সাহায্যে একজন মানুষের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় হয়।

(২) **মুদ্রা মূল্যের পরিমাপ**—বর্তমান সমাজে পণ্যসামগ্রী ও সেবামূলক কার্যের মূল্য নিরূপণ করা হয় মুদ্রা দ্বারা। একটি সাইকেলের দাম ২৫০৲ টাকা। ডাক্তারের ফিঃ ১৬৲ টাকা। এইভাবে সেবা ও সামগ্রীর মূল্যের পরিমাপ হয়।

মুদ্রার আনুষঙ্গিক কাজ—

(১) **মুদ্রা সঞ্চিত মূল্যের ভাণ্ডারস্বরূপ—**উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিয়া যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে উদ্বৃত্ত ফসলের মূল্যও সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। মুদ্রার মাধ্যমে শস্য বিক্রয়ব্যবস্থা না থাকিলে উদ্বৃত্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। উদ্বৃত্ত ফসলের মূল্যও নষ্ট হইয়া যাইত।

(২) **মুদ্রা সঞ্চিত মূল্যের স্থানান্তরের বা সময়ান্তরের সহায়কস্বরূপ—** ভারতের উদ্বৃত্ত ফসলের ভারতে কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে। কিন্তু চীনের প্রয়োজন থাকিতে পারে। আবার আজিকার উদ্বৃত্ত ফসল দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবর্ষেই বিশেষ প্রয়োজনে লাগিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ফসল মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া মূল্য সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। তারপর সেই সঞ্চিত মূল্য স্থানান্তরে বা সময়ান্তরে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৩) **মুদ্রা দ্বারা লেন-দেনের পরিমাপ হয়—**যখন কোন ঋণ দেওয়া হয় তখন উত্তমর্ণকে তাহার পাওনার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস না হইলে মুদ্রা দ্বারা এই ঋণ শোধ করায় উত্তমর্ণের পক্ষে সমান মূল্যে ফেরৎ পাওয়া সম্ভব হয়।

মুদ্রার অন্যান্য কাজ—ইহা ব্যতীত মুদ্রার আরও কতকগুলি কাজ আছে।

(১) সমাজের সম্পদ দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করা;

(২) ধারে কারবার করায় সাহায্য এবং

(৩) মূলধনের একটি সাধারণ রূপ দেওয়ায় সাহায্য করে। মুদ্রা ব্যতীত সম্পদ বণ্টনে যেমন অসুবিধা হইত তেমনি ধারে কারবারে ঋণের পরিমাপের ও পরিশোধেরও অসুবিধা হইত। মূলধনের পরিমাপও মুদ্রার সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে।

মুদ্রার সংজ্ঞা—বিনিময়ের মাধ্যম রূপে যাহা সর্বসাধারণে ব্যবহৃত হয় এবং যাহা দ্বারা আইনতঃ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা যায় তাহাকেই মুদ্রা বলে।

কোন দেশে প্রচলিত যে মাধ্যম দ্বারা পাওনা শোধ করা যায়, তাহাকে মুদ্রা বলে।

আইনবিহিত মুদ্রা—আইন অনুযায়ী পাওনাদারগণ যে মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য তাহাকেই আইনবিহিত অর্থ বা মুদ্রা বলা হয়।

দুই প্রকারের ধাতুমুদ্রা আছে—**আদর্শ মুদ্রা ও নিদর্শনী মুদ্রা।**

যে মুদ্রার আইননির্দিষ্ট মূল্য ও নিজস্ব ধাতুমূল্য অভিন্ন ও যাহা সীমাহীন আইনবিহিত মুদ্রারূপে গণ্য হয়, তাহাকেই আদর্শ মূল্য বলে।

নিদর্শনী মুদ্রার আইননির্দিষ্ট মূল্য নিজ ধাতুমূল্য অপেক্ষা বেশী। নিদর্শনী মুদ্রা আইনবিহিত মুদ্রা হইলেও সীমাবন্ধ। মহাজন বা খাতক এই মুদ্রা আইননির্দিষ্ট সীমার বেশী গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়।

ভারতীয় টাকা এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এই মুদ্রা নিদর্শনী মুদ্রা হইলেও আইনতঃ ইহা যে কোন পরিমাণে অবশ্য-গ্রাহ্য। সিকি, দুয়ানী, আনি প্রভৃতি মুদ্রা এক টাকা পর্যন্ত আইন-গ্রাহ্য। অর্থাৎ এই সকল মুদ্রা এক টাকার বেশী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হয় না।

১। ধাতুমুদ্রা

সরকারী টাঁকশালে প্রস্তুত ও সরকারী টাঁকশাল কর্তৃক নির্দিষ্ট সমান আকৃতি ও সমান ওজনের ধাতুখণ্ডসমূহকে ধাতুমুদ্রা বলে।

আদর্শমুদ্রা বা মুখ্যমুদ্রা—আইনবিহিত যে মুদ্রা যে কোন পরিমাণে অবশ্যগ্রাহ্য এবং ধাতু হিসাবে যাহার মূল্য মুদ্রার উপর অঙ্কিত মূল্যের সমান, তাহাকে আদর্শ মুদ্রা বলে। সুতরাং আদর্শ মুদ্রার মুদ্রামূল্য উহার ধাতুমূল্যের সমান।

গ্রেট বৃটেনের স্বর্ণ-গিনি আদর্শ মুদ্রা ছিল। কারণ উহার মূল্য উহার স্বর্ণ-মূল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

আদর্শ মুদ্রার মূল্যকে মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া অন্য প্রকার মুদ্রার মূল্য নির্ণয় করা হয়।

নিদর্শনী বা গৌণ মুদ্রা—রাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তুত যে সকল মুদ্রার নির্দিষ্ট মূল্য বা মুদ্রামূল্য তাহাদের স্বকীয় মূল্য বা ধাতুমূল্য অপেক্ষা বেশী, সেগুলিকে নিদর্শনী মুদ্রা বলা হয়।

শিলিং একটি নিদর্শনী মুদ্রা। বৃটিশ মুদ্রা আইন অনুযায়ী ইহার মূল্য এক পাউণ্ডের ১/২০ অংশ; কিন্তু একটি শিলিং-এ যে পরিমাণ রূপা আছে, তাহার মূল্য এক পাউণ্ডের ১/২০ অংশের চেয়ে কম। তদ্রূপ ভারতীয় মুদ্রা আইন অনুযায়ী টাকার প্রতীক মূল্য ১৬ আনা; কিন্তু একখানি টাকায় যে পরিমাণ রূপা আছে, তাহার দাম চার আনার বেশী নহে। নিদর্শনী মুদ্রার স্বকীয় মূল্য যদিও উহার নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম, তথাপি সরকার উহাকে নির্দিষ্ট মূল্যে গ্রহণ করিতে আদেশ দেন বলিয়া উহা মুদ্রা হিসাবে গ্রাহ্য হয়। এইজন্য **নিদর্শনী মুদ্রাকে অনুজ্ঞা মুদ্রাও** বলা হয়।

২। কাগজী মুদ্রা

পূর্বে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ধাতুমুদ্রার প্রচলন ছিল, কিন্তু আজকাল প্রায় সমস্ত দেশেই সরকার বা কোন আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান (যথা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) দেশে কাগজী মুদ্রা বা কাগজের নোট প্রচলন করেন। এইসব কাগজের নোট ধাতুমুদ্রার স্থান গ্রহণ করে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সরকারই নোট ছাড়িতেন। বর্তমানে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই কাজ করে। পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্ক পাকিস্তানের নোট ছাপে।

কাগজী মুদ্রা পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় হইতে পারে।

পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা ইচ্ছামত স্বর্ণ বা ধাতু-মুদ্রায় রূপান্তরিত করা চলে। রাষ্ট্রে যে কর্তৃপক্ষ এই নোট প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহারা এই নোটের পরিবর্তে যে কোন লোককে দাবী করা মাত্র ধাতুমুদ্রা দিতে বাধ্য থাকেন।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটগুলি সবই আইনবিহিত এবং এক টাকা ও দুই টাকার নোট ব্যতীত অপর সকল নোটই পরিবর্তনীয়। যে কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন-যোগ্য কাগজী মুদ্রা ছাপেন, তাঁহাদের বিশেষ সতর্কভাবে নোট ছাপিতে ও প্রচলন করিতে হয়। কারণ প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের দাবী মিটাইবার জন্য সর্বদা প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্য ধাতু মজুত রাখিতে হয়। যে দেশে মূল্য স্থিতি বা দেশের সমস্ত লোককে কর্মে নিয়োগ ও মজুরি দেওয়া প্রভৃতি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেখানে পরলোকগত অধ্যাপক কীনস-এর (Keynes) ভাষায় ইহাকে "পরিচালিত মুদ্রা" বলা হয়। কাগজী মুদ্রা এই উদ্দেশ্যে এত অধিক পরিমাণে ও গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় যে, মুদ্রাকর্তৃপক্ষকে ইহার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়।

অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকে ইচ্ছামত স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য ধাতুমুদ্রাতে রূপান্তরিত করা চলে না।

সাধারণতঃ আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা প্রচলন করেন। অদূরদর্শী ও স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধরত সমস্ত দেশের সরকার নির্বিচারে কাগজী মুদ্রার অবাধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। জার্মানী, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে নোটপ্রচলনকারী সরকার বা কর্তৃপক্ষ দেউলিয়া হওয়ায় নোটগুলি কাগজের টুকরামাত্রে পর্যবসিত হয়।

কাগজী মুদ্রার সুবিধা—

১। মুদ্রা ব্যবহারে মিতব্যয়িতায় ও মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধিকরণব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রায় যত সুবিধা ধাতুমুদ্রায় তত নয়।

(ক) স্বর্ণ বা রৌপ্যখনিতে নিয়োজিত মূলধন ও শ্রম কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া বাঁচান চলে। এই শ্রম ও মূলধনকে অন্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা যাইতে পারে;

(খ) কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের ফলে যে ধাতুমুদ্রা বাঁচিয়া যায়, তাহা দেশে ও বিদেশে অন্যান্য কার্যে নিয়োজিত করা চলে।

২। ব্যবহারের ফলে কাগজী মুদ্রার ক্ষয় কম হয়।

৩। বেশী পরিমাণ টাকা দিবার প্রয়োজন হইলে কিংবা দূরে কোথাও টাকা লইয়া যাইতে হইলে কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। কারণ কাগজী মুদ্রা সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়।

অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অসুবিধা—এক টাকার নোট প্রভৃতি কাগজী মুদ্রা কেবলমাত্র সরকারী অনুজ্ঞা বা আদেশবলে মুদ্রারূপে গৃহীত হয়। এই মুদ্রার পরিবর্তে কোন স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য ধাতু বিশেষভাবে মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য ধাতুমুদ্রার মূল্যের অনুরূপ ইহার কোন মূল্য নাই। এমতাবস্থায় যে কোন সময় সরকার ইহা পরিত্যাগ করিলে ইহার কোন মূল্য থাকে না।

১। কাগজী মুদ্রার মূল্য অনিশ্চিত ও অস্থায়ী। এরূপ মুদ্রা প্রচলনকারী সরকার যে কোন সময় ইহার মূল্য হ্রাস করিয়া বা বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

২। কাগজী মুদ্রার প্রচলন একটি সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ, বিদেশীরা ইহা গ্রহণ করিবে না।

৩। কাগজী মুদ্রা বিশেষভাবে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অত্যধিক প্রচলনজনিত মুদ্রার বিনিময় মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস হইবার বিপজ্জনক সম্ভাবনা থাকে।

কাগজী মুদ্রা ও অনুজ্ঞা মুদ্রা—কাগজী মুদ্রাকে কখনও কখনও অনুজ্ঞা মুদ্রা বলা হয়। কারণ সরকারের আদেশ, অনুজ্ঞা বা অনুমোদনের বলেই ইহা প্রচলিত হয়। মুদ্রা হিসাবে ইহার স্বাভাবিক গুণাবলী নাই।

স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, অনুজ্ঞা মুদ্রা দেশের মুদ্রার এমন এক অংশ যাহার জন্য দেশ প্রয়োজনীয় ধাতু যোগাইতে পারে না বা যাহার পরিবর্তে যথোপযুক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য মজুত রাখা হয় নাই। ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর বহু দেশ কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মুদ্রাঙ্কন—মুদ্রাঙ্কন বলিতে ধাতুমুদ্রা প্রস্তুত বুঝায়। সাধারণতঃ সরকারী টাঁকশালেই এই মুদ্রাঙ্কন কার্য হইয়া থাকে।

১। **অবারিত মুদ্রাঙ্কন**—

(ক) **সীমাহীন মুদ্রাঙ্কন**—যখন কোন মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না, তাহাকে অবাধ মুদ্রাঙ্কন বলে। যুদ্ধের আগে ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তি যে কোন পরিমাণ স্বর্ণ টাঁকশালে লইয়া গিয়া উহাকে স্বর্ণমুদ্রা-খণ্ডে রূপান্তরিত করিয়া আনিতে পারিত। এইভাবে যে মুদ্রা আনা হইত, তাহার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সীমা ছিল না।

সীমাবদ্ধ মুদ্রাঙ্কন—কোন কোন মুদ্রাঙ্কনে ভারতের মত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তখন উহাকে সীমাবদ্ধ মুদ্রাঙ্কন বলে।

(খ) **ব্যয়হীন মুদ্রাঙ্কন**—যে দেশে টাঁকশাল মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়স্বরূপ কোন মূল্য গ্রহণ করে না, তাহাকে ব্যয়হীন মুদ্রাঙ্কন বলে। যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

২। **ব্যয়সাধ্য মুদ্রাঙ্কন**—

(ক) **নির্মাণব্যয়সাধ্য মুদ্রাঙ্কন**—টাঁকশালে মুদ্রাঙ্কন করিবার নির্মাণব্যয় মাত্র গ্রহণ করা হইলে তাহাকে নির্মাণব্যয়সাধ্য মুদ্রাঙ্কন বলা হয়। ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(খ) **নির্মাণব্যয়-অতিরিক্ত মুদ্রাঙ্কন**—মুদ্রাঙ্কনের প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা বেশী মূল্য গ্রহণ করা হইলে (অর্থাৎ টাঁকশালে মুদ্রাঙ্কন দ্বারা মুনাফা করা হইলে) ইহাকে নির্মাণব্যয়-অতিরিক্ত মুদ্রাঙ্কন বলা হয়।

মুদ্রামান, একধাতব মুদ্রা ও দ্বি-ধাতব মুদ্রা

কোন দেশের মুদ্রামান সেই দেশের আদর্শ মুদ্রার সংজ্ঞাবিশেষ।

আদর্শ মুদ্রা এক ধাতু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। দুই প্রকার ধাতুর মুদ্রাও আদর্শ মুদ্রা হইতে পারে এবং দুই প্রকার মুদ্রাই আদর্শ মুদ্রা হিসাবে একই সময়ে প্রচলিত হইতে পারে।

দ্বি-ধাতব মুদ্রা বলিতে এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা বুঝায় যাহাতে আদর্শ মুদ্রা দুইটি ধাতু হইতেই (যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য) প্রস্তুত হয়।

এক-ধাতব মুদ্রা বলিতে এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা বুঝায়, যেখানে আদর্শ মুদ্রা কেবলমাত্র একটি ধাতু (স্বর্ণ বা রৌপ্য) হইতে প্রস্তুত হয়। যে দেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে সে দেশে এক-ধাতব মুদ্রামান প্রচলিত আছে বলা হয়।

মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাসকরণ—মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস বা বৃদ্ধি

পূর্বেই বলা হইয়াছে মুদ্রার নিজস্ব কোন প্রয়োজন নাই. মুদ্রার বিনিময়ে সামগ্রী বা সেবার প্রয়োজন হয়। তাহাদের মূল্যের উপর মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা নির্ভরশীল।

অন্য সকল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে এক টাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প দ্রব্য ক্রয় করা যাইবে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে এক টাকায় অধিকতর দ্রব্য ক্রয় করা যাইবে।

মুদ্রার মূল্য হ্রাস—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য হ্রাস হয়। কারণ তখন মুদ্রা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প দ্রব্য ক্রয় করা যায়।

মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি—দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ টাকার মূল্য বর্ধিত হয়। কারণ তখন টাকা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়।

দেশে দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কেন? মুদ্রামূল্যের তারতম্যের কারণ— মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাই মুদ্রার মূল্য। পণ্যদ্রব্যের বা সেবার মূল্যের মত মুদ্রার মূল্যও

চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। মুদ্রার সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা বেশী হইলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য সাধারণভাবে কমিয়া যায়। কিন্তু মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী হইলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হয় এবং দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায়। মুদ্রার চাহিদার পিছনে বণিক, ব্যবসায়ী, মহাজন, মজুর, কৃষক প্রভৃতি দেশের সকল ধরণের মানুষের চাহিদার কথাই রহিয়াছে।

সরকারী মুদ্রা ও ব্যাঙ্কের মুদ্রার সমন্বয়ে দেশের সর্বমোট মুদ্রার পরিমাপ করা হয়। এই সর্বমোট মুদ্রাকে মুদ্রা প্রচলনের গতিবেগের সহিত গুণ করিলেই 'মুদ্রার সরবরাহ' জানা যাইবে।

সরকারী মুদ্রা+ব্যাঙ্ক প্রদত্ত মুদ্রা=সর্বমোট মুদ্রা
সর্বমোট মুদ্রা×মুদ্রা প্রচলনের গতিবেগ=মুদ্রার সরবরাহ

অর্থের পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্য নিরূপণ সূত্র—অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার মূল্য আনুপাতিকভাবে কমিয়া যায় এবং দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায়। মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য কমিয়া যায় এবং আনুপাতিকভাবে মুদ্রার মূল্য বাড়িয়া যায়। অর্থের পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্যনিরূপণ সূত্র বলিতে ইহাই বুঝায়। আধুনিক যুগে অর্থ বলিতে উভয় প্রকার সরকারী মুদ্রা (ধাতুমুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা) ও ব্যাঙ্কের দাদন দেওয়া অর্থ বুঝায়।

অর্থের পরিমাণ ও মূল্যের নিরূপণে সরবরাহ ও চাহিদা সূত্রের প্রয়োগের নামই অর্থের পরিমাণ সূত্র।

অর্থের মূল্য ও দ্রব্যমূল্য অর্থের চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। পরিমাণ সূত্রের কার্যকারিতা অন্যান্য জিনিষের উপর নির্ভর করে। এই অন্যান্য জিনিষের মধ্যে অর্থের চাহিদা ও অর্থের সরবরাহ অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইলে চলিবে না। অর্থের মাধ্যমে যে পরিমাণ বিনিময়কার্য, ব্যবসাবাণিজ্য করিতে হইবে, তাহাই অর্থের চাহিদা। ইহা আবার জনসংখ্যা, দ্রব্য-বিনিময়ের পরিমাণ, উৎপাদন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। অর্থের সরবরাহ বলিতে মোট মুদ্রা ও দাদনের পরিমাণ ও ইহাদের প্রচলনের গতিবেগ বুঝায়।

অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হইবে, অনুরূপভাবে অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হইলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে, অর্থের মূল্য অর্থের পরিমাণ বা সরবরাহের উপর নির্ভরশীল।

অন্যদিকে ব্যবসাবাণিজ্যের পরিমাণের বা চাহিদার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যেরও তারতম্য হইবে। ইহাকে নিম্নলিখিত গাণিতিক সূত্রে ব্যক্ত করা হইয়াছেঃ

$$P = \frac{MV}{T}$$

P = মূল্যমান (price level)
M = মুদ্রার পরিমাণ (quantity of money)
T = বাণিজ্যের পরিমাণ
V = মুদ্রা প্রচলনের গতিবেগ (velocity of circulation of money)

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ফিসার দাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সূত্রটিকে সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

M' = ব্যাঙ্ক প্রচলিত মুদ্রা বা দাদনের পরিমাণ
V' = দাদনের প্রচলন-গতি

ইহা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কপ্রচলিত মুদ্রা বা দাদনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দেশ করে।

√**গ্রেশ্যামের সূত্র—কোন দেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে অপেক্ষাকৃত খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বিতাড়িত করিয়া চালু থাকে।** এইভাবে ভাল মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয় ও বাজারে খারাপ মুদ্রাই চলিতে থাকে। রাণী এলিজাবেথের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার টমাস গ্রেশ্যামের নাম অনুসারে মানুষের স্বভাবজনিত মুদ্রাপ্রচলনের এই গতিকে গ্রেশ্যাম সূত্র বলা হইয়াছে।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের স্বার্থপর মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখি যে, মানুষ ভাল জিনিষ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া খারাপ জিনিষ অন্যকে দিতে চায়। আমরা ইহাও লক্ষ্য করি যে, মানুষ মলিন, ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুরাতন মুদ্রাকে অপরের কাছে চালাইবার চেষ্টা করে এবং ভাল বা নূতন মুদ্রা নিজের হাতে রাখিতে চায়। এইভাবে খারাপ মুদ্রা সর্বদাই ভাল মুদ্রাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে।

ভাল মুদ্রা তিন প্রকারে অদৃশ্য হইতে পারেঃ

(১) ওজনদরে বিক্রয়—ভাল মুদ্রাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার না করিয়া ও সেই মুদ্রাকে ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিলে অধিকতর মূল্য পাওয়া যায়।

বাজারে স্বর্ণের মূল্য বাড়িয়া গেলে মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণমুদ্রার যে মূল্য হইবে, ধাতু হিসাবে ইহার মূল্য তদপেক্ষা বেশী হইবে। কৌশলী ব্যক্তিগণ মুদ্রাকে গালাইয়া ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জন করিবে। এইভাবে ওজনদরে বিক্রয় হইয়া ভাল মুদ্রা অদৃশ্য হয়।

(২) **মজুত**—অনুরূপ কারণে মানুষ স্বর্ণ সঞ্চিত করিয়া রাখে (রূপা নয়)। সাধারণতঃ লোক ভাল মুদ্রাই মজুত রাখে, খারাপ মুদ্রা নয়।

(৩) **বিদেশে লেন-দেন**—বিদেশীরা খারাপ মুদ্রা গ্রহণ করিবে না, ভাল মুদ্রা চাহিবে। আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

ব্যতিক্রম—(১) যদি সমাজের মোট মুদ্রার চাহিদা হইতে অর্থের সরবরাহ বেশী হয় অর্থাৎ বেশী অর্থ প্রচলিত থাকে কিম্বা যদি (২) জনমত খারাপ মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকার করে, তাহা হইলে এরূপ ক্ষেত্রে গ্রেশ্যামের সূত্র প্রযোজ্য হইবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্রেডিট বা ধারে কারবার

ক্রেডিট বা ধারে কারবার—অর্থ ব্যবহারের ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে আদানপ্রদানের প্রথা অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসারের সহিত তাল রাখিয়া প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকাকড়ির লেনদেন করা খুবই কঠিন। আদান-প্রদানের প্রথা আরও সহজ করিবার জন্য মানুষ আর এক নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছে। ইহাকেই ক্রেডিট বা ধারে কারবার বলা হয়।

কোন ব্যক্তিকে মহাজনের ধার শোধ করিবার জন্য ১০,০০০৲ টাকা দিতে হইবে। তিনি উহা নগদ টাকায় না দিয়া ঐ পরিমাণের একটি চেক মহাজনকে দিতে পারেন। আবার কোন ব্যক্তি বিদেশে ৫০,০০০৲ টাকার মাল বেচিয়াছেন, তিনি ঐ টাকা আদায়ের জন্য ঐ মূল্যের একটি হুন্ডী কাটিতে পারেন। এই চেক বা হুন্ডীর সাহায্যে মানুষ ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রসার সম্ভব করিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস না থাকিলে মহাজন চেক না লইতে পারিত; তেমনি বণিকের হুন্ডী বিদেশে ভাংগান সম্ভব না হইতেও পারিত। এই বিশ্বাসের ফলেই চেক ও হুন্ডীর সাহায্যে দেশে ও বিদেশে কারবারী লেন-দেন চলে।

ধারে কারবার বা ক্রেডিটের সংজ্ঞা—ভবিষ্যতে পূর্ণ মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে বর্তমানে মাল লইবার নাম ক্রেডিট বা ধারে কারবার। ধারে কারবার বা ক্রেডিটে কারবারে মহাজন বিশ্বাস করে যে বর্তমানে সামগ্রী হস্তান্তরিত করিলেও ভবিষ্যতে সে ইহার মূল্য পাইবে।

ক্রেডিট গ্রহণ পদ্ধতি—এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য প্রধান বিষয় দুইটি—(১) সময় এবং (২) বিশ্বাস।

নগদ কারবারে টাকার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। ধারে কারবারে পরে মূল্য শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ধারে কারবারে সময়ের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কেননা বিক্রেতাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়।

অপর প্রয়োজনীয় উপাদান হইল বিশ্বাস। ক্রেতা এবং তাহার প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিয়াই বিক্রেতা তাহার জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে।

ক্রেডিট বা ব্যবসায়ে বিশ্বাসের নিদর্শনপত্র—টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণের প্রমাণপত্রকে ব্যবসায়ে বিশ্বাসের নিদর্শনপত্র বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিব—(১) চেক ও (২) হুণ্ডী।

(১) চেক—কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে নিজ গচ্ছিত টাকা হইতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কাহাকেও দিবার জন্য ব্যাঙ্ককর্তৃপক্ষের নিকট যে আদেশ-পত্র জারী করেন তাহাকে চেক বলা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার পর ব্যাঙ্ককর্তৃপক্ষ ঐ আমানতকারীকে ঐরূপ আদেশপত্র জারী করিবার অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। চেকের সাহায্যে টাকা তুলিতে হইলে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া চেকে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। যিনি চেক দিতেছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত সততা এবং যে ব্যাঙ্ককে টাকা দিতে বলা হইতেছে, সেই ব্যাঙ্কের সততা বা টাকা দিবার ক্ষমতা থাকা চাই, ব্যাঙ্ক এবং চেক যিনি দিলেন উভয়ের উপর বিশ্বাস থাকা চাই।

চেকদ্বারা আদানপ্রদানে বিশ্বাস বা সততাই হইল প্রথম এবং প্রধান কথা।

চেককে কি টাকা বলা যায়?—চেক এবং টাকা এক বস্তু নহে। কারণঃ—

(১) টাকার মত চেক সকলে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে না। সুতরাং ইহার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নাই। সুতরাং চেক সাধারণতঃ একবার মাত্রই ব্যবহার হয়; অজানা লোক চেকে বিশ্বাস রাখে না। কিন্তু টাকার প্রচলন অবাধ।

(২) চেকের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত লেনদেন সম্পূর্ণ হয় না। চেকের টাকা পাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। নগদ বা টাকার লেনদেন সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বা শেষ হইয়া যায়।

(৩) চেক আইনবিহিত মুদ্রা নয় বলিয়া মহাজন চেক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। সুতরাং চেককে বিশ্বাসের নিদর্শনপত্র ব্যতীত অন্য কিছু বলা চলে না।

(২) ব্যবসায়ী হুণ্ডী—বিশ্বাসের অন্যতম নিদর্শনপত্র হুণ্ডী। ইহা দ্বারা বিদেশে বাণিজ্য বা লেনদেনের সুবিধা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবসায়ী হুণ্ডী বলা হইয়া থাকে। চেকের মত কোন ব্যাঙ্ককে এই টাকা দিতে হয় না। কোন ব্যক্তি

বা প্রতিষ্ঠানকে অঙ্গীকারপত্রানুযায়ী পণ্যমূল্য দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ী হুন্ডী দর্শনমাত্র বা হুন্ডীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাম শোধ করিতে হয়।

বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রই দেশজাত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করে এবং প্রয়োজনমত নিজ দেশে বিদেশী জিনিষ আমদানীও করে। এই বিদেশী রপ্তানী দ্রব্যের দাম কিভাবে দেওয়া হয়?

ভারতীয় টাকা নিদর্শনী মুদ্রা বলিয়া মার্কিন বা সুইডিশরা টাকা গ্রহণ করে না, কেবলমাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ এই দুইটি ধাতু পৃথিবীর সকল দেশের লোক গ্রহণ করিয়া থাকে। চাহিবামাত্র স্বর্ণ পাওয়া যাইবে, তাহারা এরূপ অঙ্গীকারপত্রও গ্রহণ করিয়া থাকে।

কোন এক ভারতীয় ব্যবসায়ী ইংলন্ডে ১৩ হাজার টাকা মূল্যের পাট বিক্রয় করিলেন। তিনি ঐ পাটের মূল্য বাবদ ইংলন্ডীয় মুদ্রার পরিবর্তে ভারতীয় মুদ্রা পাইতে ইচ্ছুক। আবার একজন ইংরাজ ব্যবসায়ী ১০০০ পাউন্ড মূল্যের পশমবস্ত্র ভারতে পাঠাইয়াছেন। তিনি ইহার মূল্য ভারতীয় মুদ্রার পরিবর্তে ইংলন্ডীয় মুদ্রায় পাইতে চাহেন। কারণ ভারতে যেমন ইংলন্ডীয় মুদ্রা অচল, ইংলন্ডে তেমনি ভারতীয় মুদ্রা অচল। এই অসুবিধা দূর করিতে হইলে সমমূল্যের স্বর্ণ কিনিয়া বিদেশে পাঠাইতে হয়। কিন্তু প্রতিবার বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে গেলে কয়েকটি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে—(১) প্রয়োজনমত স্বর্ণ কিনিতে হইবে, (২) চুরি বা নষ্ট যাহাতে না হয় সেইজন্য ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৩) দৈবদুর্ঘটনার জন্য বীমা করিতে হইবে, (৪) রেল, জাহাজে বা বিমানপোতে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব কয়টি ব্যবস্থাই ব্যয়সাধ্য ও বিরক্তিজনক। ব্যবসায়ী হুন্ডী ব্যবহারের ফলে স্বর্ণ রপ্তানি না করিয়াও আন্তর্জাতিক লেনদেন সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যবসায়ী হুন্ডী ব্যবহার—প্রভাস ইংলন্ডে জনকে ১৩,০০০৲ মূল্যের পাট রপ্তানী করিল। ইংলন্ডের জোন্সের নিকট হইতে আগরওয়ালা ভারতে ১০০০ পাউন্ড মূল্যের পশম আমদানী করিল।

আগরওয়ালার নিকট জোন্সের পাওনা হইল ১০০০ পাউন্ড, অপরদিকে জনের নিকট প্রভাসের পাওনা হইল ১৩,০০০৲ টাকা।

যদি ১ পাউণ্ড=১৩৲ টাকার সমান হয়, ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রভাসের ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী জনের নিকট ১৩,০০০৲ টাকা প্রাপ্য, আবার ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী জোন্‌সের ভারতীয় ব্যবসায়ী আগরওয়ালার নিকট ১০০০ পাউণ্ড প্রাপ্য। এখন ভারতীয় ব্যবসায়ী আগরওয়ালা তাহার দেশবাসী প্রভাসকে যদি ১০০০ পাউণ্ড বা ১৩,০০০৲ টাকা দেয় এবং ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী জন্‌ যদি তাহার বিদেশী মহাজন প্রভাসের পরিবর্তে স্বদেশবাসী জোন্‌সকে তাহার দেয় ১৩,০০০৲ টাকা বা ১,০০০ পাউণ্ড দেয়, তাহা হইলে অতি সহজেই দুই দেশের লেনদেন কার্য সমাপ্ত হইয়া যায়। উপরন্তু স্বর্ণ রপ্তানীর জন্য প্যাকিং, বীমা ইত্যাদির খরচও বাঁচিয়া যায়। আগরওয়ালার পক্ষে প্রভাসকে নিজ দেশীয় মুদ্রায় এবং জনের পক্ষে জোন্‌সকে নিজ দেশীয় মুদ্রায় দেয় টাকা দেওয়া খুব সহজ। প্রভাস এবং জোন্‌সও নিজ নিজ দেশে প্রচলিত মুদ্রায় প্রাপ্য পাইলে খুসী হইবে।
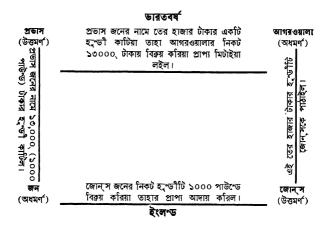
সমস্ত লেনদেন হুণ্ডীর মারফত সম্পন্ন হইল। প্রভাস জনের হুণ্ডী আগরওয়ালার কাছে বিক্রয় করিল। আগরওয়ালা তাহার প্রাপ্য শোধ করিয়া দিল। আগরওয়ালা জনের হুণ্ডীটি জোন্‌সের নিকট পাঠাইয়া

দিল। জোন্‌স আগরওয়ালার পরিবর্তে নিজ দেশবাসী ব্যবসায়ী জনের নিকট হইতে ১০০০ পাউন্ড পাইবার অধিকার অর্জন করিল। এইভাবে জোন্‌সের প্রাপ্য পরোক্ষভাবে শোধ হইল। সকলের পাওনা মিটিয়া যাওয়ায় সকলেই এখন সন্তুষ্ট। এইভাবে একটি অংগীকারপত্র একবার ভারতে ও একবার ইংলণ্ডে দেনা মিটাইল।

বাস্তব জীবনে একজন প্রভাস বা একজন আগরওয়ালা ভারতের বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতেছে না। এদেশে ও বিদেশে বহু ব্যবসায়ী ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত আছে। ক্রেতা ও বিক্রেতা তাহাদের দেনা ও পাওনা ব্যাংক মারফত শোধ করে। পরের অধ্যায়ে আমরা ব্যাংক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাংক

পূর্বে ব্যাংক বলিতে মজুত মূলধন বুঝা যাইত। আগেকার দিনে ব্যাংক্যারের কাজ ছিল শুধু টাকা ভাঙ্গাইয়া দেওয়া। বর্তমানে ব্যাংক প্রধানতঃ দাদন বা ঋণের কারবার করিয়া থাকে, অবশ্য নগদ টাকার কারবারও কিছু কিছু করিতে হয়। বর্তমান ব্যাংক্যার ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা করেন।

ব্যাংকগুলির কার্য—ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল সাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখা ও টাকাকড়ি লগ্নী করা।

ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখার অর্থ ব্যাংককে ঋণদান করা। ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রাখা হয় প্রধানতঃ ঐ টাকা দ্বারাই ব্যাংক আপন কার্য পরিচালনা করে। এই গচ্ছিত টাকা কি উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে ব্যয় করা হইতে পারে?

আমানতকারী অর্থাৎ পাওনাদারের দাবী অনুযায়ী টাকা দিবার জন্য ব্যাংককে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। সাধারণতঃ সকল আমানতকারী এক সঙ্গে সকল টাকা দাবী করেন না। দাবী অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিবার জন্য সাধারণতঃ জমার ১০ ভাগ নগদ টাকা সর্বদাই কাছে রাখিতে হয়। উদ্বৃত্ত টাকা ব্যাংক অন্য ব্যবসায়ে খাটায় বা ধার দেয়।

ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় প্রধান কার্য হইল টাকা লগ্নী করা। বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের সহিত যাহাদের যোগসূত্র আছে এইরূপ ব্যাঙ্কের সহায়তা ব্যতিরেকে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করা যায় না।

ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা এবং চেক ব্যবহারের সুবিধার জন্য মানুষ টাকা সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের জন্যও ব্যাঙ্কের সহায়তা অপরিহার্য।

ইতিপূর্বেই আমরা হুণ্ডীর ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুইটি দেশের সহিতই পণ্য ক্রয়বিক্রয় সীমাবন্ধ নহে, বরং পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মধ্যেই এই বাণিজ্য চলে। আমেরিকা হইতে যন্ত্র আমদানীকারী কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী নিম্নলিখিত উপায়ে যন্ত্রের মূল্য পরিশোধ করিবেঃ—

বিদেশে কারবার আছে—এমন একটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের নিকট গিয়া উক্ত

ভারতীয় ব্যবসায়ী ৩০,০০০৲ টাকা বা প্রায় ১০ হাজার ডলার ঋণ সংগ্রহ করেন। সেই ব্যাঙ্ক আমেরিকায় এই টাকা মিটাইয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

মার্কিন রপ্তানিকারী ভারতীয় ব্যবসায়ীর নামে একটি হুণ্ডী কাটিয়া চালানের রসিদ সহ সেই হুণ্ডীটি লইয়া কোন মার্কিন ব্যাঙ্কের নিকট যান। মার্কিন ব্যাঙ্ক নগদ টাকা দিয়া সেই হুণ্ডী কিনিয়া লয়। এইভাবে রপ্তানিকারক রপ্তানি করা মাত্র তাহার দাম পাইয়া যায়। তারপর সেই মার্কিন ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্কের (যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক টাকা মিটাইবার ভার লইয়াছে) নিকট হুণ্ডীটি বেচিয়া হুণ্ডীর টাকা আদায় করিয়া লয়। ভারতীয় ব্যাঙ্ক আবার আমদানীকারকের নিকট হইতে টাকাটি আদায় করে। অনেক সময় ঐ ব্যাঙ্কের মার্কিন দেশে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ কারবার থাকে, তাহাদের নিজস্ব অফিসও থাকে। কাজেই এক্ষেত্রে অন্য ব্যাঙ্কের সাহায্য না লইলেও চলে। এইভাবে ব্যাঙ্কের মারফৎ হুণ্ডীর হাতবদল ও ইহা ভাঙ্গান হয়।

ব্যাঙ্কের কার্য ও প্রয়োজনীয়তা—অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক থাকা একান্ত আবশ্যক। ব্যাঙ্ককে ঋণের কারবারী বলা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল দুইটিঃ—

(১) ঋণ গ্রহণ (আমানত), (২) ঋণ দান (লগ্নী বা দাদন)। ব্যাঙ্কগুলি কাহারও কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া অন্য লোককে ধার দেয়।

এগুলি ব্যতীত ব্যাঙ্ককে আরও কতকগুলি কাজ করিতে হয়—(১) বাজারে নোট প্রচলন, (২) মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদ রাখা এবং (৩) অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে সরকারী টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখা এবং সরকারী ঋণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করা। পূর্বে প্রায় সকল দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্ক নোট ছাড়িতে পারিত, এখন কেবলমাত্র সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কই নোট ছাড়িবার অধিকারী। ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করে। সরকারী অর্থসংক্রান্ত কার্যাদিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কে এই গচ্ছিত টাকা আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশে বিনিময়ের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। কীন্‌সের ভাষায়, "দেশে দৈনন্দিন ব্যবসা বা অন্যান্য কার্যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকাই ব্যবহৃত হয়"।

নোট প্রচলন ও চেক প্রচলন করিয়া দাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় ব্যাঙ্ক টাকা হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে নিরাপদে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে অর্থসঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। এই গচ্ছিত অর্থ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকে প্রয়োজনমত ধার দিয়া থাকে।

ব্যাংক ঋণের কারবারী—সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যাঙ্কের কার্য হইতেছে প্রধানতঃ দুইটি ঃ—টাকা ধার করা এবং টাকা ধার দেওয়া।

জনসাধারণ অর্থাৎ যাহারা টাকা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যাংক টাকা ধার নেয়। আবার ব্যাংক এই টাকা প্রয়োজনের সময় ব্যবসায়ীদের ধার দেয়। যে হারে টাকা ধার নেওয়া হয়, তাহার চেয়ে সামান্য বেশী হারে টাকা ধার দিয়া ব্যাংক লাভ করিয়া থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের সহায়তা অপরিহার্য। বর্তমানে ব্যবসা বা শিল্পোন্নতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের বেশীর ভাগ ব্যাংক হইতে সংগৃহীত হয়। ব্যাংক নিজে কোন টাকার মালিক নয়, ইহা সঞ্চয়কারী ও ঋণগ্রহণকারী ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগসূত্র মাত্র।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সেণ্ট্রাল ব্যাংক—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল দেশের ব্যাংক ও ঋণ সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(১) ইহা ব্যাংকসমূহের ব্যাংক। বিপদের সময়ে অন্যান্য ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ সব ব্যাঙ্কের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) ইহা সরকারী ব্যাংক। সরকারী টাকা এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে।

(৩) একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট প্রচলন করিবার অধিকারী। আজকাল অন্য ব্যাংকদের নোট চালু করার অধিকার লোপ পাইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

বর্তমানে কোন জাতি কেবলমাত্র নিজ দেশের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে পারে না। ব্যবসাবাণিজ্য এখন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধ কত নিবিড় ও কত বিরাট, তাহা আমরা ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্যসম্পর্ক হইতেই বুঝিতে পারি। যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় তুলার প্রধান ক্রেতা জাপান ও ইতালী, চা এবং গমের ক্রেতা বৃটেন, কাঁচা পাটের ক্রেতা বৃটেন, পাটের জিনিষের ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কাঁচা লোহার ক্রেতা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ছিল।

সকল দেশই যেমন আমাদের জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকে, তেমনি আমরাও প্রায় সকল দেশের জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকি। আমরা বৃটেনের তুলা এবং পশমজাত জিনিষ, অস্ট্রেলিয়ার গম, জাভা এবং কিউবার চিনি, বেলজিয়ামের লোহা, কাঁচ ইত্যাদি, জার্মানীর কলকব্জা, জাপানের খেলনা, চেকোশ্লোভাকিয়ার এনামেলের জিনিষ, নরওয়ের কাগজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটরগাড়ী প্রভৃতি আমদানী করিয়া থাকি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—

(১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দেশ যে জিনিষ নিজে উৎপন্ন করিতে পারে না বা উৎপন্ন করিলেও ব্যয় অধিক হইত, সেইসব জিনিষ অতি সহজে অন্য দেশ হইতে আমদানী করা চলে। জার্মানীতে পাট উৎপন্ন হয় না; কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক থাকার ফলে জার্মানী ভারতবর্ষ হইতে পাট ক্রয় করিয়া উহা হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত করে। ভারতে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন খুব বেশী; কিন্তু উহা এদেশে তৈয়ারী হয় না। তৈয়ারী হইলেও তাহা জার্মানীর মত সুন্দর বা মজবুত হয় না। এইজন্য পাটের পরিবর্তে জার্মানী ভারতে যন্ত্রপাতি রপ্তানী করিতে পারে। এইভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যেসব জিনিষ উৎপাদনে অধিক ব্যয় হয়, তাহা অতি সহজে এবং কম ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে।

(২) ইহার ফলে কোন কোন দেশ তাহার উৎপাদনক্ষমতা যথাশক্তি সদ্‌ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে। যেসব জিনিষ দেশে অতি সহজে উৎপন্ন হয় প্রত্যেক দেশই

কেবলমাত্র সেইসব জিনিষ উৎপন্ন করিয়া বিদেশে রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে নিজের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ আমদানী করে। এইরূপ আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন যথাসম্ভব বর্ধিত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক দেশই লাভবান হইয়াছে।

(৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জগতে শান্তিস্থাপনে সহায়তা করিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানও কম নহে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা—এই প্রকার বাণিজ্যের ফলে প্রায় প্রত্যেক দেশকেই পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বৃটেনের মত দেশকে নিজ দেশে উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া সেই দেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। অন্য দেশের ক্রয়ক্ষমতা এবং ক্রয় ইচ্ছার উপর এই প্রকার ক্রয়বিক্রয় নির্ভর করিতেছে। যদি বিদেশী ক্রেতা জিনিষ কেনা বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে দেশে বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ও লোকের দুর্দশার অন্ত থাকিবে না। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইবে।

বহির্বাণিজ্যিক ভারসাম্য—চলতি ভাষায় বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলিতে কোন দেশের আমদানী ও রপ্তানীর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝায়। কোন দেশের আমদানী ও রপ্তানী কখনও সমান হইতে পারে না। যখন আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হয়, তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল বলা হয়। এই সময়ের আর্থিক মানকে "অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য" বলা হইয়া থাকে। আবার যখন রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইয়া যায়, তখনকার আর্থিক মানকে "প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য" বলা হইয়া থাকে।

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলেই যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল এরকম মনে করা ভুল। যে দেশ অন্য দেশকে ঋণদান করিতেছে সেই দেশ হইতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইতে পারে যেমন, তেমনি যে দেশ ঋণগ্রস্ত সেই দেশ সুদ ও ঋণশোধ বাবদ আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী করিতে বাধ্য হয়।

বহির্বাণিজ্যিক হিসাব-সাম্য—কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সাম্যাবস্থায় আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র আমদানী, রপ্তানী ও ইহার ভারসাম্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চলিবে না। মোট জমা ও খরচের হিসাব-সাম্যও ভালভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সংরক্ষণ ও অবাধ্য বাণিজ্য—যখন কোন দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করে না, তখন সেই দেশে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আবার কোন দেশ বাণিজ্য ব্যাপারে সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ দেশীয় শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপিত করে। বৈদেশিক আমদানী প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর নানাপ্রকার কর চাপান হয়। এই প্রকার করকে প্রতিরোধক শুল্ক বলা হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—

(১) বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্র দূরবর্তী ও অনিশ্চিত বলিয়া স্বদেশী বাজার কয়েকটি শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন।

(২) বাজার সংরক্ষণের ফলে স্বদেশী জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ও অধিক সংখ্যক লোক কর্মে নিযুক্ত হইবে এবং ব্যবসায়ে দেশী মূলধন খাঁটিবে।

(৩) বিদেশী ব্যবসায়ীগণ যখন বাজারে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজেদের সাময়িক ক্ষতি করিয়া কমদামে জিনিষ বিক্রয় করে, তখন দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

(৪) দেশের অর্থনৈতিক জীবন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প-বৈচিত্র্যের জন্য শিল্প সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

(৫) অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে দেশকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

(৬) সংরক্ষণনীতি অনুসরণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল নবজাত শিল্পকে রক্ষা করা। বৈদেশিক উন্নত ও শক্তিশালী বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় নবজাত শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ পরিচর্যা প্রয়োজন। কালক্রমে এই শিল্প বড় হইয়া উঠিলে আর তাহা সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। সংরক্ষণের মূল নীতি—শিশুর শুশ্রূষা কর, শিশুকে রক্ষা কর, পূর্ণ বয়স্ককে মুক্তি দাও। নবজাত শিশুকে রক্ষা করাই হইল ভারতীয় শিল্পসংরক্ষণনীতির প্রধান যুক্তি।

সংরক্ষণ নীতির অসুবিধা—সংরক্ষণ নীতির অসুবিধা গুলির মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি এইরূপঃ—(১) রাষ্ট্রনীতিতে দুর্নীতি প্রবেশের সম্ভাবনা, (২) একচেটিয়া ব্যবসায়, (৩) অনুপযুক্ত বা অপুষ্ট উৎপাদন, (৪) জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি এবং (৫) ফলে জনসাধারণের ক্ষতি।

অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ—অবাধ বাণিজ্যের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে ব্যবসা একচেটিয়া হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রতিযোগিতার জন্য অপেক্ষাকৃত ব্যয়ে অধিক জিনিষ উৎপন্ন হয় বলিয়া সকলেরই লাভ হয়।

অবাধ বাণিজ্যের ফলে ধনী শিল্পপতিগণ প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত অল্প দামে জিনিষ কিনিতে পারা যায় বলিয়া অবাধ বাণিজ্যের ফলে ধনী-দরিদ্র সকলেরই উপকার হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক উন্নতির পথে সব চেয়ে বড় বাধা সংরক্ষণ। অবাধ বাণিজ্যের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক জাতীয়তা ও সংরক্ষণ—ছোট ছোট সামাজিক গোষ্ঠী লইয়া জাতি গঠিত, ক্ষুদ্র গন্ডী ছাড়িয়া আমরা সারা পৃথিবীকে একটি দেশ বলিয়া ভাবিতে পারি না। রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্ব লাভের জন্য বড় বড় রাষ্ট্রগুলি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত।

প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান নহে। কোন কোন দেশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর অর্থনৈতিক শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অর্থনৈতিক সাম্যের আশায় প্রত্যেক দেশই এই সংগ্রামের জন্য নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। এই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবোধ বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পসংরক্ষণের মূলে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বণ্টন

বণ্টন কি ?—যৌথ উৎপাদনে সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাহাদের সম্মিলিত আয় নিজ নিজ প্রাপ্য অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়াকে অর্থনীতিতে বণ্টন বলা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিশ্রম, পুঁজি, এবং সংগঠন যে চারিটি সহায়কের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। সেই চারিটি সহায়কের মধ্যেই আয় ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

বন্টন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে—(১) কি বন্টন করা হইবে? (২) প্রত্যেকের অংশ কি এবং সেই অংশ কে গ্রহণ করিবে, (৩) কি ভাবে অংশ নির্ণয় করা হইবে।

কি বণ্টন করা হয়—কোন ব্যবসায়ী দিয়াশলাই তৈয়ারী করিতে মনস্থ করিয়া জমিদারের নিকট হইতে একখণ্ড জমি ইজারা লইয়া জমিতে একটি বাড়ী তৈয়ারী করিল এবং মহাজনের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিল এবং কার্যে উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিল। সারা ব্যবসায়ে সে মোট ৪০ হাজার গ্রোস দিয়াশলাই তৈয়ারী করিল এবং ইহাই হইল তাহার মোট উৎপাদন।

সারা বৎসর ক্রমাগত উৎপাদনের ফলে যন্ত্রপাতি বিকল হইতে পারে, কারখানা-গৃহের কিছু ক্ষতি হইতে পারে, এই সব মেরামত এবং কাঁচামাল কিনিবার জন্য ব্যবসায়ী কিছু টাকা আলাদা করিয়া রাখা। এই টাকাকে পুনঃ স্থাপন ভাণ্ডার বলা হয়।

মনে কর, দিয়াশলাই কারখানার পুনঃস্থাপন ভাণ্ডারে মোট ৫০ হাজার টাকা জমা রাখা হইল।

ব্যয়সমেত উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের মোট মূল্য হইতে এই পুনঃস্থাপন ভাণ্ডারের জমা টাকা বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই হইল ঐ ব্যবসায়ের খরচ বাদে নীট আয় বা আসল উৎপাদন।

মোট উৎপাদন—	**পুনঃস্থাপন ভাণ্ডার—**	**আসল উৎপাদন বা নীট আয়—**
(৮০,০০০৲)	(৫০,০০০৲)	(৩০,০০০৲)

দিয়াশলাই ব্যবসায়ে মোট লাভ হইল ত্রিশ হাজার টাকা এবং এই টাকাই বণ্টন করিতে হইবে। সংগঠনকারী, জমিদার, মহাজন ও শ্রমিক—এই চারি শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। অতএব ইহাদের মধ্যে এই লাভের টাকা বণ্টন করিতে হইবে।

জাতীয় আয়—কোন দেশে শ্রম এবং টাকা খাটানর ফলে বৎসরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর জিনিষ তৈয়ারী হইয়া থাকে। এই উৎপাদিত জিনিষই হইল দেশের মোট বাৎসরিক আয় বা জাতীয় আয়।

পর বৎসরে শস্যবণ্টনের জন্য বীজ, কাঁচামাল ইত্যাদি করিয়া রাখিতে হয়। এইগুলিকে মোট জাতীয় আয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নীট জাতীয় আয়।

এইভাবে জাতীয় আয় একদিকে (১) মোট নীট উৎপাদন, (২) অপরদিকে এই আয় হইতেই দেশে খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা দেওয়া হয়। এই আয়ই উৎপাদনে সহায়কদের প্রাপ্য পারিশ্রমিকের একমাত্র ধনভাণ্ডার।
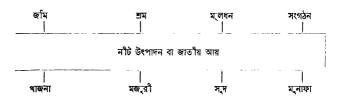
অংশ কি এবং কে সেই অংশ পাইবে?—উৎপাদনের সহায়ক হইল প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন এবং ইহাদের ভাগের অংশকে যথাক্রমে খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা বলা হইয়া থাকে।

জমি লীজ দেয় যে জমিদার, শ্রম করে যে শ্রমিক, টাকা ধার দেয় যে মহাজন এবং সংগঠন করে যে সংগঠনকারী তাহারা প্রত্যেকেই এই লাভের অংশ পাইয়া থাকে।

সমষ্টির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক—বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌গণ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সমষ্টির লাভের অংশের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ব্যক্তিগত লভ্যাংশ আলোচনা না করিয়া কার্যানুযায়ী বণ্টনব্যবস্থা আলোচনা করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষের লভ্যাংশ আলোচনা না করিয়া আমরা সমষ্টির লভ্যাংশ আলোচনা করিব এবং এইভাবে কোন একটি শ্রমিকের বিচার না করিয়া শ্রমিকসমাজের কথাই আমরা চিন্তা করিব।

কিভাবে বণ্টনের অংশ নির্ণয় করা হয়—প্রত্যেকটি সহায়ক উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া লাভ বণ্টনের সময় প্রত্যেকেই কিছু কিছু অংশ পাইয়া থাকে। বিভিন্ন সহায়কের মধ্যে কাজ ও সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিকের তারতম্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যাহারা কঠিন, বিপজ্জনক, বিরক্তিকর ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম কাজ সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহারই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের জন্য সর্বাপেক্ষা কম পারি-শ্রমিক পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাহারা নামমাত্র পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহারাই বণ্টনের সময় সর্বাপেক্ষা বেশী অংশ পাইয়া থাকে; যেমন জমিদার ও মহাজনের সুদ ও খাজনা। একমাত্র ব্যবসাসংগঠক ব্যতীত অন্য সকলের অংশ চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্যের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। শ্রমিক উৎপাদন কার্যে যে পরিশ্রম করিয়াছে সেই পরিশ্রমের মজুরীই তাহার অংশ। দ্রব্যমূল্যের মত চাহিদা এবং সরবরাহ অনুযায়ী পরিশ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয়। সাধারণতঃ শ্রমিকের সংখ্যা যখন কম তখন তাহাদের বেশী মজুরী দেওয়া হয়। সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের মজুরীও কমিয়া যাইবে। বেশী মূলধন যখন সংগ্রহ করা যায় না তখন বেশী সুদ দিতে হয়; আবার বেশী মূলধন পাওয়া গেলে সুদের হারও হ্রাস পাইবে।

ষোড়শ অধ্যায়

খাজনা

ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে টাকা দিতে হয় তাহাকে খাজনা বলা হয়।

সাধারণতঃ আমরা বাড়ী ভাড়ার কথা বলি; কিন্তু জমির খাজনা বলি। কারখানা বা বাসগৃহের ভাড়ার মধ্যে জমির খাজনা আছে এবং গৃহ বা কারখানা নির্মাণব্যয়ের জন্য মূলধন প্রয়োগের মূল্য হিসাবে সুদও আছে।

আমাদের ভাষায় খাজনা শুধু ভূমি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো খাজনা সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচার করেন।

তাঁহার মতে মাটির যে গুণ আদি এবং অবিনশ্বর—যথা, উর্বরাশক্তি এবং যাহা ব্যবহারের ফলে উৎপাদন সম্ভব হয় এবং সেইজন্য উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয় কেবলমাত্র সেই অংশকেই খাজনা বলা উচিত।

রিকার্ডোর এই সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া খাজনার নীতি ও পরিমাণ বর্তমান কালে নির্ধারিত হয়।

রিকার্ডোর পূর্ববর্তীগণ খাজনাকে **প্রকৃতির দান** বলিয়া মনে করিতেন। রিকার্ডো বলিলেন ইহা প্রকৃতির দান নয়, প্রকৃতির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাসের ফলেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। যতদিন উৎকৃষ্ট ভূমি পাওয়া গিয়াছে ততদিন খাজনার কোন প্রশ্ন উঠে নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাল মাটি কম থাকায় এবং ক্রমশঃ ভূমির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাসের ফলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ভূমির প্রয়োজন হইয়াছে।

(১) খাজনার উৎপত্তি, (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত খাজনার সম্পর্ক এবং **(৩) মূল্যের সহিত খাজনার সম্পর্ক**—এই কয়টি বিষয় রিকার্ডো বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কি করিয়া খাজনার উৎপত্তি হইল—উৎকৃষ্ট ভূমি এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ভূমির উৎপাদন পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া রিকার্ডো ভূমির খাজনা স্থির করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে কোন সমাজের কথা মনে কর—যেখানে প্রচুর সূর্যকিরণ ও বায়ু প্রভৃতি অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মত প্রচুর জমি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উর্বরতা

এবং অবস্থান বিচার করিয়া যেসব জমি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইগুলিই মানুষ প্রথমে চাষ করিবে বা ব্যবহার করিবে।

খাজনা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি—অতঃপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবে।

খাজনা বহনে অসমর্থ জমি বা প্রান্তিক কৃষিভূমি—কখনও কখনও দেখা যায় যে, উৎপন্ন শস্যমূল্য অপেক্ষা কৃষিকার্যে ব্যয় বেশী হইয়াছে বা যে পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে ঠিক সেই পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই রকম জমিকে রিকার্ডো খাজনা-ভার বহনে অসমর্থ জমি বা প্রান্তিক কৃষিভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

খাজনার ভার বহনে অসমর্থ ভূমির উৎপাদনব্যয় হিসাব করিলে যাহা থাকিবে তাহাই হইল উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বা প্রান্তীয় ব্যয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মূল্যের সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক নাই।

আবার এমন কতকগুলি উর্বরা জমি আছে যাহাদের উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন শস্যমূল্য অপেক্ষা অনেক কম। উৎপাদনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত রহিল তাহাই হইল জমির লাভ বা খাজনা। কিন্তু এমন উর্বরা জমি সব সময়ে পাওয়া যায় না।

খাজনা এবং জমির দুষ্প্রাপ্যতা—উর্বরা জমি কম বলিয়া জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়। সকলেই উৎকৃষ্ট জমি সংগ্রহের চেষ্টা করে; কিন্তু কম লোকই তাহা পাইয়া থাকে। যাহারা পায় তাহারাই কেবল এইরূপ উদ্বৃত্ত ভোগ করিয়া থাকে।

কৃষকদের মধ্যে উৎকৃষ্ট জমি সংগ্রহের প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া জমিদার জমির খাজনা স্থির করিয়া থাকেন।

ইচ্ছা করিলে জমিদার নিজে চাষ করিয়া জমির উদ্বৃত্ত নিজেই ভোগ করিতে পারেন বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনার পরিবর্তে কাহাকেও জমি চাষ করিবার জন্য দিতে পারেন।

রিকার্ডোর খাজনা সূত্রের সমালোচনা—

(১) রিকার্ডো বলিয়াছেন যে, প্রথমে উৎকৃষ্ট জমির এবং পরে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমির চাষ হইয়া থাকে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ইহা সত্য নহে।

(২) মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খাজনা পদ্ধতির সহিত রিকার্ডোর খাজনা সূত্রের কোন সঙ্গতি নাই।

(৩) মানুষ অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়া জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। কাজেই উদ্বৃত্তের জন্য কেবলমাত্র মাটির গুণ নয়, মানুষের পরিশ্রমও অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে।

(৪) জমির উৎপাদনশক্তি অবিনশ্বর নয়। ক্রমাগত চাষ-আবাদের ফলে ক্রমশঃ উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়।

(৫) রিকার্ডোর সংজ্ঞা অনুসারে কেবলমাত্র কৃষিভূমির খাজনা নির্ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু কৃষিভূমির খাজনা ব্যতীত খনিজ, মৎস্যচাষক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ইত্যাদি নানাপ্রকার খাজনা রহিয়াছে। চাহিদা এবং সরবরাহ অনুসারে কৃষিভূমির মত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদেরও খাজনা নির্ধারিত হয়।

আধুনিক খাজনা নির্ধারণ সূত্র—জমির লাভ বা উদ্বৃত্তই হইল খাজনা। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জমির উর্বরতা এবং সেজন্য উৎপাদনের পার্থক্য বিচার করিয়া খাজনা নির্ধারিত হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ রিকার্ডোর নীতিকে মূলতঃ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

প্রত্যেক দেশেই জমির আয়তন সীমাবদ্ধ এবং উর্বরতাশক্তি অনুসারে ইহার নানারূপ তারতম্য আছে।

জমির এইসকল বৈশিষ্ট্য এবং চাহিদা হইতে বুঝিতে পারা যায় কি ভাবে তাহা চাষ হইবে এবং চাষের পর কি পরিমাণ খাজনা দেওয়া হইবে। চাহিদা এবং সরবরাহ—এই দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া জমি ব্যবহারের মূল্য বা খাজনা নির্ধারিত হয়।

খাজনা ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্র—ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া খাজনা নির্ধারিত হয়। যদি জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনসূত্র কার্যকরী না হইত তাহা হইলে কৃষক সারাজীবন একটি ক্ষুদ্র জমিতে নিজ অর্থ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী চাষ করিত এবং খাজনা হইতে অব্যাহতি পাইত। কৃষি উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্য কোন ব্যক্তি এযাবৎ একটি জমিতে বেশী মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে সাহসী হন নাই।

কি করিয়া অর্থনৈতিক খাজনা নির্ধারিত হয়?—

অর্থনীতিতে খাজনা কাহাকে বলে—উৎপাদকের লাভ বা উদ্বৃত্তই হইল অর্থনীতির খাজনা। উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া উৎপাদকের যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলা হয়।

অর্থনৈতিক খাজনা=উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য—বাদ—উৎপাদন ব্যয়। উৎপন্ন শস্য ঝাড়াই এবং বাজারে বিক্রয়ের পর এই খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

খাজনা এবং শস্যমূল্য—মূল্যের সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক আছে কি?—

সাধারণ মানুষের ধারণা খাজনা বেশী হইলে মূল্য বেশী হইবে। রিকার্ডো প্রমাণ করিয়াছেন যে, খাজনা বেশী হইলে মূল্য বেশী হয় না, বরং মূল্য বেশী হইলে কৃষক বেশী খাজনা দিতে পারে। প্রান্তিক কৃষিভূমি অর্থাৎ যে ভূমি চাষের পর কোন উদ্বৃত্ত থাকে না—সেই ভূমিখন্ড ও উৎকৃষ্ট ভূমির মধ্যে উৎপাদনগত পার্থক্যকে ভূমির খাজনা বলা হয়। খাজনা-ভার-বহনে-অসমর্থ ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইয়া থাকে। সেই শস্যের মূল্য উৎপাদনের ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়; কিন্তু সেই জমিতে খাজনা দেওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই এইসব জমি হইতে কোন খাজনা পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাজনার সহিত মূল্যের কোন সম্পর্ক নাই।

পক্ষান্তরে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মানুষ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে আরম্ভ করিবে। ফলে উৎকৃষ্ট এবং সাধারণ জমির মধ্যে উৎপাদনের দিক হইতে প্রভেদ থাকায় উৎকৃষ্ট জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে মূল্য বেশী হওয়ার ফলে খাজনা বেশী হইয়া থাকে।

চুক্তির ভিত্তিতে খাজনা স্থির হয়—ব্যবহারিক জীবনে খাজনা নির্ণয়—ব্যবহারিক জীবনে জমিদার প্রজার সঙ্গে চুক্তি করিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনায় জমি চাষ করিতে বা অন্য ব্যবহারের জন্য দেন। চুক্তি অনুসারে খাজনা স্থির হয় বলিয়া এইরূপ খাজনাকে চুক্তিবদ্ধ খাজনা বলা হয়।

কি করিয়া চুক্তিবদ্ধ খাজনা স্থির করা হয়—জমির সরবরাহ এবং চাহিদা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ খাজনা স্থির করা হয়। জমিদার এবং প্রজা উভয়েই জানে যে জমি হইতে কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত হইবে। কেহ ভাবে উদ্বৃত্ত খুব বেশী হইবে; কেহ বা ভাবে উদ্বৃত্ত কম হইবে।

জমির সরবরাহ হইতে চাহিদা যদি বেশী হয় তাহা হইলে খাজনা বাড়িবে; কিন্তু জমি বেশী অথচ চাহিদা কম হইলে খাজনা কমিয়া যাইবে। এইভাবে সরবরাহ এবং চাহিদা অনুযায়ী জমি ব্যবহারের মূল্য বা জমির খাজনা স্থির করা হয়।

শহরের জমির খাজনা—সাধারণতঃ মানুষ বাসগৃহ নির্মাণ বা ব্যবসার জন্য শহরে জমি ক্রয় করিয়া থাকে। যে স্থান স্বাস্থ্যকর ও মনোরম এবং যেখানে যাতায়াতের সুবিধা আছে সেখানকার জমির মূল্য সাধারণতঃ বেশী। রেলস্টেশনের নিকটবর্তী

ব্যবসাকেন্দ্র বা সুদৃশ্য পার্কের নিকট বাসস্থানের জন্য জমির পরিমাণ চাহিদা অনুযায়ী কম বলিয়া এইসব স্থানের খাজনা খুব বেশী।

অনুপার্জিত লাভ বা আয়—শহরের জমির খাজনা—শহরের জমির খাজনা নির্ধারণ প্রসঙ্গে অনুপার্জিত লাভের কথা মনে আসে।

গ্রামের কৃষিভূমির মত শহরের জমির খাজনাও চাহিদা এবং সরবরাহ অনুযায়ী স্থির হয়।

বিগত একশত বৎসরে প্রত্যেক দেশেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহর ও নগরে অধিকসংখ্যায় লোক বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একশত বৎসর পূর্বে বর্তমান জমিদারের পূর্বপুরুষগণ হয়ত শহরে মাত্র দুই হাজার টাকায় একশত বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ জমির বাৎসরিক খাজনা ছিল মাত্র বার টাকা।

শহরের উন্নতির ফলে এই একশত বিঘা জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইয়া তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়া দুই হাজার টাকা হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

সমগ্র দেশের উন্নতির জন্য ও লোকসংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই এই মূল্য এবং খাজনা বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। এই বৃদ্ধির জন্য জমিদারকে কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় নাই বলিয়া ইহাকে অনুপার্জিত লাভ বা আয় বলা হইয়া থাকে।

বর্তমান সমাজে একটি গুরুতর নৈতিক প্রশ্ন দেখা দিয়াছে—এই অনুপার্জিত লাভ বা আয় ভোগ করিবার অধিকারী কে?—দেশের জনসাধারণ না জমিদার?

জমির খাজনার উপর জনসংখ্যার প্রভাবের ফল—জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সমাজের প্রয়োজন বাড়িয়া যাওয়ায় জমির উপর চাপ পড়িয়াছে। খাদ্য, খনিজ সম্পদ, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্ত জিনিষেরই এখন প্রয়োজন অধিক এবং ইহা মিটাইবার জন্য গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই বেশী পরিমাণে জমি ব্যবহৃত হইতেছে। ইতিপূর্বেই উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় এখন নিকৃষ্ট জমি ব্যবহৃত হইতেছে। সেইজন্য সেখানে বিভেদন উৎপাদন হইয়া থাকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও জমির বৃদ্ধি সম্ভব নয়—ইহার আয়তন সীমাবদ্ধ। কাজেই জনসংখ্যা বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে জমির আয়তন বর্ধিত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকায় জমির খাজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

মজুরী

মজুরী—শ্রমিক তাহার শ্রমের পরিবর্তে যে টাকা পায় তাহাই তাহার বেতন বা মজুরী।

যে কোন শ্রমমূল্যকে মজুরী বলা হয়। দৈহিক এবং মানসিক পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে শ্রমিককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) **কায়িকশ্রমবিমুখ** এবং (২) **শ্রমিক জনসাধারণ।**

বুদ্ধিজীবী কায়িকশ্রমবিমুখ শ্রমিক	(১) **সমাজের উচ্চশ্রেণী**—ডাক্তার, আইনজীবি, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, জমিদার, মহাজন, শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী। (২) **নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী**—কেরাণী, শিক্ষক ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ কায়িকশ্রমবিমুখ, ইহাদের হাত নরম। ইঁহাদের হাতে কাজ করার অভ্যাস নাই।

শ্রমিক জনসাধারণ কায়িকশ্রমে অভ্যস্ত	(১) **সুদক্ষ শ্রমিক**—ফোরম্যান, মিস্ত্রী, কারখানার কুলি এবং মেসিনম্যান। (২) **সাধারণ দিনমজুর**—মাটিকাটা মজুর, মুটে, ঘরামি ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ কায়িকশ্রমে অভ্যস্ত। ইহাদের হাত শক্ত। হাতের কাজ করিয়া ইহাদের জীবিকা অর্জন করিতে হয়।

বেতন—বেতন এবং মজুরীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শ্রমের মূল্য পাইবার সময়ের দীর্ঘতা অনুসারে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে।

মাসান্তে দেয় পারিশ্রমিককে বেতন বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা অধিক পারিশ্রমিক বা বেতন পাইয়া থাকে। কিন্তু দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে সাধারণ শ্রমিকের প্রাপ্য পারিশ্রমিককে মজুরী বলা হয়।

প্রকৃত মজুরী এবং নামেমাত্র বা আপাতঃ মজুরী—পরিশ্রমের মূল্য বাবদ শ্রমিককে নগদ টাকা দেওয়া হইলে সেই টাকাকে আপাতঃ মজুরী বলা হয়; কিন্তু সেই শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি নানা প্রকার সামগ্রী

ও সেবার অধিকারী হয় তাহাকেই প্রকৃত মজুরী বলা হয়। প্রকৃত মজুরী কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নয়—ইহা মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার সমষ্টি।

টাকার ক্রয়ক্ষমতা এবং বাজার দরের উপর আসল বা প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য যখন কম, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকায় তখন বেশী জিনিষ কিনিতে পারা যায় এবং মূল্য যখন বেশী তখন কম জিনিষ কিনিতে পারা যায়। সেইজন্য মূল্য হ্রাস হইলে আসল মজুরী বেশী হইয়া থাকে এবং মূল্যবৃদ্ধির সময় ইহা কম হইয়া থাকে।

অন্যান্য আনুষঙ্গিক আয়ের সুযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসল মজুরী নির্ণয় করিতে হয়। প্রকৃত মজুরী নির্ণয়ের সময় শ্রমিকের আনুষঙ্গিক ব্যয় (যেমন, ডাক্তারের মোটবগাড়ীর ব্যয়, উকিলের মুহুরীর বেতন ইত্যাদি) নামেমাত্র বা আপাতঃ বেতন হইতে বাদ দিতে হইবে।

প্রকৃত মজুরী নির্ধারণের সময় কাজের স্থায়িত্ব বিচার করিতে হইবে। অনির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য চিত্রতারকাদের আপাতঃ বেতন বেশী হইয়া থাকে। প্রকৃত বেতন এইরূপ বেশী নাও হইতে পারে।

প্রকৃত বেতন নির্ণয়ের সময় শ্রমিকের বিনা ভাড়ায় বাসস্থান বা বিনামূল্যে পরিধেয়ের সংস্থান ইত্যাদি সুবিধাও বিচার করিতে হইবে।

আপাতঃ বেতন সমান হইলেও দুইজনের প্রকৃত বেতন সমান নাও হইতে পারে।

সুতরাং প্রকৃত বেতন বলিতে খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের ভোগের সুযোগসুবিধা বুঝায়।

আদম স্মিথের মতানুসারে বিভিন্ন কার্যে বেতনের তারতম্যের কারণ হইলঃ—

(১) **প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কার্য**—সাধারণতঃ প্রীতিকর কার্যের মজুরী কম। বাসচালকের কার্য অপ্রীতিকর বলিয়া সে শিক্ষক অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিয়া থাকে।

(২) **শিক্ষাগ্রহণপদ্ধতি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়**—যে কার্য্য অর্থব্যয় করিয়া এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা করিতে হয়, সে কার্যের বেতন অবশ্যই বেশী। সুদক্ষ শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী উপার্জন করিয়া থাকে।

(৩) **কার্যের স্থায়িত্ব**—স্থায়ী কার্য অপেক্ষা অস্থায়ী কার্যের মজুরী বেশী। চিত্রতারকাদের মজুরী বেশী, কারণ অনেক সময় তাহারা বেকার থাকে।

(৪) **কার্যে উন্নতির আশা**—কার্যে যদি উন্নতির আশা থাকে অর্থাৎ শীঘ্র পদ বৃদ্ধি বা বেশী উপার্জনের আশা থাকে তাহা হইলে সেই কার্যে মজুরী কম হইবে। অন্যথায় বেশী উপার্জনের সম্ভাবনা না থাকিলে মজুরী বেশী দিতে হইবে।

স্বর্ণকার এবং চিকিৎসকের পারিশ্রমিক সাধারণতঃ বেশী। আইনব্যবসায়ীদের মধ্যে অল্প ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করেন, অধিকাংশই বিফল হন।

আরও কয়েকটি কারণে বেতনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যেমন,—

(১) অন্য আয়ের সম্ভাবনা;

(২) বিনাব্যয়ে বাসস্থান, পরিধেয় ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সুবিধা;

(৩) বর্ণ-বৈষম্য;

(৪) অন্যান্য সুবিধা। যেমন, সম্মানজনক কাজ বলিয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে শিক্ষক বা ধর্মযাজকের জীবন গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে একই কার্যে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক ভিন্ন ভিন্ন বেতন পাইয়া থাকে। সাধারণতঃ সুদক্ষ ইমারতী মিস্ত্রি বা অভিজ্ঞ চিকিৎসক সাধারণ মিস্ত্রি বা চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জন করিয়া থাকেন।

কি ভাবে মজুরী নির্ধারিত হয়—"যেসব জিনিষ বাজারে কেনা-বেচা হয় এবং যাহাদের সরবরাহ বাড়ান বা কমান যায় সেই সব জিনিষের মত শ্রমেরও বাজার দর রহিয়াছে।"

চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ মূল্য নির্ধারণের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী বেতন স্থির করা হয়।

বেতন নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

(১) শ্রমের সরবরাহ বা শ্রমিকসংখ্যা এবং

(২) শ্রমের চাহিদা বা শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা।

চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইলে বেতন কম হইবে। পক্ষান্তরে শ্রমিকসংখ্যা যদি চাহিদা অনুযায়ী কম হয় তাহা হইলে শ্রমিকের বেতন বেশী হইবে।

আধুনিককালে মজুরী নির্ধারণ সূত্র—বেতন নির্ধারণে চাহিদা এবং সরবরাহের বিশ্লেষণ—শ্রমিকের চাহিদা তাহার উৎপাদনক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

শ্রমিকের পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী মালিক তাহাকে বেতন দিয়া থাকে। মালিক সর্বদাই বেশী লাভের আশায় যথাসম্ভব কম বেতন দিতে চেষ্টা করেন। ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই আজ শ্রমিকসমাজে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। মালিক শ্রমিককে নানাভাবে শোষণ করিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রমিকও মজুরী বাড়াইবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে।

জীবনযাত্রার মান অবনতির সঙ্গে পারিশ্রমিক কমিয়া যায়। এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের মত মজুরী দেওয়া হয়—ইহাতে কোন রকমে প্রাণটুকু রক্ষা করা যায়।

প্রগতিশীল দেশসমূহে শ্রমিকগণ এখন সঙ্ঘবদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের সর্বনিম্ন পারিশ্রমিক স্থির করিয়া দিয়াছে। ইহার কমে কোন শ্রমিকই কাজ করিতে রাজী নয়। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে।

দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক শ্রমিককে জীবনধারণ উপযোগী সর্বনিম্ন বেতন দেওয়া হয়। সে সর্বদাই ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

মজুরী চুক্তি—মালিক এবং শ্রমিকদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফলে মজুরীর চুক্তি হইয়া থাকে। উভয় পক্ষের শক্তি ও পরিমাপ অনুসারে এই চুক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তির দুইটি দিক রহিয়াছে—(১) চাহিদার দিকে শ্রমিকের দাবীর পিছনে ধনোৎপাদনে শ্রমিকের স্থান এবং (২) সরবরাহের দিকে শ্রমিকের সংখ্যা ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান।

শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মানের উপর ভিত্তি করিয়া মজুরী নির্ধারিত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রমিক-সমস্যা

মালিক এবং শ্রমিকের সংঘশক্তি অনুযায়ী মজুরী চুক্তি হয়।

মালিকগণ ধনী, শিক্ষিত এবং সংঘবদ্ধ একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়। শ্রমিকগণ ইহাদের তুলনায় সাধারণতঃ দরিদ্র, মূর্খ এবং বিচ্ছিন্ন—ইহাদের মধ্যে একতা নাই।

শক্তিমান সর্বদাই দুর্বলকে পরাভূত করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও শ্রমিক শক্তিহীন বলিয়া অল্প পারিশ্রমিক পায় এবং কার্যে অন্যান্য নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। কম মজুরী দেওয়ার ফলে বর্তমানে সর্বত্রই এক দারুণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্রই "শ্রমিক-সমস্যা" এক গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। অনেকে মানবকল্যাণ সাধনের প্রেরণায় এই সমস্যা দূরীকরণে ব্রতী হইয়াছেন।

সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ বলিয়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; যেমন, কার্য-সময় নির্ধারণ, সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের সহিত মালিকগণও শ্রমিক-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু নিজে না দাঁড়াইতে শিখিলে অপরে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি অপেক্ষা বড় শক্তি আর নাই, শ্রমিকগণ এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা, নিজেদের উন্নতিবিধানের জন্য একতাবদ্ধ হইয়া একটি সংঘ গঠন করিয়াছে। এই সংগঠনকেই ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন—শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং উন্নতিবিধানের জন্য গঠিত সংঘকে ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়।

প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নেরই একজন কর্মঠ এবং সুদক্ষ সম্পাদক রহিয়াছেন। তিনিই সমগ্র প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র।

ট্রেড ইউনিয়ন মালিকশ্রেণীর অত্যাচার হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আত্মমর্যাদা দান করিয়াছে—তাহাদিগকে আত্মসচেতন করিয়াছে।

ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য—ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হইল—

(১) সমবেত শক্তির দ্বারা মালিকদের নিকট হইতে শ্রমিকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। শ্রমিকদের বেতনমান স্থির করা। বেতন কম হইলে তাহা বাড়াইবার চেষ্টা করা।

(২) কার্যের সুখসুবিধা আদায় করা (বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধা)।

(৩) কোন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মারফৎ সমবেতভাবে জিনিষপত্র ক্রয় করা।

ট্রেড ইউনিয়নের কার্যাবলী এবং কার্যনীতি—ট্রেড ইউনিয়নের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) **মৈত্রীভাবাপন্ন কার্যাবলী**—ট্রেড ইউনিয়নসমূহ বৃদ্ধ শ্রমিকদের জন্য পেনসন, অসুস্থ হইলে অর্থসাহায্য এবং দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার ক্ষতি-পূরণ মালিকদের নিকট হইতে আদায় করিতে চেষ্টা করে। ইহা শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে এবং তাহাদের জন্য নানা-রকম আমেদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে।

(২) **বৈরীভাবাপন্ন কার্যাবলী**—শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত মজুরী আদায় করিবার উদ্দেশ্যে অথবা শ্রমিকদের নানাপ্রকার অভাব অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন প্রথমে মালিকদের সহিত আপোষ আলোচনার দ্বারা একটি মীমাংসার চেষ্টা করে। মীমাংসার চেষ্টা বিফল হইলে শেষ অস্ত্র হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মালিকদের অন্যায় কার্যাবলী রোধ করিবার একমাত্র অস্ত্র হইল ধর্মঘট। ধর্মঘট ন্যায়সংগত এবং সুপরিচালিত হইলে মালিকগণ শ্রমিকদের দাবী মিটাইতে বাধ্য হন, জনসাধারণও ন্যায়সংগত ধর্মঘট সমর্থন করিয়া থাকে।

(৩) **রাজনৈতিক কার্যকলাপ**—দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া একটি সক্রিয় রাজনৈতিক দল গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের বিশ্বাস একমাত্র শ্রমিক বা সমাজতন্ত্রী সরকারই তাহাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে সক্ষম হইবে।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং মজুরী—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে জীবনযাত্রার মানের উপর শ্রমিকের সরবরাহ মূল্যে নির্ভর করিতেছে। ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান কার্য হইল জীবনযাত্রার মান স্থির এবং তাহা উন্নত করা।

ভারতবর্ষে শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ নয় বলিয়া মালিকগণ অল্প বেতন দিয়া বেশী লাভ করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ট্রেড ইউনিয়নের একটি সর্বনিম্ন

বেতন মান স্থির করিতে হইবে—যাহার কমে কোন শ্রমিকই কাজ করিতে রাজী হইবে না, ফলে শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা বেতন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

আধুনিক উন্নত এবং শিল্পপ্রধান দেশ সমূহে শ্রমিকের পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হইতে তাহার বেতন বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত বা লাভ থাকে তাহা মালিকগণ নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকেন। বহুদিন সংগ্রাম করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য এই উদ্বৃত্ত বা লাভ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে। শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহ সমবেত চেষ্টায় লাভ অনুযায়ী শ্রমিকদিগকে উপযুক্ত মজুরী দিয়া সর্বনিম্ন লাভ গ্রহণ করিতে মালিকগণকে বাধ্য করিয়া থাকে।

অদূর ভবিষ্যতে **শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রমিক যত সুদক্ষ হইবে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইবে, ফলে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হইবে,** ইতিমধ্যেই উন্নত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকদিগের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা—মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ বন্ধ করিয়া শিল্প-ক্ষেত্রে শান্তি বজায় র‍াখিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। যেমন, লাভ বন্টন, শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্পনা, শ্রমআইন এবং সমবায়।

শ্রমআইন—বর্তমান যুগে জনমতের চাপে শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য সকল দেশেই সরকার চেষ্টা করিতেছেন।

জনসাধারণের সমর্থন লাভের আশায় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা প্রচার করিয়া থাকে।

জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিবার জন্য জনমতের চাপে রাষ্ট্র নিম্নলিখিত কয়েকটি অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন—অতিরিক্ত খাটুনী, শিশু শ্রমিক নিয়োগ, রাত্রে কাজ, মাটির নীচে নারী শ্রমিক নিয়োগ, বিপজ্জনক অবস্থায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার, গর্ভবতী নারী শ্রমিকের কাজ, দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ না-দেওয়া, বৃদ্ধ বয়সে শ্রমিককে অর্থ সাহায্য না-করা ইত্যাদি।

সমবায়—প্রাচীন নীতি অনুসারে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় কয়েকজন পুঁজিপতি একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন,—যেমন টাটা, ফোর্ড।

বর্তমানে সমবায় উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সূচনা করিতেছে।

শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলিতে জীবিকা অর্জনের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে শ্রমিকদের নিজ কর্তৃত্বাধীনে, নিজ পরিচালনায় উৎপাদন ব্যবস্থা বুঝায়।

শ্রমিকেরা নিজ নিজ সঞ্চিত পুঁজি সংগ্রহ করিয়া যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া নিজেরাই উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকে। এই উৎপাদনের সমস্ত দায়িত্ব এবং ঝুঁকি তাহাদেরই এবং নিজ নিজ অংশ মত তাহারাই উৎপাদনের লাভ বা ক্ষতির অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ উৎপাদনের নাম সমবায় উৎপাদনব্যবস্থা। উৎপন্ন দ্রব্য সমবায়-প্রথা অনুসারে বিতরিত এবং ব্যবহৃত হইতে পারে। ক্রেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রয়োজনমত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রেতার নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে ক্রয় করিয়া ফড়িয়াকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই লাভবান হইতে পারে।

সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা করিতে হইলে প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বাড়ীভাড়া দিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইবে ও একজন বেতনভোগী কর্মসচিব নিযুক্ত করিতে হইবে। ব্যবসায়ের লাভ প্রত্যেক সভ্যের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিতে দিতে হইবে।

সমবায় প্রথার সুবিধাঃ—(১) ইহা মালিক-শ্রমিক বিরোধের অবসান ঘটায়, (২) শ্রমিকের কার্যশক্তি বর্ধিত করে, (৩) মিতব্যয়ী হইতে সহায়তা করে, (৪) পরিচালনাক্ষেত্রে অনাবশ্যক শ্রম কমাইয়া দেয়, (৫) ইহার নৈতিক এবং শিক্ষনীয় প্রভাব খুব বেশী।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সুদ

সুদ কাহাকে বলে—সুদ বলিতে মূলধনের ব্যবহারের মূল্য বুঝায়। মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া তাহা উৎপাদনকার্যে লাভের আশায় খাটানর পর সেই মূলধনের সঙ্গে অতিরিক্ত যে টাকা উহার ব্যবহার মূল্য বাবদ মহাজনকে দেওয়া হয় সেই অতিরিক্ত টাকাকে অর্থশাস্ত্রে সুদ বলা হয়। সঞ্চিত অর্থ যাহারা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া উৎপাদনকার্যে ধার দেয় তাহারাই এই সুদ ভোগ করিয়া থাকে।

সুদ কেন দিতে হয়—সাধারণতঃ উৎপাদনকার্যে আমরা ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকি। সেজন্য বণ্টনের সময় লাভের একাংশ সুদ বাবদ দিয়া থাকি।

সমাজের দুঃস্থ এবং দরিদ্র লোকেরাই আহার্য, পরিধেয় প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ঋণ করিত বলিয়া পূর্বতন যুগের অর্থনীতিবিদগণ সুদ গ্রহণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই সমস্ত লোকের আয় ছিল অতি অল্প; কাজেই আসল টাকার উপর আবার সুদ দেওয়া তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

বর্তমান যুগে উৎপাদনকার্যের জন্য প্রায়শঃই ঋণ গ্রহণ করা হয়। শতকরা ৮৲ হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ী তাহা এমনভাবে খাটাইবে যাহাতে সে শতকরা ২০৲ হারে লাভ করিতে পারে।

পুঁজিপতিগণের মতে সুদ গ্রহণ না করা হইলে কাহারও অর্থ সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি হইত না। অর্থ সঞ্চিত না হইলে বর্তমান যুগের ব্যাপক উৎপাদনকার্যে অবিরত অর্থ সরবরাহ করাও সম্ভব হইত না।

মোট সুদ এবং নীট বা আসল সুদ—মোট সুদ এবং নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য এইভাবে দেখান হয় যে মোট সুদে ব্যবসায়ে ঝুঁকি গ্রহণের পারিশ্রমিক ধরা হয়; কিন্তু নীট সুদে উহা ধরা হয় না।

মোট সুদ বলিতে ঋণের টাকার সুদ এবং ঋণপরিশোধের অনিশ্চয়তার দরুণ ঝুঁকি গ্রহণের পারিশ্রমিক দুইই বুঝায়। মোট সুদের দুইটি অংশ—

(১) **ঋণের টাকার সুদ** এবং

(২) **ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার দরুণ ঝুঁকি গ্রহণের পারিশ্রমিক।**

নিছক মূলধন ব্যবহারের জন্য যে সুদ দিতে হয় তাহাকে আসল বা **নীট সুদ** বলা হয়। কিন্তু লেন-দেন ব্যাপারে টাকা ধার দেওয়ার সময় নানা **ঝুঁকি**—(যেমন, সুদ

বা আসল টাকা পরিশোধ না করা, টাকা আদায়ের জন্য মামলামোকদ্দমার ব্যয় ইত্যাদি) থাকায় সাধারণতঃ **মোট সুদের** হার আসল সুদ অপেক্ষা একটু বেশী হইয়া থাকে।

সরকার বা কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসভাজন বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারেন।

ঝুঁকি দুই প্রকার—(ক) ব্যবসাসম্পর্কিত ঝুঁকি এবং (খ) ব্যক্তিগত ঝুঁকি।

কোন কোন ব্যবসায়ে অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা দায়িত্ব অধিক। কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসভাজন। ঝুঁকি যত বেশী হইবে ততই তাহার বীমা খরচা বেশী হইবে; ফলে সুদের হারও বেশী হইবে।

একই দেশে সুদের হারের বিভিন্নতার কারণ—ঝুঁকি গ্রহণ এবং টাকা খাটানর তারতম্য অনুসারে একই দেশে একই সময়ে বিভিন্ন প্রকার সুদের হার প্রচলিত থাকে। ব্যক্তি অপেক্ষা সরকার অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেশরক্ষার জন্যও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় অল্প সুদে ঋণদান করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বন্ধকী কারবারীরা বেশী সুদে টাকা ধার দিয়া থাকে।

কিরূপে সুদের হার নির্ধারিত হয়—সুদ হইল মূলধনের ব্যবহারমূল্য। অন্যান্য জিনিষের মূল্য নিরূপণের মত মূলধনের ব্যবহারমূল্যও ইহার চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অনুসারে স্থির করা হয়।

অর্থাৎ চাহিদা এবং সরবরাহ অনুযায়ী অধমর্ণ মূলধনের ব্যবহারের মূল্য যে হারে সুদ দিতে স্বীকৃত হয় এবং উত্তমর্ণ যে হারে মূলধন ব্যবহার করিতে দেয় সেই হারকেই সুদের হার বলা হয়।

যখন সরবরাহ অনুযায়ী চাহিদা অধিক তখন সুদের হার বেশী। পক্ষান্তরে, সরবরাহের তুলনায় চাহিদা কম হইলে সুদের হার কমিয়া যাইবে।

মূলধনের চাহিদা এবং সরবরাহের বিশ্লেষণ—মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের উপরই সাধারণতঃ মূলধনের চাহিদা নির্ভর করে। আরও পরিষ্কার ভাষায় মূলধনের প্রান্তীয় উৎপাদনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে তাহার চাহিদা। যতদিন ধার-করা টাকায় অধিক উৎপাদন সম্ভব হইবে ততদিন টাকার চাহিদা বেশী থাকিবে।

অতএব টাকার চাহিদা নির্ভর করে—(১) ইহার উৎপাদনক্ষমতা এবং (২) সুদের উপর।

সাধারণতঃ উৎপাদনব্যয় লক্ষ্য করিয়া টাকা সরবরাহ করা হয়। সঞ্চিত অর্থ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া অপরের উৎপাদনকার্যে সরবরাহ করার নাম হইল টাকার সংযত ব্যবহার।

অর্থ সরবরাহ (১) সুদের হার এবং (২) মহাজনের কাছে স্বর্ণ বা সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর জামানত বা সিকিউরিটির উপর নির্ভর করে।

সুদের হার এবং অর্থসঞ্চয়—সুদের হার মানুষকে অর্থসঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। সুদের হার যত বেশী হইবে অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছাও তত বেশী হইবে।

অন্য দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সুদের হার বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি ইহার জন্য ব্যবসায়ীরা উৎপাদনে বেশী টাকা না খাটায় তাহা হইলে অল্প দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। ফলে অধিক অর্থ সঞ্চিত হইবে না।

সমাজতান্ত্রিক নীতি—শ্রমিকের শ্রমের ফলেই পুঁজি উৎপন্ন হয়। অতএব পুঁজি ব্যবহারের ফলে যাবতীয় আয় শ্রমিকের প্রাপ্য। শ্রমিককে শোষণ করিয়াই ধনিক সুদ পায়। খাজনা এবং লাভের মত এই সুদ গ্রহণ প্রথাও রহিত করিতে হইবে।

বিংশ অধ্যায়

লাভ বা মুনাফা

লাভ কাহাকে বলে?—উৎপাদনকার্যে ব্যবসা-সংগঠক যে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহারই পুরস্কার হইল লাভ বা মুনাফা। লাভের বিশেষত্ব হইল এই যে, উৎপাদন-কার্য আরম্ভের পূর্বে ইহা স্থির করা সম্ভব নয়। মোট উৎপন্ন দ্রব্যমূল্য হইতে খাজনা, শ্রমিকের বেতন বা মজুরী এবং মূলধনের সুদ, কাঁচামালের দাম এবং অন্য যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইল ব্যবসা-সংগঠকের লাভ বা আয়।

প্রাচীনকালের ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্‌গণ সুদ এবং লাভের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিতেন না। সুদ এবং লাভ দুইই পুঁজিপতির প্রাপ্য মনে করিয়া তাঁহারা দুইটি বিষয়ের আলোচনা এক সঙ্গে করিয়াছেন।

সে যুগে প্রত্যেক মালিক নিজেই ব্যবসায়ে অর্থ সরবরাহ করিতেন এবং ব্যবসায়ের লাভ উপভোগ করিতেন। এই লাভ বলিতে (১) তাহার সরবরাহ-করা অর্থের সুদ এবং (২) তাহার পারিশ্রমিক দুইই বুঝাইত।

বর্তমানে শ্রমবিভাগের ব্যাপকতার জন্য ধনিকশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবসা-সংগঠকশ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। বর্তমানে ব্যবসা-সংগঠক হইলেন সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-কেন্দ্র। তিনিই পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিবলে শিল্পকে উন্নত করিয়া তোলেন। চুক্তিমত বেতন, খাজনা এবং সুদ দিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই তাঁহার পুরস্কার বা লাভ। ইহা তাঁহার সংগঠন এবং ব্যবসা পরিচালনার কৃতিত্ব এবং ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার। প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিশ্রম এবং মূলধনের মত ব্যবসা-সংগঠকের এই পারিশ্রমিকের কোন নির্দিষ্ট বাজারদর নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একই ব্যবসায়ে লিপ্ত একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশী অর্থ উপার্জন করিতেছে। ইহার কারণ প্রথমজন অন্যজন অপেক্ষা অধিক সুদক্ষ এবং চতুর। ব্যবসা-সংগঠক যত উপযুক্ত হইবে তাহার কার্যপরিচালনক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাইবে। তিনি কৌশলে অতি সহজে পুঁজিপতি, শ্রমিক এবং জমিদারের সহিত আবশ্যকীয় চুক্তি সম্পাদন করিবেন। সকলেই অল্প মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। কৌশলী ব্যক্তি সফলতার সহিত এই কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশী কৌশলী তিনি তত বেশী লাভ করিয়া

থাকেন। সুতরাং ব্যবসা-সংগঠক হইবেন এমন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁহার লোক-চরিত্র এবং বাজার সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা এবং নিবিড় পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহাকে সতর্কতার সহিত সুদক্ষভাবে শ্রমিকদের পরিচালনা করিতে হইবে এবং জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে হইবে।

লাভ কখনই নির্দিষ্ট থাকে না। সব সময়েই ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রতিদিনই উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতিবিধান হইতেছে। চতুর এবং তৎপর ব্যবসা-সংগঠক-মাত্রই এই উন্নত ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব কার্যে পরিণত করিয়া থাকেন। ফলে অধিক উৎপাদনের জন্য বাজারে অল্প মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিয়া তাঁহারা অতি সহজেই সমব্যবসায়ীগণ অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া থাকেন।

বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে লাভ করিবার জন্য ভীষণ পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজ নিজ দ্রব্য বাজারে চালু করিবার জন্য অল্প মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফলে অতি অল্প লাভ হইয়া থাকে।

মোট লাভ এবং প্রকৃত লাভ—মোট লাভ বলিতে (১) জমিদারের জমির খাজনা, (২) মহাজনের টাকার সুদ, (৩) যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, (৪) ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার, (৫) কার্য পরিদর্শনের পারিশ্রমিক, (৬) যুদ্ধের সময় ফাটকা লাভ, (৭) একচেটিয়া ব্যবসায়ের লাভ ইত্যাদি সর্বপ্রকার লাভ বুঝায়। প্রকৃত লাভ বলিতে ঝুঁকি গ্রহণে ব্যবসা-সংগঠকের দায়িত্ব গ্রহণের পুরস্কার। উৎপাদনের অন্য কর্মীদের অংশ কম হইলে লাভ বেশী হয়, খরিদ্দারগণ মূল্য বেশী দিলে লাভ বেশী হয়।

স্বাভাবিক লাভ—তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যবসায়ী যে পরিমাণ লাভ করিয়া থাকে তাহাই হইল স্বাভাবিক লাভ।

স্বাভাবিক লাভ বলিতে (১) কার্যপরিচালনার পুরস্কার, (২) ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার এবং (৩) মূলধনের সুদ বুঝায়।

যদি ভবিষ্যতে ব্যবসা চালাইতে হয় তাহা হইলে আর কিছু না হউক স্বাভাবিক লাভটুকু কোনক্রমে যাহাতে করিতে পারা যায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

লাভের স্বরূপ—(১) লাভ হইল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ। বেতন বা মজুরী, খাজনা, সুদ ইত্যাদি ব্যয়ের অংশ; এইসব ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই হইল লাভ।

(২) লাভ অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। ইহা বেতনও নয়, সুদও নয়। লাভ হইবে কি লোকসান হইবে সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। ১৯৩৯ সালে ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা লাভ হইল। ১৯৪৯ সালে তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য, কিম্বা মূল্য

হ্রাস হওয়ায় বা বেতন, সুদ, খাজনা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় হয়ত তাহার কিছুই লাভ হইল না। অন্য প্রকার আয় কিন্তু এইরূপ অনিশ্চিত নহে। খাজনা, সুদ, বেতন চুক্তিমত একরূপ নির্দিষ্ট থাকে।

(৩) প্রতিযোগিতার ফলে হয় সকল ব্যবসায়ীর লাভ সমান হইল কিম্বা কাহারও লাভ কম হইল। সাধারণতঃ একচেটিয়া ব্যবসায়ে লাভ বেশী হইয়া থাকে।

(৪) ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে। সুদক্ষ, অভিজ্ঞ এবং কৌশলী ব্যবসা-সংগঠক তাঁহার সহকর্মী অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া থাকেন। বেতন বা মজুরী, খাজনা ও সুদ একপ্রকার নির্দিষ্ট থাকে। সেজন্য ইহাদের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না।

(৫) দর উঠা-নামার উপর লাভ নির্ভর করে। দর বৃদ্ধি হইলে লাভ বৃদ্ধি পাইবে। দর হ্রাস পাইলে লাভও হ্রাস পাইবে কিম্বা একেবারেই হইবে না। দর উঠা-নামার জন্য খাজনা, সুদ এবং বেতনের কোন পরিবর্তন হয় না।

একবিংশ অধ্যায়

দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার বা উপভোগ

অভাব এবং তাহা দূরীকরণ—মানুষের অভাব এবং তাহা দূরীকরণের উপায় সংক্রান্ত আলোচনাই হইল "উপভোগের" যথার্থ আলোচনা। এক হিসাবে উপভোগ হইল অর্থনৈতিক জীবনের সূচনা এবং সমাপ্তি। উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারের ইচ্ছা অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক বলিয়া উপভোগকে অর্থনীতির সূচনা বলা হয়। আবার সন্তুষ্টি বা উপভোগই হইল অর্থনীতির চরম লক্ষ্য। কারণ পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া মানুষ আপন অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে।

পুরাকালে অর্থনীতিবিদ্‌গণ অভাবমোচন বা উপভোগের মধ্যে মানবকল্যাণের আদর্শ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

বর্তমান যুগে ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—বর্তমান যুগে আমরা এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিতে সক্ষম। বর্তমান যুগধর্মী মানবতার বশবর্তী হইয়া আমরা সম্পদ এবং মানবকল্যাণের সম্পর্ক আলোচনা করিয়া থাকি।

অভাব মোচন করিয়া সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ সম্পদ উৎপাদন, বিনিময় এবং বিতরণ করিয়া থাকে। এজন্য উপভোগ বিদ্যা বর্তমানকালে অর্থশাস্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

উপভোগের সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষণ—সম্পদ ব্যবহারে অভাব দূর হইয়া মানুষের সন্তুষ্টির নামই উপভোগ।

মানুষ যেমন কোন জড়পদার্থ তৈয়ারী করিতে পারে না, তেমনি সে সম্পূর্ণরূপে জড়পদার্থ উপভোগ করিতেও পারে না, সে কেবল পদার্থের গুণগুলি উপভোগ করিয়া থাকে।

উদাহরণ, কোন ব্যক্তি বৎসরে দুইটি জামা এবং একটি কোট ব্যবহার করে—এই কথা বলিলে ইহা মনে করা ভুল হইবে যে বৎসরের শেষে জামা বা কোটের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এক বৎসর ধরিয়া আমরা ইহাদের উপযোগিতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া থাকি, যতদিন না ইহা ছিন্নবস্ত্রে পরিণত হয়।

উৎপাদন এবং উপভোগ—উৎপাদন এবং উপভোগ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

দ্রব্য সামগ্রী উপভোগের ইচ্ছাই মানুষকে উৎপাদন কার্যে উৎসাহিত করিয়া তোলে, নিজ অভাব দূর করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে পরিশ্রম করিতে হয়। **উপভোগের জন্যই মানুষ উৎপাদন করিয়া থাকে।**

আবার, **ইহাও সত্য যে উৎপাদনের জন্যই মানুষ উপভোগ করিয়া থাকে।** বর্তমান যুগে দ্রব্য উৎপাদনের পূর্বে শ্রমিককে আহার্য দিতে হইবে, বস্ত্র দিতে হইবে, বাসস্থান দিতে হইবে। অর্থাৎ উৎপাদনের পূর্বেই উপভোগের ব্যবস্থা করিতে হয় নতুবা উৎপাদন সম্ভব হয় না।

মানুষের অভাবের স্বরূপ—সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূলে রহিয়াছে মানুষের অভাব মোচনের প্রচেষ্টা, নিজ অভাব মোচন করিবার জন্যই সে উৎপাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের অভাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

সকল দেশে সকল মানুষের অভাব একপ্রকার নহে। নৈসর্গিক, নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে।

আধুনিক যুগের কোন হিন্দুর অভাব তাহার পূর্বপুরুষগণের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার ভারতীয়গণের অভাবের সহিত ইউরোপীয়গণের অভাবের কোন মিল নাই।

প্রাচীন বর্বর মানুষ অপেক্ষা আধুনিক সভ্য মানুষের প্রয়োজন বা অভাব অনেক বেশী। সভ্য মানুষ নানা প্রকার দ্রব্য কামনা করে, তাহারা পোষাক-পরিচ্ছদে অধিকতর বিলাসিতা এবং গৃহে অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চায়।

অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে কার্যক্ষমতা এবং নূতন দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কারের ইচ্ছাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণভাবে মানুষের অভাবের বিচার করিয়া দেখিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্র নির্ধারিত হইয়াছে।

(১) মানুষের অভাবের কোন সীমারেখা টানা যায় না। একটি অভাব দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি নূতন অভাব অনুভব করে। এইভাবে আমাদের নিত্য নূতন অভাবের সম্মুখীন হইতে হয়।

আদমের অভাব ছিল অতি অল্প।

কিন্তু বর্তমান যুগে আদমের সন্তানসন্ততিগণ খাদ্য, পরিধেয়, মনোরম আবাস, মোটরযান, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি কত রকম অভাব বোধ করিতেছে। বস্তুতঃ মানুষের অভাব সীমাহীন। মানুষ যত পায় তত চায়।

(২) কতকগুলি অভাব দূর করিতে পারা যায়। এক সঙ্গে সমস্ত অভাব দূর করিতে না পারিলেও কতকগুলি অভাব সহজেই পূরণ করা যায়।

ভোগের ইচ্ছার নিবৃত্তি না হইলেও কোন একটি বিশেষ অভাব থাকিলে মানুষ সে অভাব মোচন করিতে পারে। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদ আহরণ করিলে সে অভাব দূর হইতে পারে।

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পানীয় জলের বিশেষ প্রয়োজন। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পান করিবার পরই তাহার তৃষ্ণা কিছু প্রশমিত হয়। সেজন্য দ্বিতীয় গেলাস জলের আকাঙ্ক্ষা আর প্রথমবারের মত তীব্র থাকে না। জলপানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তৃষ্ণা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ইহা হইতে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

(৩) অভাবসমূহ পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অভাবটিই প্রথমে অনুভূত হয়। তারপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবনধারণের সুবিধা এবং ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে অন্য অভাবগুলি ক্রমান্বয়ে মানুষের মনে অনুভূত হইতে থাকে।

কিছু অর্থ পাইলে ছাত্র কখনও সিনেমা যাইবার ইচ্ছা করে; কখনও বা বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আহার করিবার ইচ্ছা করে; কখনও বা মনে করে যে পুস্তকক্রয়ই ভাল। সমস্যা হইল এই বিভিন্নমুখী অভাবগুলির মধ্যে কোনটিকে সে প্রথমে দূর করিবে। ইহা হইতে সম-প্রান্তীয় উপযোগিতা সূত্র উদ্ভূত হইয়াছে।

(৪) **অভাবগুলি পরস্পর অনুপূরক**—কতকগুলি অভাব এক সঙ্গে বোধ করা যায়। যেমন, কালি-কলমের অভাব, কাগজ-পেন্সিলের অভাব, মোটরগাড়ী-পেট্রোল। ইহাদের একটি সংগ্রহ করিবার সময় অপরটি সংগ্রহ করিতেই হইবে—নহিলে অভাব মোচন হইবে না।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্র—অন্য সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে কোন লোকের মজুত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে প্রতি দফায় বৃদ্ধির অনুপাতে সামগ্রীর উপযোগিতা হ্রাস পাইবে।"—মার্শাল।

মানুষের যে কোনও অভাব পূরণ করা সম্ভব এই অভিজ্ঞতা হইতে উপরোক্ত সূত্র উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের অভাব বহুপ্রকার। এক সঙ্গে এই সমস্ত অভাব কখনও দূর করা যায় না। পৃথকভাবে এক একটি অভাব দূর করিতে পারা যায়।

উদাহরণঃ—ফুটবল খেলার পর প্রত্যেক খেলোয়াড়ই এক গেলাস পানীয় জলের প্রয়োজন অনুভব করে। প্রথমে এক গেলাস সরবৎ পান করিয়াই তাহার তৃষ্ণা কিছু প্রশমিত হইল।

প্রথম গেলাস সরবৎ পানের উপযোগিতা মনে কর ১০০ ইউনিট।

সে যদি আরও এক গেলাস সরবৎ পান করে তখন আর প্রথমবারের মত আগ্রহ থাকিবে না। কারণ উপযোগিতা কম। উপযোগিতা হ্রাস পাইয়া এখন মনে কর ৭৫ ইউনিট হইল।

তৃতীয় গেলাস সরবৎ পানের সময় তাহার আগ্রহ আরও কম বলিয়া মনে হইল। মনে কর, তৃতীয় গেলাসের উপযোগিতা ৫০ ইউনিট।

চতুর্থ গেলাস সরবৎ গ্রহণের সময় দেখা গেল যে, তাহার আগ্রহ যেন পূর্বাপেক্ষা আরও কম। চতুর্থ গেলাসের উপযোগিতা মনে কর ২৫ ইউনিট।

পঞ্চম গেলাস দেওয়ার সময় খেলোয়াড়ের আর তাহা প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হইল। এবার তাহা হইলে সরবতের কোন উপযোগিতাই অনুভূত হইল না। এইখানে ভোগ পূর্ণ হইল। আরও সরবৎ পান করিতে অনুরোধ করিলে খেলোয়াড়ের উপর অত্যাচার করা হইবে এবং ফলে সে অসুস্থ বোধ করিবে।

উদাহরণটি তালিকাভুক্ত করিলে এইরূপ দেখায়ঃ—

সরবতের গেলাসের সংখ্যা			প্রান্তীয় উপযোগিতা	মোট উপযোগিতা
(ক)	১ গেলাস	প্রথম গেলাসের উপযোগিতা ১০০	১০০	১০০
(খ)	২ গেলাস	দ্বিতীয় গেলাসের উপযোগিতা ১০০+৭৫	৭৫	১৭৫
(গ)	৩ গেলাস	তৃতীয় গেলাসের উপযোগিতা ১০০+৭৫+৫০	৫০	২২৫
(ঘ)	৪ গেলাস	চতুর্থ গেলাসের উপযোগিতা ১০০+৭৫+৫০+২৫	২৫	২৫০

প্রান্তীয় উপযোগিতা এবং মোট উপযোগিতা—জিনিষ ক্রয় করিবার সময় এমন এক সময় আসে যখন ক্রেতা চিন্তা করে যে এই অবস্থায় আরও ক্রয় করা উচিত কিনা, অর্থাৎ এই অবস্থায় সে অর্থ ব্যয় করিবে কি না। এইরূপ সন্দেহ-দোদুল্যমানচিত্তে সে শেষবারের মত যে জিনিষ ক্রয় করে তাহাকে অর্থশাস্ত্রে প্রান্তীয় ক্রয় বলা হয়। এবং এই প্রান্তীয় ক্রয়ের সামগ্রীর শেষ দফা হইতে যে উপযোগিতা সে লাভ করে তাহাকেই প্রান্তীয় উপযোগিতা বলা হয়।

পূর্বোল্লিখিত উদাহরণে,—

(ক) এক গেলাস সরবৎ পানের সময় ঐ গেলাসই হইল প্রান্তীয় ক্রয়।

(খ) দুই গেলাস সরবৎ পানের সময় দ্বিতীয় বারে কেনা সরবৎ হইল প্রান্তীয় ক্রয়।

(গ) তিন গেলাস সরবৎ পানের সময় তৃতীয়বারে কেনা সরবৎ হইল প্রান্তীয় ক্রয়।

প্রথমবার ক্রয়ের প্রান্তীয় উপযোগিতা বাদ—প্রথম গেলাস=১০০
দ্বিতীয়বার ক্রয়ের প্রান্তীয় উপযোগিতা বাদ—দ্বিতীয় গেলাস=৭৫
তৃতীয়বার ক্রয়ের প্রান্তীয় উপযোগিতা বাদ—তৃতীয় গেলাস=৫০

এইভাবে মজুতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের প্রান্তীয় উপযোগিতা হ্রাস পায়।

ক্ষেত্রবিশেষে প্রান্তীয় উপযোগিতা নাও থাকিতে পারে।

টাকার প্রান্তীয় উপযোগিতা—অন্যান্য জিনিষের মত টাকারও উপযোগিতা রহিয়াছে। কেননা টাকার সাহায্যে আমাদের অভাবমোচন সম্ভব হয়। টাকার ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ জিনিষ পাওয়া যাইবে তাহা বিচার করিয়া টাকার উপযোগিতা স্থির করা হয়। পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টাকারও উপযোগিতা হ্রাস পায়। দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা বিত্তশালীর কাছে এক টাকার উপযোগিতা অনেক কম।

মোট উপযোগিতা—কোনও জিনিষের মোট উপযোগিতা বলিতে সেই জিনিষের সমস্ত দফার উপযোগিতা যোগফল বুঝায়।

(ক) এক গেলাস সরবতের মোট উপযোগিতা—১০০
(খ) দুই গেলাস সরবতের মোট উপযোগিতা—১০০+৭৫=১৭৫
(গ) তিন গেলাস সরবতের মোট উপযোগিতা—১০০+৭৫+৫০=২২৫

সম-প্রান্তীয় উপযোগিতা সূত্র—মনে কর কোন মায়ের কাছে পশম আছে যাহা নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বভাবতঃই এই জিনিষ তিনি বিভিন্ন কার্যে এমনভাবে ব্যবহার করিবেন যাহাতে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার পাইবেন বা সন্তোষ লাভ করিবেন।

অন্য কথায়, জিনিষটি এমনভাবে ব্যবহার করা হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি প্রয়োগ বা ব্যবহার হইতে সমপরিমাণ প্রান্তীয় উপযোগিতা লাভ করা যায়। যেমন, শিশুর জন্য মোজা বোনা, বাবার জন্য ও ভাইবোনেদের প্রত্যেকের জন্য সোয়েটার বোনা, মায়ের নিজের জন্যও সোয়েটার প্রয়োজন।

কোন ব্যক্তির দশটি টাকা আছে। তাহার কাপড় এবং জুতা দরকার। দশ টাকা ব্যয় করিয়া সে দুই জোড়া জুতা কিনিতে পারে; কিম্বা ঐ টাকায় দুই জোড়া কাপড় কিনিতে পারে।

যদি সে কেবলমাত্র দুই জোড়া জুতা কেনে তাহা হইলে সে ঐ টাকা ব্যয় করিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার পাইবে না। কারণ তাহার কাপড়ের অভাব এখনও মিটে নাই। অধিকন্তু দ্বিতীয় জোড়া জুতার প্রান্তীয় উপযোগিতা **প্রথম জোড়া জুতার প্রান্তীয় উপযোগিতা** প্রথম জোড়া জুতা অপেক্ষা অনেক কম।

আবার একেবারেই জুতা না কিনিয়া যদি সে কেবল দুই জোড়া কাপড় কেনে তাহা হইলেও সে আশানুরূপ উপকৃত হইবে না। কারণ তাহার জুতার প্রয়োজন এখনও পূরণ হয় নাই। অধিকন্তু দ্বিতীয় জোড়া কাপড়ের প্রান্তীয় উপযোগিতা প্রথম জোড়া অপেক্ষা অনেক কম।

বিজ্ঞ ব্যক্তি এই দশ টাকায় এক জোড়া জুতা এবং এক জোড়া কাপড় কিনিবেন। এইভাবে তাহার জুতা এবং কাপড়ের প্রয়োজন মিটিবে। বিবেচনা করিয়া জিনিষ কেনার জন্য ঐ ব্যক্তি প্রত্যেকটি জিনিষ হইতেও সমপরিমাণ প্রান্তীয় উপযোগিতা উপভোগ করিয়া থাকেন। এইভাবে ঐ ব্যক্তি টাকা ব্যয় করিয়া আশানুযায়ী উপকৃত হইলেন। অনুরূপভাবে যদি কোন সুদক্ষ গৃহিণীর বেশী পশম থাকে, তবে তিনি ঐ পশম হইতে সোয়েটার, মোজা ইত্যাদি নানাপ্রকার শীতবস্ত্র তৈয়ারী করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন রকমের অভাব—প্রয়োজনীয়তা, আকর্ষণীশক্তি এবং স্থায়িত্ব অনুসারে অভাবকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

কতকগুলি অভাব অধিক প্রয়োজনীয়, কতকগুলি বা অধিক আকর্ষণীয়; তেমনি সাময়িকভাবে কতকগুলির প্রয়োজন অনুভূত হয়; কতকগুলি আবার স্থায়ী-ভাবে প্রয়োজন।

উপভোগ করিবার পূর্বে আমাদের—(১) জীবনধারণের অপরিহার্য, (২) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় এবং (৩) বিলাসব্যসনের উপযোগী—এই তিন শ্রেণীর অভাবের মধ্যে পার্থক্য সম্যকরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

১। **অপরিহার্য অভাব**—

(ক) **বাঁচিবার জন্য প্রয়োজন**—জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র প্রভৃতি।

(খ) **কর্মে দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজন**—উৎপাদনকার্যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজন।

(গ) **প্রচলিত বা অভ্যাসগত প্রয়োজন**—এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা না থাকিলেও মানুষের কোন ক্ষতি হইত না; কিন্তু বহু দিনের অভ্যাস বা প্রচলিত প্রথার ফলে তাহা আবশ্যকীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে—যেমন, পান বা তামাক প্রভৃতি। মানুষ অনেক সময় অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ না করিয়া এই সব প্রচলিত বা অভ্যাসগত অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

২। **সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য**—অপরিহার্য দ্রব্য ব্যতীত এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং আনন্দময় করিয়া তুলে। এই সমস্ত জিনিষকে সুখ বা আরামের সামগ্রী বলা হয়।

সাধারণতঃ আরামের অনুপাতে মূল্য বেশী।

৩। **বিলাসসামগ্রী**—যাহা না হইলে আমাদের কোনই ক্ষতি হইত না অথচ যাহা লাভ করিতে আমাদের প্রচুর ব্যয় হইয়া থাকে, তাহাকেই বিলাসসামগ্রী বলা হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে, বিলাসসামগ্রী একটি আপেক্ষিক শব্দ। প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিরূপণের পর আমরা বিলাসদ্রব্য স্থির করিয়া থাকি। বিলাসদ্রব্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে। কুড়ি বৎসর পূর্বে সকল দেশেই মোটরযানকে বিলাসদ্রব্য মনে করা হইত। এখন অনেকের কাছেই ইহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

ইংরাজ শ্রমিকের প্রত্যহ প্রভাতে এক কাপ চা প্রয়োজন; ভারতীয় শ্রমিকের নিকট ইহা নিছক বিলাস।

বিলাসদ্রব্য—সামাজিক প্রয়োজনীয়তা—সর্ব যুগেই দার্শনিক এবং ঋষি ব্যক্তিগণ বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। বহু দোষযুক্ত হইলেও বিলাস-দ্রব্যের কিছু সামাজিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

(১) সামান্য মাত্রায় বিলাসদ্রব্য উপভোগ কাম্য। ইহা আমাদের জীবনমান উন্নত করে এবং এইভাবে জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে সহায়তা করে।

(২) উৎপাদনকার্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার জন্য বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন আছে। আবিষ্কার এবং শিল্পোন্নতির পথে ইহা মানুষকে উৎসাহিত করে।

(৩) বিলাসদ্রব্য ব্যবহারের ফলে চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং বাণিজ্য-ব্যবস্থা উন্নত হইবে। কাজেই শ্রমিকের পক্ষেও ইহা মঙ্গলজনক।

কিন্তু সর্বপ্রকার বিলাসদ্রব্যই গ্রহণীয় নয়। গ্রহণীয় এবং পরিত্যাজ্য বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

অভাব-বিশ্লেষণ

জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বিলাসসামগ্রীকে নিম্নলিখিতভাবে আরও বিস্তৃত করিয়া বিবৃত করা যায়ঃ—

প্রয়োজনীয় সামগ্রী	জীবনধারণোপযোগী কেবলমাত্র কোনক্রমে বাঁচিবার জন্য	যেমন, উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ইত্যাদি।
সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য	জীবনে সুখের জন্য	যেমন, সুখাদ্য, পরিধেয়, গৃহ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, মনের খোরাক মিটাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি।
বিলাস	ব্যয়বহুল অভ্যাস এবং আমোদপ্রমোদ আরও ব্যাপক জীবনযাপনের ব্যবস্থা	যেমন, মূল্যবান মোটর যান, অলঙ্কার, শিল্প, সাহিত্য ও ভ্রমণব্যাপারে ব্যক্তিগত ব্যয়বহুল অভিরুচি।

উপভোগ সূত্র—এঙ্গেল্‌সের মত—বিশ্ববিখ্যাত জার্মান অর্থনীতিবিদ ডাঃ আর্নেস্ট এঙ্গেল্‌স স্যাক্সনি প্রদেশের শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং ধনিক সমাজের বহু পরিবারের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া উপভোগসূত্র স্থির করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যাহার উপার্জন যত কম জীবনধারণের জন্য ব্যয় তাহার তত বেশী। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদি প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উপার্জনের অধিকাংশই তাহাদিগকে ব্যয় করিতে হয়। দৈনন্দিন সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি

যে, যাহাদের উপার্জন বেশী তাহারা খাদ্য, বস্ত্র অপেক্ষা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সুখসম্ভোগে বেশী ব্যয় করিয়া থাকে।

শ্রমিককে তাহার মজুরী ৫০৲ টাকার মধ্যে ৪৫৲ টাকাই খাদ্য, বস্ত্রের জন্য ব্যয় করিতে হয়। কেরাণীর মাসিক মাহিনা ৮০৲ টাকার মধ্যে ৭০৲ টাকাই খাদ্য ও বস্ত্র বাবদ ব্যয়িত হয়। ইঞ্জিনীয়ার ৪০০৲ টাকা বেতন পান, তিনি ৩০০৲ টাকা খাদ্য ও বস্ত্রে এবং বাকী ১০০৲ টাকা সন্তানবর্গের শিক্ষা, আনন্দ এবং স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করেন। কোন ব্যবসায়ী মাসে হয়ত ৩০০০৲ টাকা উপার্জন করেন। খাদ্য এবং বস্ত্রের জন্য তাঁহার ব্যয় হইল ১০০০৲ টাকা। বাকী ২০০০৲ টাকা তিনি সন্তানবর্গের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন ও উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করেন।

ভোগোদ্বৃত্ত—কোন জিনিষ ক্রয়ের পর যদি ক্রয়মূল্য অপেক্ষা ঐ জিনিষ প্রাপ্তিতে বেশী লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে ঐ ক্রয় হইতে আনন্দকে ভোগোদ্বৃত্ত বলা হয়।

উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা উপযোগিতা বেশী হইলে এইরূপ উদ্বৃত্ত ভোগ করা যায়।

দৃষ্টান্তঃ—সুদূরপ্রবাসী পিতাকে সপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি লিখিবার জন্য তুমি মাত্র তিন পয়সা ব্যয় করিয়া একটি পোস্টকার্ড কিনিয়া থাক। পোস্টকার্ডের উপকারিতা তিন পয়সার চেয়ে অনেক বেশী—হয়ত তাহা প্রয়োজন হইলে চার আনা মূল্যের মত।

তুমি চার আনা ব্যয় করিতেও ইচ্ছুক, কিন্তু কার্যতঃ তিন পয়সা দামের একখানি পোস্টকার্ডের সাহায্যে তোমার কার্য সমাধা হইল। এক্ষেত্রে তোমার উদ্বৃত্ত হইল (চারি আনা—বাদ—তিন পয়সা) বা তিন আনা এক পয়সা।

ভোগোদ্বৃত্ত—কি করিয়া ইহা স্থির হয়—দ্রব্যের উপযোগিতামূল্য হইতে উৎপাদনব্যয় বাদ দিয়া ভোগোদ্বৃত্ত স্থির করা হয়।

মোট উপযোগিতা—বাদ—**মোট উৎপাদন ব্যয়=ভোগোদ্বৃত্ত।**

উল্লিখিত উদাহরণে ভোগোদ্বৃত্ত হইল—

চারি আনা—বাদ—**তিন পয়সা=তের পয়সা।**

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সঞ্চয় এবং ব্যয়

সঞ্চয় এবং ব্যয় কাহাকে বলে—আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন। ইহা হইল উৎপাদন এবং উপভোগের যোগসূত্র।

উৎপাদন হইতে মানুষ যাহা লাভ করিয়া থাকে তাহাই তাহার উপার্জন। আবার উপার্জনেরই এক অংশ সে ব্যয় করিয়া থাকে। সঞ্চয় এবং ব্যয় হইল উপার্জনের দুইটি বিপরীত ধারা।

উপার্জিত অর্থ পুনরায় উৎপাদনকার্যে খাটান যাইতে পারে কিম্বা অভাব মোচনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইহা ব্যয় করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অর্থ সঞ্চয় এবং উৎপাদনে তাহার পুনর্নিয়োগ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইহা কেবলমাত্র অর্থ ব্যবহার বা ব্যয় বা সম্ভোগ বুঝায়।

সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা হয় তখন তাহা মূলধনে পরিণত হয়। সঞ্চয়কারী ব্যক্তি নিজেই সব সময় তাহার অর্থ এইভাবে মূলধনে পরিণত থাকেন এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখেন সেই ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হারে তাঁহাকে কিছু সুদ দিয়া তাঁহার সেই গচ্ছিত টাকা উৎপাদন কার্যে খাটাইতে পারে।

জনসাধারণ অর্থ সঞ্চয় করিবে না অর্থ ব্যয় করিবে?—মানুষ অর্থ বেশী ব্যয় করিবে না সমাজের কল্যাণের জন্য তাহা সঞ্চয় করিবে? এই লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। একদল বলেন, সমস্ত অর্থ ব্যয় করাই হইল সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক। কারণ বেশী ব্যয় করিলে বেচা-কেনা বেশী হইবে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এবং সকলেই সুখ সম্পদ ভোগ করিবে। অপর দল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের একমাত্র উপায় হইল অর্থসঞ্চয় করা। তাঁহারা বলেন, অর্থ ব্যয় মানেই তাহা নষ্ট করা। অর্থ সঞ্চয় করিলেই প্রকৃত উপকার হইবে। বর্তমানে কিছু সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতে তাহা আমাদেরই উপকারে লাগিবে এবং এইভাবে ধীরে ধীরে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে, এই উভয় মতই ভ্রান্ত। প্রথম দল ভুলিয়া গিয়াছেন যে সমস্ত উপার্জনই ব্যয় করা হইলে ভবিষ্যতে উৎপাদনের জন্য কিছুই সঞ্চিত থাকিবে না। ফলে সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থা অচিরেই অচল হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় দলও ঠিক একই ভুল করিয়াছেন। যদি সকলেই উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে তবে তাহার ফল কি হইবে? সমস্ত উপার্জনই উৎপাদনে ব্যয় করার জন্য বা জীবনধারণের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যে অভাব মোচন করিবার জন্য মানুষ অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করিয়া থাকে, এই সঞ্চয়নীতির ফলে সেই অভাবই দূর হইল না। ভবিষ্যতে উৎপাদনব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্যই বর্তমানে অর্থ ব্যবহার করা প্রয়োজন। অর্থ ব্যবহার অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে তাহা ব্যয় করা না হইলে সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থা একদিন বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতের মধ্যবর্তী পথে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে। অর্থ ব্যয় করা ভাল এবং ইহা প্রয়োজনীয়। কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করাও কর্তব্য। অনুরূপভাবে অর্থসঞ্চয়ও কাম্য এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করাও প্রয়োজন। পেনসন্ সত্যই বলিয়াছেন, "উৎপাদন এবং উপভোগ, প্রচেষ্টা এবং সন্তোষলাভের মধ্যে সাম্য থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞ ব্যক্তি শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি যথাসম্ভব প্রয়োজন মিটাইয়া সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মিতব্যয়িতার সহিত তাঁহার উপার্জন ব্যয়—অর্থাৎ প্রয়োজন-মত অর্থ সঞ্চয় এবং ব্যবহার করিয়া থাকেন"। সামাজিক উন্নতির পক্ষে ইহাই হইল সর্বোত্তম পন্থা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয়

কর

রাষ্ট্রীয় আয়ের অধিকাংশই কর আদায় করিয়া সংগৃহীত হয়।

আপন কার্য নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিকট হইতে যে অর্থ আদায় করিয়া থাকেন তাহাকে কর বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—(১) আইনতঃ প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই কর দিতে হইবে এবং (২) এই কর গ্রহণের পরিবর্তে রাষ্ট্র কোন স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে না—সাধারণভাবে সমগ্র রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্বাহের জন্যই সরকার কর আদায় করিয়া থাকেন। মামলামোকদ্দমার সময় বিচারকের পারিশ্রমিকরূপে আমরা কোর্ট ফি দিয়া থাকি। এখানে আমাদের নিজস্ব কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিচারকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের শাসন-ব্যবস্থার সুখসুবিধা উপভোগ করিবার জন্য আমরা সরকারকে কর দিয়া থাকি।

প্রধান প্রধান কর হইলঃ—

(১) বাণিজ্য শুল্ক

এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্যসামগ্রী আমদানী বা রপ্তানী করিবার সময় তাহাদের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। আমদানী দ্রব্যের উপর ধার্য শুল্ককে আমদানী-শুল্ক এবং রপ্তানী দ্রব্যের উপর ধার্য-শুল্ককে রপ্তানীশুল্ক বলা হয়।

শুল্ক দুই প্রকারঃ—(১) **সংরক্ষণার্থক**—দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যসামগ্রীর উপর ধার্য শুল্ক; এবং (২) **রাজস্ব-বর্ধক**—সরকারী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধার্য শুল্ক।

(২) আবগারী

দেশজাত মদ্য, গাঁজা, আফিং, তামাক ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্যের উপর আবগারী কর ধার্য করা হয়।

(৩) আয়কর

নাগরিকের উপার্জিত অর্থের উপর ধার্য করকে আয়কর বলা হয়।

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অধিক উপার্জন করিলে এই কর প্রদান করিতে হয়। উপার্জন যত অধিক হইবে, করের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।

কর-নির্ধারণনীতিগুলির প্রত্যেকটি আয়কর নির্ধারণের সময় প্রযোজ্য হয় বলিয়া প্রত্যেক উন্নত দেশে করব্যবস্থায় আয়কর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

(৪) ভূমি-রাজস্ব

পূর্বে ভূমি-রাজস্বই ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। বর্তমানে শুল্ক ও আয়করের চাপে ইহার প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে।

(৫) বিক্রয় কর

করের বোঝা—আসল আর্থিক চাপ। বর্তমান যুগে সকল দেশেই জিনিষের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করা হয়—বিক্রয়কর হইতে ক্রমবর্ধমান রাজস্ব আয় হইতেছে। যাহার নিকট হইতে সরকার কর আদায় করে, তাহার উপর যে ভার পড়ে তাহাকে করের প্রাথমিক আর্থিক ভার (Impact of Taxation) বলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত যাহাকে আসল করভার বহন করিতে হয়, অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে করদাতা কর আদায় করিয়া থাকেন, তাহার উপর যে ভার পড়ে তাহাকে করের আসল আর্থিক **চাপ** বা বোঝা (Incidence of Taxation) বলা হয়। সিনেমাগৃহের মালিকের উপর সরকার প্রমোদকর ধার্য করিয়া থাকেন। মালিকের উপর করের প্রথম আর্থিক চাপ পড়িয়া থাকে। কিন্তু তিনি ইহা সাধারণ দর্শকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন। করের আসল আর্থিক চাপ কার্যতঃ দর্শকদের উপর পড়িল।

'প্রত্যক্ষ কর—নাগরিকের উপর প্রত্যক্ষভাবে যে কর ধার্য করা হয় এবং যাহা সে সরাসরি প্রদান করিয়া থাকে সেই করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়; যেমন—আয়কর।

সুবিধা—

(১) প্রত্যক্ষ কর এমনভাবে ধার্য করা যাইতে পারে যাহাতে যাহার অধিক ক্ষমতা সে অধিক কর দিবে এবং যাহার ক্ষমতা কম সে অল্প কর দিবে। এইভাবে ধনীদের নিকট হইতে বেশী পরিমাণে কর আদায় করা যাইতে পারে এবং দরিদ্র জনগণকে করভার হইতে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে।

(২) এইরূপ কর আদায়ের ব্যয় অতি অল্প।

(৩) এইরূপ কর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। করদাতা জানেন তাঁহাকে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে এবং কখন ও কি ভাবে দিতে হইবে। রাষ্ট্রও এই কর হইতে আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারে।

(৪) এই কর প্রসারণশীল। প্রয়োজনবোধে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(৫) সরাসরি নিজেকে কর দান করিতে হয় বলিয়া নাগরিক আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকেন, আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই সক্রিয় ও সজাগ থাকিতে হইবে।

অসুবিধা—

(১) এককালীন করদান করিতে হয় বলিয়া নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহার জন্য করদাতা ও করগ্রহীতা উভয়কেই একটি দীর্ঘ এবং নির্ভুল হিসাব রক্ষা করিতে হয়।

(২) আয়ের পরিমাণ বিচার করিয়া প্রত্যেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকর ধার্য করিতে হয়। কিন্তু এই বিচারের জন্য কোন নির্ভুল মাপকাঠি নাই। অসাধু ব্যক্তিরা কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ মিথ্যা হিসাবপত্র দাখিল করিয়া থাকে।

(৩) প্রজার নিকট হইতে সরাসরি এই কর আদায় করা হয় বলিয়া সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। করভার অধিক হইলে জনগণ সরকারের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবে।

পরোক্ষ কর—যে কর একজনের উপর ধার্য হয় এবং সে উহা অপরের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে, সেই করকে পরোক্ষ কর বলা হয়। একশ্রেণীর উপর এই কর ধার্য করা হয় এবং অপর একশ্রেণীকে ইহা শেষ পর্যন্ত দিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীকেই প্রকৃতপক্ষে এই করভার বহন করিতে হয়। যেমন—লবণকর, প্রমোদকর। সরকার সিনেমাগৃহের মালিকের উপর প্রমোদকর ধার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু মালিক উহা সাধারণ দর্শকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে।

সুবিধা—

(১) দরিদ্রশ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর সহজেই ধার্য করা যায়।

(২) এইরূপ করভার প্রজারা সহজে বুঝিতে পারে না বলিয়া সরকার ইহা সহজেই আদায় করিয়া থাকেন।

(৩) দ্রব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর ধার্যের ফলে অর্থব্যয়ের সময় মানুষ ইহার চাপ তেমন উপলব্ধি করিতে পারে না।

(৪) সমাজের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্যের উপর পরোক্ষভাবে কর ধার্য করিয়া ইহাদের ব্যবহার হ্রাস করা যাইতে পারে।

অসুবিধা—

(১) পরোক্ষভাবে সকলের উপর সমভাবে কর ধার্য করা সম্ভব নহে। সাধারণতঃ দরিদ্র জনসাধারণকেই এই করভার অধিক পরিমাণে বহন করিতে হয়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের অসাম্য এইভাবে আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(২) সাধারণতঃ অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর ধার্য করার ফলে জাতি ও সমাজের স্বার্থের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

(৩) পরোক্ষ কর হইতে আয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই।

(৪) এইরূপ কর আদায়ের জন্য অধিক ব্যয় করিতে হয়।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের সুবিধা এবং অসুবিধা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যক্ষ কর অধিকতর সম্প্রসারণশীল এবং কল্যাণপ্রদ।

কিভাবে কর ধার্য করা উচিত—সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে করনির্ধারণনীতি অনুসারেই কর নির্ধারিত হওয়া উচিত।

যাহারা কর প্রদান করিয়া থাকে সাধারণতঃ তাহারা কর-প্রদানের ফলভোগ করিতে পায় না। ধনী ব্যক্তিরাই অধিক পরিমাণে কর দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে দরিদ্র জনসাধারণ। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখিতে হইবে যে যাহারা সরকারীব্যবস্থায় উপকৃত হইয়া থাকে তাহাদের কর দিবার সামর্থ্য নাই। এইজন্য সরকারের পক্ষে কর-নির্ধারণ করা একটি অতীব কঠিন কার্য।

করনির্ধারণনীতি—আদম স্মিথের মতানুসারে চারিটি প্রধান করনির্ধারণনীতি হইলঃ—

(১) সামর্থ্য—রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সরকারকে কর দেওয়া উচিত। এই নীতি অনুসারে আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ধনী ব্যক্তিদিগকে অধিক কর প্রদান করিতে হয়।

প্রত্যেক সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে সামর্থ্যনীতি অনুসারে কর নির্ধারণ করা হয়। সময় সময় ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। লোভের বশবর্তী এবং স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ধনীরা দরিদ্র জনগণের উপর অধিক করভার চাপাইয়া থাকে।

(২) নিশ্চয়তা—কি পরিমাণ কর দিতে হইবে এবং তাহা কখন ও কিভাবে দিতে হইবে তাহা সম্যকরূপে জানা প্রয়োজন। কেন কর দিতে হইতেছে তাহা কর-দাতার নিজ স্বার্থে জানা উচিত।

(৩) সুবিধা—করদাতাদের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এমনভাবে কর-নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

নাগরিকদের সহিত আলোচনা করিয়া সরকার করগ্রহণের সময় ও প্রণালী স্থির করিবেন।

(৪) **মিতব্যয়িতা বা ব্যয়সংক্ষেপ**—কেবলমাত্র কর আদায়ের ব্যয় হ্রাস করিলেই চলিবে না; এমনভাবে ইহা স্থির করিতে হইবে যাহাতে ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের লাভ অপেক্ষা সমাজের ক্ষতি বেশী না হয়। সম্পদ উৎপাদন ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করিলে সংগে সংগে উহা পরিহার করা উচিত।

এই সংগে আরও কয়েকটি করনির্ধারণনীতি মনে রাখা প্রয়োজন। যথাঃ—

(৫) **প্রাচুর্য**—এমনভাবে কর নির্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনমত পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

(৬) **পরিবর্তনশীলতা**—প্রতি বৎসরই সরকারী ব্যয়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অতএব এমনভাবে কর ধার্য করা উচিত যাহাতে বর্ধিত সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনবোধে করের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই প্রসংগে আয়করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুরাতন করকে সাধারণতঃ উত্তম কর (an old tax is no tax) বলা হয়। কোন নূতন কর ধার্য করিলেই করদাতার প্রথম প্রথম নানা অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার জন্য তাহারা বিরক্ত হয়। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া কর দিবার ফলে তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে—তখন আর অসুবিধা তেমন বোধ করে না। সেইজন্য পুরাতন করকে উত্তম কর বলা হয়।

কর ধার্য করিলে কাহারও উপর বেশী চাপ এবং কাহারও উপর অল্প চাপ পড়িয়া থাকে। সেজন্য এমনভাবে ইহা ধার্য করিতে হইবে যাহাতে মোটামুটিভাবে সমাজের সকলের কল্যাণ সাধিত হয়।

কর-সাম্য এবং কিভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত করা যায়—ক্রমবর্ধমান করনির্ধারণ-নীতি—ব্যক্তির দিক হইতে যাহা ন্যায় ও কল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে হয় সমাজের দিক হইতে হয়ত তাহা সেরূপ নাও মনে হইতে পারে। সাধারণ ব্যক্তি মনে করে যে অনুপাতে সে উপকার পাইয়া থাকে ঠিক সেই অনুপাতে কর ধার্য হওয়া উচিত। উপকারের মাত্রা বৃদ্ধির সংগে সংগে করের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। ধনী ব্যক্তিরা বেশী কর দিয়া থাকে, কিন্তু বেশী উপকার পাইয়া থাকে দরিদ্র জনসাধারণ। জনসাধারণ দাবী করিয়া থাকে যে দরিদ্র জনগণের উন্নতি এবং কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যে যাহারা সমর্থ তাহাদের উপর কর ধার্য করা উচিত।

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের মত এইরূপ যে, সামর্থ্যনীতি অনুসারে কর ধার্য করিলে সমাজে কাহারও উপর তেমন চাপ দেওয়া হইবে না। নিজ সামর্থ্যমত প্রত্যেককেই কর দিতে হইবে। যাহাদের কর দিবার ক্ষমতা নাই তাহাদিগকে ইহা হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু কিভাবে সামর্থ্য বা ক্ষমতা বিচার করা হইবে? উপার্জনের পরিমাণ দেখিয়া সামর্থ্য বিচার করিলে ভুল হইবে। বাৎসরিক ৬,০০০ টাকা বেতনভোগী একজন অবিবাহিত এবং ঐ বেতনে একজন বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে অবিবাহিত ব্যক্তির অবস্থা অধিকতর স্বচ্ছল—তাহার সামর্থ্য বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী।

বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা উপার্জনকারী এবং ২,০০০ টাকা উপার্জনকারী দুইজন ব্যক্তির মধ্যে অধিক উপার্জনকারী ব্যক্তি নানাভাবে বেশী ব্যয় করিতে পারেন। তিনি হয়ত বিলাসব্যসনে অর্ধেক টাকা ব্যয় করিলেন। কিন্তু অল্প উপার্জনকারী ব্যক্তিকে আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ জীবনধারণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী-ক্রয়ে এবং মাত্র ১০ ভাগ সুখসুবিধার জন্য ব্যয় করিতে হয়।

সামর্থ্যনীতি অনুসারে যদি প্রত্যেককে সমপরিমাণে কর দিতে হয় তাহা হইলে ধনী ব্যক্তি তাহার বিলাসব্যসন কিছু হ্রাস করিয়া তাহা শোধ করিবে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পউপার্জনকারী ব্যক্তিকে শুধু সুখসুবিধা নয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণও হ্রাস করিতে হইবে। এইভাবে দেখা যাইতেছে করের পরিমাণ এক হইলেও বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্নভাবে তাহা শোধ করিতে হয়। অতএব আনুপাতিক করনির্ধারণনীতি অনুসারে অর্থাৎ সম্পত্তি বা আয়ের অনুপাতে কর নির্ধারণ করিলে করব্যবস্থায় সাম্য স্থাপন করা যায় না।

করব্যবস্থায় সাম্য স্থাপন করিতে হইলে করদাতার উপার্জন এবং অভাব বিচার করিয়া তাহার উপর কর ধার্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার যে পরিমাণ ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার উপর সেই পরিমাণ কর ধার্য করিতে হইবে।

কর বহনের ক্ষমতা অনুসারে করনির্ধারণনীতিকে গতিশীল বা ক্রমবর্ধমান হইতে হইবে। ক্রমবর্ধমান করনির্ধারণপ্রণালী অনুসারে উপার্জন যত বৃদ্ধি পাইবে করবহনের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অনুপাতে করের পরিমাণও বর্ধিত করা হইবে। দৃষ্টান্ত, ২,০০০ টাকা উপার্জনের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে, ৫,০০০ টাকা উপার্জনের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে এবং ১০,০০০ টাকা উপার্জনের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে কর ধার্য করা উচিত।

করের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারী আয় বৃদ্ধি পাইলে উক্ত করকে **ক্রমবর্ধমান-কর** বলা হয়—২,০০০ টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা, ৫,০০০ টাকার উপর শতকরা

১০৲ টাকা এবং ১০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৩০৲ টাকা হারে ধার্য। করের হার হ্রাস পাইলে তাহাকে **ক্রমহ্রাসমান কর** বলা হয়—২,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৫৲ টাকা, ৫,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৩৲ টাকা এবং ১০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে ধার্য কর। এবং যখন হার এক থাকে তখন তাহাকে **আনুপাতিক কর** বলা হয়। সকল রকম উপার্জনের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে কর ধার্য করিলে তাহাকে আনুপাতিক কর বলা হয়।

জাতীয় ঋণ—বর্তমানে সকল দেশেই সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এই ঋণকে জাতীয় ঋণ বলা হয়। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়—(১) যুদ্ধ এবং অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে; (২) কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন, রেলপথ নির্মাণ এবং সেচকার্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য নির্বাহ এবং (৩) অন্যান্য সাময়িক প্রয়োজন।

জাতীয় ঋণ দুই প্রকার—**(ক) উৎপাদক** এবং **(খ) অনুৎপাদক**। যে সকল বিষয়ে বর্তমানে ঋণ গ্রহণ করা হইলেও পরে তাহা হইতে আয়ের সম্ভাবনা থাকে, সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ বলা হয়; যেমন, রেলপথ নির্মাণ বা সেচকার্যের ব্যবস্থার জন্য ঋণ। কিন্তু অনুৎপাদক কার্যে ঋণ গ্রহণ করা হইলে তাহাকে অনুৎপাদক ঋণ বলা হয় যেমন, যুদ্ধ-ঋণ।

ঋণ পরিশোধের সময়ানুসারে জাতীয় ঋণ—(ক) **অল্পমেয়াদী** বা (খ) **দীর্ঘ মেয়াদী** এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

অল্প মেয়াদী বা ভাসমান ঋণ (Floating Debt) বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বা (Funded Debt)। Floating Debt বলিতে অল্পমেয়াদী ঋণ বা ট্রেজারী বিল—সাময়িক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বা ট্রেজারীকর্তৃপক্ষ ৩ মাস বা ৬ মাসের মেয়াদে এইরূপ বিল বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করেন—বৎসরের মধ্যেই রাজস্ব আদায় হইলে এই ঋণ শোধ করিয়া দেন এবং Funded Debt বলিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বুঝায়। জাতীয় ঋণ—(ক) **বৈদেশিক**—যখন বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করা হয় বা (খ) **আভ্যন্তরীণ**—যখন দেশের মধ্যেই ঋণ গ্রহণ করা হয়—হইতে পারে।

যখন সুদের হার শতকরা ৬৲ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৲ টাকা হয় তখন সরকারের পক্ষে ৬৲ টাকা হারে ঋণ ৩৲ টাকা হারে ঋণে রূপান্তরিত করা সুবিধাজনক। বর্তমানে কোটি কোটি টাকার জাতীয় ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সরকারের পক্ষেই একটি অতি জটিল সমস্যা। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পর এই ঋণ পরিশোধ করিবার উপায়স্বরূপ **যুদ্ধকালীন উপার্জিত অর্থের উপর কর** ধার্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এই কর Capital Levy নামে পরিচিত। পুঁজিবাদীরা ইহার

বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। গ্রেটবৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা কার্যকরী হয় নাই। ইহা গ্রহণ না করা অর্থাৎ মকুব করা ভিন্ন এই বিপুল ঋণভার পরিশোধের অন্য কোন উপায় নাই।

পরিশোধ ভাণ্ডার (The Sinking Fund) সরকারী ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে যে ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় করা হয় তাহাকে পরিশোধ ভাণ্ডার বলা হয়। নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বৎসরে এই ভাণ্ডারে অর্থ জমা রাখা হয়। পরিপূর্ণভাবে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সময় সময় এককালীন কিছু অর্থও এই ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা হয়।

ঋণ পরিশোধ ভাণ্ডার না থাকিলে সরকারকে এককালীন অর্থসংগ্রহ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। সরকারের পক্ষে তাহা সম্ভব নয় বলিয়া ঋণপরিশোধ ভাণ্ডারের প্রয়োজন এবং প্রতি বৎসর ঋণ পরিশোধ বাবদ নির্দিষ্ট অর্থ সেই ভাণ্ডারে দেওয়া হয় যাহাতে ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সরকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন।

ভারতীয় অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

এক্ষণে আমরা আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সবিস্তারে পর্যালোচনা করিব। স্বাধীনতালাভের পর অল্পকালের মধ্যেই আমাদের সম্মুখে নানাপ্রকার জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

কয়েকটি বৃহৎ বন্দর বা দ্রুত উন্নতিশীল শিল্পপ্রধান নগর দেখিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে না। ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে তাহার সাত লক্ষ গ্রামের জীবনে। দেশের শতকরা নব্বই জন অধিবাসী গ্রামেই বাস করে এবং কৃষিই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। সুতরাং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যা বুঝিতে হইলে ভারতের গ্রাম ও নগর উভয়েরই অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে।

ভারত-বিভাগের পর সমগ্র জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ ভারতীয় ইউনিয়নের অধিবাসী রহিয়াছেন; কিন্তু সমগ্র দেশখণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত হইয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। এমনকি একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা বিভিন্ন রকম হয়। ইহার প্রধান কারণ হইল ভৌগোলিক অবস্থান—আয়তন, জীব, উদ্ভিদ্, জল, বিদ্যুৎ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান-বৈচিত্র্য।

এইজন্য ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনার পূর্বে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

পরিসীমা এবং অবস্থান—যে কোন দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথে উহার অবস্থান, আয়তন এবং চতুঃসীমা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। অনুকূল অবস্থান এবং আয়তনের জন্যই বর্তমান পৃথিবীর অনেকগুলি বৃহত্তর রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

আয়তন—ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মিলিত আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গমাইল। ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে ২,০০০ মাইল এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে ২,৫০০ মাইল

বিস্তৃত। তন্মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন ১,২২০,০০০ বর্গমাইল। পাকিস্তানের আয়তন ৩৬১,২০০ বর্গমাইল।

চতুঃসীমা—উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণী এবং দক্ষিণে মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত এই দেশ পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক স্বতন্ত্র ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাকৃতিক বিভাগ—মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) হিমালয় পর্বতশ্রেণী এশিয়া মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ড হইতে ভারতবর্ষকে পৃথক করিয়াছে। সমগ্র বৎসরই ইহা তুষারাবৃত থাকার জন্য সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র—এই তিনটি প্রধান নদী জলপূর্ণ থাকে। ভারতবাসীর নৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে হিমালয় সর্মাধক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

(২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা বেলুচিস্থান হইতে ব্রহ্মদেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর অবিরাম জল সরবরাহের ফলে এই অঞ্চল সমগ্র দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্বরা, শস্যশ্যামল এবং সমৃদ্ধি-শালী রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপত্যকার পূর্বাংশে চাউল এবং পাট, মধ্যভাগে বহুবিধ শস্য এবং উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়।

(৩) দক্ষিণভাগের উপদ্বীপ। এই অঞ্চলের সাতটি প্রধান নদী গভীর উপত্যকার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আরবসাগর এবং বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এই অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের কোথাও-বা চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, কোথাও-বা উত্তপ্ত মরুভূমি, কোথাও-বা শস্যশ্যামল জনপদ আবার কোথাও-বা জনহীন প্রান্তর।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইহার উপকারিতা—প্রত্যেক মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে তাহার দেশের অবস্থান বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অনুকূল পরিবেশে অতি শীঘ্রই ব্যবসাবাণিজ্য গড়িয়া উঠে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের সমাজজীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে: এমনকি রাষ্ট্রজীবনেও দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

এশিয়ার মানচিত্র দেখিলে মনে হয় ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের ও পাকিস্থানের ব্যবসাবাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই জলপথে বা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়া অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষ বৈদেশিক বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। বিদেশী-শাসনে ভারতের জলবাণিজ্য লোপ পায়।

কালক্রমে রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে বর্তমান জগতে স্থলপথের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তন, কোকনদ, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম ইত্যাদি কয়েকটি বড় বন্দরে ভারতের বৈদেশিক-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। স্বাধীন ভারতের বাণিজ্যপোতসমূহ ও বন্দরগুলি ভারতের জল-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির সহায়ক হইবে।

জলবায়ু—ভারত একটি মহাদেশের সমতুল্য; এখানে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে জলবায়ু সাধারণতঃ শুষ্ক, বঙ্গদেশ এবং মাদ্রাজে আর্দ্র, দেশের সর্বত্রই মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। জলবায়ু আমাদের কার্যক্ষমতাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রত্যক্ষভাবে ইহা মানুষের দেহ, মন ও চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরোক্ষভাবে খাদ্যশস্য, জীবজন্তু, ভূমি এবং খনিজ সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দেশের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং ঘনবসতির সহিত ভৌগোলিক অবস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

তাপমাত্রা—অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বৃষ্টিপাতের পরেই তাপমাত্রার স্থান।

মৌসুমি বায়ু—ভারতবর্ষে প্রধানতঃ মৌসুমি বায়ুর উপর বৃষ্টিপাত নির্ভর করে। ইহা দুই প্রকারঃ—(১) উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু, এবং (২) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের এক অংশ আরবসাগর হইতে উত্থিত হইয়া বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টিপাত করে এবং অপর এক অংশ বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হইয়া ভারতের অন্যান্য অংশে বৃষ্টিপাত করে।

সাধারণতঃ জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই বায়ুপ্রবাহের জন্য দেশের সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আগস্ট মাসের শেষার্দ্ধে বা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধে এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয় পর্বতে প্রতিহত হইয়া পশ্চাদ্‌গামী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু নামে ফিরিয়া আসে। এই সময় হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতের জলবায়ু শুষ্ক থাকে, তখন এখানে শীতকাল আরম্ভ হয়। তবে এই পশ্চাদ্‌গামী বায়ুপ্রবাহের জন্য মাদ্রাজের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকালে যখন ভূভাগ শীতল এবং সমুদ্র উত্তপ্ত থাকে তখন উত্তর দিক হইতে উত্তর-পূর্বে মহাসমুদ্র অভিমুখে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। ভূভাগ হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প থাকে। উত্তর-ভারতে বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের গমজাতীয় শস্যের পক্ষে এই বৃষ্টিপাত বিশেষ উপকারী।

ঋতু—সাধারণতঃ একটি বৎসর ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত হইলেও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—গ্রীষ্ম এবং শীত। ঋতু অনুসারে বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত ভারতের গ্রীষ্মকাল। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত শীতকাল।

বৃষ্টিপাত এবং ইহার বৈশিষ্ট্য—ভারতবর্ষের বৃষ্টিপাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—(১) দেশের সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। (ক) পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণ বৃষ্টিপাতের মাত্রা হইল ৮০", চেরাপুঞ্জিতে ৪৬০" বৃষ্টিপাত হয়। (খ) মধ্যবর্তী অঞ্চল, যথা—বঙ্গদেশ, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে ৪০" হইতে ৮০" বৃষ্টিপাত হয়; (গ) ভারতীয় ইউনিয়নের রাজপুতানা এবং পাকিস্থানের সিন্ধু ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে ৪০ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চল বৃষ্টিশূন্য বলিলেই চলে। (২) বৎসরের সব সময় একভাবে একস্থানে বৃষ্টিপাত হয় না। কোন ঋতুতে একস্থান জলপ্লাবিত হইয়া যায়; আবার ঠিক পরের ঋতুতেই সেইস্থানে ভীষণ জলাভাব দেখা দেয়। (৩) বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যে শুধু হ্রাস পায় তাহা নহে, কোন কোন বৎসর বৃষ্টি একেবারেই হয় না।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সেচব্যবস্থার অভাবে কৃষিকার্য সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি-পাতের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতের বৃষ্টিপাতের গুরুত্ব সমধিক। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবন নির্ভর করিতেছে। কারণ, এই প্রবাহই দেশে শতকরা নব্বই ভাগ বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া থাকে। বৃষ্টিপাত প্রচুর হইলেই চলিবে না, তাহা দেশের সর্বত্র এবং সময়মত হওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত কম হইলে দেশে যেমন হাহাকার উপস্থিত হয় তেমনি বেশী হইলে জলপ্লাবনের ফলে খাদ্যশস্য বিনষ্ট হইয়া যায়; ফলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। শস্যবপনের পূর্বে বা প্রয়োজন শেষে বৃষ্টিপাত হইলে অর্থাৎ সময়মত বৃষ্টি না হইলেও দেশে অন্নাভাব দেখা দেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ভাগ্য—তাহাদের সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রায় সমুদয় ভারতীয় বাণিজ্য কৃষিজাত দ্রব্য বা কৃষিজীবির সহিত জড়িত বলিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয়বিধ বাণিজ্যই বৃষ্টিপাতের উপর একান্ত নির্ভরশীল। ব্যাঙ্কব্যবসা, জাহাজী কারবার, রেলওয়ে, কলকারখানা ইত্যাদি সমস্ত প্রকার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া বৃষ্টিপাত ইহাদের মঙ্গলামঙ্গল ব্যাপারে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক কথায়, দেশের

সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি বা অবনতি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতেছে। এমনকি বৃষ্টিপাতের ফলেই অঞ্চলবিশেষে ঘনবসতি সম্ভব হইয়াছে।

মৃত্তিকা—রাজপুতনা, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল বাদে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বরা। কোথাও বা ইহা শুষ্ক, বালুকাময়, কোথাও বা ইহা অতিশয় আর্দ্র, আবার কোথাও বা ইহা ঘন কৃষ্ণবর্ণের।

সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর অববাহিকায় বঙ্গদেশ, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম তটভূমিতে তাঞ্জোর এবং গোদাবরী অঞ্চল পলিমাটি দিয়া প্রস্তুত, ইহা অতিশয় উর্বরা। এখানে নানাপ্রকার শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

সমগ্র দাক্ষিণাত্যে, এবং মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশে, হায়দ্রাবাদ এবং কাঠিয়াওয়াড়ের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়।

ভারতের অন্যান্য অংশে লালবর্ণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এই মৃত্তিকা শুষ্ক এবং অনুর্বর।

ভারতের খনিজসম্পদ—ভারত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। ১৯১৮ সালের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের মতে খনিজসম্পদের দিক হইতে ভারত সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল। সম্প্রতি কয়েকটি অঞ্চলে নানাবিধ খনিজ সম্পদ মৃত্তিকা অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতীয় খনিজসম্পদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) ধাতব-খনিজ সম্পদ, যথা লৌহ, মাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তাম্র, স্বর্ণ।

(২) অ-ধাতব খনিজসম্পদ, যথা, লবণ, অভ্র, গন্ধক, খড়িমাটি, চূণাপাথর।

(৩) শক্তিসম্পদ যথা, কয়লা এবং পেট্রলিয়ম।

ভারতের প্রধান প্রধান খনিজদ্রব্য :—

(ক) ভারতে খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে কয়লা প্রধান। ভারতের বহুস্থানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে যথেষ্ট কয়লা রহিয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নে গড়ে প্রায় ২ কোটি ৬১ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। পাকিস্তানে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে পাওয়া যায়।

(খ) কয়লার পরেই লৌহের নাম করিতে হয়। ভারতে অন্য দেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনিজ লৌহ জমা রহিয়াছে। সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর, বরাকর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রধান প্রধান লৌহখনিগুলি অবস্থিত। মধ্য-

প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, মহীশূর, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও লৌহ পাওয়া যায়। বৎসরে গড়ে প্রায় ২৩ লক্ষ টন লৌহ উত্তোলিত হয়।

(গ) সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। রেলওয়ে, বৈদ্যুতিক শিল্প এবং নানাপ্রকার রাসায়নিক কার্যে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মহীশূরে ইহা পাওয়া যায়। ভারতে বৎসরে গড়ে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

(ঘ) ভারতীয় ইউনিয়নে আসামের ডিগবয় অঞ্চলে এবং পাকিস্তানের আটক, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়। ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় পেট্রোলিয়মের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সেজন্য বিদেশ হইতে ইহা আমদানী করিতে হয়।

(ঙ) পৃথিবীর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ অভ্র ভারতে পাওয়া যায়। বিহারের কোদারমা এবং গিরিধি অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৯৪৪ সনে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার টন অভ্র উত্তোলিত হয়।

ছোটনাগপুর এবং দক্ষিণভারতে বকসাইট পাওয়া যায়। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ১২ হাজার টন।

উল্লিখিত খনিজ দ্রব্য ব্যতীত ভারতে ক্রোমাইট, লবণ, ম্যাগনেসিয়াম, মূল্যবান প্রস্তরখন্ড, এলুমিনিয়ম, স্বর্ণ, রৌপ্য, নিকেল প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। কয়েকটি খনিজ সম্পদে যদিও ভারত বিশেষ সমৃদ্ধ, তথাপি এদেশে সীসা, তাম্র, দস্তা, গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়; কোনটি আবার একেবারেই পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন দেশই সকল প্রকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তবে ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের খনিজ দ্রব্যের একান্ত অভাব। পাকিস্তান এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী।

অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ—ভারতে প্রায় সর্বপ্রকার ফল, ফুল, বৃক্ষ, শস্য এবং জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ধান্য, গম, পাট, সরিষা, চা, কফি, অহিফেন, সিঙ্কোনা, তামাক উল্লেখযোগ্য।

ভারতের অরণ্যসম্পদ ও ইহার উপকারিতা—ভারতের অরণ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঠ এবং আঠা, ঔষধি, ধুনা ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগৃহীত হয়। ভারতের সমগ্র অরণ্য অঞ্চলের আয়তন ৮২০ লক্ষ বিঘা। ভারতের শতকরা ১৫ ভাগ বনাবৃত।

বনবিভাগ হইতে প্রধান প্রধান সংগৃহীত দ্রব্য হইল—গৃহনির্মাণ ও আসবাব-পত্রের জন্য কাঠ, জ্বালানি কাঠ, চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনা, আঠা, তৈল, বাঁশ,

ঔষধের জন্য গাছ গাছড়া ইত্যাদি। প্রায় ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বনবিভাগ হইতে সংগৃহীত হয়।

ভারতের গৃহপালিত পশু—ভারতে গাভী, বৃষ, মহিষ, গর্দভ, খচ্চর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি নানাবিধ গৃহপালিত পশু রহিয়াছে। বৃষ এবং মহিষ জমি কর্ষণ কার্যে নিযুক্ত হয়। মালবহন কার্যে গর্দভ এবং খচ্চর নিযুক্ত হয়। দেশের অধিবাসীগণ নানাবিধ পশুর মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের গোসম্পদের শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে।

শক্তিসম্পদ—ভারতের শক্তিসম্পদের প্রধান উৎস হইল কয়লা, কাঠ, পেট্রোলিয়ম, বায়ু, জল এবং জল বিদ্যুৎ।

অধিবাসী—প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায় অধিবাসিগণের কার্যক্ষমতা, চরিত্রবল এবং দৃঢ় ইচ্ছার উপরও দেশের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। মানুষ যদি আগ্রহশীল, কার্যক্ষম এবং উপযুক্ত না হয় তাহা হইলে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কোন দেশ উন্নত বা সমৃদ্ধ হইতে পারে না। বর্তমানে মানুষ বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে বশ করিয়া আপনার কল্যাণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারতের অধিবাসিগণ অক্ষম এবং দরিদ্র বলিয়া দেশের উন্নতি সম্ভব হয় নাই। পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ১০ লক্ষ। ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৮৮ লক্ষ।

উপজীবিকা—ভারতের শতকরা ৬৫.৬ জন অধিবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষি-কার্য, শতকরা ১০ জন লোক শিল্পকর্মে, যানবাহন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে শতকরা ৭ জন লোক, শতকরা ১⅓ জন লোক শাসনকার্যে, শতকরা ২ জন লোক পশুচারণ এবং শিকারে এবং শতকরা ১½ জন লোক অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে।

লোকসংখ্যার ঘনত্ব—ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ২৯৯; এবং পাকিস্তানে প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৫।

পাকিস্তানের সমগ্র আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ পূর্ব-বাঙ্গলার অন্তর্গত। পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৬৪ জন লোক পূর্ববাঙ্গলার অধিবাসী। পূর্ব-বাঙ্গলার লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৭১৮ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ইহা ১৩৬ মাত্র। বেলুচিস্থান এবং সিন্ধুর অধিকাংশই মরুভূমি। এখানকার লোকসংখ্যার ঘনত্ব সর্বনিম্ন মাত্র ৯ জন। (প্রতি বর্গ মাইলে)

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১৭০ জন। বোম্বাইএ ২৭২ জন, মাদ্রাজে ৩৯১ জন এবং বিহারে ৫২১ জন।

জন্ম, মৃত্যু এবং দেশান্তর গমন—ভারতে জন্ম এবং মৃত্যু উভয় হারই অধিক। জন্মহার হাজার প্রতি ৩৫ জন। ভারতে প্রায় সকল অধিবাসিই বিবাহ করে এ সম্পর্কে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাই।

মৃত্যুহার হাজার প্রতি ২৪ জন। খাদ্যাভাবের জন্য প্রতি ৫ জনের ১ জন শিশু জন্ম বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধি, অল্পবয়সে বিবাহ, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি মৃত্যুহারের অন্যতম কারণ।

লোকবৃদ্ধিহেতু দেশান্তরগমন পূর্বে বহুবার হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, ফিজি, ব্রিটিশ গায়েনা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকে ইতিপূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। ভারতের মধ্যেও এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে বহু লোক গিয়াছেন।

ভারতবিভাগের পর পাকিস্তান হইতে বহু লোক প্রত্যহ ভারতীয় ইউনিয়নে চলিয়া আসিতেছেন। ফলে ভারতের বর্ধিত জনসংখ্যার সমস্যা ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করিতেছে।

ভারতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে কি?—ভারতের জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে কি হয় নাই, এসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্যই ইহার প্রমাণ। আবার কেহ বলেন, জনগণের দারিদ্র্যের মূলে রহিয়াছে বিদেশী শাসনে এই দেশের নির্মম শোষণ; এই শোষণ বন্ধ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যা দূর হইবে।

১৯৩১ সালের হিসাব অনুযায়ী বিগত ১০ বৎসরে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ভারতের লোকসংখ্যা আরও ৫ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ বৎসরে (১৯২১-৪১) ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৮৷৷৹ কোটি লোক—ইংলন্ড, পোল্যান্ড, স্পেনের মিলিত মোট লোকসংখ্যার সমান।

বিজ্ঞানসম্মত, যন্ত্রচালিত এবং উন্নত কৃষি প্রণালীর সাহায্যে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা এবং সার ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। উন্নত শিল্প ব্যবস্থা ও যানবাহনের সুব্যবস্থার ফলে দেশে শিল্পউৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার কিছু অংশ জীবিকা সংস্থান করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু উন্নত কৃষি-প্রণালী বা অধিক কলকারখানা কেবলমাত্র অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যার তীব্রতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করিতে পারিবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান পরিমাণে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯০১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা

শতকরা ১৭ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ হারে।

১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের মধ্যে আমাদের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নাই। গান্ধীজী বলিতেন উন্নত কৃষি প্রণালী দ্বারা এবং শিল্পের শ্রী বৃদ্ধি করিয়া আমরা বর্তমানের দ্বিগুণ সংখ্যক লোকের খাদ্যসংস্থান করিতে পারি। অনেক খ্যাতনামা অর্থনীতিক এই অভিমত সমর্থন করেন। কিন্তু সর্বদাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনবহুল দেশ এবং সুখী ও উন্নতিশীল জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা উচিত। তার জন্য উৎপাদনবৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি সমভাবে প্রজনন-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে কোনরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং তাহা সমভাবে বণ্টন করিয়া অভাব অনেকখানি দূর করা যায়।

অতএব আসল সমস্যা জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি নয়। আসল সমস্যা হইল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তাহা সকলের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবস্থা করা।

সহর এবং গ্রাম—প্রকৃত ভারতবর্ষ গ্রামে নিহিত। মাত্র ১০ জন লোক সহরে বাস করে। ভারতে ৭ লক্ষ গ্রাম রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য সহরের সংখ্যা হইল মাত্র ৫৮টি। ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতের সহরে লোকসংখ্যা শতকরা ৮৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের পূর্বেকার ত্রিশ বৎসরে সহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা ১০ জন। বর্তমান যুগে একদিকে যেমন গ্রামের লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং গ্রামগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, তেমনি বৃহদাকার শিল্পপ্রধান ও বাণিজ্যনগরী গড়িয়া উঠিতেছে।

সমাজ ব্যবস্থা—কোনও দেশের সমাজ-ব্যবস্থার উপর দেশের সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সমাজ ব্যবস্থা সম্পদ উৎপাদনের সহায়ক বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল জাতিভেদ এবং যৌথ-পরিবার প্রথা, এই সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। জাতিভেদ আর নাই বলিলেই চলে বিশেষতঃ অর্থনৈতিক জীবনে। যৌথ-পরিবারও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

জাতিভেদ প্রথা—অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত বৃত্তি অনুসারে সমগ্র সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

জাতিভেদপ্রথার স্বপক্ষে বলা হয় যে, ইহার দ্বারা শ্রমবিভাগের নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি বা কাজ করিবার ফলে এক একটি শ্রেণীর

লোক সেই কাজে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। অধিকন্তু একই শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির ভাব গড়িয়া উঠে।

কালচক্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার উপযোগিতা হ্রাস পাইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এবং ব্যক্তিতন্ত্রের ভাব প্রসারের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু-সমাজের ভিত্তিভূমি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আর জাতিভেদ প্রথা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। এই প্রথার সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে (ক) ইহা এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া সামাজিক এবং জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, (খ) ইহার ফলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় নাই। উপযুক্ত মানুষ উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হয় নাই। শূদ্রের শিক্ষাদানের যোগ্যতা থাকিলেও সে তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। (গ) একই স্থানে থাকিয়া একই বৃত্তি অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া শ্রম বা মূলধনের স্থানান্তরকরণ সম্ভব হয় নাই। (ঘ) উচ্চশ্রেণীর মধ্যে মিথ্যা মর্যাদা বোধ সৃষ্টি হইয়াছে। কায়িক শ্রম করিতে তাহারা অপমান বোধ করে।

অতএব দেখা যাইতেছে জাতি ভেদ প্রথা নব্য ভাবধারার পরিপন্থী।

যৌথ-পরিবার প্রথা—ভারতীয় সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ-পরিবার প্রথা। পাশ্চাত্য সমাজের কেন্দ্র ব্যক্তি; ভারতীয় সমাজের ভিত্তি ব্যক্তি নয়, পরিবার। ভারতে পরিবার বলিতে সাধারণতঃ যৌথ-পরিবার বুঝায়, পরিবারের সকলেই গৃহকর্তার অধীন। সকলেই সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। গৃহকর্তা যৌথ ভূসম্পত্তি তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা করিয়া থাকেন।

এই প্রথার প্রধান উপযোগিতা হইল এই যে, পরিবারস্থ সকলেই জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, সবল, দুর্বল, শিশু বৃদ্ধ সকলের প্রতিই গৃহকর্তা সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন। সকলকেই তিনি পরিবারমধ্যে আশ্রয় দেন। একসঙ্গে থাকিবার ফলে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে সহযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠে, একে অন্যের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়। যৌথভাবে জিনিষক্রয়ের জন্য সংসার খরচ অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। সকলের মধ্যে সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করা হয়। যৌথভাবে সম্পত্তি পরিচালনা করিবার ফলে উত্তরাধিকার আইনের কুফল দেখা দেয় না। সকলে একসঙ্গে থাকার ফলে মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং সেবার গুণ বিকশিত হয়। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রত্যেকেই পরিবারের কথা চিন্তা করে। আপন সাধ্যমত সকলেই অর্থ সাহায্য করিয়া সংসার বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ইহা অসুস্থতা বা মৃত্যুর বিরুদ্ধে বীমার মত কাজ করে বলা যায়।

যৌথ-পরিবারের দোষও অনেক। ইহাতে অলসতা প্রশ্রয় পায়। মানুষ আপন স্বাধীনতা, উদ্যম ও প্রচেষ্টা হারাইয়া ফেলে। একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের উপার্জন বিভিন্ন হওয়ায় প্রায়ই পরিবারিক কলহ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

নানাকারণে যৌথ-পরিবার প্রথা ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতেছে। বর্তমান যুগের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষা এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

অন্যান্য সামাজিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান—অন্যান্য প্রথার মধ্যে বাল্য-বিবাহ, পর্দাপ্রথা, নারী শিক্ষার অভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুকালীন আচার অনুষ্ঠানের সহিত ধর্ম জড়িত। এই সকল অনুষ্ঠানে সাধ্যাতীত অর্থব্যয় করিয়া ধর্মভীরু মানুষ অকারণ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ধর্ম ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী—সাধারণতঃ ধর্ম মানুষকে কর্মবিমুখ করিয়া তুলে, মানুষের এই জীবনের কথা চিন্তা না করিয়া পরজীবনের কথা চিন্তা করে।

কিন্তু কর্মবিমুখতার জন্য ধর্মকেই একমাত্র দায়ী করিলে ভুল করা হইবে। প্রাচীনকালে ভারতীয়গণ বর্তমান অপেক্ষা বহুগুণে ধর্মপ্রবণ এবং আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান ছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহারা শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

জলবায়ু আমাদের কর্মবিমুখ করিলেও রাষ্ট্রবিমুখতায় আমরা কৃষি শিল্প বা বাণিজ্যে বড় হইবার সুযোগ পাই নাই।

প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ভারতে জাতির অভ্যুত্থানের ও অর্থনৈতিক উন্নতির নূতন সুযোগ বহু শতাব্দী পরে আজ আসিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনসাধারণের অবস্থা

জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ—ভারতের অগণিত নরনারী অপরিসীম দৈন্য, দারিদ্র্য, রোগ ও অশিক্ষার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেদেশে প্রকৃতির করুণা শতধারায় বর্ষিত হইতেছে সেই দেশের মানুষ এত দৈন্যের মধ্যে বাস করিতেছে, ইহা যেন স্বপ্নাতীত। এত প্রাচুর্যের মধ্যেও এত অভাব, ইহাই ভারত-ভাগ্যবিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস।

ভারতের জনপ্রতি গড় আয়—ভারতবাসীর জনপ্রতি গড় আয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করেন। Baring-এর মতে জনপ্রতি বাৎসরিক আয় মাত্র ২৭৲। V. K. R. V. Rao র মতে ইহা ৬৫৲। গত দশ বৎসরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য টাকার অঙ্কে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, বস্তুসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির হিসাব ধরিলে আসল আয় জনপ্রতি কমিয়া গিয়াছে। দেড় শত বৎসরকাল বৃটিশ শাসনের অবসানে ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে জনপ্রতি বাৎসরিক মোট আসল আয়ের (১৯৪৯-৫০) হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

বিহার	...	...	... ৩৯।	৩
পশ্চিম বাংলা	...	...	... ৪০॥৶	২
যুক্তপ্রদেশ	...	...	... ৫৫॥/	৩
পাঞ্জাব	...	...	... ৫৯।	৪
উড়িষ্যা	...	...	... ৫৯॥৶	১১
আসাম	...	...	... ৫৯৸৶	৬
মাদ্রাজ	...	...	... ৬৭॥৵	৫
মধ্যপ্রদেশ	...	...	... ৮১॥/	৫
বোম্বাই	...	...	... ৯৮ ৵	৪

ভারতবাসীর প্রয়োজন অতি সামান্য, আসল কথা, কি করিয়া ভালভাবে বাস করিতে হয় তাহারা জানে না। জীবন ধারণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তাহাদেরই নাই।

কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন করিয়াই জীবন কাটাইয়া দেওয়াই তাহাদের লক্ষ্য। বর্তমানে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যাও জটিল ও দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

ভারত কি ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে?—জনগণের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে ভারত ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্য যুগেও জনগণ অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিত। বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়িয়াছে। কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার ফলে বর্তমান কালে এই দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। উৎপন্ন শস্য বিতরণের সময় শোষণনীতির ফলে কৃষক শোষিত ও উৎপীড়িত হইয়াছে। তাহার দুর্দশাভার ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ সমগ্র সমাজে সে দুর্দশা দেখা দিয়াছে।

বণ্টন—জনগণ কি চায় আর কি তাহারা পায়—জনগণের প্রধান অভাব হইল খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ। অধিকাংশ মানুষের দৈনিক দুইবেলা অন্ন জুটে না। বস্ত্রসমস্যাও একই রূপ। বহু নরনারী কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে মাত্র।

মধ্যবিত্ত সমাজেও আজ অন্নসমস্যা ও বস্ত্রসমস্যা ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চ দ্রব্যমূল্যমান, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাভাব জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে।

জাতির দৈহিক ও মানসিক শক্তি আজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মানুষের বিশ্রাম, শিক্ষা ও আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে সমাজজীবন উন্নত হইবে কি প্রকারে? জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়।

জীবনযাত্রার মান—ইহা কি বৃদ্ধি পাইয়াছে?—গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভারতের জীবনযাত্রার মান প্রায় একই অবস্থায় রহিয়াছে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে নগর বা শহরের সাধারণ মানুষের জীবনমান অকস্মাৎ ও সাময়িকভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইলেও গ্রামের অবস্থা পূর্ববৎ রহিয়াছে।

ভবিষ্যৎ—সুখের কথা যে, সম্প্রতি সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনমান উন্নত করিবার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। অচিরেই সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন আবাসগৃহ, প্রশস্ত রাস্তা, উন্নত কৃষিব্যবস্থা, কল-কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

দারিদ্র্যের কারণ—ভারতের গ্রামাঞ্চলে বুভুক্ষু নরনারী দেখিয়া দেশের দারিদ্র্য উপলব্ধি করা যাইবে। পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং মহানগরীর রাজপথের নিরন্নের দল ইহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের সম্পদ যথাসম্ভব শোষণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু ইহাই আমাদের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ নয়। ভারতীয় দারিদ্র্যের অন্য প্রধান কারণসমূহ দেশের সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত আচার আচরণের মধ্যে নিহিত আছে। পরিবারবৃদ্ধি, বেকারবৃদ্ধি ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে অযথা ব্যয়াধিক্য, এই দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

আমাদের দারিদ্র্যের অন্য কারণগুলি নিম্নে বর্ণিত হইলঃ—

(১) ভারতীয় জীবনদর্শন মানুষের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ করিয়া জীবনমান হ্রাস করিয়া দিয়াছে। অনেকে কাস্তে বা হাতুড়ির পরিবর্তে ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র সানন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

(২) ভারতীয় নারী অর্থনৈতিক জীবনযুদ্ধ হইতে দূরে বাস করেন। জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এইভাবে অন্যের উপার্জনের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

(৩) দারিদ্র্য সত্ত্বেও জনসংখ্যা রোধ করিবার কাহারও কোন চেষ্টা নাই। ভারতে ভিক্ষুকেও বিবাহ করে।

(৪) শতকরা ৮০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষির উপর এই অতিনির্ভরতা আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। আয়তনে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হওয়ার ফলে জমির উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে।

(৫) বাল্যবিবাহ এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি জাতিকে শক্তিহীন করিয়া কর্মে নিরাসক্ত করিয়াছে।

(৬) সামাজিক ব্যাপারে অযথা ব্যয়বাহুল্য।

(৭) ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে ধর্মভীরু মানুষকে অযথা সাধ্যাতীত অর্থব্যয়ে প্ররোচিত করে।

(৮) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরকার দ্রব্য সরবরাহ করিতে না পারায় চোরাকারবারিগণ সাধারণ মানুষের নিকট অগ্নিমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করেন। এইভাবে জনসাধারণ আরও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে।

(৯) মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের দারিদ্র্য আরও বর্ধিত হইয়াছে।

সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে ১৯৩৯ সালের হিসাবে ১৯৪৯ সালে দেশের মজুর শ্রেণীর জীবিকানির্বাহের জন্য ব্যয় কলিকাতায় ৫ গুণ, নাগপুরে ৪ গুণ, মাদ্রাজে ৩ গুণ ও বোম্বাইতে ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের কৃষিসমস্যা

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি ৭ লক্ষ গ্রামের একমাত্র অবলম্বন।

সাধারণভাবে অন্য দেশের তুলনায় ভারতের মাটি উর্বরা। ইহার মধ্যে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং মালাবার সর্বাপেক্ষা উর্বরা-শক্তিযুক্ত।

ভারতের কৃষিক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। আবহমানকাল হইতে লাঙ্গল দিয়াই কৃষিকার্য চলিতেছে, জমিতে সার প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা নাই, উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল না, জলসরবরাহের কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ফলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং কৃষক অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কোনরকমে বাঁচিয়া থাকে মাত্র।

গ্রামাঞ্চলে অর্থসংগ্রহের কোন সুব্যবস্থা না থাকায় কৃষক প্রয়োজনের সময় গ্রামে মহাজনের নিকট উচ্চসুদের হারে ঋণগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উৎপন্ন ফসল বিক্রয়ের কোন সুপরিচালিত বাজার না থাকায় লোভী এবং অসৎ ব্যাপারী সহজেই সরল প্রকৃতির কৃষককে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

ভারতে আবাদী জমির শতকরা ৮০ ভাগে ধান্য, গম, ভূট্টা ইত্যাদি খাদ্যশস্য: প্রায় ৬ ভাগে সরিষা, রেড়ি ইত্যাদি তৈলবীজ; ৮ ভাগ জমিতে তুলা এবং পাট এবং বাকি অংশে অহিফেন, চা, কফি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

বর্ষা আগমনের পূর্বে ধান্য, তুলা, পাট ইত্যাদি লাগান হয় এবং শরৎকালে এইসকল শস্য কর্তন আরম্ভ হয়। বর্ষার শেষে গম, ডাইল, তিসি ইত্যাদি রোপণ করা হয় এবং শীতকালে বা বসন্তের প্রথমার্ধে এইসকল শস্য পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত শস্যকে খারিফশস্য এবং দ্বিতীয় প্রকার শস্যকে রবিশস্য বলা হয়।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব—কৃষিই ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প। এদেশের মানুষের কৃষিই প্রধান অবলম্বন। ভারতীয় জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৯০ জন লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। ভারতীয় শিল্পগুলির যাবতীয় কাঁচামাল ভারতেই উৎপন্ন হইত। ভারতবিভাগের ফলে ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজন পাট ও তুলা পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। ভারতবর্ষে পাট ও তুলার চাষের ব্যবস্থা হইলেও বাহির হইতে আমদানী করিতে হইবে। পাকিস্তানের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাট এবং তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান। ভারতবর্ষ রপ্তানী করে

চা ও বনজ দ্রব্য এবং তুলা ও পাটশিল্পজাত দ্রব্য। ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বহুল পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির অবস্থা ভাল হইলেই দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে শিল্প-বাণিজ্যেও উন্নতি ঘটিবে। আর কৃষি ভাল না হইলে দেশের সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া যায়। কৃষক তো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ই, এমনকি কৃষির উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল জমিদার, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল এবং রেলগাড়ী ও ডাকঘর প্রভৃতির আয়ও কমিয়া যায়।

বস্তুতঃ কৃষির সহিত ভারতের আর্থিক উন্নতি বা অবনতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কৃষির দুর্বৎসর হইলে দেশের সর্বব্যবসায়েই দুর্বৎসর। এমনকি সরকারী রাজস্বও হ্রাস পায়।

কৃষকের অবস্থা—ভারতীয় কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও সে আপন স্ত্রীপুত্রকন্যার জন্য দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না—বস্ত্র বা আশ্রয় তো দূরের কথা।

প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইলেও জমিদার, মহাজন ও ফড়িয়াদের অত্যাচারের ফলে কৃষকের আপন বলিতে প্রায় কিছুই থাকে না।

ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য—ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্যের স্থান সর্বাগ্রে। ফলমূল, গুটিপোকা, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশু ও পক্ষীপালন প্রভৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্যদেশসমূহ এইসব বিষয়েও সবিশেষ যত্নবান ও আগ্রহশীল।

বনের উপকারিতা—গৃহপালিত জীবজন্তু বনের গাছপালা ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। গোমহিষাদি প্রাণী গোচারণভূমিতে বিচরণ করে। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র জনগণ বন্য লতাপাতা, ফলমূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। অরণ্যের অবস্থান এবং দেশের বৃষ্টিপাতের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বৃষ্টিধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া অরণ্য মৃত্তিকার উর্বরাশক্তিবর্ধনে সহায়তা করে। দরিদ্র জনগণ বন হইতে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহারের জন্য বন হইতে কাঠ সংগৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত অরণ্যে আঠা, ধূনা ও ঔষধের জন্য নানাবিধ লতা, গুল্ম, ফুল, ফল ও মূল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কার্যে অরণ্যসম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকার অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

রেশম ব্যবসার জন্য গুটিপোকার চাষ—পূর্বে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে গুটিপোকার চাষ হইত। এক্ষণে ইহার অবনতি ঘটিয়াছে। মহীশূর, বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে রেশমশিল্পের জন্য গুটিপোকা চাষের ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই ব্যবসা হইতে প্রভূত আয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মৎস্যচাষ—অধুনা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্যচাষের প্রতি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতে প্রচুর নদীনালা খালবিল থাকার জন্য মৎস্যচাষের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ।

ভারতের শস্যসম্পদ—ভারতের কর্ষিত ভূমির শতকরা ৮০ ভাগে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। বাকি জমিতে অন্যান্য শস্যের চাষ হইয়া থাকে।

খাদ্যশস্য—

(ক) **ধান্য**—ধান্যই ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য, কর্ষিত ভূমির এক-তৃতীয়াংশে ধান্যের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার প্রধান খাদ্য চাউল, ধান্যের চাষ ব্যাপক হইলেও ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় ধান্য উৎপাদন যথেষ্ট নহে, সেজন্য অন্য দেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে হয়। আগামী ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৪৯ সনে ৬ কোটি ৫ লক্ষ একর জমিতে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টন চাউল হয়।

(খ) **গম**—খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান্যের পরেই গমের স্থান। পাঞ্জাব, যুক্ত-প্রদেশ ও বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়, সেখানকার অধিবাসীদের ইহাই প্রধান খাদ্য, গম উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, রুশিয়া এবং আর্জেন্টিনা হইতে ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে গম আমদানী করিয়া থাকে। গত বৎসর ২ কোটি ১২ লক্ষ একর জমিতে ৫৪ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়।

(গ) **ইক্ষু**—ইক্ষু চাষে ভারত পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। শর্করা শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে বিগত পনের বৎসরে ইক্ষুর চাষ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শর্করা শিল্পে সরকার সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার ফলে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়। ইক্ষুরস হইতে প্রধানতঃ গুড় তৈয়ারী হয়। তালরস হইতেও গুড় তৈয়ারী হয়। ৩৫ লক্ষ একর জমিতে ৪৯ লক্ষ টন গুড় হয়।

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে ডাইল, ভুট্টা, বার্লি ও নানাপ্রকার ফল ও শাক-সব্জির নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য শস্য—অন্যান্য শস্যের মধ্যে আঁশজাতীয় শস্য, যথা তুলা ও পাট, তৈল-

জাতীয় শস্য—যথা রেঁড়ি, সরিষা, তিসি এবং ঔষধ ও পানীয় জাতীয় শস্য—যথা চা, কফি, তামাক, অহিফেন উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) তুলা—তুলা উৎপাদনের দিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতের স্থান। দক্ষিণ-ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল এবং বিহার, গুজরাট, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশে তুলা উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তুলার এক-দশমাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ১৯ লক্ষ (৪০০ পাউণ্ডের) গাঁট এবং পাকিস্থানে ১২ লক্ষ (৪০০ পাউণ্ডের) গাঁট তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ঙ) পাট—ইহা ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থানের একচেটিয়া জিনিষ। প্রধানতঃ পাকিস্থানের পূর্ববঙ্গে এবং ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিম-বঙ্গে পাট উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত আসাম ও উড়িষ্যায় সামান্য পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়। ভারতীয় ইউনিয়নে প্রায় ২ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়।

পাটের দিক হইতে ভারত অপেক্ষা পাকিস্থানের সুবিধা বেশী।

পাট অনুসন্ধান সমিতি (Bengal Jute Enquiry Committee) পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান পাট-চাহিদা মিটাইবার জন্য চাষের জমি নির্দিষ্ট, বিক্রয়ের বন্দোবস্ত ও সর্বনিম্ন দর সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছিলেন।

ভারতের কৃষিসমস্যা

কৃষি ভারতের প্রধান উপজীবিকা হইলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় কৃষিকর্মের দিক হইতে ভারত বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। একর-পিছু ভারতে ইক্ষু উৎপাদন কিউবার এক-তৃতীয়াংশ, জাভার এক-ষষ্ঠাংশ এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এক-সপ্তমাংশ।

এইরূপ অল্প উৎপাদনের কারণ সহজেই অনুমেয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের উৎকর্ষতার উপর অধিক উৎপাদন নির্ভর করে। ভারতে এই চারিটি বিষয়েই যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে।

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ত্রুটি—ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ চারিটি দফায় আলোচনা করা যাইতে পারে; যথা—ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন।

১। **ভূমি**—এই দফায় ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ত্রুটি প্রধানতঃ জল-সরবরাহ, সার ও জমির ক্রমক্ষীয়মান আয়তন।

(ক) জলসরবরাহ—ভারতবর্ষের জমি বেশীর ভাগ স্থানেই শুষ্ক, কিন্তু অনুর্বরা নহে। উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হইলে ভাল চাষ হইতে পারে। কিন্তু দেশের সর্বত্র উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয় না। যে

বৃষ্টিপাত হয়, তাহাও সর্বত্র সমভাবে হয় না এবং সর্বদা যথা-সময়ে হয় না। ভারতে সেচব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কাজেই কৃষককে কেবলমাত্র অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

(খ) **সার**—বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত কৃষিকার্যের ফলে জমির উৎপাদিকাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। সার ব্যবহার করিলে এই শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু ভারতের জমিতে প্রায়ই সার দেওয়া হয় না। অল্পমূল্যে উপযুক্ত সার গোবর দরিদ্র কৃষক জ্বালানি-রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

(গ) **জমির ক্রমবিভাগ—ক্রমহ্রাসমান আয়তন**—ভূমি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি এই যে, ভারতবর্ষে ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। উত্তরাধিকার আইনানুসারের ফলে পিতার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় পুত্রগণ একই জমিতে অংশ দাবী করে। এইভাবে জমির আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার ফলে জমির কোন উন্নতি সম্ভব হয় না—উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা যায় না।

ত্রুটি প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে নির্দেশ

১। **জল**—খাল ও কূপ খনন করিয়া উপযুক্ত সেচ ও জলব্যবস্থা করিতে পারিলে জলাভাব বিদূরিত হইবে, অনাবাদী জমি আবাদ হইবে এবং আবাদী জমির ফলন বাড়িবে। দ্রুত সেচব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন।

সার—কৃষককে অল্পমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করিয়া গোবর জমির সার-রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যপ্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার প্রচলন করিতে হইবে। ঋতুভেদে বিভিন্ন প্রকার শস্য আবাদের ফলেও জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব। একই জমিতে এক চাষের পর ভিন্ন চাষ এমন হওয়া উচিত যাহাতে জমির উৎপাদনশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃষিরাসায়নিকেরা এবিষয়ে চাষীকে পরামর্শ দিবেন।

ক্ষুদ্রাকৃতি জমি—সমবায় পদ্ধতিতে বা আইন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি-গুলিকে একত্র করিতে হইবে। অন্যথায় কখনই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ সম্ভব হইবে না।

পাঞ্জাবে কৃষকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিল। সমবায়ভিত্তিতে তাহারা আপন আপন ক্ষুদ্রাকৃতি জমিগুলিকে একত্র করিয়া বৃহৎ জমিতে রূপান্তরিত করিয়াছে।

২। **শ্রম**—ভারতীয় কৃষক প্রাচীনপন্থী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা অযোগ্য নয়। শান্ত, পরিশ্রমী ও সৎ বলিয়া তাহাদের খ্যাতি আছে। অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় কৃষকের কর্মকুশলতা অনেক কম। এদেশের কৃষকেরা শিক্ষার আলোক পায় নাই। তাহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও উদ্যমহীন। অজ্ঞতার জন্য তাহারা কোন নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সহজে রাজী হয় না। অদৃষ্টবাদী বলিয়া তাহারা জীবনমান উন্নত করিবার কোন চেষ্টা করে না। উপযুক্ত খাদ্যাভাবের জন্য তাহারা হীনবল ও স্বাস্থ্যহীন। কর্মে অপটুতার ইহাও একটি প্রধান কারণ। খাদ্যসমস্যা প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যা—অগণিত স্বাস্থ্যহীন ও দুর্বল কৃষকের খাদ্যসমস্যার সমাধান ভারতীয় কৃষককেই করিতে হইবে। তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবে আজ জাতীয় সরকার।

কৃষিকার্যে দিনমজুর—সাধারণতঃ একপরিবারভুক্ত লোকেরাই জমি চাষ করিয়া থাকে। কখনও কখনও দিনমজুর নিয়োগ করা হয়। গড়ে ১০০ জন কৃষক ২৫ জন দিনমজুর নিয়োগ করিয়া থাকে। দিনমজুরদের অধিকাংশেরই কোনও জমি নাই এবং থাকিলেও তাহার আয় এত কম যে তদ্দ্বারা জীবনধারণ সম্ভব নয়। দিনমজুরদের পারিশ্রমিকের হার অতি অল্প।

দিনমজুরের সমস্যা কৃষকসমস্যার অনুরূপ। মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের জীবনমান ও কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে।

উন্নতির উপায় সম্পর্কে নির্দেশ—কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতি করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও নৈরাশ্যবাদী মনোভাব দূর করিতে হইবে।

৩। **মূলধন**—মূলধন বিনা কোনপ্রকার উৎপাদনকার্য সম্ভব নয়। ভারতীয় কৃষকের মূলধনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বহু পুরাতন একটি কাঠের লাঙ্গল, একজোড়া রুগ্ন বলদ ও কিছু সার ও বীজ—ইহাই হইল তাহার একমাত্র মূলধন। জমির সংস্কারসাধন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, বীজ, সার ও বলদের খাদ্য ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। উৎপন্ন শস্য হইতে মাত্র কয়েক মাস কোনক্রমে জীবনধারণ সম্ভব। বাকি সময়ে জীবনধারণের জন্যও অর্থের প্রয়োজন। এইরকম নানা কারণে কৃষক ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার

উপর গ্রামাঞ্চলে কম সুদে ঋণ দেওয়ার কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায় অত্যন্ত চড়া সুদে গ্রামে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। একবার মহাজনের কবলে পড়িলে আর সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকারে মহাজন তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে।

উন্নতির উপায় সম্পর্কে নির্দেশ—সমবায় পদ্ধতির মধ্য দিয়া এই সকল সমস্যা দূর করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন করিয়া অল্পসুদে কৃষককে অর্থ সরবরাহ করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, বলদ প্রভৃতিও সমবায় সমিতির মারফৎ সরবরাহ করিতে হইবে।

৪। **সংগঠন**—ভারতীয় কৃষকসমাজে কোনরূপ সংগঠনের ব্যবস্থা নাই। সংগঠনের অভাব আমাদের কৃষিসমস্যার অন্যতম ত্রুটি। ইহার জন্যই কৃষকেরা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই।

উৎপাদন বা বণ্টন কোন দিকেই সংগঠনের কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

উন্নতির উপায় নির্দেশ—নিজেদের সুখসুবিধা এবং জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় কৃষকসমাজে সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(ক) **নিজেদের সুখসুবিধার জন্য সংগঠন**—পাশ্চাত্য-সভ্যতার চাপে প্রাচীন গ্রাম্যসমাজ আজ শতধা-বিভক্ত। এই গ্রাম্যসমাজকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সনাতন পদ্ধতি বা যুগোপযোগী আধুনিক পদ্ধতি—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টির উপর ভিত্তি করিয়া পুনর্গঠন করিলে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। যাহাই হউক গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি, কৃষিবিদ্যালয় ও সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া কার্যনির্বাহের জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েত সৃষ্টি করিতে হইবে। কৃষকসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানই হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

(খ) শোষণ ও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকদিগকে সংগঠিত করিতে হইবে। ফড়িয়াদের নিকট উৎপন্ন শস্য বিক্রয় না করিয়া যাহাতে তাহারা সরাসরি বাজারে শস্য বিক্রয় করিয়া বেশী

লাভবান হইতে পারে তজ্জন্য সমবায় সমিতি মারফত বিক্রয়-ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

ভারতে কৃষিজাত ফসল-বিক্রয়সমস্যা—ভারতে কৃষিজাত ফসল বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা না থাকায় ব্যাপারী কৃষকদিগকে প্রবঞ্চিত করে। পাইকারী ব্যবসায়ীরা আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাজারদর ইচ্ছামত স্থির করে এবং তাহাদের কারসাজিতে বাজারদর উঠা-নামা করে। কৃষকদের বাজার সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান নাই। যানবাহনের তেমন সুবিধা না থাকায় তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। তাই অনেক সময় ব্যবসায়ী যে দর দেয়, সেই দরেই তাহারা শস্য বিক্রয় করে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা এমন নহে যে পরে দাম বৃদ্ধি পাইলে শস্য বিক্রয় করিবে বলিয়া শস্য মজুত রাখিতে পারে। বহুক্ষেত্রেই তাহারা গোলায় শস্য উঠিবার সময় যখন সাধারণতঃ বাজারদর কম থাকে, তখন শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অনেকে আবার মহাজনের নিকট হইতে কর্জের জন্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম দামে মহাজনকে ফসল বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করে। ইহা ছাড়া ফড়িয়ারা অনেক সময় বেশী ওজনের বাটখারা দিয়া মাল ওজন করে এবং মাল খারাপের অজুহাতে কৃষককে কম দাম দিয়া থাকে। এইভাবে নানা উপায়ে কৃষকরা তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ উৎপন্ন শস্যমূল্যের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হয়। আবার অপরদিকে তাহাদিগকে এইভাবে শোষণ করিয়া দালাল ও ফড়িয়ারা লাভবান ও অর্থবান হইয়া উঠে।

বিদর্ভের নিয়ন্ত্রিত বাজারের আদর্শে অন্যান্য প্রদেশেও নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ফসল-বিক্রয়সমস্যার কার্যকরী কোন সমাধান করিতে হইলে দেশে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন, একস্থান হইতে অন্যস্থানে মাল চলাচলের জন্য যানবাহনব্যবস্থার উন্নতি, ন্যায্য বাজার-দর স্থিরীকরণ, দেশের সর্বত্র একই ওজনের বাটখারা প্রচলন, গ্রাম্য ঋণদান সমিতি স্থাপন, মাল মজুত রাখিবার জন্য গুদামঘর স্থাপন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রতিকারের উপায়—সমবায় সমিতির দ্বারাই ফসল বিক্রয়সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে। অল্প সুদে কর্জ দিয়া এই সমিতি কৃষককে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। ব্যাপারীর অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষার জন্য ইহা ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে।

কৃষি-প্রদর্শনীর সাহায্যে কৃষককে উন্নত কৃষিপ্রণালী ও যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত করিতে হইবে। তাহাকে বাজারদর সম্পর্কে সর্বদা অবহিত রাখিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত কার্যেই সরকারকে অগ্রণী হইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

সর্বাগ্রে কৃষিশিক্ষার প্রবর্তন বা অন্ততঃপক্ষে কৃষকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথা তাহারা সমস্যার গুরুত্ব বা সমাধানের উপায় কোনটিই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অতএব সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

কৃষি সম্পর্কে ভারত সরকার কি করিয়াছেন

(১) সরকার কৃষি-গবেষণার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য সম্বন্ধে নানা উপায়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের অধীনে এই গবেষণাকার্য হয়।

(২) সরকার কতকগুলি কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-কলেজ স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারও এ সম্পর্কে প্রচার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনগণের সহিত সম্পর্ক না থাকায় এই ব্যবস্থা তেমন কার্যকরী হইতে পারে নাই।

(৪) সরকার আইন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড জমির ক্রমহ্রাসমান আয়তন রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টাও তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

(৫) জেলা বোর্ডের সহযোগিতায় সরকার গবাদি পশুর রোগ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন।

(৬) যানবাহন ও ফসল বিক্রয়ের জন্য বাজার, গ্রাম্য পথ প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কেও সরকার সচেতন রহিয়াছেন।

(৭) দেশের সর্বত্রই বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব, বোম্বাই, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সরকার সেচব্যবস্থার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

(৮) সমবায় পদ্ধতিতে ঋণদান আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়া সরকার কৃষি-মূলধনসমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে তক্কভী সাহায্য প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় নাই।

(৯) কৃষি-উন্নতি সম্পর্কে সরকারী বিশেষজ্ঞগণ ১,০০০ কোটি টাকার একটি কৃষিপরিকল্পনা করিয়াছেন।

কিন্তু এ সমস্ত প্রচেষ্টাই এতাবৎকাল বিদেশী সরকারের অনিচ্ছা এবং ঔদাসীন্যের জন্য মোটেই কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই।

সিদ্ধান্ত—ভারতীয় কৃষকের উন্নতির জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ভারতের কৃষি-সমস্যার উন্নতি বিধানের জন্যও সেই সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ইতিপূর্বেই আমরা জমি, শ্রমিক, মূলধন ও সংগঠন—এই চারি ভাগের

আলোচনা করিয়াছি। কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, ভারতবর্ষে কৃষি উন্নতির জন্য মূলধন ও উপযুক্ত নেতৃত্বেরও প্রয়োজন আছে।

যুগ যুগ সঞ্চিত এই বিপুল সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। বর্তমানে অনুসৃত নীতির ফলে ইহার সমাধান হইবে না। এই সম্পর্কে জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃঢ় পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রকৃতি ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান দেশরূপে গড়িয়া তুলেন নাই। ভারতবর্ষ খনিজসম্পদেও সমৃদ্ধ। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এই সুযোগে ভারতবর্ষ খনিজসম্পদের প্রাচুর্য, প্রচুর শ্রমিক ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের বৃহৎ বাজার ইত্যাদি সুবিধার জন্য আপন শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার অন্নসংস্থানের জন্য কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

অধ্যাপক ব্রজনারায়ণের মতে ভারতে কৃষি-সংস্কারের জন্য—(১) নিষ্প্রয়োজন বহু কৃষি-শ্রমিককে অন্যান্য শিল্পকার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে দেশে কলকারখানা বাড়াইতে হইবে। (২) সমস্ত ভূমি জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রায়াত্ত করিতে হইবে। এবং (৩) সরকারকে এই সম্পর্কে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

কৃষি-সংক্রান্ত পরিকল্পনা—দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালে তীব্র খাদ্যাভাবের চাপে অধুনা সকলের দৃষ্টি কৃষিকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ভারতের অগণিত জনগণের কৃষিই হইল একমাত্র উপজীবিকা। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, গ্রামের উন্নতি তথা কৃষির উন্নতি সম্পর্কে কিছু করা একান্ত দরকার।

যুদ্ধ শেষ হইবার পর সৈন্যবাহিনী হইতে বরখাস্ত হইয়া অনেক লোক গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল বেকার লোকের আগমনের ফলে গ্রামাঞ্চলের অন্নাভাব সমস্যা আরও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে সরকারের প্রধান সমস্যা হইল এই বিরাট জনসমাজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১,০০০ কোটি টাকার কৃষি বিষয়ক যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা অনুসারে জলসরবরাহ ও জলনিকাশী খাতে ২২৫ কোটি টাকা, রাসায়নিক সার ও বীজের জন্য ১০০ কোটি টাকা, গুদাম ঘরের জন্য ১০০ কোটি টাকা এবং বাকী অংশ বলদ, যন্ত্রপাতি, কৃষি-গবেষণা, শিক্ষার জন্য ব্যয় করার প্রস্তাব হইয়াছিল।

পরিকল্পনার নীতি

(ক) **অভাব হইতে মুক্তি**—প্রত্যেক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কৃষককে সর্বতোভাবে অভাব হইতে মুক্তিদান করা। তাহার অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়সংস্থান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) **ভয় হইতে মুক্তি**—ভারতের কৃষিব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে কৃষক নির্ভয়ে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থাকিলে সে ভয়মুক্ত হইবে না। রাষ্ট্রে কৃষিব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষকের স্বচ্ছল ও স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ থাকা দরকার।

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা—১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ইক্ষু চাষের হ্রাস হইয়াছে শতকরা দশ ভাগ। কারণহিসাবে বলা হইয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশে সেচব্যবস্থার ত্রুটি ও খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি। ফলে চাষীরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত হইয়াছে। চিনির উৎপাদন হ্রাস আশঙ্কায় সরকার চিনির কারখানার মালিকদের মণপিছু নয় আনা হিসাবে কর রেহাই দিয়াছেন এবং প্রয়োজন-মত লৌহ, কয়লা ও সিমেণ্ট সরবরাহ করিবেন।

খাদ্যশস্যের অভাব থাকার জন্য বিদেশ হইতে ১৩০ কোটি টাকা খাদ্য গত বৎসর আমদানী করিতে হইয়াছিল। ১৯৫২ সালে ভারত খাদ্য ব্যবস্থায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবে ভারত সরকার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

মুদ্রা, যাতায়াত-অসুবিধা ও রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জন্য আমরা পাকিস্তানের পাট ও তুলা পাইতেছি না। ভারতবর্ষে পাট ও তুলা উৎপাদনের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা কতদূর ফলবতী হইবে জানা নাই। সকল দেশে সকল জিনিস জন্মায় না বা জন্মাইবার প্রয়োজনও নাই। স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন থাকিলেও কোন দেশ সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে না। অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে যে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী না হইলেও যে দ্রব্যসামগ্রী দেশে অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে উৎপাদন হয় সেই দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিয়া অন্য দ্রব্যসামগ্রীর সহিত বিনিময় করিতে হয়। উৎপাদনে যেমন ধনাগম হয় বিনিময়েও ধনাগম হয়। বৃটেন খাদ্য উৎপাদন করে না, কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব হয় না। বিনিময়েও তাহার খাদ্য আসে। এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজ সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয় নাই। বৈদেশিক মৈত্রী ও ব্যবসাসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা সকল সময়ে করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের কৃষিঋণ

ঋণের পরিমাণ—১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের মতে সমগ্র কৃষকসমাজের এক-তৃতীয়াংশ ঋণভারে পীড়িত এবং প্রায় সমসংখ্যক লোকের ঋণভার এত অধিক যে তাহা পরিশোধের কোন আশা ছিল না। ১৯০১ সালের কমিশন বোম্বাই অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া ছিলেন যে সমগ্র জনসংখ্যার একপঞ্চমাংশ ঋণমুক্ত বাকী সকলেই ঋণজালে আবদ্ধ।

এই কৃষিঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদক ঋণ। ১৯৩১ সালের ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির মতে ভারতীয় কৃষি-ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হিসাবে ১৯৩৭ সালে কৃষি-ঋণের পরিমাণ ১,৮০০ কোটি টাকা ছিল। জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এই ক্রমবর্ধমান ঋণের কারণ বলিয়া অনুমান করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণ দেওয়া হয়—গড়পড়তা সুদের হার ২৫ টাকা।

কৃষি-ঋণ সমস্যার গুরুত্ব—অর্থনৈতিক জীবনের বহু বিপর্যয় ইহার সহিত জড়িত বলিয়া ভারতে কৃষি-ঋণসমস্যা অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এদেশে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অনুৎপাদকে কার্যের জন্য অতি উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই ঋণ পরিশোধের কোন আশা নাই; ভারতে কৃষি-ঋণ প্রায় চিরস্থায়ী বলিলেই চলে। অন্যান্য দেশেও (যেমন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে) কৃষকেরা ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা অল্পসুদের হারে এবং কেবলমাত্র উৎপাদক কার্যের জন্যই ঋণ করিয়া থাকে।

কৃষি-ঋণের কারণ—এইবার আমরা কৃষি-ঋণভারের কারণ সমূহ আলোচনা করিব।

(১) ভারতীয় কৃষকের আয় অতি সামান্য, অপরিসীম দৈন্যের মধ্যে কোন-ক্রমে সে জীবনধারণ করিয়া থাকে মাত্র। তাহার এই দুঃসহ দারিদ্র্যই কৃষি-ঋণভারের প্রধান কারণ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটি সুবৎসর, একটি দুর্বৎসর এবং অপর তিনটি বৎসরে মাঝামাঝি ফসল হয়। একটিমাত্র সুবৎসরে ভালভাবে খাইতে পাইলেও সঞ্চয়ের জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। কাজেই অন্যান্য

বৎসরে ঋণ গ্রহণ করা ব্যতীত তাহার পক্ষে প্রাণধারণের আর কোন উপায় থাকিত না।

তাহার এই অপরিসীম দৈন্যের জন্য দায়ী—(ক) অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত (খ) একমাত্র অবলম্বনরূপে জমির উপর অতি নির্ভরশীলতা—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি ব্যতীত অন্য কোন জীবিকা-অর্জনের পথ নাই, (গ) জমির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, যুদ্ধের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার ফলে তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বটে—কিন্তু এ উন্নতি নিতান্ত সাময়িক। এই উন্নতির ভিত্তিভূমি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ। কৃষির উন্নতি দ্বারা বিঘা প্রতি ফলন না বাড়িলে ও তাহার উপযুক্ত বিক্রয়ব্যবস্থা না হইলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না।

(২) মহাজনের নিকট সহজেই ঋণ গ্রহণের সুবিধা, ঋণ গ্রহণের সহজ ব্যবস্থা ফলে কৃষি-ঋণভারের আরও কয়েকটি কারণ সৃষ্ট হইয়াছে, যেমন (ক) ধারে জমি ক্রয়, (খ) অনুৎপাদক কার্যের জন্য উচ্চসুদের হারে ঋণ গ্রহণ (গ) সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে অকারণ ব্যয় বাহুল্য।

(৩) মামলামোকদ্দমার জন্য কৃষিঋণভার বৃদ্ধি।

(৪) পরিশেষে (ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি চাষের জন্য অল্প উৎপাদন; (খ) উৎপন্ন শস্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না থাকায় অল্প আয় এবং (গ) ভারতে ভূমিকরের গুরুভার ভারতীয় কৃষকের ঋণভার আরও বর্ধিত করিয়াছে।

এককথায়, কৃষকের দারিদ্র্যের যে যে কারণ, কৃষকের ঋণেরও মূলগত কারণ তাহাই।

প্রতিকারের উপায়—

(১) সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ে জীবিকা সংস্থানের জন্য কুটির শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

(২) খণ্ড খণ্ড জমিগুলি একত্রিত করিয়া উন্নত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে সংগঠন এবং ভূমিকর হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) অতি অল্প সুদের হারে কৃষকদিগকে অর্থ সরবরাহ করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে অর্থ-সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ভারতের কৃষি-ঋণ ভার দ্রুত হ্রাস পাইবে।

কৃষি-ঋণ সমস্যা সমাধান করিবার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা—ভারতে কৃষি-ঋণ সমস্যা প্রতিকার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল।

অপ্রয়োজনীয় ঋণ রোধের ব্যবস্থা—অকারণ এবং অপ্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার বিস্তার, মিতব্যয়িতা অভ্যাস, সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষার বিস্তার ধীরে ধীরে হইতেছে, কৃষকের আয় পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে। কয়েকটি সমবায় ও সেভিংস ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে।

জমির হস্তান্তরীকরণ রোধের ব্যবস্থা—মহাজনেরা যাহাতে খাতকের জমি দখল করিতে না পারে সে উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রাদেশিক সরকার প্রজার জমি বিক্রয় বা বন্ধক রাখিবার অধিকার খর্ব করিয়াছে। যেমন পাঞ্জাবে ১৯০০ সালে পাঞ্জাব Alienation of Land Act' পাশ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

অল্পসূদে কৃষিঋণের ব্যবস্থা—টাকাভী লোন—সরকারী ঋণ ও অগ্রিম সাহায্য— কৃষককে অল্প হারে ঋণ দিবার উদ্দেশ্যে টাকাভী আইন, ১৮৮৩ সালের ল্যান্ড ইমপ্রুভমেণ্ট লোনস এ্যাক্ট এবং ১৮৮৪ সালের এগ্রিকালচারিষ্ট লোন এ্যাক্ট রচিত হয়। এই আইন জনপ্রিয় হয় নাই, কারণ প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্য ছিল অতি সামান্য।

সমবায় ঋণদান সমিতি মারফৎ অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা—বস্তুতঃ সমবায় ঋণদান সমিতির দ্বারাই সর্বাপেক্ষা সহজে কৃষককে অল্পসূদে অর্থ সরবরাহ সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তবে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

অতিরিক্ত সুদগ্রহণ রোধের উদ্দেশ্যে আইনপ্রণয়ন—মহাজন কর্তৃক অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কতকগুলি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, ১৯১৮ সালের অন্যায় সুদের আইন অনুসারে আদালত সুদের পরিমাণ অত্যধিক দেখিলে বা খাতকের সহিত মহাজনের কোনরূপ অন্যায় দেখিলে সুদের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতেন।

বর্তমানে আইন করিয়া সুদের হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মহাজনকে নিয়মিতভাবে হিসাবপত্র রাখিতে ও খাতককে দেনা-পাওনার হিসাব দেখাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আইন হইল ঋণ সালিশী আইন।

কৃষক যাহাতে তাহার পুরাতন ঋণভার হইতে মুক্তি পায়, সে উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যেমন বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে। বাংলাদেশে ঋণগ্রস্ত কৃষক আইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ঋণসালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ঋণসালিশী বোর্ডের চেষ্টায় কৃষি-ঋণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে শ্রমিক-খাতক সম্বন্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা—গ্রামাঞ্চলে কৃষি ঋণসমস্যা দুইভাবে সমাধান করিতে হইবে

(১) **পুরাতন ঋণ মকুব**—ঋণসালিশী বোর্ডের মারফৎ মহাজনকে পুরাতন ঋণ মকুব করিতে বাধ্য করিয়া কৃষককে ঋণমুক্ত করিতে হইবে।

(২) **ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা**—অল্পসুদে ঋণপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। দীর্ঘকালীন ঋণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে সরকারী উদ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ৫টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কৃষিঋণ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় ইহা আপন কর্তব্য যথোচিতরূপে পালন করিতেছে না। সম্প্রতি ভারত সরকার পল্লীঅঞ্চলে ঋণদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সমবায় ও ভারতে সমবায় আন্দোলন

কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যখন কয়েকজন ব্যক্তি মিলিতভাবে চেষ্টা করে তখন তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা সমবায় গড়িয়া উঠিয়াছে বলা যায়।

কিন্তু অর্থনীতিতে সমবায়ের অর্থ আরও ব্যাপক হইলেও নির্দিষ্ট।

সমবায় কাহাকে বলে—পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা না করিয়া সৎ উপায়ে কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কয়েকজন ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টার নামই সমবায়। সমবায়ের মূলশক্তি হইল সংঘশক্তি। এককভাবে যাহা করা সম্ভব নয় দশজনের সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসেই তাহা করা যায়।

সমবায়ের লক্ষ্য—সমবায়ের লক্ষ্য হইল মানুষের পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি তথা নৈতিক উন্নতি সাধন।

সমবায় সংগঠনের মূল ভিত্তিসমূহ—

(১) **স্বাধীনভাবে পরস্পর মেলামেশা**—সমবায় সমিতির সভ্যেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের সহিত মেলা-মেশা করিয়া থাকে, এখানে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই।

(২) পরস্পরের সান্নিধ্য—কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সমবায় সমিতির কার্যাবলী সীমাবদ্ধ। সভ্যবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্কবোধ এবং সহযোগিতার উপরই ইহার সফলতা নির্ভর করিতেছে। একই অঞ্চলে বাস কিম্বা একই ব্যবসায় লিপ্ত থাকায় যাহাদের উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ এক কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তিই সভ্য হইলে সমিতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে।

(৩) **প্রত্যেকের সমানাধিকার**—সমবায়ের মূলে রহিয়াছে সাম্য। সমবায় সমিতির সকল সভ্যেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা রহিয়াছে—কাহারও একাধিক ভোট নাই।

(৪) **প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী**—সমবায়ের উদ্দেশ্য হইল : "প্রত্যেকেই আমরা সকলের তরে এবং সকলেই আমরা প্রত্যেকের তরে," একভাবে দুঃখ বা সুখভোগ করিয়া থাকে।

(৫) **মিতব্যয়িতা**—সমবায় সমিতি অবস্থাপন্ন মানুষের জন্য নহে। প্রত্যেকেরই স্বার্থজড়িত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাধারণ মানুষ এখানে সমবেত হয়। সুতরাং নিজস্বার্থে প্রত্যেক সভ্যেরই মিতব্যয়ী এবং সংযমী হওয়া উচিত। অকারণ ব্যয় যাহাতে না হয় তৎপ্রতি সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(৬) **শান্তি**—সমবায় সংঘর্ষের পরিপন্থী। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা উদ্দেশ্যলাভই সমবায়ের লক্ষ্য। সমবায়ের পথ শান্তিপূর্ণ।

সভ্যদের আবশ্যকীয় গুণাবলী—দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক পথ পরিত্যাগ করিয়া সমবায় শান্তির পথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মহাজন, ফড়িয়া ও পুঁজিবাদী মালিককে পরিহার করিতে চেষ্টা করে।

সভ্যবৃন্দের গুণরাশির উপরই সমিতির সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সমবায় সংগঠনের মূলনীতিসমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই এই সকল গুণরাশির বর্ণনা করা হইয়াছে। নিলিখিতভাবে ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করা যায়ঃ—

(ক) **বুদ্ধি বা মেধা**—প্রত্যেক সভ্যেরই সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার মত জ্ঞান বুদ্ধি থাকা আবশ্যক।

(খ) **সততা**—প্রত্যেকেরই সৎভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। সকলকেই যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সমিতির কোনও দ্রব্য অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা উচিত নয়।

(গ) **মিতব্যয়িতা**—কোন সভ্যেরই অমিতব্যয়ী হওয়া উচিত নয়। কেবলমাত্র উৎপাদক কার্যেই ঋণগ্রহণ করা উচিত।

(ঘ) **পারস্পরিক সহানুভূতি**—আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া প্রত্যেককেই বৃহত্তর সার্বজনীন স্বার্থের জন্য সমবেতভাবে কার্য করিতে হইবে।

সমবায়ের প্রকার ভেদ—বিভিন্ন রকমের সমবায় সমিতি রহিয়াছে। সম্পদ উৎপাদন এবং বিতরণ উভয় ক্ষেত্রেই সমবায় সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে।

কৃষিজীবি এবং শ্রমিক উভয়েরই নানাপ্রকার অভাব রহিয়াছে।

উৎপন্নদ্রব্য অধিকমূল্যে বাজারে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য তাহারা একত্রিত হইয়া সমবায় বিক্রয় সমিতি গঠন করিতে পারে। সমবায় ক্রয় সমিতি মারফৎ ইহারা ন্যায্য-মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে।

অল্পহারে ঋণ গ্রহণের জন্য ইহারা সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করিতে পারে।

সমবায় ঋণদান সমিতির মূল ভিত্তিসমূহ—

(১) **সান্নিধ্য**—কোন একটি অঞ্চলবিশেষে এই প্রকার সমিতি গড়িয়া উঠে। ইহার সভ্যরা একই স্থানের অধিবাসী এবং ইহার কার্যক্রম সেইস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সভ্য সংগ্রহের সময় এই ভিত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

(২) **মিতব্যয়িতা**—সমবায় ঋণদান সমিতিতে মিতব্যয়ী ও সংযমী হইতে হইবে।

(৩) **নিরাপত্তা—**ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে নিরাপত্তা না থাকিলে ঋণ দান করা উচিত নয়। ঋণ দান করিলেও তাহা কেবলমাত্র উৎপাদককার্যের জন্যই দেওয়া উচিত।

(৪) **সমদায়িত্ব**—সমিতির ঋণের জন্য সভ্যরা সমভাবে দায়ী, ব্যক্তিগত জামিনে ব্যাঙ্ক ঋণদান করিতে অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু সকলেই সমবেতভাবে জামিন হইলে সমিতির ঋণগ্রহণের সুবিধা হয়।

(৫) **সুখ-সুবিধা**—সভ্যরা অধিকাংশই শ্রমিক বা কৃষক, ইহাদের পক্ষে এককালীন সমস্ত সুদ বা অল্প সময়ের মধ্যে ঋণের শোধ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য অল্প সুদের হারে এবং কিস্তিবন্দিতে মাসিক কিছু কিছু করিয়া ঋণ শোধের সুযোগ দিতে হইবে।

ভারতে সমবায়ের প্রয়োজন—প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশেই ঋণগ্রহণ একান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা অন্যায় যে ভারতীয় কৃষক বৎসরের পর বৎসর কেবলই ঋণ গ্রহণ করিবে।

দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার অভাবে ভারতে কৃষক কৃষি-সংক্রান্ত প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া ঋণ করিয়া থাকে।

সরকারী কোনরূপ ঋণদানের ব্যবস্থা না থাকায় তাহারা গ্রামে মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। মহাজনেরা সকলেই অতিরিক্ত মাত্রায় সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে। কখনও কখনও তাহারা শতকরা ৩৭॥০ হারে ও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করে এবং মিথ্যা হিসাবপত্র দাখিল করে। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান বা মামলা-

মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অনুৎপাদক কার্যে ঋণ দান করিয়া তাহারা কৃষককে অমিতব্যয়ী করিয়া তাহার নিজেরই ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে।

এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কৃষকের ঋণভার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অধিকন্তু উৎপন্ন শস্য অল্পমূল্যে ফড়িয়াদের নিকট বিক্রয় করে। নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ব্যাপারীদের নির্দিষ্ট উচ্চ বাজারদরে ক্রয় করার ফলে তাহাদের দুর্দশা আরও বর্ধিত হয়।

মহাজন ও ফড়িয়াদের পরিহার করিয়া একমাত্র সমবায় পদ্ধতিতে ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্য ও ঋণ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস—বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার উপায় স্বরূপ সমবায় আন্দোলনের উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জার্মেনীতে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। জার্মেনী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া Find Raiffeisen এই দুইটি কথায় আপন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

রাইফাইসেন নামক একজন পরহিতব্রতী সমাজসেবক জার্মেনীর কৃষকসমাজের ঋণজনিত দুর্দশা ও অবনতি লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হন। তিনি তাহাদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে ঋণদান সমিতি গঠন করিয়া ঋণভার হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া সমাজে নূতন প্রাণসঞ্চার করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতির নাম 'রাইফাইসেন সমিতি'।

প্রায় একই সময়ে ডেলিট্‌স্‌ নগরে শুল্‌জ নামক আর একজন পরোপকারী ব্যক্তি ছোট ব্যবসায়ী ও কারিগরদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতি Schulze-Delitzsch Society নামে পরিচিত।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়। ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি বিষয়ক একটি আইন পাশ হয়। ইহার বিধান অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে রাইফাইসেন সমিতির অনুকরণে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা যাইত এবং পৌর ও গ্রাম্য এই দুই ভাগে সমিতি বিভক্ত হয়।

গ্রাম্য লোক লইয়া গঠিত গ্রাম্য ঋণদান সমিতি কৃষককে অল্পহারে প্রয়োজনমত অর্থ সরবরাহ করিত।

নগরে দরিদ্র শ্রমিক ও শিল্পীদের সাহায্য করিবার জন্য Schulze-Delitzsch সমিতির অনুকরণে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল।

১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন অনুসারে ঋণদান সমিতি ব্যতীত স্বাস্থ্য, বীমা, গৃহনির্মাণ, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি নানাপ্রকার সমিতি এবং সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন পৌর ও গ্রাম্য সমিতির মধ্যে পার্থক্য দূর করিয়া সীমাবদ্ধ দায়িত্ব এবং দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহে এমন দুইটি শ্রেণীতে সমবায় সমিতিকে পৃথক করিয়া দেয়।

১৯১৫ সালে ম্যাকলাগান কমিটির রিপোর্টে ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কমিটির মতামত প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ সালে সমবায় প্রাদেশিক সরকারের বিষয় তালিকাভুক্ত হয়। ইহার পর হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে সরকার সমবায় সমিতির প্রসার সম্পর্কে নানারূপ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৭২,১৬৬টি। সমিতিগুলির মোট মূলধনের পরিমাণ ১৬৪ কোটি টাকা এবং মোট সদস্যসংখ্যা ১৮০ লক্ষেরও অধিক ছিল। বিগত ৪০ বৎসরে বিশেষ করিয়া ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অফ্ ইন্ডিয়াকে কৃষিঋণ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছিল। ভারত সরকার বা রিজার্ভ ব্যাংক কেহই গ্রাম অঞ্চলে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনে তেমন উৎসাহ বা আগ্রহ দেখায় নাই।

ঋণদান ব্যাপারে সমবায় পদ্ধতির দ্রুত প্রসার ঘটিলেও ক্রয় বা বিক্রয় ব্যাপারে ইহা তেমন প্রসার লাভ করে নাই।

বঙ্গদেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেচব্যবস্থা সম্পর্কে, পাঞ্জাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি একত্রীকরণ এবং অন্যান্য স্থানে রাস্তাঘাট নির্মাণ, কৃষিকার্যে নানারূপ সাহায্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমবায় পদ্ধতি প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য সমবায় আন্দোলনের তেমন প্রসারলাভ ঘটে নাই। সরকারও এই আন্দোলনকে সাহায্য করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইনকোয়ারী কমিটি মাইনরিটি রিপোর্টে সভ্যগণ বৃটিশ-ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে নৈরাশ্যজনক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত উন্নতি ও প্রসার আশা করা যায়।

ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সমিতি
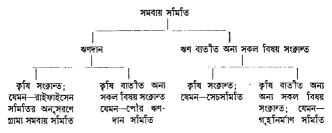
সমবায় সমিতিকে প্রথমতঃ ঋণদান সমিতি এবং ঋণদান ব্যতীত অন্য সকল বিষয় সংক্রান্ত সমবায় সমিতিতে পৃথক করা হইয়াছে। তাহার পর কৃষিসংক্রান্ত সমিতি ও কৃষি ব্যতীত অন্য সকল বিষয় সংক্রান্ত সমিতিতে পৃথক করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রাথমিক সমবায় সমিতি, সেণ্ট্রাল সমবায় সমিতি এবং প্রাদেশিক সমবায় সমিতি রহিয়াছে।

গ্রামে কৃষককে ঋণদানের জন্য কিম্বা সহরে কারিগর ও শিল্পীগণকে ঋণদানের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি রহিয়াছে।

সমবায় আন্দোলন কিভাবে ভারতীয় কৃষককে সাহায্য করিতে পারে?—অল্প হারে ঋণপ্রাপ্তি ব্যতীত ভারতীয় কৃষকের প্রয়োজন জল সরবরাহ, সার, চাষের জন্য বলদ, জমির একত্রীকরণ, ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও তাহা মজুত রাখিবার জন্য গুদাম প্রভৃতি। এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য যথাক্রমে সমবায় সেচ সমিতি, সার ও বীজ ক্রয় সমিতি, বলদ ক্রয় সমিতি, জমির একত্রীকরণ সমিতি, বিক্রয় সমিতি, ক্রয় সমিতি গঠন করা যাইতে পারে।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের বিশেষত্ব—সমবায় পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনবিধি ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিভূমি।

ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি বলিয়া সমবায় সমিতিগুলি প্রধানতঃ কৃষিজড়িত। অতএব ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহা প্রধানতঃ গ্রাম্য আন্দোলন—কৃষকদিগকে নানাভাবে সাহায্য করাই ইহার লক্ষ্য। গ্রাম্য সমিতিগুলির প্রসারলাভ ঘটিলেও নগরে এই আন্দোলনের তেমন প্রসার ঘটে নাই। গ্রাম্য সমিতিগুলি নানা উপায়ে কৃষকসমাজের প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

কৃষি ব্যতীত অন্য সকল বিষয় সংক্রান্ত সমিতিগুলি ঋণদান বা অন্য কার্যে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই।

অল্পবিত্তের কারিগরদের সাহায্যের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি, অল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণের জন্য সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বীমা ইত্যাদি নানা বিষয়ক সমবায় সমিতি রহিয়াছে।

ঋণদান ব্যাপারে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করিলেও অন্যান্য বিষয়ে ইহা তেমন কার্যকরী হইয়া উঠে নাই। ক্রয়-বিক্রয় সমিতি নামেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতে সমবায় আন্দোলনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা জনসাধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত আন্দোলন নহে, সরকারী প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে ইহার সূত্রপাত ও বিস্তার হইয়াছে। অনেকে এই আন্দোলনকে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিতে চাহেন।

সমবায় ব্যাংক—ইহার কার্য—প্রদেশে সমবায় ব্যাংক কাঠামোর সর্বনিম্নে রহিয়াছে প্রাথমিক ব্যাংক(Primary Society), , তাহার ঊর্ধ্বে সেণ্ট্রাল ব্যাংক এবং সর্বোচ্চে রহিয়াছে প্রাদেশিক ব্যাংক।

শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি গ্রাম্য ব্যাংক একত্রিত হইয়া একটি Banking Union বা Guaranteeing Union বা Supervising Union গঠন করে। এই ইউনিয়নসমূহ গ্রাম্য ব্যাংক এবং সেণ্ট্রাল ব্যাংকের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখে, গ্রাম্য সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করে এবং জামিন থাকিয়া শহরের ব্যাংক হইতে ইহাদের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সেণ্ট্রাল ব্যাংকের উপরে প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক রহিয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাংকের প্রধান কার্য হইল প্রাথমিক ব্যাংকগুলির তহবিল ঠিক রাখা ও মূলধন সরবরাহ করা। ইহারা উদ্বৃত্ত তহবিল প্রাদেশিক ব্যাংকে চালান করিয়া দেয়। প্রাদেশিক ব্যাংকও সেণ্ট্রাল ব্যাংক এবং ইহার মারফত গ্রাম্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনমত আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে।

এইভাবে মজুত অর্থ প্রাদেশিক ব্যাংক হইতে সেণ্ট্রাল ব্যাংক; সেণ্ট্রাল ব্যাংক হইতে গ্রাম্য সমিতি এবং গ্রাম্য সমিতি হইতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়।

প্রাদেশিক ব্যাংকের প্রধান কার্য হইল সেণ্ট্রাল ব্যাংকের সহযোগিতায় ঋণদান ও ঋণদান সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা। যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশেই একটি করিয়া প্রাদেশিক ব্যাংক রহিয়াছে।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতির গঠন ও কার্যাবলী—দশজন বা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক লোক একত্রিত হইয়া গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করিতে পারে।

সভ্যদিগকে একই গ্রামের অধিবাসী বা একই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হইবে। কোন সভ্যকে মোট শেয়ারের এক-পঞ্চমাংশের অধিক রাখিতে দেওয়া হইবে না এবং একজন সভ্যের শেয়ারের মোট মূল্যের পরিমাণ ১,০০০ টাকার অধিক হইবে না। লাভের এক-চতুর্থাংশ মজুত তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। সভ্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহে। সমিতির ঋণের জন্য সকল সভ্যই একযোগে দায়ী থাকিবেন।

প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোটাধিকার রহিয়াছে। সমিতির কার্য নির্বাহের জন্য প্রত্যেক বৎসর সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দ বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহাদের উপর ন্যস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। রেজিস্ট্রার সমিতির হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সমিতি পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা এবং প্রয়োজন-বোধে ইহা বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

গ্রাম্য সমবায় সমিতির আয়—সদস্যগণ কর্তৃক ক্রীত শেয়ারের টাকা ও আমানতের টাকা—ইহাই হইল সমবায় সমিতির মূলধন। ইহা ব্যতীত সমিতি ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণভাবে ঋণগ্রহণের অসুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সমবায় পদ্ধতির ভিত্তিতে এ সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রাম্য সমিতির উপরেই রহিয়াছে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক যাহার প্রধান কার্য হইল গ্রাম্য সমিতিগুলিকে ঋণদান করা। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক আবার প্রদেশের রাজধানীতে অবস্থিত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রদেশের আর্থিক লেন-দেন হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

গ্রাম্য সমবায় সমিতির সুবিধা—

(১) সান্নিধ্যের জন্য ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়েরই নানাপ্রকার সুবিধা। (২) অল্প সুদের হার, গ্রামাঞ্চলে ব্যয় অল্পের জন্য অল্পহারে ঋণ দেওয়া হয়। (৩) স্থানের অধিবাসী হিসাবে খাতক কোনরূপ জুয়াচুরি বা অন্যায়ভাবে অর্থব্যয় করিতে সাহসী হয় না। (৪) স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাসভাজন হইলে সকলেই এখানে অর্থ মজুত রাখিবে; ফলে ইহার মূলধন বৃদ্ধি পাইবে। (৫) নানা বিষয়ে ইহা সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসাধন ঘটাইয়া থাকে, যথা—কৃষিসংস্কার, স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পর্কে ব্যবস্থা, কুটিরশিল্পের সংস্কার ও উন্নতি, দুর্ভিক্ষে সহায়তা ইত্যাদি। (৬) ইহা মানুষকে মিতব্যয়ী, সহযোগী ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলে। (৭) সকলকে সমান অধিকার ও সকলকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়া ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারে সহায়তা করিয়া থাকে।

অর্থনৈতিক উপকারিতা—অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ফলে জনসাধারণের প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে। মহাজনের অত্যাচার অনেক হ্রাস পাইয়াছে। সাধারণ লোকে অর্থ মজুত না করিয়া তাহা সমিতিতে বা ব্যাঙ্কে খাটাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া কৃষক সুলভে সার, বীজ ও কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। কৃষক সমবায় সমিতির মারফত ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে; কারিগরও এইভাবে উপযুক্ত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরশিল্পগুলি সমবায় সমিতির সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।

অন্যান্য উপকারিতা—কোন কোন অঞ্চলে যেমন বঙ্গদেশে সমবায় পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে (ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক সমবায় সমিতি) অন্যান্য অংশে সেচ, গৃহ, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যা সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার নৈতিক এবং মানসিক উপকারিতাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, আত্মসংযম, শৃঙ্খলা, আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান, স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণরাশি বিকশিত হইয়াছে। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতিকে সালিশি মানা হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তার এবং চিকিৎসার জন্য কোন কোন সমিতি অর্থসাহায্য করিয়াছে।

মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস, মহাজনের প্রভাব খর্ব, শিক্ষা বিস্তরে এবং জনগণকে মিতব্যয়ী করিয়া সমবায় সমিতিগুলি ভারতের গ্রামে গ্রামে সমাজজীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। কৃষিঋণভার হ্রাস ও কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিতে পারে।

ভবিষ্যৎ—জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উপর সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসার নির্ভর করিতেছে। অতএব সর্বাগ্রে জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার প্রয়োজন।

সমবায় আন্দোলনের দোষ-ত্রুটি—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই আন্দোলনের গতি অতি মন্থর। নানাবিধ দোষ-ত্রুটির জন্য ইহা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও ভারতে কৃষিসম্বন্ধীয় সমবায় আন্দোলন ব্যতীত অন্য প্রকার আন্দোলনের তেমন প্রসারলাভ হয় নাই। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদানের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নাই।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত দোষ-ত্রুটিগুলিও উল্লেখযোগ্য—সময়মত ঋণ পরিশোধ না করা, বেনামীতে ঋণ গ্রহণ করা, পক্ষপাতিত্ব, সরকারী নিয়ন্ত্রণের চাপ, সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত মনোভাবের অভাব, পরিচালক-সদস্যগণের নানা প্রকার দুর্নীতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি-রাজস্বব্যবস্থা

ভূমি-রাজস্বব্যবস্থার গুরুত্ব—ভারতীয় অর্থনীতিতে ভূমি-রাজস্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ভূমিই এদেশের অধিকাংশ লোকের উপজীবিকার একমাত্র উৎস। দেশের সরকারেরও অন্যতম প্রধান আয় ভূমি-রাজস্ব। অতএব ভারতে ভূমি-রাজস্ব কিরূপে নির্ধারিত হয় সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

প্রাচীনকাল হইতে এদেশের রাজা জমির উৎপন্ন ফসলের এক অংশ পাইয়া আসিতেছেন। কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ রাজ-কর দিয়া থাকিত। পরবর্তী মোগল আমলে টোডরমল উর্বরতাশক্তি অনুসারে মধ্যে মধ্যে জমি জরিপ করিয়া শস্যের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভূমি-কররূপে স্থির করিয়া দেন। ব্রিটিশ শাসকগণও মূলতঃ মোগলদের প্রবর্তিত ব্যবস্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

জমির উপর কাহারও একাধিপত্য নাই। সরকার, জমিদার ও কৃষক—এই তিনটি শ্রেণী জমির সহিত বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। প্রত্যেকেরই কতকগুলি ক্ষমতা বা অধিকার রহিয়াছে।

দেশের সর্বময় প্রভু হিসাবে রাষ্ট্র সমস্ত জমির মালিক। রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ বা সরকার কিছু জমি আবার খাসদখলে রাখিতেন, অর্থাৎ সরকার ছিলেন সেই অঞ্চলের জমিদার। নব-ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হইলে সরকার সমস্ত জমিদারী অঞ্চলে জমি খাসদখলে আনিবেন—জমি রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে। সামন্তযুগের জমিদারীপ্রথা লোপ হইবে।

ভূমিব্যবস্থা—ভারতবর্ষে ভূমিব্যবস্থা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) রায়তওয়ারী এবং (২) জমিদারী।

(ক) **রায়তওয়ারী ভূমিব্যবস্থা**—ভারতের প্রায় অর্ধেক অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে রায়ত বা কৃষক সরকারের নিকট হইতে সরাসরি ভূমি গ্রহণ করিয়া থাকে। সরকার ও কৃষকের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী নাই।

রায়ত জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিতে পারে কিংবা ইহা হস্তান্তরিত করিতেও পারে। সরকার উৎপন্ন শস্যের

এক অংশ রাজস্বরূপে কৃষকের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় কৃষককে সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দিতে হয়।

(খ) **জমিদারীব্যবস্থা**—জমিদারীব্যবস্থায় সরকার ও কৃষকের মধ্যে জমিদার-শ্রেণী রহিয়াছে। জমিদার সরকারের নিকট হইতে ভূমি গ্রহণ করেন, আবার জমিদারের নিকট হইতে কৃষক সে জমি গ্রহণ করে। কৃষক জমিদারকে খাজনা দেয় এবং জমিদার সরকারকে রাজস্ব দিয়া থাকে।

রায়তওয়ারী ভূমিব্যবস্থায় কৃষক ভূমি ভোগ করিতে এবং তাহা হস্তান্তর করিতে পারে। কিন্তু জমিদারী ভূমিব্যবস্থায় ভূমি জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মাদ্রাজে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে জমিদারীব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ভূমি-রাজস্ব—সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক নির্ধারিত প্রত্যেক ভূমি খণ্ড হইতে প্রাপ্য সরকারী রাজস্বকে ভূমি-রাজস্ব বলা হয়। জমি জরিপ, তাহার শ্রেণীবিভাগ ও মূল্যনির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বার্থ ও অধিকার বিচার বিবেচনা করিয়া ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হয়।

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের নীতি—ভারতে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট নীতি নাই। সেটেল্‌মেণ্ট কর্মচারিগণ স্থানীয় অবস্থা বিচার করিয়া আপন আপন বিবেচনামত ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

একটি নীতি হইল যে পূর্বেকার হার অনুসারে সর্বনিম্ন একটি হার স্থির করিয়া দেওয়া হয়। শস্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে কিংবা দেশে অর্থনৈতিক সুদিন আসিলে সরকার এই হার বর্ধিত করিতে পারেন। অপর নীতিটি জমিদারীসংক্রান্ত। প্রজা জমিদারকে কি হারে খাজনা দিয়া থাকে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সরকার জমিদারের মোট আয়ের এক অংশ ভূমি-রাজস্বরূপে দাবী করিয়া থাকেন।

সাহারাণপুর নীতি—১৮৫৫ সালে সাহারাণপুরে রাজস্ব নির্ধারণের সময় স্থির করা হইয়াছিল যে রায়তওয়ারী অঞ্চলে মোট উৎপন্ন শস্যের $\frac{1}{2}$ অংশ এবং জমিদারী অঞ্চলে এস্টেটের মোট আয়ের $\frac{1}{2}$ অংশ ভূমি-রাজস্বরূপে সরকারকে দিতে হইবে। এই হার দেশের অন্যত্রও অনুসৃত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা সাহারাণপুর নীতি নামে পরিচিত।

রাজস্বের হার—মোটামুটিভাবে রাজস্বের হার হইল অস্থায়ী জমিদারী অঞ্চলে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ এবং স্থায়ী জমিদারী অঞ্চলে শতকরা ১০ হইতে ২৫

ভাগ। উর্বরতার তারতম্য, জলবায়ু, সেচব্যবস্থা, যানবাহন ও বাজারের সুবিধা ইত্যাদি নানা কারণে এই হার পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

চিরস্থায়ী এবং অস্থায়ী বন্দোবস্ত—এখন প্রশ্ন হইল কত দিনের জন্য ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কিয়দংশে ভূমি-রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাকী অংশে ভূমি-রাজস্ব অল্পকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যেমন,—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য ও অন্যান্য অংশে ২০ বৎসরের জন্য।

এইভাবে ভারতে দুই প্রকার ভূমি-রাজস্বপ্রথা প্রচলিত আছে—(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা, (২) অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা—ইহার বিশেষত্ব—ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত অল্পদিনের জন্য করা হইত। প্রথমে ইহা এক বৎসরের জন্য নির্ধারিত হইত। ইহাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজস্ব আদায় করিতে এবং জনগণকে তাহা শোধ করিতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ১৭৮৯ সালে বঙ্গদেশে "দশশালা" বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং পরে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস উহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় পরিণত করেন। কর্ণওয়ালিসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) ভূমি-রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার আদায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া এবং (২) জমির উন্নতিসাধন। রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলে কৃষক আপন স্বার্থে জমির প্রতি যত্নবান হইবে। ইহা ব্যতীত কর্ণওয়ালিসের মনে সুদূরপ্রসারী কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে এবং ফলে সরকার সহজেই জমিদারশ্রেণীর সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিবে। দেশের তৎকালীন অশান্তি ও অনিশ্চয়তার দিনে কোম্পানীর পক্ষে রাজ্যশাসনের জন্য এইরূপ সাহায্য ও সমর্থন ছিল একান্ত অপরিহার্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিশেষত্ব হইল এই যে, প্রথমতঃ (১) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেওয়া এবং (২) প্রজার সুখসুবিধার জন্য তাহাকে কতকগুলি আইনগত অধিকার দেওয়া—এই দুইটি সর্তসাপেক্ষে ভূমি জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইল।

এইভাবে ভারতে সর্বপ্রথম ভূমির উপর জমিদারের স্বত্ব স্বীকৃত হইল। দ্বিতীয়তঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি-রাজস্ব চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

হইয়াছিল। নিয়মিতভাবে এই রাজস্ব পরিশোধ করিয়া জমিদারগণ বংশানুক্রমে জমি ভোগ করিয়া যাইবেন। অন্যথায় নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ইহা দিতে না পারিলে সরকার সম্পত্তি নীলাম করিয়া রাজস্ব আদায় করিবেন।

তৃতীয়তঃ, এই প্রথা জমিতে অনেক স্বত্বভোগীর সৃষ্টি করিয়াছে। জমিদার ও চাষীর মধ্যে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী রহিয়াছেন। এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা কেবল-মাত্র খাজনা আদায় করিয়া থাকেন; কৃষিকার্য বা জমির উন্নতি বিষয়ে ইহারা কিছুই করে না।

চতুর্থতঃ, জমিদার আপন খেয়ালখুশীমত যে কোন সময়ে প্রজাকে জমি-চাষ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার আলোচনা—যে সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, সে সময় ইহার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। দেশের তৎকালীন অশান্তিপূর্ণ ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় সুষ্ঠু শাসনকার্যের পক্ষে জমিদারশ্রেণীর আনুগত্য ও সহায়তা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার উপর অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

বঙ্গদেশের কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী নানাভাবে জমিদারগণ কর্তৃক অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন। রাজস্বের দিক হইতে সরকার ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল আজও রাজস্বের সেই একই পরিমাণ রহিয়াছে। জমিতে টাকা আবদ্ধ রাখিতে উৎসাহিত করিয়া এই প্রথা বঙ্গদেশে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ও কৃষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় নাই। জমিদারবর্গ কৃষকের দুঃখদুর্দশা ও অভাব-অভিযোগের প্রতিকার না করিয়া তাহাদিগকে শোষণ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন এবং এই অর্থে শহরে ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করেন। নায়েব ও গোমস্তাগণও কৃষককে নানা উপায়ে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে।

ফ্লাউড্ কমিশন—১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে ক্রয় মূল্যের **দশগুণ অধিক** ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকারের সমস্ত জমি নিজ দখলে রাখা উচিত। জমিদারগণ আরও বেশী ক্ষতিপূরণ দাবী করিতেছেন। পক্ষান্তরে জনসাধারণ সমস্ত জমি জাতীয়তা করণের জন্য আন্দোলন করিতেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপ্রথার বিলোপসাধন—সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে— জাতীয় সরকার জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিলুপ্তি সাধন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বিহার প্রাদেশিক সরকার ফ্লাউড্ কমিশনের সুপারিশমত এই বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন। কয়েকটি প্রদেশে ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে সরকারী বিল পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। সরকার সমস্ত জমি জমিদারদের নিকট হইতে ক্ষতি পূরণ দিয়া ক্রয় করিবেন।

অস্থায়ী বন্দোবস্ত—অস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। উৎপন্ন শস্য মূল্য বিচার করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমি রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য কৃষকের কষ্ট লাঘব হইয়াছে।

কিন্তু অল্প সময়ের জন্য ভূমি-রাজস্ব নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। সময় সময় ইহার জন্য কৃষিকার্যও ব্যাহত হইয়া থাকে। সময় যত অল্প হইবে, কুফল ততই বৃদ্ধি পাইবে। নির্দ্ধারিত রাজস্বের মেয়াদ অল্পকালের জন্য হওয়া যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, তেমনি তাহা দীর্ঘমেয়াদী হওয়াও কাম্য নহে।

ভারতে প্রজাস্বত্ব আইন—প্রজাদের মঙ্গল বিধানের জন্য ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্দ্ধারণ, জমি ভোগ দখলের অধিকার নির্ণয়, জমি হস্তান্তরীকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল আইন ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি, জমি হইতে উচ্ছেদ ইত্যাদি জমিদারের নানা অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষা করিয়াছে। অধিকন্তু আইনবলে কৃষক পুরুষানুক্রমে জমি ভোগদখল, বিক্রয়, বন্ধক বা হস্তান্তরিত করিতে পারে।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলাদেশে ভূমিব্যবস্থা—পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশে ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। কয়েক লক্ষ ভূমিহীন কৃষক গত দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অভাবের তাড়নায় ছোট ছোট জোতদার তাহাদের একমাত্র সম্বল সামান্য পরিমাণ জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বিপুল কৃষকসমাজকে জমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার

দুর্ভিক্ষ বলিতে সাধারণতঃ ভীষণ অন্নাভাব বুঝায়। নানা কারণে সময় সময় এমন এক অবস্থা উপস্থিত হয় যখন মানুষ অর্থ দিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে অন্নাভাবে বহু নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্তমানে ভারতের সর্বত্রই অন্নাভাবের জ্বালা মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে।

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ—১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে দুর্বৎসরেও ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা সকল অধিবাসীর অভাব পূরণ করা সম্ভব। ১৮৯৮ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে ভারতে মানুষকে অনাহারে মরিতে হয়। দেশে যে খাদ্য নাই তাহা নহে; উহা কিনিবার মত সামর্থ্য দেশবাসীর নাই।

ভারতবর্ষের প্রকৃত অভাব খাদ্যের নহে—প্রকৃত অভাব অর্থের। বৃটেনেও খাদ্য উৎপাদন হয় না—কিন্তু সেখানে লোক অনাহারে মরে না।

উপযুক্ত কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ সুবিধা না থাকায় এ দেশের অধিবাসীদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কম। সাধারণভাবে বলা যায় বহুলোক বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন। আবার কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই তাহাদের বুদ্ধি বা দক্ষতা অনুযায়ী কর্ম পান নাই।

বিগত পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্মৃতি বাঙ্গালী সহজে বিস্মৃত হইবে না। সেদিন আমরা নিরপরাধ দেশবাসীকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিতে দেখিয়াছি। এই মহামন্বন্তরের ভয়াবহ মৃত্যুসংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধজনিত মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক।

দুর্ভিক্ষের কারণ

ক। অর্থনৈতিক—প্রথমেই ভারতীয় জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভারতের কৃষকসমাজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। শস্য ভালরূপে উৎপন্ন হইলে কৃষক কোন রকমে প্রাণধারণ করিয়া থাকে মাত্র। দুর্বৎসরে

প্রাণধারণের জন্য তাহাকে সাধারণের নিকট দয়া ভিক্ষা করিতে হয়। সংকটের জন্য, দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতবাসীর অপরিসীম দারিদ্র্যের বহুবিধ কারণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধানঃ—

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় নাই।

(খ) কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। জনসংখ্যা প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষিব্যবস্থার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই; আবহমান কাল সেই একই পদ্ধতিতে ভূমিচাষ করা হইতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমি হইতে জনপ্রতি আয় আরও কমিয়া গিয়াছে।

(গ) ভূমি-রাজস্বের গুরুভার।

এবং (ঘ) উৎপাদন এবং বিতরণব্যবস্থার ত্রুটি।

খ। প্রাকৃতিক—

(ক) অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষে কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ৮০ ভাগে কোনরূপ সেচ-ব্যবস্থা নাই। এই সকল অঞ্চলে একমাত্র বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য সম্পন্ন করা হয়। বৃষ্টিপাতের সময় এবং পরিমাণ দুই-ই অনিশ্চিত।

(খ) যানবাহনের অসুবিধা।

দেশের অভ্যন্তরে যানচলাচলের সুব্যবস্থা না থাকায় উদ্বৃত্ত অঞ্চলের খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। সম্প্রতি রেলওয়ে ও রাস্তা নির্মাণের ফলে ভারতের বিভিন্ন খাদ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

(গ) জীবজন্তু কর্তৃক খাদ্যশস্য বিনষ্ট।

ইঁদুর বৎসরে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। বানর, ময়ূর, শূকর, পারাবত এবং পঙ্গপাল ইত্যাদি প্রাণীও নানা উপায়ে বৎসরে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের শস্য নষ্ট করিয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষের বিভীষিকাময়ী রূপ—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর গ্রন্থ "আনন্দ-মঠে"র প্রারম্ভে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মভেদী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিগত পঞ্চাশের মন্বন্তরে সেই চিত্রই আমরা পুনর্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

১৮৬৫-৬৭ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ১ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। যথাসময়ে খাদ্য সরবরাহ করিতে না পারার জন্য সেদিন উড়িষ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাহাতে সমগ্র ভারত চঞ্চল হইয়াছিল।

১৯৪৩ সনে বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিল—সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়—খাদ্যসমস্যাই বর্তমানের সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক কারণগুলির সমাধান করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ক। অর্থনৈতিক—সর্বপ্রথমে সর্বপ্রযত্নে জনসাধারণের দারিদ্র্যের উপশম করিতে হইবে। সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(ক) ভূমির উপর চাপ কমাইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে কৃষকের জীবিকার জন্য অন্যান্য বৃত্তির সংস্থান করিতে হইবে। কুটিরশিল্প এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

(খ) জনবহুল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(গ) ভূমি-রাজস্বের হার কমাইতে হইবে। কৃষিভূমি এবং তাহার নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষককে ঋণদান প্রভৃতি সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

(ঘ) ব্যয়বহুল সামাজিক রীতিনীতি ও মামলা-মোকদ্দমার প্রতি অন্যায় আসক্তি রোধ করিতে হইবে।

খ। প্রাকৃতিক—

(ক) ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে হইবে। ইহার জন্য সর্বপ্রথমে জল-সরবরাহ ও সেচব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিতে হইবে। প্রয়োজনমত বৃষ্টিপাত না হইলে সেচব্যবস্থার জন্য কৃষিকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টিপাতের আধিক্যহেতু যাহাতে খাদ্যশস্য বিনষ্ট না হয় তজ্জন্য উপযুক্ত জলনিকাশী ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজনমত বৃষ্টিপাত এবং ভূমির ক্ষয়প্রাপ্তি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বন-অঞ্চল রক্ষা করিতে হইবে।

(খ) দেশের মধ্যে যানচলাচলের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যে অঞ্চলে

দুর্ভিক্ষের প্রায়ই সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই অঞ্চলে রেলপথ ও রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত তাহার যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। ফলে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে অতি সহজে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যসরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

(গ) জীবজন্তু কর্তৃক খাদ্যশস্য বিনষ্ট করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে। শাসনকর্তৃপক্ষের অক্ষমতার জন্যই মানুষ অসহায়-ভাবে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—জীবজন্তু কর্তৃক খাদ্যশস্য বিনষ্ট হওয়ার জন্য নহে।

কি করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা হইয়া থাকে—প্রাচীন হিন্দু আমল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বহুবার দুর্ভিক্ষ হওয়ার ফলে জনসাধারণের অপরিসীম দুঃখদুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকার করিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের চিহ্ন—অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলে সে বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা থাকে। খাদ্যশস্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং দরিদ্র মানুষ শহরে ভীড় করিবে। দেশে চুরিডাকাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে এবং অনাহারের জন্য নানারূপ মহামারী দেখা দিবে।

দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত আইন—প্রত্যেক প্রদেশেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি আইন লিপিবদ্ধ আছে। অন্নাভাব দেখা দিলে তাহা প্রতিকার করিবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সরকারী কর্মচারিগণ কিভাবে কার্য করিবেন ইত্যাদি বিধিসমূহ উক্ত আইনে লিপিবদ্ধ আছে।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সরকারী ব্যবস্থা—সরকারী ব্যবস্থাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রতিকারমূলক এবং (২) সাহায্যমূলক।

(১) প্রতিকারমূলক সরকারী ব্যবস্থা

(ক) এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রেলপথ নির্মাণ ও সেচব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিতে হয়।

কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেই রেলপথে শীঘ্রই উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে সেখানে খাদ্যশস্য আমদানী করা যায়। দেশমধ্যে রাস্তা তৈয়ারী হওয়ার ফলে খাদ্যশস্য চলাচল আরও সহজ হইয়াছে।

রাজপুতানার শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলে রেলপথে বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন উদ্বৃত্ত খাদ্যঅঞ্চলের সহিত যুক্ত।

জলসেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে জমিতে সব সময় প্রয়োজনমত জল সরবরাহ সম্ভব হইয়াছে।

(খ) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারী কৃষিবিভাগ নানাভাবে মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকে।

(গ) বন-অঞ্চল রক্ষা করিবার জন্য সরকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

(ঘ) সরকার কৃষককে ঋণদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় কেবলমাত্র কৃষিকার্যের জন্যই নহে, কৃষকের দুঃখদুর্দশা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ সরকারী ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণের পরিমাণ খুব অল্প এবং ইহা তেমন জনপ্রিয় নহে।

(ঙ) ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ প্রথার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

দুর্বৎসরে ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখা হয়। পরে কিস্তি-বন্দীতে শোধ দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ-বৎসরের রাজস্ব মকুব করা হয়। কিন্তু ইহাতে কৃষকের নামেমাত্র উপকার হয়।

(চ) সরকারী প্রচেষ্টায় ভারতের সর্বত্রই সমবায় সমিতির প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। এই সমিতি মারফত গ্রাম্য ঋণদানসমস্যার সমাধান করা যায়।

(ছ) সাধারণ রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দুর্ভিক্ষবীমা তহবিলে জমা রাখা হয়। সেচব্যবস্থা নির্মাণের ব্যয় অনেক সময় এই তহবিল হইতে নির্বাহ করা হয়।

(২) সাহায্যমূলক সরকারী ব্যবস্থা—উল্লিখিত দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষকে নানারূপে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেই এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য করা হয়।

সারা বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইল তাহা লিপিবদ্ধ রাখা হয় এবং সর্বদা লক্ষ্য করা হয়। কোন বৎসরে অনাবৃষ্টি হইলে, কিংবা অতিবৃষ্টির ফলে প্লাবন হইলে ইহা বিপদসংকেত হিসাবে গণ্য হয়। দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দিলেই সরকার ঐ সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিলম্ব হইলে জনসাধারণের বিপদ বাড়ে।

(ক) সরকারী দুর্ভিক্ষনীতি ঘোষিত হইবার পর বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নানারূপ সাহায্যমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করে। জনসাধারণের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়।

(খ) সরকার রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখেন বা তাহা একেবারেই মকুব করিয়া থাকেন। সরকার কৃষকদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।
(গ) সরকারী সাহায্য গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের একটি তালিকা তৈয়ারী করা হয়।

প্রথম অবস্থা

(ক) আগামী ঋতুতে শস্যবপনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ বা মেরামত করিবার জন্য জেলাবোর্ডসমূহকেও ঋণ দেওয়া হয়।
(খ) কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য টেস্ট-ওয়ার্কএর কার্য আরম্ভ করা হয়। এই কার্যে কত লোক নিযুক্ত হয়, তাহা দেখিয়া দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বুঝা যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা—অতঃপর টেস্ট-ওয়ার্কসমূহকে স্থায়ী ত্রাণকার্যে রূপান্তরিত করা হয়। গরীবখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্তদের আহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাস্তাঘাট, রেলপথনির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন ত্রাণকার্যে কর্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

শেষ অবস্থা—পরবর্তী বৎসরে বর্ষার সময় যাহাতে তাহারা কৃষিকর্মের প্রতি মনোযোগী হয় সে উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইতে উৎসাহিত করা হয়। কৃষিকর্ম আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে বীজ, গবাদি পশু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য তাহাদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। হেমন্তে ফসল তুলিবার সময় সকল-প্রকার সাহায্যমূলক কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ—বিদেশী সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং নিষ্ঠুর উপেক্ষা এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। প্রাদেশিক সরকার যথাসময়ে সমস্যার তীব্রতার প্রতি গুরুত্ব দেন নাই এবং কেন্দ্রীয় সরকার যখন সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন তখন অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল।

এই মন্বন্তরে সেদিন ৩০ লক্ষ মানুষ পথে-প্রান্তরে অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সামরিক প্রয়োজন, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাকারবার, মুনাফার লোভ ইত্যাদি বহুবিধ কারণের ফলে এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার মজুতদারদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন; জনসাধারণ সরকারকে দোষ দিল। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর রাজ-শক্তির ব্যর্থতা ও অক্ষমতার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত।

উডহেড কমিশনের রিপোর্ট—স্যার জন উডহেডের সভাপতিত্বে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে এই সময় জনগণের অর্থনৈতিক মান হ্রাস পাইয়াছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় নাই। যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারার জন্য কমিশন বঙ্গীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিল। কমিশনের মতে এই দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষে মৃত জনপ্রতি ১,000 টাকা মুনাফা ব্যবসায়ীর হইয়াছিল। মুনাফাশিকারীরা অধিকাংশই অবাঙ্গালী, দুর্নীতিপরায়ণ। রাষ্ট্রশক্তির অক্ষমতার জন্যই ইহারা নিরঙ্কুশভাবে এইরূপ শোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

সেচব্যবস্থা

সেচব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং উপকারিতা—অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল কৃষিপ্রধান দেশে সেচব্যবস্থার গুরুত্ব বেশী। সেচব্যবস্থার দিক হইতে সমগ্র দেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) সিন্ধু, রাজপুতানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টিহীন অঞ্চল—এই অঞ্চলে সেচব্যবস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সেচব্যবস্থার ফলেই কৃষিকার্য সম্ভব হইবে।

(খ) পূর্ব-পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই এবং দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টিপাতের কোন নিশ্চয়তা নাই—এই অঞ্চলেও একমাত্র সেচব্যবস্থার ফলেই কৃষিকার্য সম্ভব।

(গ) বাংলা, আসাম, মালাবার অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক এবং ইহা কিছুটা নিশ্চিত—এখানে সেচব্যবস্থার অভাব তেমন অনুভূত হয় না।

সেচব্যবস্থার ফলে কেবলমাত্র কৃষিকার্যই সম্পন্ন হইবে না; যে সকল শস্য উৎপাদনের জন্য (যেমন, আখ) সারা বৎসর নিয়মিত জল সরবরাহ প্রয়োজন সেই সকল শস্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। জুন হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কাজেই সেচব্যবস্থা ভিন্ন শীতকালীন শস্য উৎপাদন সম্ভব নহে।

যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে শস্য উৎপাদন মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মরুভূমি অঞ্চলে এখন আর জীবনযাত্রা পূর্বের মত কষ্টসাধ্য নহে। সেখানে বর্তমানে ব্যবসাবাণিজ্য চালু হইয়াছে, নূতন গ্রাম ও শহরের উদ্ভব হইয়াছে, নানা-প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেচ ব্যবস্থার ফলে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে; দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে এবং পাঞ্জাবের মত কৃষি-প্রধান প্রদেশে রেলপথ হইতে লাভ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জীবনযাত্রার মান বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানে খাল-পথের সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে ঐ জলপথ দিয়া যান চলাচলের সুবিধা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে সেচ ব্যবস্থা ও ইহার বিস্তার—ভারতবর্ষে ২৮৩·৩ লক্ষ একর ভূমিতে অর্থাৎ মোট কর্ষিত ভূমির ১৮ ভাগে সেচব্যবস্থা রহিয়াছে। পাকিস্থানে ৫৪ লক্ষ একর ভূমিতে মোট কর্ষিত ভূমির ৩৬ ভাগে সেচব্যবস্থা রহিয়াছে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ ব্যয় করা হয় না বলিয়া সরকারকে দোষারোপ করা হয়। অথচ সরকার রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। সেচকার্য হইতে সরকার শতকরা ৭ বা ৮ টাকা লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু রেল বিভাগে ইহার অর্ধেকও লাভ হয় না।

সরকারী সেচ কার্য ব্যতীত বে-সরকারী প্রচেষ্টাতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট কার্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সেচ ব্যবস্থা—ভারতবর্ষে সেচ ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) কূপ; (২) পুষ্করিণী; (৩) খাল।

(১) যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বিহারে কূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) প্রাচীনকাল হইতে এই দেশে পুষ্করিণীর সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মাদ্রাজে ৪০,০০০ হাজার পুষ্করিণী আছে।

(৩) ভারতের প্রায় সর্বত্রই খালের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা রহিয়াছে, খালের দ্বারাই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে জল সরবরাহ করা যাইতে পারে। এইরূপ খাল দুই প্রকার—(১) সর্বদা জলপূর্ণ খাল (২) বন্যার জলপূর্ণ খাল।

নদীতে বাঁধ দিয়া এক স্থানে জল সঞ্চয় করা হয়, ঐ সঞ্চিত জল বিভিন্ন খালের মধ্য দিয়া জমিতে সরবরাহ করা হয়। নদীতে যখন বন্যা হয় কেবলমাত্র তখনই বন্যাপ্লুত খালগুলিতে জল ভর্তি থাকে। আবার সকল ঋতুতেই যে সকল নদীর জলপূর্ণ থাকে সেই সকল নদীর অবিরাম জলপ্রবাহের জন্য সর্বদা জলপূর্ণ খালগুলিতে কখনও জলাভাব হয় না। এই সকল খালের মধ্য দিয়া বৎসরের সকল সময় জমিতে জল সরবরাহ করা হয়।

পাঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী এবং মহানদীর বদ্বীপ অঞ্চলে প্রয়োজনমত সেচ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(খ) উপত্যকার মধ্যে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করা হয়। ঐ জল বিভিন্ন খালের মধ্য দিয়া জমিতে পাঠান হয়। দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বুন্দেলখণ্ডে এইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

উৎপাদক, প্রতিরোধক এবং ক্ষুদ্র সেচ কার্য—সরকারী সেচকার্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(ক) উৎপাদক, (খ) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক এবং (গ) ক্ষুদ্র সেচ কার্য।

খননকার্যের পর দশ বৎসরের মধ্যেই যে সকল খাল হইতে এমন অর্থ উপার্জন হয় যাহা হইতে উহার খনন ব্যয় সম্পূর্ণ নির্বাহ করা যাইতে পারে সেই সকল খালকে উৎপাদক সেচ কার্য বলা হয়। ভারতের দীর্ঘতর খালগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সম্পদশালী অঞ্চল রক্ষা বা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল খাল খনন করা হয় সেগুলিকে প্রতিরোধক সেচ কার্য বলা হয়। ইহা হইতে সরকারের কোনরূপ আয় হয় না। এই দুইটি শ্রেণীর বহির্ভূত ক্ষুদ্র সেচকার্যকে ক্ষুদ্র সেচকার্য বলা হয়।

পাঞ্জাবে খালঅঞ্চলে উপনিবেশ—সেচকার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে পাঞ্জাব ও রাজপুতানা শুষ্ক ও দামোদর উপত্যকায় খাল কৃষি ও উপনিবেশ অনুর্বর মরুভূমি ছিল। ব্যবস্থার ফলে রাস্তাঘাট নির্মিত হইল, নূতন নূতন গ্রাম ও সহরের উদ্ভব হইল। রেলপথনির্মাণের ফলে যানবাহন চলাচলের দ্রুত উন্নতি হইল। এই সকল নূতন বসতি অঞ্চল হইতে পাঞ্জাব সরকার বৎসরে ২ কোটিরও অধিক টাকা লাভ করিয়া থাকে। বৎসরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এই সকল নূতন উপনিবেশ স্থাপনের ফলে পাঞ্জাবে এক নূতন সূত্রপাত হইয়াছে।

দামোদর উপত্যকায় খাল কৃষি ও উপনিবেশ—বিহার ও পশ্চিম বঙ্গে দামোদর উপত্যকাভূমিতে শিল্প ও কৃষি উন্নতির জন্য দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ও ভারত সরকার ও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে যে বিরাট পরিকল্পনা ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহা ভবিষ্যতে দামোদরের প্লাবন রোধ করিবে, প্লাবনের জল বন্ধন করিয়া সেচপ্রণালী দিয়া অনুর্বর জমিকে উর্বর করিবে। জল বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া দামোদর অঞ্চলে শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব করিবে। প্লাবিত অঞ্চলে নূতন নূতন গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠা হইবে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের আয়ের পথ বাড়াইবে।

আট বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল—পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের হিসাব ছিল ৫৫ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য ও সময়ে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না পাওয়ায় হয়ত আরও কয় বৎসর সময় বেশী লাগিতে পারে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য মোট ব্যয় ৫৫ কোটি টাকা হইতে বেশী হইতে পারে।

১৯৪৫ সালে ভারত সরকার বিশেষজ্ঞদের লইয়া কেন্দ্রীয় জলশক্তি, সেচ ও জলপথ কমিশন গঠন করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে সেচ উন্নতি, জলবিদ্যুৎ-এর ব্যবহার ও প্রসার এবং জলপথের উন্নতি বিধায়ক নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। পাঞ্জাবে ভাকড়া বাঁধ, উড়িষ্যায় মহানদী, মাদ্রাজে রামপদসাগর ও বঙ্গদেশে ময়ূরাক্ষীর নূতন সেচ ব্যবস্থা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেচ ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে না। বীজ ও সারের উপকারিতা জলের অভাবে অনুভূত হয় না। ফসল বাড়াইতে হইলে যেমন বীজ ও সারের প্রয়োজন তেমনি জলের প্রয়োজন।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের উন্নত সেচ ব্যবস্থা প্রধানতঃ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ছিল—উভয় স্থলেই সেচ ব্যবস্থা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ও লোকসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের তাগিদে ভারতের সেচ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন।

নবম অধ্যায়

যান-চলাচল ও সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা

যান-চলাচল এবং সংবাদ আদানপ্রদানের সুব্যবস্থার উপর দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও ধন উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে।

যান চলাচল—ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যানবাহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেক বেশী, প্রতিদিনই যাত্রীগণকে শত শত মাইল ভ্রমণ করিতে হয়; মালপত্র দূরে পাঠাইতে হয় বা সেখান হইতে আনিতে হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে হইবে এবং দ্রব্য সামগ্রীও দেশের সর্বত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল নানাকারণে যান চলাচল আরও সুলভ এবং আরও সহজ হওয়া প্রয়োজন। নতুন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, কৃষি ও শিল্পের দ্রুত প্রসার উন্নত যান চলাচল ও সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

১। **রেলপথ**—বর্তমান যুগে আভ্যন্তরীণ গমনাগমনের ব্যবস্থা হিসাবে রেলপথের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ভারতীয় ইউনিয়নে রেলপথের পরিমাণ মোট ৩৪,৫৬৫ হাজার মাইল এবং পাকিস্থানে মোট রেলপথের পরিমাণ ৬,৭৪৮ মাইল। রেলপথে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ভারতীয় ইউনিয়নে ৬৭২ কোটি টাকা এবং পাকিস্থানে ১৩৬ কোটি টাকা।

ভারতবর্ষে ১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম রেলপথ নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৩ সালে লর্ড ড্যালহৌসীর আমল হইতে রেলপথের দ্রুত প্রসারলাভ হইয়াছে।

রেলপথ নির্মাণের ইতিহাস—

(১) **১৮৪৪-১৮৬৯**—ইংলন্ডে সংগঠিত কয়েকটি ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতে রেলপথ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে; যেমন, ই, আই, আর এবং জি, আই, পি, আর। ইহাদের সহিত ভারত সরকারের এইরূপ চুক্তি ছিল যে, রেল পরিচালনায় লাভ না হইলেও ইহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর ভারত সরকার নির্দিষ্ট হারে লাভ দিবেন। এই প্রথা নিশ্চিতলাভের প্রতিশ্রুতির পুরাতন প্রথারূপে পরিচিত।

(২) **১৮৬৯-৭৯**—ভারত সরকার রেলপথ নির্মাণের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে ইহা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইল।

(৩) **১৮৭৯-১৯০০**—১৮৭৯ সাল হইতে নূতন বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় রেলপথ নির্মাণের ভার বৃটিশ কোম্পানীগুলিকে দেওয়া হয়। এইবার কোম্পানীগুলির সহিত এইরূপ চুক্তি হইল যে, গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর লোকসানের জন্য ক্ষতিপূরণ বাদে ও নিশ্চিত লাভবাবদ অর্থ দিবেন। ভারত সরকার নির্দিষ্ট সময়ের পর ইচ্ছা করিলে রেলপথ কিনিয়া লইতে পারিবেন। এই ব্যবস্থাকে নিশ্চিত লাভের প্রতিশ্রুতির নূতন প্রথা বলা হয়, (বি, এন, আর এবং এম, এস, এম, আর)।

(৪) **১৯০০-১৯১৪**—এই সময়ে রেলপথের দ্রুত প্রসার হয় এবং ইহা হইতে আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৫) **১৯১৪-১৯২১**—মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে, পরিচালনা কার্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

(৬) **১৯২১**—এ্যাকওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার স্বয়ং রেলপথ অধিকার করিতে সিদ্ধান্ত করিল। রাষ্ট্র কর্তৃক রেলপথ পরিচালনার নীতি গৃহীত হইল।

(৭) **১৯২৫**—১৯২৫ সাল হইতে রেল রাজস্ব সাধারণ রাজস্ব হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৮) **১৯৩৯-১৯৪৫**—রেলপথে গমনাগমনে চরম বিশৃঙ্খলা এবং যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা।

(৯) **১৯৪৭**—ভারতবিভাগের ফলে এন, ডব্লিউ, আর, বি, এ, আর ও যোধপুর হায়দ্রাবাদ রেলপথ বিভক্ত হইল, ৬,৭৪৮ মাইল রেলপথ পাকিস্থানের অধিকারভুক্ত হইল। রেলওয়ে-কারখানা, স্লিপার, ব্রিজ-গার্ডার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সম্পত্তি ও সামগ্রীও উভয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

ভারতীয় রেলপথের অধিকার এবং পরিচালন-কর্তৃত্ব—

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সমগ্র রেলপথ আজ রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীন, রেলওয়ে বোর্ড মারফৎ সরকার রেলপথ শাসন-পরিচালনা করিয়া থাকেন।

(১) রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনাধীন রেলপথ ব্যতীত (যেমন ই, আই, আর) ভারতে আরও একপ্রকার রেলপথ রহিয়াছে, যথাঃ—

(২) কোম্পানী কর্তৃক এবং কোম্পানী পরিচালনাধীন রেলপথ-যেমন মার্টিন কোম্পানীর রেলপথ।

ভারতীয় রেলপথ পরিচালন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। জনমত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালন-পদ্ধতির অনুকূলে।

রেলপথের শ্রেণীবিভাগ—রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য বিচার করিয়া ইহাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ—

(১) **ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত রেলপথ**—এই রেল পথ নির্মাণের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বা বিদেশে মাল পত্র চলাচলের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

(২) **দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক রেলপথ**—যে সকল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রায়ই থাকে সেখানে রেলপথ নির্মাণের ফলে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঐ এলাকায় দ্রুত খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে। আজ রেলপথে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যে কোনও স্থানে অন্নকষ্ট দূর করা সম্ভব।

(৩) **সীমান্ত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ**—হিমালয়ের অপর দিক বা আফগানিস্থান এবং ব্রহ্মদেশ হইতে শত্রু অভিযান প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রেল-পথ নির্মাণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক হইতে এই সকল রেলপথের গুরুত্ব সমাধিক। বর্তমান আসাম রেল লিঙ্ক এই পর্য্যায়ে পড়ে। পাকিস্থানের খাইবার রেলওয়ের কথা বলা যায়।

ভারতে রেলপথ স্থাপনের ফলাফল এবং সুবিধা

রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক সুবিধা—ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে শাসন-ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য, বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত রেলপথের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক।

সামাজিক সুবিধা—রেলপথ বিস্তারের ফলে দূরবর্তী গ্রামের সহিত সহরের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পর মেলামেশার ফলে মানুষের হৃদয় প্রসারিত ও উদার হইয়াছে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে, অনেক কুসংস্কার দূর হইয়াছে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে রেলপথের সাহায্যে দ্রুত খাদ্য-বস্তু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করা সম্ভব হইয়াছে।

অর্থনৈতিক সুবিধা—ভারতের গ্রাম্য অর্থনীতিতে, শিল্প-ব্যবসায়, বৈদেশিক বাণিজ্যে, মূল্য নির্দ্ধারণে এবং লোক বসতির ঘনত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে রেলপথ নির্মাণের প্রভাব অতি পরিস্ফুট।

রেলপথ নির্মাণের ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের স্বাতন্ত্র্য আজ লুপ্ত হইয়াছে। সহরের সহিত গ্রামের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে গ্রামের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহর হইতে আমদানী করা এবং সহরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রাম হইতে রপ্তানী করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রাম্য কৃষক এবং কারিগর তাহাদের উৎপন্ন মালের জন্য অধিকতর উচ্চমূল্য লাভ করিতেছে। তাহাদিগকে আর বাধ্য হইয়া স্বল্প মূল্যে গ্রামের মধ্যেই সমস্ত মাল বিক্রয় করিতে হয় না।

দীর্ঘকাল যাবৎ সরকার এইভাবে রেল নীতি নির্ধারণ করিতেন যাহাতে কাঁচা মাল বিদেশে অধিক পরিমাণে রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে শিল্প-সামগ্রী এদেশে আমদানী হয়। বস্তুতঃ রেলনীতিই বৈদেশিক-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। আজ রেলপথ নির্মাণের ফলে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারলাভ হইয়াছে। রেলপথদ্বারা সহজে কাঁচা মাল একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনা যায় এবং শ্রমিক চলাচলেরও সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া রেলপথের সাহায্যেই কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য সহজেই দূরবর্তী অঞ্চলে বিক্রয় করিতে পারা যায়। রেলপথের ফলে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে।

যেখানে লোকবসতি বেশী রেলপথের সাহায্যে সেইস্থান হইতে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা অল্প-বসতি স্থানে যাইয়া বসবাস করিতে পারে। রেলপথের সাহায্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাট্‌তি অঞ্চলে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানী করা সম্ভব হইয়াছে। ফলে দেশের সর্বত্রই দ্রব্যসামগ্রীর দাম প্রায় সমস্তরে আসিয়াছে। রেলপথ হইতে সরকারের আয়ের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেলপথ স্থাপনের অসুবিধা—

১। (ক) রেলপথ বিস্তারের ফলে বিদেশ হইতে মাল আমদানী সহজ হইয়াছে। সস্তা বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কুটির শিল্পগুলি

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে আমাদের গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবনেও নানা বিপর্যয় দেখা দিয়াছে।

(খ) দেশের অভ্যন্তরে একস্থান হইতে অন্য স্থানে এবং বিদেশে কাঁচা-মাল রপ্তানীর সুবিধা হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। রেলপথ নির্মাণের ফলে জল-নিকাশের স্বভাবিক ব্যবস্থা রুদ্ধ হইয়াছে। দেশে বন্যার প্রকোপ ও নানারূপ ব্যধি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। **জলপথ**—ভারতীয় জলপথ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) আভ্যন্তরীণ জলপথ এবং (২) সামুদ্রিক বা বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক জলপথ।

(ক) **আভ্যন্তরীণ জলপথ**—ভারতবর্ষ নদী-মাতৃক দেশ, গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ২৬,০০০ মাইল নৌ-চলাচলের উপযোগী। তাহা ছাড়া মাদ্রাজ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের খালগুলিও নৌ-চালনার উপযুক্ত।

(খ) **সামুদ্রিক জলপথ**—জলপথে বাণিজ্য ও চলাচল স্থলপথ হইতে কম ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইউরোপীয় দেশেও জলপথের বিস্তারের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ভারতের উপকূল বাণিজ্য প্রধানতঃ বিদেশী কোম্পানীগুলির হাতে রহিয়াছে। উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য পর্যাপ্ত বাণিজ্য জাহাজ ভারতের নিজের থাকা আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানীগুলি একচেটিয়া অধিকার খর্ব্ব হইতেছে। ভারতের পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিতে বা বিদেশের পণ্য ভারতে আমদানী করিতে এখনও আমাদিগকে বিদেশী জাহাজ-কোম্পানীগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়।

জাহাজ নির্মাণ—সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীণ জলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বাণিজ্যপোত নির্মাণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশীয় পোত বিনা বিদেশী জাহাজে ভারতীয় পণ্য দেশে বা বিদেশে বাজারে বিক্রয় করা ব্যয়সাধ্য হইবে। বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য হটিয়া যাইবে।
সম্প্রতি বিশাখাপত্তন বন্দরে একটি ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সরকারী কর্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে ভারতে যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দ্রুত ভারতীয় পোতবাহিনীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

রেলপথ ও জলপথের সুবিধা-অসুবিধার তুলনা—

১। জলপথ অপেক্ষা রেলপথে অতি শীঘ্র মাল চলাচল করা সম্ভব, কিন্তু রেলপথ অপেক্ষা জলপথে খরচ অনেক কম।

২। জলপথে শুধু মাল চলাচলই নয় ইহার সাহায্যে জমিতে জল সরবরাহ করাও সম্ভব, রেলপথে কেবলমাত্র মাল চলাচল করিতে পারে।

৩। রেলপথ জলনিকাশী ব্যবস্থা অবরুদ্ধ করিয়া দেশে নানাপ্রকার রোগ বিস্তার করিয়াছে, জলপথে জলনিকাশের সুব্যবস্থা হওয়ার ফলে দেশের স্বাস্থ্য ভালই থাকে।

৪। রাজস্বের দিক হইতে রেলপথ অপেক্ষা জলপথেই বেশী আয় হইয়া থাকে।

৩। **রাজপথ**—ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তার পরিমাণ খুব কম। প্রত্যেক প্রদেশেই এমন বহু জেলা সদর ছিল যেখান হইতে প্রাদেশিক রাজধানীতে যাইবার মত মোটর চলাচল করিতে পারে এমন সহজ রাস্তা ছিল না। বহু গ্রাম রহিয়াছে যাহাদের সহিত নিকটবর্তী সহরের কোনও পথ-ঘাটের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নাই। কোন কোন স্থানে মহকুমা সহরের সহিত জেলার প্রধান সহরের কোন সহজ যোগাযোগ নাই। ইহা শাসন ব্যবস্থা ও ভারতীয় অর্থনীতির দিক হইতে অবাঞ্ছনীয়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বহুলাংশে উপযুক্ত রাস্তা-ঘাটের উপর নির্ভর করিতেছে।

ভারতীয় রাজপথগুলিতে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রধান রাজপথ—প্রধান রাজপথগুলি সাধারণতঃ আন্তঃপ্রাদেশিক যেমন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। প্রাদেশিক সরকার এই সকল আন্তঃ প্রাদেশিক রাজপথের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

(২) প্রাদেশিক রাজপথ—জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সকল রাজপথ নির্মিত হইয়াছে। জেলা বোর্ড ইহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

(৩) গ্রাম্য পথ—ইউনিয়ন বোর্ড গ্রাম্য রাস্তাগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। উপযুক্ত মেরামতের অভাবে বহু রাস্তার অবস্থা শোচনীয়।

রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং তত্ত্বাবধানের ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত। সুপরিকল্পিত উপায়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাস্তা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশেই একটি রোড বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে রাস্তার উন্নতি—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম সহায়করূপে রাস্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব এযাবৎ দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে সকলেই ইহার গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে মোটর চলার মত রাস্তা ছিল মোট ৬৪,০০০ হাজার মাইল এবং মোটর চলার মত নহে এরূপ রাস্তার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ মাইল। বর্তমানে মোটর চলাচল বাড়িয়া যাওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত উন্নতি হওয়ায় রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মোটর চলাচল জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে রাস্তার সহিত রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মোটর চলাচল গ্রাম্য জীবনে নানারূপ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে।

যুদ্ধোত্তর পথ নির্মাণ পরিকল্পনা—ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর পথ নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ বৎসরের মধ্যে ৪ লক্ষ মাইল পথ নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এইরূপ বিস্তৃত পথ নির্মাণের ফলে কৃষি অঞ্চল, গ্রাম, সহর ও ব্যবসা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রের সহিত অতি সহজে যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। এই পথগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ—(ক) জাতীয় রাজপথ—রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য নির্মিত। (খ) প্রাদেশিক রাজপথ, (গ) জেলা-পথ এবং (ঘ) গ্রাম্য-পথ।

যোগাযোগ ও সংবাদ আদান প্রদানের অন্যান্য ব্যবস্থা—যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান প্রদানের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে ডাক, তার, টেলিফোন, বিমান ও বেতার উল্লেখযোগ্য।

৪। **ডাক, তার ও টেলিফোন**—ভারত সরকারের অধীনে ডিরেক্টর জেনারেল অফ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন ভারতীয় ডাক, তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ডাক বিভাগের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ৯টি সার্কেলে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮টি সার্কেল পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অধীন।

ডাকঘর—ডাকঘরের মারফৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হইয়াছে।

সাধারণ ডাক-সংক্রান্ত কার্য ব্যতীত ডাকঘরে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। দেশবাসী এই ব্যাঙ্কে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন। ম্যালেরিয়া প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সরকার ডাকঘর মারফৎ কুইনাইন বিক্রয় করিয়া থাকেন।

দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত ডাক চলাচলের জন্য সম্প্রতি বিমান ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তার ও টেলিফোন—পূর্বে তার একটি পৃথক বিভাগ ছিল। বর্তমানে ডাক

ও তার একই বিভাগের অধীন। তার বিভাগের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশের যে কোনও স্থানে সংবাদ পাঠান যায়। বেতার মারফৎ সংবাদও তার বিভাগ ধরিয়া থাকে এবং বেতার মারফত সংবাদ পাঠাইয়া থাকে। ভারতের সকল স্থানের টেলিফোন এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রধান প্রধান সহরের সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোন প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে যে কেহ দিল্লী, লণ্ডন, নিউইয়র্ক বা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে টেলিফোন যোগে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

যথাসম্ভব অল্প খরচে সংবাদ পাঠানই ডাক ও তার বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেতারে সংবাদ প্রচার—অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও পাকিস্থান রেডিও—সম্প্রতি এদেশে বেতারে সংবাদ প্রচার ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই এবং কলিকাতা বেতার কেন্দ্র পুনর্গঠিত এবং শক্তিশালী হইয়াছে এবং মাদ্রাজ, লাহোর, ঢাকা, ত্রিচিনপল্লী, লক্ষ্মৌ, কটক, শিলং-গৌহাটি, পাটনা, নাগপুর ইত্যাদি স্থলে বিভিন্ন নূতন বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতের মত বিশাল নিরক্ষর দেশে বেতারের সাহায্যে শিক্ষাদানের মহতী সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানুষ পড়িতে না পারিলেও অতি সহজেই শুনিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। বেতার জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে পল্লীঅঞ্চলের জন্য নানারূপ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। যুদ্ধোত্তরকালে পল্লীঅঞ্চলে বেতারের দ্রুত প্রসার লাভ হইয়াছে। আগামী যুগে ভারতের সমাজ জীবনে বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিমান চলাচল—সময় ও দূরত্বের গণ্ডী বিমান চলাচল দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। ভারতের মত বিশাল দেশে সামরিক দিক হইতে বিমান চলাচলের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

ইতিমধ্যেই ভারতের প্রধান নগরগুলিতে বেসামরিক বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বিমানপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি প্রদেশের মধ্যেই বিভিন্ন সহরে বিমান পথে যাওয়া যায়। দুই বা তিন দিনের রেলপথ বিমানপথে তিন হইতে ছয় ঘণ্টায় যাওয়া যায়। বিমানপথে ডাক চলাচল হওয়ায় চিঠিপত্র বিলির সুবিধাও হইয়াছে। বিমানপথে দ্রব্য সামগ্রী পার্শেল করা যায়—বিমানের মাশুল বেশী হওয়ায় অনেকে বিমানপথে যাতায়াত করার সুবিধা আজও গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

এদেশে বিমানপোত নির্মাণের ব্যবস্থা হইলে স্বদেশজাত বিমান ব্যবহারে দেশ ও দেশবাসিগণ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায়

কুটির শিল্প

ভারতে কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা—ভারতের কুটির শিল্পের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। এমন একদিন ছিল যেদিন প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনাহার বা দারিদ্র্য কি তাহা ভারতবাসী জানিত না। এ কথা যেন আজ উপকথা। ভারতের অর্ধেক অধিবাসীর নিকট দুই বেলা দুই মুঠা আহার আজ স্বপ্নমাত্র। দারিদ্র্য ও অনাহারই তাহার সাথী। সুবৎসরে কৃষক তিন মাসের জন্য কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে এবং এই সময় তাহার গড় আয় বৎসরে মাত্র ৪০৲ টাকা। দুর্বৎসরে এই সামান্যতম আয় হইতেও সে বঞ্চিত হয়।

বস্তুতঃ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাবেই ভারতবাসীর দারিদ্র্য আজ এত তীব্র ও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বৎসরের নয় মাসই কৃষককে বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয়।

ভারতের অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই কর্মহীন বিরাট জনসমাজের কর্মসংস্থান করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে যে কোন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিবার পূর্বে স্বভাবতঃই কুটিরশিল্পের কথা মনে উদিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে অতি সহজে কুটিরশিল্পে নিয়োজিত করিয়া এই সমস্যা সমাধান করিবার এত সহজ পন্থা আর নাই। মহাত্মা গান্ধী এইজন্যই গ্রাম্য কুটিরশিল্পের পুনর্গঠনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

কুটিরশিল্প কাহাকে বলে—গৃহে বসিয়া যে সকল শিল্পকর্ম অতি সহজে সম্পন্ন করা যায় তাহাদিগকে কুটিরশিল্প বলা হয়।

এই সকল শিল্পকর্মে মূলধন অতি অল্পই লাগে। শ্রমিক নিজ পরিবারবর্গের সহায়তায় অতি সহজে ইহা সম্পন্ন করিয়া স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা অনেকটা বংশগত।

ভারতীয় কুটিরশিল্প ধ্বংসের কারণ—প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণে ভারতীয় কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেঃ—

(১) দেশীয় রাজ্যগুলি বিদেশীর করতলগত হওয়ার ফলে রাজন্যবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

(২) বৈদেশিক মালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

(৩) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির ঔদাসীন্য—ইংলণ্ডের অর্থনীতি ও ভারতীয় অর্থনীতির স্বার্থসংঘাত।

(৪) কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

(৫) ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারত সরকারের উদাসীন মনোভাব।

কিন্তু দ্রুত শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার কুটিরশিল্পকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারে নাই। এখনও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহা আপন অস্তিত্ব সগৌরবে বজায় রাখিয়াছে।

কুটিরশিল্পের টিকিয়া থাকিবার কারণ—

(ক) কুটিরশিল্পী তাহার উৎপন্ন মাল নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় করে। বাজারের অবস্থা ও ক্রেতার চাহিদা সে ভালভাবেই জানে।

(খ) কুটিরশিল্পগুলির জন্য অল্পমূল্যের সামান্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়; এগুলি কারিগর সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে। পরিবারের সকলেই কারিগরকে তাহার কার্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

(গ) কারিগর আধুনিক উন্নত ছোট ছোট যন্ত্রপাতিগুলিকে সুকৌশলে আপন কার্যে লাগাইয়াছে।

(ঘ) সূক্ষ্ম শিল্পকার্যে কিংবা ক্রেতার রুচিবিশেষ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদনে কুটিরশিল্পের কারিগর আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

(ঙ) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চলে আজিও কুটিরশিল্প আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া এখনও সেখানে কারখানাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব বোধ হয় নাই।

(চ) অল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ফলে কুটিরশিল্প যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে।

(ছ) অবসর সময়ে কর্মহিসাবে অনেক ব্যক্তি কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে।

কয়েকটি ভারতীয় কুটিরশিল্প—সম্প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি কুটিরশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ এবং নিখিল ভারত গ্রাম্যশিল্প সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীও উল্লেখযোগ্য।

বিদেশে ভারতীয় শাল, কার্পেট, নানাবিধ সূচীকর্ম, রৌপ্য ও এনামেলের কাজ প্রভৃতি শিল্পের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে।

প্রধান প্রধান কুটিরশিল্প—ঃ

১। **তাঁত-শিল্পঃ**—তাঁত শিল্প ভারতের প্রধানতম কুটিরশিল্প। এই শিল্পে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। বর্তমানে ভারতে বিক্রীত মোট কাপড়ের শতকরা ৩০ ভাগ তাঁতশিল্প হইতে পাওয়া যায়। তাঁতশিল্পে উৎপন্ন কাপড়ের মোট মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

১৯০৫-৬ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যে এই শিল্প হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ১০৮ কোটি গজ হইতে বর্ধিত হইয়া ১৪৯ কোটি গজ দাঁড়াইয়াছে।

নানারূপ সামাজিক প্রথা, মোটা কাপড়ের চাহিদা এবং মিলের কাপড় অপেক্ষা তাঁতের কাপড় বেশী টেঁকসই এইরূপ বিশ্বাস ইত্যাদি নানা কারণে তাঁতশিল্পের চাহিদা আজও অব্যাহত রহিয়াছে। এই শিল্পে অল্প মূলধন দরকার হয় এবং কৃষি-কর্মের পর অবসর সময়ে কার্য করিতে পারা যায় বলিয়া অনেকে ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উপরন্তু পরিজনবর্গের সহায়তার জন্য উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়।

২। **পশমশিল্পঃ**—পশমশিল্প দ্বারাও বহু লোক জীবিকা অর্জন করে। কাশ্মীর, অমৃতসহর, মির্জাপুর, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল শাল ও কার্পেটের জন্য বিখ্যাত। বিদেশী প্রতিযোগিতা, দেশীয় শিল্পীদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং সংগঠন-হীনতার ফলে মহাজনদের অত্যাচারের জন্য এই শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

৩। **গুটিপোকা পালন ও রেশমশিল্পঃ**—এককালে এই শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার, মহীশূর, আসাম ও কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে গুটিপোকা পালন করিয়া রেশম তৈয়ারী হয়। বেনারসে উৎকৃষ্ট রেশমী শাড়ী তৈয়ারী হয়।

অন্যান্য কুটিরশিল্পের মধ্যে মাটির দ্রব্য, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সূচীকর্ম, সাবান তৈয়ারী, তামাক ও বিড়ি তৈয়ারী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কুটিরশিল্প

১। **তাঁতশিল্পঃ**—বাংলাদেশে কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্পই সর্বপ্রধান। ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতশিল্প বিশেষ বিখ্যাত। চরখা ও খাদি-আন্দোলনের ফলে কাটুনীর সংখ্যা বাড়িয়াছে।

২। **কাঁসা ও পিতলের কাজঃ**—কাঁসা ও পিতলের বাসনের জন্য মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা বিখ্যাত।

৩। **বাঁশ ও বেতের কাজ ও মাদুর তৈয়ারীঃ**—এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর, যশোহর ও ত্রিপুরার নাম উল্লেখযোগ্য।

৪। **হাতির দাঁতের কাজ, শাঁখার কাজ, বোতাম তৈয়ারী ঃ**—যশোহরের বোতাম-শিল্প, ঢাকার শাঁখার কাজ এবং মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ বিখ্যাত।

৫। **লেস তৈয়ারী ঃ**—দার্জিলিং, হুগলী এবং ২৪ পরগণা লেস তৈয়ারীর জন্য বিখ্যাত।

মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগর এবং ছুরি-কাঁচির জন্য কাঞ্চননগরের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া ঝুড়ি তৈয়ারী, মাছধরার জাল তৈয়ারী, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানা-প্রকার ছোট ছোট শিল্পকর্ম রহিয়াছে।

কতকগুলি কুটিরশিল্পে কারিগরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে হয়; যেমন—রেশমশিল্প, বাসন তৈয়ারী, মাটির কাজ ইত্যাদি। এই কাজ ছাড়া সে আর অন্য কোন কাজ করিতে পারে না। আবার কতকগুলি কুটিরশিল্প কৃষিকর্মের পরিপূরক হিসাবে করা হয়। কৃষিকর্মের পর অবসর সময়ে এই সব শিল্পকর্ম সম্পন্ন করা হয়; যেমন—দড়ি তৈয়ারী, তেলের ঘানি, গুড় তৈয়ারী, বিড়ি, সিগারেট প্রস্তুত ইত্যাদি।

কুটিরশিল্পগুলির অসুবিধা—কুটিরশিল্পের উন্নতির পথে প্রধান প্রধান অসুবিধা হইল ঃ—

(১) কারিগরী শিক্ষার অভাব।

(২) মূলধনের অভাব। গ্রাম্য মহাজনের নিকট ঋণগ্রহণ করা হইলে তিনি অধিকাংশ শিল্পদ্রব্যই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন।

(৩) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাব।

(৪) বাজারের অবস্থা এবং দাম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব।

(৫) জনগণের সহযোগিতার অভাব ও রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য।

কুটিরশিল্পের উন্নতির উপায়—কুটিরশিল্পগুলিকে সাহায্য করিয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহার জন্য সর্বাগ্রে জনগণের মধ্যে কুটিরশিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও এই শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ক। **কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা**—দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার চাহিদা নানারূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে। নানাবিধ প্রয়োজনে সরকারকে বহু কোটি টাকার মাল কিনিতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যকে প্রথম স্থান দিতে হইবে। ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারিলে জনসাধারণও ক্রমশঃ কুটিরশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

খ। **কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের সরবরাহ**—কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইলে প্রথমতঃ, তাঁতশিল্প, লেস তৈয়ারী, চামড়াশিল্প ইত্যাদি শিল্পগুলির পুনর্গঠন

ও সম্প্রসারণ করিতে হইবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, সাবান, দিয়াশলাই, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি তৈয়ারী, রং তৈয়ারী, বেতের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ক) ইহার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন কুটিরশিল্পীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার এবং বিশেষ করিয়া শিল্পশিক্ষার বিস্তার।

(খ) স্থানীয় শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য কুটিরশিল্পীকে ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক নানারূপ সংবাদ দিতে হইবে। উপযুক্ত শিল্পীকে উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) কুটিরশিল্পের প্রচারকার্য এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।

(ঘ) নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

(ঙ) সস্তায় কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে সমিতি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

(চ) অল্পহারে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক প্রদেশে সরকার এই কার্যে কুটিরশিল্পীকে ঋণদান করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

যন্ত্র-শিল্প

প্রয়োজনীয়তা—ভারতবর্ষে কৃষির পরেই যন্ত্র-শিল্পের স্থান। আগামী যুগে যন্ত্রশিল্পের প্রসার এবং উন্নতির উপর আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

যন্ত্রশিল্পের উন্নতির উপায়—মোটামুটিভাবে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। যথাঃ—

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য;

(খ) শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ও গুণাগুণ;

(গ) প্রয়োজনমত মূলধন সরবরাহ;

(ঘ) সরকারী শিল্পনীতি।

শিল্পজগতে ভারতবর্ষের অনগ্রসরতার কারণ—ভারতবর্ষে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিক এবং অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে। তবু ইহা শিল্পজগতে এত পশ্চাদ্পদ কেন?

যন্ত্রশিল্পে উন্নতির উপায়গুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমিক রহিয়াছে সত্য; কিন্তু

(১) এই সম্পদের অধিকাংশই বিদেশী ব্যবসায়িগণ শোষণ করিয়া থাকেন (কয়লা, পেট্রলিয়ম, স্বর্ণ ইত্যাদি)।

(২) প্রয়োজনমত সুদক্ষ শ্রমিক নাই। অল্প বেতনের জন্য, শিক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য শ্রমিকগণ সুদক্ষ হইবার সুযোগ পায় নাই।

(৩) ধনী ব্যক্তিরা যন্ত্রশিল্পে টাকা খাটাইতে ইচ্ছুক নহেন। টাকার অভাবে শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে পারেন না।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিরা একমাত্র কৃষিকার্যে বা বড় জোর পাট ও তুলা ইত্যাদি শিল্পে টাকা খাটাইতেন। কাহারও কাহারও মতে ভারতে প্রকৃতপক্ষে মূলধনের অভাব রহিয়াছে।

(৪) শিল্প বা ব্যবসাজগতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির তেমন আবির্ভাব ঘটে নাই। পুঁথিগত শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়ার ফলে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বা

ব্যবসায়ীর আত্মপ্রকাশ হয় নাই। প্রয়োগাত্মক বিদ্যার প্রতি অসীম আগ্রহের ফলেই একদিন জার্মেনী শিল্পক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল।

(৫) বিদেশী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক নানারূপ অসাধু ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনেক দেশী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(৬) রেলপথের উচ্চ মাশুল অনেক সময় শিল্পবিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

(৭) পূর্বতন সরকারী নীতিও শিল্পে অনগ্রসরতার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

পূর্বতন সরকারী নীতি—যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে সরকার কখনই সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নিতান্ত বাধ্য হইয়াই ভারত সরকার এ সম্পর্কে কতকগুলি শিল্পনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন—যন্ত্রশিল্পে দেশকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন (১৯১৬-১৮) ভারত সরকারকে এ সম্বন্ধে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেয়। নানারূপ গবেষণা, পরামর্শদান, প্রদর্শনী, আর্থিক সাহায্য ও এই শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি নানাভাবে সরকার এই শিল্পকে সাহায্য করিতে পারেন।

ভারত সরকার সাধারণভাবে শিল্পনীতি নির্ধারণ করিতেন; প্রাদেশিক যন্ত্র-শিল্প সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন।

সরকারী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালে একটি ভারতীয় স্টোরবিভাগ স্থাপিত হয়। এই বিভাগ যথাসম্ভব ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিত।

অবাধ বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ—ভারতীয় শিল্পে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা— শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে হইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রথম অবস্থায় শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি পৃথিবীর প্রত্যেকটি শিল্পপ্রধান রাষ্ট্র শিল্প-বিস্তারের প্রথম অবস্থায় আপন আপন শিল্পগুলিকে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করিয়াছিল। বিদেশী পণ্যকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে বহুকাল যাবৎ অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল; যে কেহ এখানে ব্যবসা করিতে পারিত। ইহার ফলে দেশীয় শিল্পগুলির উন্নতি একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেইজন্য নেতৃবৃন্দ বহুদিন পূর্ব হইতেই ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের দাবী করিতেছিলেন। তাঁহাদের সর্বপ্রধান যুক্তি হইল—**শিশুশিল্প সংরক্ষণের যুক্তি।**

ভারতের নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির শৈশবাবস্থায় পণ্যের উৎপাদন ব্যয় শিল্পপ্রধান দেশের পণ্য উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। কাজেই উন্নত দেশের সহিত অবাধ প্রতিযোগিতায় ভারত সহজেই পরাজিত হয়। অতএব দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে সংরক্ষণ ছাড়া পথ নাই। ইহা ছাড়া অন্য যুক্তি হইলঃ— (ক) বিভিন্ন প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে কৃষির উপর চাপ কমিয়া যাইবে। লোকেরা নানারূপ কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইবে। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে জীবনের মান উন্নত হইবে। (খ) রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য শিল্পসংরক্ষণ অপরিহার্য।

শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী সাহায্য—নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে ভারত সরকার দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দান করিয়াছেনঃ—

(১) সরকার নিজেই কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—চামড়াশিল্প। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রমাণ করিয়া ইহাদের মালিকানা ও পরিচালনভার ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

(২) আপন প্রয়োজনের জন্য সরকার দেশীয় দ্রব্যই সর্বাগ্রে ক্রয় করিয়া থাকেন।

(৩) শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নতি বিধানের জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই সরকারী শিল্পবিভাগের অধীনে একটি গবেষণাগার রহিয়াছে।

(৪) সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও ম্যানেজারের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সরকার আপন ব্যয়ে ছাত্রদিগকে পাঠাইয়া থাকেন।

(৫) বিদেশ হইতে আনীত লৌহের উপর উচ্চ হারে মাশুল ধার্য করিয়া সরকার দেশীয় লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এইভাবে বহু দেশীয় শিল্প সংরক্ষিত হইয়াছে।

(৬) ক্ষেত্রবিশেষে সরকার ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্যও করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের রাজস্বনীতি ভারতীয় রাজস্ব কমিশন

বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালে ভারতীয় রাজস্ব কমিশন বৈদেশিক দ্রব্যসামগ্রীর উপর প্রথম গুরুভার কর চাপাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে দেশীয় শিল্পকে আর্থিক সাহায্য করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলির আনুকূল্যে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (Policy of Discriminating Protection) অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন।

শুল্ক বোর্ড—কোন্ কোন্ শিল্পকে সংরক্ষণ করা উচিত তাহা বিচার করিবার জন্য রাজস্ব কমিশন একটি স্থায়ী শুল্ক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করেন।

কোন শিল্পে নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থা বর্তমান থাকিলে শুল্ক বোর্ড তাহা সংরক্ষণের জন্য সরকারের নিকট অনুমোদন করিতে পারেনঃ—

(১) শিল্পটিতে নানাবিধ স্বাভাবিক সুবিধা থাকা প্রয়োজন, যেমন কাঁচামালের সরবরাহ, জল বা বৈদ্যুতিক শক্তি ও দেশীয় চাহিদা বা বাজার।

(২) অদূর ভবিষ্যতে সংরক্ষণের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া শিল্পটি বিশ্ব-প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারা চাই।

(৩) শিল্পটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাহা বিনা সংরক্ষণে একেবারেই উন্নত হইবে না অথবা যত শীঘ্র দেশের স্বার্থে উন্নতি প্রয়োজন তত শীঘ্র উন্নত হইবে না।

শুল্ক বোর্ড যদি দেখেন যে উল্লিখিত সর্তাবলী অনুসারে শিল্পটি সংরক্ষণের যোগ্য, তাহা হইলে সেইরূপ সুপারিশ করিবেন।

শুল্ক বোর্ডের সুপারিশে ভারত সরকার শিল্পটি সংরক্ষণের জন্য আইনের খসড়াটি ভারতীয় আইন পরিষদে সমর্থনের জন্য উপস্থিত করিবেন।

সংরক্ষণের ফলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি

বৎসর	লৌহ-ইস্পাত	তুলাজাত দ্রব্য	শর্করা (ইক্ষু হইতে)	দিয়াশলাই	কাগজ
	হাজার টন হিসাবে	লক্ষ গজ হিসাবে	হাজার টন হিসাবে	গ্রোস (লক্ষ হিসাবে)	হাজার টন হিসাবে
১৯২২-২৩	১৩১	১,৭২৫	২৪	৮	২৪
১৯৩৯-৪০	২০৭	৪,০৩১	১,২৪২	১৮০	৭০
১৯৪৮-৪৯	২৭৩	৩৭,৩৪৭	২৫,৯০১	১৬০	১৪১

সংরক্ষণ দানের পর ২০ বৎসরের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে এবং কতকগুলি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যথা;—লৌহ ও

ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাগজশিল্প, বস্ত্রশিল্প, দিয়াশলাই শিল্প এবং শর্করা শিল্প।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পপতির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইলেও শিল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। বহু শিল্প শিল্পপতি ও সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে শোচনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন। শ্রমিকরাও অনেক সময় সুপরিচালিত না হওয়ায় শিল্প সমস্যার বিপদ বাড়াইতেছে। বোর্ডের উচিত এই সকল ভারতীয় শিল্পগুলিকে সুপরিচালিত ব্যবস্থায় আনা ও প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ করা।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ভারত সরকার তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের সহিত বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ক্ষেত্রেও গ্রেট বৃটেনকে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দান করিতে হইয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকার সুবিধা দানকে ইংরাজীতে economic preferences বলে। যথা;— বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চলের দ্রব্য সামগ্রী অপেক্ষা বৃটিশজাত সামগ্রীর উপর অল্পহারে শুল্ক ধার্য করা হইয়া থাকে। এইরূপ সুবিধা দানের জন্য ভারতের কোনরূপ উপকার সাধিত হয় না; পরন্তু দেশবাসীকে উচ্চমূল্যে বিদেশী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে হয়। নিজেদের আর্থিক ক্ষতি এবং দেশের স্বার্থ হানি করিয়া আমরা বিদেশী সাম্রাজ্যের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করি। বহুদিন ধরিয়া ভারতীয় জনমত এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য দাবী করিতেছে, স্বাধীন ভারতে এই সকল ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।

অটোয়া চুক্তি—কয়েক বৎসর পূর্বে স্যার সম্মুখম চেট্টির নেতৃত্বে ভারত সরকারের এক প্রতিনিধিদল অটোয়া নগরীতে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে বৃটিশ ভারতে বৃটিশ সামগ্রীকে এবং বিলাতে ভারতীয় সামগ্রীকে বিশেষ সুবিধাদানের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ভারতীয় স্বর্থের পরিপন্থী বলিয়া এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল; এমন কি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদও ইহার নিন্দা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় বাণিজ্যে সমানাধিকার—সর্বক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ স্বত্বাধারী স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র আজ সকল দেশকে বাণিজ্যে সমান অধিকার দিবে এই আশা সকল দেশ করিতেছে। ভারত সকল দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে অধিকারী হইবে যদি ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সকলে দেশের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপন করে।

বৃটিশ কমনওয়েলথের দেশসমূহ যে বিশেষ সুবিধা এযাবৎ কাল এদেশে পাইয়াছে তাহার সংস্কার হইলে বৃটিশ শাসিত দেশসমূহ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ কোন পক্ষপাত করিবে না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ আজ ভারতের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী হইয়াছে। ভারতেরও আজ নূতন সুযোগ আসিয়াছে। ভারতীয় স্বার্থে ভারতীয় পণ্য বিদেশীর কাছে বিক্রয় করিয়া ভারতীয়গণ লাভবান হইতে পারেন।

যুদ্ধ এবং ভারতীয় শিল্প—যুদ্ধপূর্ব কালে ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্প হইল, বস্ত্র শিল্প, পশম শিল্প, পাট শিল্প, শর্করা, লৌহ এবং ইস্পাত, দিয়াশলাই, কাগজ, সিমেণ্ট, এ্যামোনিয়াম সালফেট, চা ও কফি।

এই সকল শিল্পজাত দ্রব্য প্রধানতঃ দেশের মধ্যে বা পার্শবর্তী দেশসমূহে বিক্রয় হয় বলিয়া যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পজগতে তেমন কোন পরিবর্তন হয় নাই।

ভারতবর্ষে বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং বা রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শ্রমিক বা কারিকর বিশেষ কিছুই নাই।

শিল্প বিষয়ে ভারতের উন্নতি প্রধানতঃ বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি আমদানীর উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকালীন যুদ্ধের জন্য এই সকল জিনিষ আমদানী করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল এবং এদেশের কল কারখানাগুলিতে কেবলমাত্র সামরিক উপকরণাদি তৈয়ারী হইত।

এদেশে যুদ্ধের পূর্বে ৬০০ শত কল কারখানা ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই সংখ্যা বর্ধিত হইয়া ২,০০০ হাজার হয়, বর্তমানে দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে।

প্রথম দিকে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে কোনরূপ কার্যকরী সরকারী ব্যবস্থা না থাকায় মুদ্রাস্ফীতির জন্য মূল্য আশাতীত বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া অবশেষে সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বেসামরিক জনগণকে সামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, এই উদ্দেশ্যে শিল্প ও সরবরাহ নামে একটি পৃথক সরকারী বিভাগ স্থাপিত হইল। বর্তমানে অর্থনৈতিক এবং শিল্পোন্নতি সংক্রান্ত সুপরিকল্পনার অভাব প্রত্যেকই অনুভব করিতেছেন।

ভারতে বিদেশী মূলধন—মূলধন বিনা দেশের শিল্পোন্নতি সম্ভব নহে। ভারতীয় মূলধনের স্বল্পতা, বিদেশী শাসকের স্বার্থপ্রণোদিত শিল্পনীতি এবং শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় মালিকশ্রেণীর অর্থ নিয়োগে অনিচ্ছা ইত্যাদি নানা কারণে এদেশে প্রধানতঃ বৈদেশিক মূলধন এবং প্রচেষ্টায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া

উঠিয়াছে। মোটামুটি ৮০০ কোটি হইতে ১৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মূলধন এদেশের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের ফলেই ভারতের বর্তমান শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

পাট শিল্প, চা, কফি, নীল ইত্যাদি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিদেশী মূলধনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অবাধে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের ফলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে প্রয়োজনাতীত মূল্য দিতে হইয়াছে। এক সময়ে ইহার প্রয়োজন ছিল বর্তমানেও সে প্রয়োজন আছে। যদি কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন দেশে না থাকে দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃসহ জীবনের মান উন্নত করিতে হইলে বিদেশ হইতে মূলধন আনিতে হইবে এবং সে মূলধনের জন্য ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

মূলধনের জন্য কোন রাজনীতিক মূল্য দিতে ভারতবর্ষ প্রস্তুত নয়—ভারতীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব সকল ভারতীয় শিল্পের উপর থাকিবে।

যন্ত্রের যুগে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাবে আমাদের উৎপাদন শক্তি কম ও আমাদের জনপ্রতি মাসিক আয় ১৯৩৯ সালের হিসাবে মাত্র ৬৲। দেশের বুভুক্ষু জনসাধারণের এই শোচনীয় দুরবস্থা দূর করিতে হইলে মূলধন, শ্রম ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের পক্ষে যুক্তি—

(ক) ভারতীয় মূলধনের স্বল্পতার জন্য বিদেশী মূলধন নিয়োগ করিবার ফলে দ্রুত শিল্পোন্নতি হওয়া সম্ভব।

(খ) ভারতে বিদেশী মূলধনের সাফল্য দেখিয়া দেশীয় ধনী ও মালিকশ্রেণী বিভিন্ন শিল্পে মূলধন নিয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছে।

(গ) শিল্পের সাফল্য সম্পর্কে ঝুঁকি গ্রহণ বা ক্ষতি স্বীকার বিদেশী বণিক-দিগকেই করিতে হয়। শিল্পে অবনতি হইলে দেশবাসীগণকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না।

ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের বিপক্ষে যুক্তি—

(ক) বিদেশী মূলধন নিয়োগের ফলে ভারতে বৈদেশিক প্রভাব কায়েম হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, জাহাজী কারবার, চা, পাট, কয়লা, স্বর্ণ, পেট্রলিয়ম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিদেশীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত হইতে শুধু মূলধন নিয়োগের সুদ হিসাবে নয়, মুনাফা হিসবে

এবং বিদেশী কর্মচারীদের বেতন হিসাবেও বিরাট অঙ্কের টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়।

(খ) খনিজ সম্পদ সীমাবদ্ধ বলিয়া খনিজ শিল্প বা মাইনিং শিল্পে বিদেশী মূলধন নিয়োগ জাতীয় স্বর্থের পরিপন্থী।

(গ) অবাধে বিদেশী মূলধন নিয়োগের ফলে কেবলমাত্র ভারতীয় অর্থনীতিতে নহে ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বৈদেশিক স্বার্থ জাঁকিয়া বসিয়াছে।

(ঘ) রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্পগুলির মত অন্য শিল্পগুলিরও রাষ্ট্রীয় মূলধন ও প্রচেষ্টা দ্বারা উন্নতি সম্ভব।'

ভারতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক প্রভুত্ব কোনমতেই আর স্বীকার করা উচিত নহে। সরকারের উচিত এইরূপ মূলধন নিয়োগ নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্তমানে একত্রিত হইতে হইবে। প্রয়োজনবোধে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করা সরকারের কর্তব্য। যত শীঘ্র এদেশে বিদেশী মূলধন নিয়োগ প্রথা বন্ধ হইবে তত শীঘ্র এদেশের মঙ্গল হইবে।

প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প—ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প হইলঃ—

(১) **বস্ত্রশিল্প**—ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইল বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চল। উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-ভারত, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা ও মাদ্রাজ প্রদেশেও কাপড়ের কল রহিয়াছে। ভারতে ৪৩৫টি কাপড়ের কল রহিয়াছে। এই শিল্পে ৬·৩৫ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে, পাকিস্থানে ১৬টি কাপড়ের কল রহিয়াছে এবং সেখানকার মোট শ্রমিক সংখ্যা ২০,০০০, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪,৮৭১ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্পে প্রভূত লাভ হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতের প্রয়োজনমত কাপড় মিলগুলিতে তৈয়ারী হইতে পারে; এমন কি কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানী করা যাইতেও পারে। তথাপি মিহি সূতার কাপড়, ছাপা কাপড় প্রভৃতি এখনও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ভারতীয় মিল-গুলিতে সাধারণতঃ মোটা সূতার কাপড় তৈয়ারী হয়। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য সরকার এই শিল্পটিকে সংরক্ষিত করিয়াছেন।

(২) **পাটশিল্প**—পাটশিল্পের কেন্দ্র বাংলাদেশ। অধিকাংশ পাটকল বিদেশীয়দের পরিচালনাধীন। একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য এই শিল্পে আশাতীত লাভ হইয়া থাকে, ভারতে ইহাই সর্বাপেক্ষা সুগঠিত শিল্প।

ভারতে বর্তমানে মোট ৯৫টি পাটকল রহিয়াছে এবং এই শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যা হইল ২·৩ লক্ষ। পাকিস্তানের পাট সরবরাহ না হওয়ায় এই শিল্পের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

যুদ্ধের সময় এই শিল্পকে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সরকারী সংরক্ষণ নীতির ফলে নিম্নলিখিত শিল্পগুলির উন্নতি সাধিত হইয়াছেঃ—

(৩) **লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প**—এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বিহার। জামসেদপুরে টাটার লৌহকারখানা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম বৃহৎ কারখানা। এখানে ৪৮,০০০ শ্রমিক কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে ভারতে ১·৭৫ কোটি টন কাঁচা লোহা এবং ৭৫০,০০০ টন ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে উৎপাদন বর্ধিত হইয়া কাঁচা লোহা ২ কোটি টন এবং ইস্পাত ১·২৫ কোটি টনে দাঁড়ায়। ভারতীয় ইউনিয়নে ৩৫টি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা রহিয়াছে এবং মোট শ্রমিকসংখ্যা হইল ৫৮,৪৫০ জন। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প হইল ভারতের প্রধান শিল্প। ১৯২৪ সালে সরকার সর্বপ্রথম এই শিল্পকে সংরক্ষণ দান করেন। এই শিল্পের আশাতীত উন্নতি হইলেও এখনও বিদেশ হইতে লৌহ ও ইস্পাত আমদানী করিতে হয়।

(৪) **কাগজশিল্প**—এদেশে ১৬টি কাগজের কল রহিয়াছে। মোট মূলধনের পরিমাণ ৪ কোটি টাকা এবং বৎসরে ১,৪০,০০০ টন কাগজ তৈয়ারী হয়।

(৫) **দিয়াশলাই শিল্প।**

(৬) **চিনি শিল্প**—১৯৩১ সালে চিনি শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা হওয়ায় এই শিল্পের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ১৫১টি চিনির কল আছে এবং মোট শ্রমিকসংখ্যা হইল ৮২,১৮৩ জন। পাকিস্তানে ৯টি চিনির কল রহিয়াছে এবং শ্রমিকসংখ্যা হইল ৩,৭৭১ জন।

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে চামড়া, রাসায়নিক, কাঁচ, কয়লা, স্বর্ণ, পেট্রোলিয়ম এবং ম্যাঙগানিজ প্রভৃতি শিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য।

কয়লা—কয়লাখনিসমূহে ১৭০,০০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। বৎসরে প্রায় ২৫ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়। কলকারখানা ও রেল-স্টীমার চালু রাখার জন্য কয়লা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা বর্তমানে অন্যতম জাতীয় শিল্পে পরিণত হইয়াছে। উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি এবং শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। দেশের কয়লাসঙ্কট নিবারণ করিবার জন্য একজন কোল কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে কয়লা বিশেষ প্রয়োজন।

কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা—সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র এক ভাগ শ্রমিক-শিল্পে নিযুক্ত—সুগঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও অনেক কম।

ইউরোপীয় শ্রমিকজীবনের সর্বপ্রকার দুঃখদুর্দশা ও কুফল ভারতীয় শ্রমিক-সমাজেও লক্ষ্য করা যায়। যথা—সংখ্যাধিক্য, চরিত্রহীনতা, অসাধুতা, মদ্যপান, ঋণ-গ্রহণ, জুয়াখেলা ইত্যাদি।

কারখানার শ্রমিকগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসী। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়িয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহারা কলকারখানায় কাজ করে। তাহাদের মন গ্রামেই পড়িয়া থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা গ্রামে চলিয়া যায়। কারখানা অঞ্চলে তাহারা কখনও স্থায়ীভাবে বাস করে না।

ভারতীয় শিল্পশ্রমিকের দক্ষতার অভাবের কারণ—ভারতীয় শিল্প পশ্চাৎপদ হইবার একটি প্রধান কারণ এদেশের শিল্প-শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব।

ভারতীয় শ্রমিকেরা অন্য দেশের তুলনায় কম কর্মদক্ষ। বোম্বাই ও আমেদাবাদের পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা জাপানী নারী শ্রমিক অধিকতর কর্মদক্ষ। ভারতীয় শ্রমিকের কর্মে অপটুতার কারণ চারি দফায় আলোচনা করা যায়। যথা—(১) শারীরিক, (২) সামাজিক, (৩) শিল্পসংক্রান্ত এবং (৪) যন্ত্রসংক্রান্ত।

ভারতীয় শ্রমিকের স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ। অল্প বেতনে পুষ্টিকর খাদ্য বা স্বাস্থ্যকর বাসস্থান সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কাজেই অতি সহজেই ভারতীয় শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভাঙিগয়া পড়ে। ইহা ছাড়া বাল্যবিবাহ এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাওয়ার অভ্যাসের জন্যও তাহারা কর্মে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে না। শিল্পশিক্ষার অভাব, শিক্ষানবিশী থাকিবার কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকা এবং বহু পুরাতন যন্ত্রপাতি লইয়া কার্য করা ইত্যাদি নানা কারণে ভারতীয় শ্রমিক দক্ষতা অর্জন করিতেছে না।

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে। যথা—সর্দারী-প্রথার বিলোপ সাধন, অধিক পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, কারখানাগৃহের উন্নতিসাধন এবং শিল্পপরিচালন নীতির পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন এবং শিল্পশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

প্রাচ্যদেশে সর্বত্রই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সর্বত্রই আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। এইভাবে একটি নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

শ্রমিকদিগকে কর্মদক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সরকার নানারূপ আইন বিধিবন্ধ করিয়াছেন। শিল্পপতিগণ উন্নতিবিধায়ক নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং শ্রমিকগণ নিজেরাও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়া দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হইয়াছে।

ভারতে অল্পমাত্রায় উৎপাদন এবং বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন—ভারতবর্ষে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন ভিন্ন দ্রুত শিল্পোন্নতি বা বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব নহে। বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের জন্য প্রচুর অর্থ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে বিদেশ হইতে এই সমস্ত আমদানী করিতে হইবে। কিন্তু বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনশিল্পের উন্নতির জন্য অল্পমাত্রায় উৎপাদনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই। জার্মানীতে খেলনা, সুইজারল্যাণ্ডে ঘড়ি, জাপানে রেশমী কাপড়, শেফিল্ডে খাবার বাসনপত্র, নটিংহামে হোসিয়ারী দ্রব্য প্রভৃতি এখনও গৃহে তৈয়ারী হয়।

নৈতিক এবং সামাজিক দিক হইতে ভারতীয় জীবনের সহিত কলকারখানার দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ ও চরিত্রহীন জীবনযাত্রার কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায় না। মুক্ত ও স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলি আজও আমাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে কৃষির পরিপূরক হিসাবে এবং অবসর সময়ে কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় অর্থনীতি কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথোচিত সাম্য থাকা প্রয়োজন। নানাপ্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমিবে। কৃষকদিগকে বর্তমানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বসিয়া থাকিতে হয়। কৃষিকর্মের জন্য কয়েক মাস পরিশ্রম করিলেই চলে। অবসর সময়ে কৃষকেরা বিভিন্ন প্রকার কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে। কুটিরশিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে; দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। জাতীয় মঙ্গলবিধানের জন্য দুইটি শিল্পেরই যথোচিত উন্নতি বিধান প্রয়োজন।

বোম্বাই পরিকল্পনা—টাটা-বিড়লা পরিকল্পনা—বোম্বাই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল—(ক) জাতীয় আয় বৃদ্ধিকরণ এবং (খ) অধিকতর অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সহ মোট ১৫ বৎসর সময় এবং ১০,০০০ কোটি টাকা লাগিবে বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে আগামী ১৫ বৎসরে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বর্ধিত সম্পদ বিতরণের কোনরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা

এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ সম্পদ উৎপাদনের মত ন্যায়সঙ্গত-ভাবে তাহা বিতরণের উপরই অর্থনৈতিক সাম্য অধিকতর নির্ভর করে। দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে প্রথমটি কার্যকরী করিতে ১,৪০০ কোটি, দ্বিতীয়টির জন্য ২,৯০০ কোটি এবং তৃতীয়টির জন্য ৫,৭০০ কোটি টাকা লাগিবে। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের উপর দ্বিতীয়টির সাফল্য এবং দ্বিতীয়টির সাফল্যের উপর তৃতীয়টির সাফল্য নির্ভর করিতেছে। পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার জন্য নিম্নলিখিতভাবে অর্থ সংগৃহীত করা হইবে:—

ভারতে মজুত স্বর্ণ		৩০০ কোটি
বৈদেশিক অর্থ		২,৩০০ ”
ভারতের পাওনা স্টার্লিং মুদ্রা ...	১,০০০ কোটি	
ভারতের বাণিজ্যিক ভারসাম্য ...	৬০০ ”	
বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ ...	৭০০ ”	
		২,৬০০ ”
ভারতের আভ্যন্তরীণ মূলধন		৭,৪০০ ”
ভারতের জনগণের সঞ্চিত অর্থ ...	৪,০০০ কোটি	
ভারতের মুদ্রাস্ফীতি বা কাগজী মুদ্রা (রিজার্ভ ব্যাংক হইতে)	৩,৪০০ ”	
		১০,০০০ কোটি

নিম্নলিখিত খাতে টাকা ব্যয় হইবে:—

শিল্প ...	৪,৪৮০ কোটি
কৃষি ...	১,২৪০ ”
সংবাদ আদানপ্রদান ...	৯৪০ ”
শিক্ষা ...	৪৯০ কোটি
স্বাস্থ্য ...	৪৫০ ”
গৃহনির্মাণ ...	২০০ ”
বিবিধ খাতে ...	২,২০০ ”
	১০,০০০ কোটি

পরিকল্পনাকারীরা আশা করিয়াছিলেন যে, জাতীয় সরকার এই পরিকল্পনা সমর্থন করিবেন। শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা থাকিলেও এই পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি সম্পর্কে তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় উন্নতির জন্য সমগ্র শিল্পব্যবস্থা অচিরেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন। জনগণই দেশের শিল্পসম্পদের অধিকারী। তাহারাই নবভারত গঠন করিবে।

বর্তমানে এই পরিকল্পনার বিশেষ মূল্য নাই। কারণ পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার জন্য অর্থাগমের যে পথের তাঁহারা নির্দেশ দিয়াছিলেন সেই পথ আজ বহুলাংশে রুদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে এই পরিকল্পনায় আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন হইবে। তৃতীয়তঃ, ইতিপূর্বে ভারত ও পাকিস্তান অখণ্ড ভারতবর্ষের সম্পদ নিয়োজিত করিয়া এক অখণ্ড পরিকল্পনা ছিল। সে স্বপ্ন আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চতুর্থতঃ, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে ব্যয়সংকোচের অজুহাতে অনেকে ইহার বিরোধিতা করিবেন।

অর্থনৈতিক নির্মাণ পরিষদ—বোম্বাই পরিকল্পনায় শিল্পপতিগণ ভাবী সমাজের চিত্র অংকন করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা ব্যতীত অন্য পরিকল্পনাও এদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কোনটাই বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্মিত হয় নাই—ইহারা তথ্যসংগ্রহ করে নাই এবং সরকারী নীতির সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ ছিল না বলিয়া ইহারা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই।

অর্থনৈতিক সংকট উত্তীর্ণ হইবার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভারতীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক নির্মাণ পরিষদ নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের কর্তব্য—

(ক) বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(খ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও সংখ্যা সংগ্রহ;

(গ) সরকারকে সময়োচিত পরামর্শ ও নির্দেশ দান;

(ঘ) পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য পরিদর্শন ও পরিচালন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতীয় বাণিজ্য

ব্যবসাবাণিজ্য ও যান-চলাচলব্যবস্থা—রেল, রাস্তা ও জলপথের সুব্যবস্থার উপর ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। ভারতবর্ষে সাধারণ রাস্তা এবং জলপথ অপেক্ষা রেলপথের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অপেক্ষা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের মধ্যে জলপথে যান-চলাচলের প্রতি আজও তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই; সামুদ্রিক যান-চলাচলব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। ডাক, তার, টেলিফোন ইত্যাদি সংবাদ আদানপ্রদানের সুব্যবস্থাও দেশের ব্যবসাবাণিজ্য উন্নতির সঙ্গে যথেষ্ট সহয়তা করিয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য—ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ বেশী হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বে কয়েকটি বণিকগোষ্ঠীর হস্তে দেশের সমুদয় বাণিজ্য ন্যস্ত ছিল। তাহাদের একাধিপত্য এখন আর নাই। বর্তমানে শহর ও নগর অঞ্চলে বড় বড় ব্যবসায়ী ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বহুসংখ্যক দালাল বা ফড়িয়ারা দেশের ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে। দেশের সর্বত্রই ফেরিওয়ালারা জিনিষ বিক্রয় করে। গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট দিনে হাট-বাজারে জিনিষ কেনা-বেচা হয়। উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা প্রভৃতিতেও জিনিষ কেনা-বেচা হয়।

উপকূল-বাণিজ্য—উপকূলপথে ভারতের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য প্রচলিত রহিয়াছে। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ভারতের উপকূল-বাণিজ্যের পরিমাণ বেশ হ্রাস পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্য এখন বৈদেশিক-বাণিজ্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল, তৈল, কাষ্ঠ আমদানী করা হয় এবং ভারত হইতে সেখানে কয়লা, পাট ও পাটদ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত ও বস্ত্র রপ্তানি করা হয়।

সমুদ্রপথে বাণিজ্য—ইহার বৈশিষ্ট্য—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ভারতে আমদানী অপেক্ষা এখান হইতে রপ্তানি বেশী হইত। কিন্তু বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী আমদানী করার ফলে এদেশের বাণিজ্য-ভারসাম্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা বর্তমানে সম্ভব নহে।

রপ্তানি—১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত হইতে ৪১৬ কোটি টাকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছিল—ইহার মধ্যে পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, সুতা এবং কয়লা, কফি, ম্যাঙ্গানিজ, রবার, চন্দনকাষ্ঠ ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী।

১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানি হইয়াছিল ১৬২ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী। দশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু ইহাতে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য রপ্তানির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া দুই-তৃতীয়াংশ হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পাটের প্রধান ক্রেতা হইল বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রেজিল, আর্জেণ্টিনা, ব্রহ্মদেশ, মালয় দেশ এবং ভারতীয় তুলার প্রধান ক্রেতা হইল জাপান, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি।

ভারতবর্ষ শতকরা ৭৫ ভাগ চা বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে—ইহার শতকরা ৯০ ভাগ বৃটেন ক্রয় করে। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইরাক, ইরাণ, বৃটেন এবং জার্মানি প্রভৃতি অঞ্চলে ভারত হইতে চা রপ্তানি করা হইয়াছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস্ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন তৈলবীজ রপ্তানি করা হইয়াছিল। লাক্ষা ও পশুচর্ম প্রধানতঃ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়।

ভারতীয় শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে এদেশ হইতে তৈয়ারী জিনিষপত্র রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; যেমন—পাট ও তুলাজাত দ্রব্য, নানাবিধ ধাতব দ্রব্য প্রভৃতি।

ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে রপ্তানি ভারতের পক্ষে ক্ষতিজনক—(১) ভারতে পশুচর্ম শিল্পের সম্ভাবনা থাকিলেও এখনও উহা বিদেশে রপ্তানি হয়; (২) ভারতীয় খাদ্য ও সার হিসাবে তৈলবীজের প্রভূত প্রয়োজন থাকায় তাহা বিদেশে রপ্তানি করা উচিত নহে। (৩) নানাবিধ কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্য রপ্তানী সমর্থন করা যায় না।

ভারতের রপ্তানীবৃদ্ধি সম্ভব হইবে যদি আমরা উন্নতব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারি ও আমাদের উৎপাদনব্যয় হ্রাস হয়।

আমদানী—১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে ৫১৮ কোটি টাকার সামগ্রী আমদানী হইয়াছিল। ভারত পাট, তুলা, খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানী করিয়াছিল।

এখন ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী রপ্তানী করিয়া থাকে এবং বিদেশ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। প্রাক্-যুদ্ধ কালে মোট আমদানী দ্রব্যের শতকরা ৭৪ ভাগ ছিল এইরূপ বিভিন্ন শিল্প-সামগ্রী।

ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণে খাদ্য ও বস্ত্র, এবং সমুদয় শিল্প কার্যের জন্য যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রী, রং, ঔষধ, রেলপথ নির্মাণের সামগ্রী প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ আমদানী করিতে হয়। ভারতে কাপড়ের কলের দ্রুত বিস্তার, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কারণে বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী হ্রাস পাইয়াছে।

অন্যান্য আমদানী দ্রব্যের মধ্যে পশম ও রেশমের দ্রব্য, কাচ, কাগজ, ধাতব দ্রব্য, চিনি, লবণ, রেডিও, মোটর গাড়ী, বৈদ্যুতিক যন্ত্র পাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গত দুই বৎসরে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৩৯ ভাগ; কিন্তু আমদানী বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৮০ ভাগ।

আমদানী বৃদ্ধি হইলেই আশঙ্কার কারণ হয় না—যদি যন্ত্রপাতি,, কাঁচামাল আমদানী হয় যাহার সাহায্যে আমরা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশে ও বিদেশে অধিক ধনোপার্জন করিতে পারি। কিন্তু যদি ভোগসামগ্রী আমদানী হয়—যেমন প্রসাধন দ্রব্য বা বিলাসের মোটরকার প্রভৃতি তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ হয়। যেহেতু আমাদের দেশের আয় ও অর্থাগম এত প্রচুর নয় যাহাতে আমরা অযথা বিলাসে বা ব্যয়বাহুল্যে দেশের সম্পদ বিদেশে নষ্ট করিতে পারি।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয়ে দেখা যায় যে, ১৯৩৮ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমাদের আমদানীর শতকরা ৭ ভাগ জিনিষ আসিত; ১৯৪৭ সনে আমদানীর শতকরা ২৯ ভাগ আসিয়াছিল। বৃটেন ও কমনওয়েলথের অংশ ১৯৩৭ সনে শতকরা ৫৭ ভাগ হইতে ১৯৪৭ সনে শতকরা ৪৬ ভাগে নামিয়া আসে। বৃটিশ কমনওয়েলথে আমাদের রপ্তানি দ্রব্য ঐ সময়ে শতকরা ৫৩ ভাগ হইতে ৫১ ভাগে নামিয়া আসে।

প্রধানতঃ বৃটেন হইতে এই পশম ও পশমজাত দ্রব্য ক্রয় করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও জাপান হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়। ফ্রান্স, ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও আর্জেণ্টিনার সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

এতকাল প্রধানতঃ বৃটেনের সহিত ভারত বৈদেশিক বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

পাকিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার সহিত স্থলপথে সীমান্ত বাণিজ্য—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য আলোচনা করা প্রয়োজন। সীমান্তবর্তী দেশসমূহ হইতে স্থলপথে পাট, ডাইল ও অন্যান্য শস্য, ধাতু, মাদকদ্রব্য, ফল, নারিকেল, তরিতরকারি, কাঁচা রেশম, পশম, ও জীবজন্তু ভারতে আমদানী কর হয়। ভারত হইতে ঐ সকল স্থানে কয়লা, তুলাজাত দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, চিনি, চা, লবণ ও মশলা প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, তিব্বত, সিংকিয়াংএর সঙ্গে আমাদের স্থলপথে বাণিজ্যসম্পর্ক আছে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য—পাকিস্তান সাধারণতঃ রপ্তানি করে পাট, তুলা, পশম, চামড়া, খাদ্যশস্য, ফল, লবণ ইত্যাদি এবং আমদানী করে কয়লা, তৈল, লৌহ, ইস্পাত, নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও বস্ত্রসামগ্রী। বস্ত্রসামগ্রী পাকিস্তানের মোট আমদানীর অর্ধেক। চিনি, পশমী বস্ত্র, কাগজ, সাইকেল প্রভৃতিও আমদানী হয়।

ভারতবর্ষ, ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই সকল দ্রব্য আমদানী হয়।

১৯৪৮ সনে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাকিস্তানে মোট ৬৭ কোটি টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছিল—ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে ৩৬ কোটি টাকার, ইংলন্ড হইতে ১৭ কোটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫ কোটি এবং বাকি ফ্রান্স, ইতালি, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে। এই সময়ে পাকিস্তান ৪৮॥ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে আসে ১০ কোটি টাকার, ইংলন্ডে ৯ কোটি টাকা, সোভিয়েট ইউনিয়নে ৪ কোটি টাকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫॥ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী।

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য—১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারত ও পাকিস্তান অভিন্ন ছিল। দেশ ভাগের ফলে নূতন পরিস্থিতিতে উভয় রাষ্ট্র নূতন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বাণিজ্যক্ষেত্রে পূর্বেকার সকল ব্যবস্থা চালু রাখা স্থির করিলেন।

১৯৪৭ সনে নভেম্বর মাসে পাকিস্তান ভারতবর্ষে পাট রপ্তানির উপর রপ্তানিশুল্ক দাবী করিলে ভারত সরকার পাকিস্তানকে বিদেশী রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে পাকিস্তান ভারতীয় বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের পর্যায়ে আসিল।

উভয় রাষ্ট্র ১৯৪৮ সালের মে মাসে এক বৎসরের জন্য নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। স্থির হইল যে ভারতবর্ষ হইতে মাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন কয়লা পাকিস্তানে পাঠান হইবে। পাকিস্তানের তুলা ও সূতার চাহিদা ৪ লক্ষ গাঁইট

ভারতবর্ষ হইতে যাইবে। ভারতবর্ষ লোহা, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, পাটশিল্পজাত দ্রব্যও দিবে। পাকিস্তান পরিবর্তে ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট, ৬॥ লক্ষ গাঁইট তুলা এবং পৌনে দুই লক্ষ টন খাদ্যশস্য (প্রধানতঃ চাউল) দিবে।

এক বৎসরের বাণিজ্যের ফলে দেখা গেল যে পাকিস্তানের কাছে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক দেনা আছে প্রায় ৪৭ কোটি টাকা।

১৯৪৮ সালের চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে ১৯৪৯ সালে জুন মাসে নূতন চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তিতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ভারসাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা হয় যে ভারতবর্ষকে পাকিস্তান হইতে পাট ও তুলা কম লইতে হইবে। ভারতবর্ষ হইতে তিসির তৈল, বনস্পতি প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানির ব্যবস্থা হইল। চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার মূল্য হইবে।

এই বাণিজ্যব্যবস্থায় উন্নতি সম্ভব যদি রাজনীতিক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অমিল না থাকে। ভারতবর্ষের আজ পাকিস্তানের বাজার প্রয়োজন যেমন পাকিস্তানেরও আজ ভারতীয় বাজারের প্রয়োজন। উভয় রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ ও বন্ধু-ভাবাপন্ন হইলেই বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হইবে।

হাভানা চার্টার—বিশ্ব-বাণিজ্য সংগঠনের (I. T. O.) মারফত পৃথিবীর সকল দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্রব্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য সর্বদেশে উন্নত এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল অর্থনীতির ভিত্তিতে বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রসার, অনুন্নত দেশগুলির শিল্প ও কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা এবং মূলধন যোগান, সকল দেশের লোকের পৃথিবীর বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ে সমান ও অবাধ অধিকার এবং বিশ্ব-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সকল অন্যায় বাধানিষেধ দূরীকরণ।

হাভানা চার্টারের এই উদ্দেশ্য সফল হইলে শান্তিকামী ও প্রগতিশীল সকল দেশই উপকৃত হইবে। ভারত সরকার হাভানা চার্টারে স্বাক্ষর করিয়াছে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাব—বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান সময়ে যে অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহার কারণ দেশে খাদ্যশস্য অভাবের জন্য আমরা বৎসরে ১৩০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিতেছি। ইহা ব্যতীত দেশবিভাগের ফলে আমরা পাকিস্তানকে বৎসরে ৮০ হইতে ১০০ কোটি টাকা পাট ও ২০ হইতে ৩০ কোটি টাকা তুলা ক্রয় বাবদ দিতেছি। পাকিস্তানের ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা মিটাইয়াও আমরা প্রায় ৬০ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণী হইতেছি। এই কারণে আমাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্যের যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে তাহাকে পুনরায় সাম্যে লইতে হইলে বিলাসদ্রব্যের ও বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের

আমদানী সাময়িক বন্ধ রাখিতে হইবে ও ভারতীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইবে যদি ভারতীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য মূল্যে ও উৎকর্ষতায় বিদেশী পণ্যের বাজারে বিদেশজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারে। উন্নত উৎপাদনব্যবস্থাই আমাদের কৃষি ও শিল্পকে রক্ষা করিবে—উন্নত কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা আমাদের দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যকে রক্ষা করিয়া ভারতীয় অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের রক্ষা করিবে।

সরকার আমদানী ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অদূরভবিষ্যতে বাণিজ্যিক ভারসাম্য আনিতে পারিবেন যদি সুচিন্তিত নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ও দেশবাসিগণ চালিত হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতীয় মুদ্রা এবং ব্যাংকব্যবস্থা

ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা—ভারতে দুই শ্রেণীর মুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছেঃ—

(ক) **ধাতব মুদ্রা—**রৌপ্যনির্মিত টাকা (এদেশের নিদর্শনী মুদ্রাই আদর্শ মুদ্রা (the token money is also standard money)। অন্যান্য ধাতু-নির্মিত মুদ্রা; যেমন আধুলি, সিকি, দুয়ানি, একানি, দুই পয়সা ও এক পয়সা। এক টাকা বা দুই টাকার কাগজের নোটকেও এদেশে আইনের দৃষ্টিতে ধাতবমুদ্রার সামিল বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

(খ) **কাগজী মুদ্রা—**পাঁচ, দশ এবং একশত টাকার নোট। এই সকল নোট ভাঙ্গাইয়া ধাতব মুদ্রা বা খুচরা টাকা-পয়সা পাওয়া যায়।

বর্তমানে ভারতের টাকা আর পূর্বের মত ইংলণ্ডের মুদ্রা পাউণ্ড স্টার্লিংএর সহিত যুক্ত নয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময় ফণ্ডের সদস্য হওয়ায় টাকার স্বর্ণমূল্য নির্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিতও ইহার নির্দিষ্ট বিনিময় হার রহিয়াছে। ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে ভারতের টাকা স্টার্লিংএর সহিত সংযুক্ত। বর্তমানে ভারত আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের একজন সদস্য।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতি—জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি—গত যুদ্ধের সময় কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রচলন আশাতীত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ভীষণ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ভারতীয় সরকারকেও যুদ্ধের বোঝা বহিতে হইল। ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষকেই যুদ্ধের জন্য প্রায় ১৩৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইল। ভারতবর্ষের রাজস্ব বাবদ এই ব্যয় হইল। এই ব্যয় বাদে ভারতবর্ষের সম্পদবৃদ্ধির খাতে আরও যুদ্ধব্যয় হইয়াছিল। বৃটেন যুদ্ধবিধ্বস্ত হওয়ার পরে বৃটিশ সরকার এ ব্যতীত বহু সামগ্রী যুদ্ধোপকরণ হিসাবে এদেশ হইতে লইলেন। তাহার মূল্য ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ১১৫০ কোটি টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমরা Lend-Lease হিসাবে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ৫৫১ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী পাই। ভারতবর্ষ ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেয় ১৮১ কোটি টাকার দ্রব্যসামগ্রী।

কর বা ঋণ গ্রহণ করে ভারত সরকারের পক্ষে এই ব্যয় সম্ভব ছিল না। সেজন্য তাঁরা কাগজী মুদ্রা ছাপিয়ে দেশের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী বা সরকারী

কর্মচারীদের মারফত দেশে চালালেন। যাঁরা বৃটিশ-ভারতীয় সরকারকে সেবা বা সামগ্রী দিয়েছিলেন তাঁরা এই অর্থ পেলেন। ২০০ কোটি টাকার কাগজী মুদ্রার স্থলে ১২০০ কোটি টাকার কাগজী মুদ্রা হল। মুদ্রাবৃদ্ধি হল সরকারের প্রয়োজন বলে, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী বৃদ্ধি হল না। মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষের দাম চতুর্গুণ হল। মুদ্রাস্ফীতি যেমন চারগুণ হল মূল্যবৃদ্ধিও চারগুণ হল। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য বর্তমান সরকারের দায়িত্ব থাকলেও মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী সম্পূর্ণ বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ভারতীয় সরকার।

বন্যার জল বাঁধতে হলে যেমন বাঁধ প্রয়োজন, মুদ্রাস্ফীতির গতি কমাতে হলে বাঁধ প্রয়োজন—সে বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়েছে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংব্যবস্থায়। কোন ব্যবস্থা সুপরিচালিত না হলে সে ব্যবস্থায় ফল পাওয়া যায় না—যেমন বালির বাঁধ কখনও কখনও বন্যার জলে ভেসে যায় যদি সুচিন্তিত বা সুপরিচালিত না হয়।

রেশনিং ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ বাদে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা যায় যদি দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহের বৃদ্ধি করা যায় কিংবা অতিরিক্তি অর্থ বা মুদ্রা যদি সরকার ব্যক্তির নিকট হতে কর বা ঋণ হিসাবে নেন এবং সে অর্থ ব্যয় না করেন। যদি পুনরায় সে অর্থ ব্যয় হয় তাহলে অতিরিক্ত মুদ্রা পুনরায় মুদ্রাস্ফীতির কারণ ঘটে।

কর বা ঋণ হিসাবে যদি অতিরিক্ত মুদ্রা না পাওয়া যায় এবং সরকার সে কাগজী মুদ্রাকে যদি নষ্ট বা লুপ্ত না করেন তাহলে মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ দবারা সহজে সম্ভব হয় না।

মুদ্রাস্ফীতির ও মূল্যবৃদ্ধির নিবারণ সম্ভব হয় যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়—অর্থাৎ সেবা ও সামগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। চারগুণ বেশী মুদ্রা হওয়ায় চারগুণ দাম হয়েছে। চারগুণ দ্রব্যসামগ্রী যদি উৎপাদন করা যায় বা চারগুণ সেবা দেওয়া যায় তাহলে মূল্যহ্রাস সম্ভব হয়।

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে দু দিক থেকে অভিযান করা যায়—কর বা ঋণ করে মুদ্রাসঙ্কোচের ব্যবস্থা করা কিংবা বহুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে ও শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। **মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের এই দুই পথকে বলা হয় মুদ্রার পথ ও উৎপাদনের পথ।**

ভারতীয় ব্যাংকব্যবস্থা

ভারতে নিম্নলিখিত ব্যাংকগুলি রহিয়াছেঃ—

(১) দেশীয় ব্যাংক—মহাজন এবং সাহুকর;

(২) ভারতীয় জয়েণ্ট স্ট ব্যাংক;
(৩) ইউরোপীয় বিনিময় ব্যাংক;
(৪) ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাংক; এবং
(৫) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক।

ব্যাংকব্যবসায়ে ভারত সরকারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া পল্লী-অঞ্চলে অসংখ্য সমবায় সমিতির মারফত ব্যাংকিং কার্য নির্বাহিত হয়।

মহাজন—পল্লী অঞ্চলে মহাজনেরা অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ দিয়া থাকেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ, দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী এবং শিল্পী এই সকল মহাজনের নিকট কর্জ গ্রহণ করিয়া থাকে। গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্য ইহারা ক্রয় করে এবং গ্রামের ব্যবসাবাণিজ্য চালু রাখার জন্য ঋণ দেয় বলিয়া পল্লী অঞ্চলে ইহাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্যের একটি বিপুল অংশের ব্যাংকিং কার্য মহাজন, শেঠ, সাহুকর প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়। গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠু ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার পূর্বে ইহাদের অন্যায় বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

ভারতীয় জয়েণ্ট স্টক ব্যাংক—ইউরোপীয় ব্যাংকিং পদ্ধতির অনুকরণে ভারতীয় যৌথ ব্যাংকগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের অবহেলা, সরকারী ঔদাসীন্য, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এবং ব্যাংকব্যবসায়ে আমাদের অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ভারতীয় যৌথ ব্যাংকের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। বর্তমানে ৯২টি তপশীলভুক্ত যৌথ ব্যাংক রহিয়াছে। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন যৌথ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উপর ভবিষ্যৎ ভারতের ব্যাংকব্যবসায়ের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সরকারের এ বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা উচিত।

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক—ভারতের সমুদয় বিনিময় ব্যাংক (মাত্র দুইটি ভিন্ন) বিদেশীদের পরিচালনাধীন।

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাংকিং কার্য এই সকল বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ নির্বাহ করিয়া থাকে। আমদানী ও রপ্তানি, এই উভয় প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্যে এই সকল ব্যাংক অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে বিদেশীদের সম্পূর্ণ আধিপত্য ভারতীয় জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। বিপুল পরিমাণ টাকা এই সকল ব্যাংক মারফত বিদেশে চলিয়া যায়। বিদেশীরা ভারতীয় পণ্যের বাজার ও ক্রেতার সন্ধান পায়। ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ইহাদের নিকট প্রয়োজনমত সাহায্য পায় না। স্বাধীন ভারতে এই ব্যাংকগুলির কার্য-

কলাপ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার এবং যাহাতে ক্রমশঃ ভারতীয় ব্যাংকগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাঙ্কিং কার্যে আত্মনিয়োগ করে তাহার জন্য চেষ্টা করা দরকার।

ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাংক—ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ ব্যাংক। ১৯২০ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি স্থানের প্রেসিডেন্সী ব্যাংককে একত্রিত করিয়া এই ব্যাংক গঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হইবার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে কার্য করিত। বর্তমানে যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা নাই সেই সকল স্থানে ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিনিধিরূপে কার্য করিয়া থাকে। ভারতের বহু স্থানেই ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের শাখা রহিয়াছে। ইহার পরিচালকবর্গ অধিকাংশই বিদেশী।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক—রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হয়। ইহার মোট মূলধন ৫ কোটি টাকা। এই মূল্যের শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

রিজার্ভ ব্যাংকের পরিচালনভার কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। সরকারী মনোনীত সদস্য ও অংশীদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইত। রাষ্ট্রপাল রিজার্ভ ব্যাংকের জন্য একজন গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ করেন। গভর্নর রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তা। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপরিচালনাধীন হইয়াছে। রাষ্ট্রপাল মনোনীত ব্যক্তি লইয়া ইহার বোর্ড গঠিত হয়।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এবং মুদ্রানীতি পরিচালনা করা রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান কার্য। রিজার্ভ ব্যাংকের দুইটি বিভাগ রহিয়াছে—ব্যাঙ্কিং বিভাগ এবং ইসু বিভাগ। ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের যাবতীয় ব্যাংকসংক্রান্ত কার্য করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাহাদের অর্থ এই ব্যাংকে জমা রাখে। রিজার্ভ ব্যাংক প্রয়োজনমত তাহাদিগকে ঋণ দিয়া থাকে। ইহা ব্যাংকসমূহের ব্যাংক। তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে চল্তি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়। ইহার পরিবর্তে আর্থিক সংকটের সময় রিজার্ভ ব্যাংক এই সকল ব্যাংককে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। ইসু বিভাগের প্রধান কার্য হইল নোট প্রচলন করা। একমাত্র রিজার্ভ ব্যাংকই ভারতে নোট প্রচলন করিতে পারে। মোট চালু নোটের শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং স্টার্লিং জমা রাখিতে হইবে। এদেশে সকল প্রকার ব্যাংক প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদন সাপেক্ষ ও রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কৃষিঋণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ আলোচনা এবং প্রকাশ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের একটি কৃষি-ঋণবিভাগ রহিয়াছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক—দেশবিভাগের পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার একটি কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যাংক স্থাপন করিয়াছেন। পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের ক্ষমতা অনেকাংশে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত।

সরকারী ব্যাংকব্যবস্থা—পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক—ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে দেশের সর্বত্র সেভিংস ব্যাংক রহিয়াছে। অল্প সুদের বিনিময়ে সরকার এই ব্যাঙ্কে জনসাধারণের টাকা জমা রাখেন। পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের অভাবের জন্য সেখানে সেভিংস ব্যাংক স্থাপনের ফলে জনগণের প্রভূত উপকার হইয়াছে। সরকার কৃষকদিগকে কৃষির জন্য অর্থ দাদন দিয়া থাকেন (টাকভি ঋণ)।

অন্যান্য প্রকার ব্যাঙ্কের মধ্যে **জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাজনের অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যাংক জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা ধার দিতে পারে। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে এই ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভারতীয় ব্যাংকব্যবস্থার ত্রুটি

(১) দারিদ্র্যের জন্য জনসাধারণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। সেজন্য দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা খুবই কম। ইংলণ্ডে প্রতি ১৩ বর্গমাইলে গড়ে একটি করিয়া ব্যাংক আছে; আর আমাদের দেশে প্রতি ৩৫ হাজার বর্গমাইলে একটি করিয়া ব্যাংক আছে। জাপানের লোকসংখ্যা আমাদের এক-ষষ্ঠাংশ; অথচ সেখানে আমাদের পনের গুণ বেশী ব্যাংক রহিয়াছে। বৃটেনের লোকসংখ্যা ভারতের এক-সপ্তমাংশ; অথচ সেদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা আমাদের দেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যার ২০ গুণ বেশী।

(২) যে ব্যাংকগুলি রহিয়াছে তাহাদের আয়তনও অতি ক্ষুদ্র। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক। বিলাতের পাঁচটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তিন গুণ।

(৩) আমাদের দেশের ব্যাংকগুলি কেবলমাত্র অল্প মেয়াদে ঋণ দিয়া থাকে। শিল্পবাণিজ্যে বা কৃষিকর্মে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দিবার মত কোন শিল্পব্যাঙ্ক Industrial Bank বা জমি-বন্ধকী ব্যাংক আমাদের দেশে নাই। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মত বৃহৎ ব্যাংকও এদেশে তেমন নাই।

সুপরিচালিত ব্যাংকব্যবস্থার জন্যই ইউরোপ বা আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

ব্যাংকসম্বন্ধীয় আইন (১৯৪৯)—ভারতীয় ব্যাংকসমূহ পরিচালনার জন্য সম্প্রতি বিধিবদ্ধ নূতন ব্যাংক-আইন অনুযায়ী—

(ক) সকল ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমোদন পাইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাংক যে কোন ব্যাংকের লাইসেন্স জনস্বার্থের জন্য বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

(খ) রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যাংক নূতন শাখা অফিস খুলিবেন না।

(গ) কোন ব্যাংক ব্যাংকিং কার্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিবেন না বা নিজ বাসগৃহের প্রয়োজন ব্যতীত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(ঘ) বিদেশী কোন ব্যাংক ১৫ লক্ষ ও কলিকাতা ও বোম্বাইর কোন ব্যাংক ২০ লক্ষ টাকার কম মূলধন লইয়া কারবার করিতে পারিবেন না। মফঃস্বলের কোন ব্যাংকের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হইবে না। প্রত্যেক শাখা খুলিবার পূর্বে আইনে নির্দিষ্ট উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের অন্ততঃ অর্ধেক বিলিকৃত মূলধন হওয়া চাই। ব্যাংকের বিলিকৃত মূলধনের অন্ততঃ অর্ধেক আদায়ীকৃত মূলধন হওয়া চাই।

(ঙ) এক ব্যাংকের ডিরেক্টর অন্য ব্যাংকের ডিরেক্টর হইতে পারিবেন না।

(চ) প্রত্যেক ব্যাংক সকল সময়ে তাহার দায়ের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ নগদ টাকা বা স্বর্ণ বা কোম্পানীর কাগজে রক্ষা করিবে।

(ছ) ডিরেক্টরদের নিজ ব্যবসায়ে ব্যাংকের অর্থ নিয়োজিত করা চলিবে না।

রিজার্ভ ব্যাংকের পরিদর্শনের ফলে ও ব্যাংক-বিধিনিষেধের জন্য ভারতীয় ব্যাংকগুলি নিরাপদ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতীয় রাজস্ব

সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উন্নতি ও সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনানুসারে পরিবর্তন—১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন রচিত হইবার পূর্বে রাজস্বব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের পর মেস্টন-বাঁটোয়ারা অনুসারে আয়ব্যয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

রাজস্ব বণ্টন—স্যার জেমস মেস্টনের বাঁটোয়ারা অনুসারে নিম্নলিখিত ভাবে রাজস্ব বণ্টন করা হয়ঃ—

কেন্দ্রীয়	প্রাদেশিক
১। শুল্ক এবং মাদকদ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য আবগারী আয়	১। ভূমি-রাজস্ব
২। আয়কর এবং অতিরিক্ত আয় বা মুনাফা-কর	২। মাদকদ্রব্যাদির উপর ধার্য আবগারী কর
৩। লবণ-কর	৩। আদালতের মোহর-শুল্ক
৪। অহিফেন-শুল্ক	৪। আয়করের প্রাদেশিক অংশ
	৫। দলিল রেজেস্ট্রী ফিঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি প্রাদেশিক সরকারসমূহকে পূরণ করিতে হইত। পরে এই নিয়ম রহিত করা হয়।

সেচকার্য, বনবিভাগ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের কিছু আয় হইত।

রেল, ডাক ও তারবিভাগ হইতে আয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হইল।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও প্রাদেশিক রাজস্ব—১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার পর স্যার অটো নিমেয়ারের নির্দেশমত নূতনভাবে রাজস্ব বণ্টন করা হয়। কতকগুলি আয় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়; যেমন, আমদানী শুল্ক (লবণ ভিন্ন), কর্পোরেশন ট্যাক্স, যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ের উপর কর, রেল-বিভাগ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা হইতে আয়, মুদ্রাঙ্কন হইতে আয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের এক অংশ, রপ্তানিশুল্ক (পাট ভিন্ন), যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার আদায় ও ব্যয় করিবেন।

কতকগুলি আয় কেন্দ্রীয় সরকার সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু প্রাদেশিক সরকার তাহা সম্পূর্ণ (উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক স্ট্যাম্প প্রভৃতি) বা আংশিক ফেরত পাইবেন। আয়করের একাংশ প্রদেশসমূহ পাইবে এবং পাট রপ্তানি শুল্কের একাংশ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহ পাইবে।

ইহা ভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের আয়ের উৎস হইল—ভূমিরাজস্ব, মাদক দ্রব্যাদির উপর ধার্য আবগারী কর, আদালতের কোর্ট ফি, কৃষি-আয়কর প্রভৃতি।

ভারতীয় রাজস্বের অবস্থা

ভারত সরকারের রাজস্ব আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (বাজেট) ১৯৪৯-৫০

আয়	কোটি টাকা	ব্যয়	কোটি টাকা
১। বহির্বাণিজ্যশুল্ক	১২১·২৩	১। দেশরক্ষা	১৫৭·৩৭
২। উৎপাদন শুল্ক	৬৩·২৭	২। শাসন বিভাগ	৪০·৫
৩। যৌথকারবারের উপর আয়কর		৩। ঋণপরিশোধ বাবদ	৩৯·৩
	৪১·৮১	৪। খাদ্যশস্য সাহায্যমূল্য বাবদ	৩২·৯৭
৪। আয়কর (অন্যান্য)	১০৭·০৯	৫। বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি বাবদ	
৫। অহিফেন	১·১৮		৯·৮৫
৬। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয়		৬। পূর্তবিভাগ	৭·৩২
	৪·৪৭	৭। পেনসন বাবদ	২·৬৮
৭। রেলওয়ে বিভাগের আয়	৪·৭২	৮। প্রাদেশিক সরকারদের সাহায্য বাবদ	
অন্যান্য খাতে আয়			২·৯৬
বাদ আয়করের প্রাদেশিক অংশ		অন্যান্য বাবদ	৬৯·৭৮
		মোট রাজস্ব ব্যয়	৩২২·৫৩
		উদ্বৃত্ত	·৪৫
মোট নীট রাজস্ব আয়	৩২২·৯৮		৩২২·৯৮

ক। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়—

১। **আমদানী-রপ্তানী শুল্ক**—আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বা বাণিজ্য হইতে ভারত সরকারের সর্বাধিক আয় হইয়া থাকে। ১৯৪৯ সালে এই খাতে আয় হইয়াছিল ১২৯·২৩ কোটি টাকা।

বাণিজ্য শুল্কে বলিতে **আমদানী শুল্ক,** যেমন মোটর গাড়ীর উপর শুল্কে এবং **রপ্তানী শুল্ক** যেমন পাট, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির উপর শুল্ক—দুইই বুঝায়, ইহার মধ্যে আমদানী শুল্কেই অপেক্ষাকৃত প্রধান।

আমদানী শুল্ক দুই প্রকারঃ—

(ক) **রাজস্ব বর্দ্ধক শুল্ক;** যেমন সিগারেট ও মোটর গাড়ীর উপর ধার্য শুল্ক।

(খ) **রক্ষণমূলক শুল্ক,** দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমদানী-জাত দ্রব্যের উপর এই প্রকার শিল্প ধার্য করা হয়, যথা,—চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, দিয়াশলাই ইত্যাদির উপর ধার্য শুল্ক।

২। **আয়কর ও কোম্পানীর আয়ের উপর কর** —তিন হাজার টাকার অধিক উপার্জন কারী ব্যক্তিকে আয়-কর দিতে হয়, বেশী আয়ের উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর বসানো হয়। এই কর হইতে বর্তমানে সর্বাধিক আয় হইয়া থাকে। ১৯৪৯-৫০ সালে আয়কর বাবদ ১০৭·০৯ কোটি টাকা আয় ধরা হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে যৌথ কোম্পানীর আয়ের উপর কর বাবদ ৪১·৮১ টাকা আয় হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারসমূহেরও এই খাতে মোটা আয় হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার এই আয়ের প্রাদেশিক অংশ প্রাদেশিক সরকারকে দিয়া থাকেন।

৩। **কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক**—মাদক দ্রব্য ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্যের উপর যথা চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন, চা, কফি, তামাক ইত্যাদির উৎপাদনের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কর ধার্য করিয়া থাকেন। ১৯৪৯-৫০ সালে এই বাবদ সরকারের আয় হইয়াছিল ৬৩·২৭ কোটি টাকা।

যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা করের পরিবর্তে বর্তমানে ব্যবসা মুনাফার উপর কর ধার্য করা হইয়াছে।

৪। **অহিফেন**—জাতি সংঘের নির্দেশানুসারে অহিফেন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে ইহা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত রেলবিভাগের লাভ, মুদ্রাঙ্কন ও মুদ্রা প্রচলনের আয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভের একাংশ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতেও কেন্দ্রীয় সরকার আয় করিয়া থাকেন।

খ। **কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়**—কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের প্রধান বৈশিষ্ট হইল যে শাসনকার্য পরিচালনা ও সামরিক খাতে আয়ের অধিকাংশ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ভারত সরকারের মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩২২·৫৩ কোটি টাকা। ঋণ-গ্রহণ এবং নূতন কর বসাইয়া ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

১। **দেশরক্ষা**—১৯৪৯-৫০ সালে ১৫৭·৩৭ কোটি টাকা দেশরক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছিল। আয়ের অনুপাতে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের দেশরক্ষা খাতে ব্যয় সর্বাধিক।

২। **শাসনবিভাগ**—ভারতীয় ইউনিয়নে শাসনবিভাগের জন্য ৪০·৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ভারতীয় শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত মাথাভারী এবং ব্যয়বহুল বলিয়া প্রায়শঃই অনুযোগ করা হয়।

৩। **পুনর্বসতি সাহায্য**—উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য ৯·৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

৪। **ঋণশোধ**—ঋণশোধ বাবদ ভারত সরকারের এই বৎসর ৩৯·৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর শিল্প ও কৃষিবিষয়ক পরিকল্পনায় ভারত সরকারের ব্যয়ের মাত্রা অল্প। উদ্বাস্তুদের সাহায্য, দেশরক্ষা ও ঋণশোধ বাবদ যে ব্যয় হয় তাহার অতিরিক্ত যতটুকু থাকে তাহাই ব্যয় হইতে পারে। সরকার যদি দেশে বা বিদেশে ঋণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারেন, তবে এদেশে কৃষি ও শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সম্ভব হইবে। যদি দেশবাসিগণ অধিকতর কর বা তাঁদের সঞ্চিত অর্থ দেশে ধনোৎপাদনের জন্য সরকারের প্রয়োজনমত দেন বা নিজেরাই নিজ মূলধন বিনিয়োগ করেন তাহা হইলেই নিজেদের সাহায্যেই আমরা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইব। ইহা সম্ভব না হইলে বিদেশীর মূলধন সাহায্য লইতে হইবে। নতুবা দ্রুত উন্নতির কোন আশা নাই। দেশবাসিগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের যে উন্নত ব্যবস্থা নূতন রাষ্ট্রের নিকট আশা করেন তাহা পূরণ হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (বাজেট) ১৯৫০-৫১

আয়	কোটি টাকা	ব্যয়	কোটি টাকা
প্রধান প্রধান খাতে		**প্রধান প্রধান খাতে**	
১। বহির্বাণিজ্যশুল্কের প্রাদেশিক অংশ বাবদ	১·০৫	শাসন বিভাগ	২·৩৮
		বিচার বিভাগ	·৯৪
২। আয় করের প্রাদেশিক অংশ বাবদ (ব্যবসায় আয়কর বাদ)	৬·৯২	পুলিশ বিভাগ	৪·৮৪
		শিক্ষা বিভাগ	৩·০৬
৩। ভূমি রাজস্ব	২·০৬	চিকিৎসা বিভাগ	৩·০৩
৪। প্রাদেশিক শুল্ক	৫·৮৭	জনস্বাস্থ্য বিভাগ	·৭৮
৫। আদালতের মোহরশুল্ক	২·৪৩	কৃষি বিভাগ	২·৬১
৬। ধনবিজ্ঞান	·৬২	জেল বিভাগ	·৯১
৭। দলিল রেজেষ্ট্রী বিভাগ	·৩৮	পূর্ত বিভাগ	৩·৬৪
৮। বিক্রয়কর	৪·২	জনসংভরণ বিভাগ	৩·৮৩
৯। সরকারী মোটর বাস বিভাগ	·৩৪	বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি বাবদ*	·৪০
অন্যান্য খাতে	১০·০২	অন্যান্য খাতে	৮·৮১
		মোট	৩৫·২৩
মোট রাজস্ব আয়	৩৩·৮৯	মোট রাজস্ব ঘাটতি	১·৩১

* বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি বাবদ পশ্চিমবঙ্গের মোট রাজস্ব ব্যয় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে।

ক। প্রাদেশিক রাজস্ব—প্রদেশের আয়তন এবং জনসংখ্যার তুলনায় পশ্চিম-বঙ্গের রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত কম—৩৩·৯ কোটি টাকা মাত্র। মাদ্রাজের আয় ৫৬ কোটি, বোম্বাই ৪৯ কোটি, উত্তর প্রদেশ ৫৬ কোটি, বিহার ২৪·৪ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম আয়ের উৎস হইল আবগারী শুল্ক। ভারত সরকার কর্তৃক মাদকদ্রব্যবর্জন নীতির ফলে অচিরেই এই উৎস হইতে আয় বন্ধ হইবে। ভূমিরাজস্ব হইতে আয় সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আয়করের অংশ বাবদ ৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য নানা ভাবে আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব পূরণ করিতে হইলে হয় আয় বৃদ্ধি নতুবা ঋণ অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রয়োজন। ব্যয় সঙ্কোচের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রাদেশিক রাজস্ব তহবিলে মাথাপিছু পশ্চিমবঙ্গে ১৫/০, বোম্বাইতে ২০৲, মাদ্রাজে ১০।/৭, পূর্ব পাঞ্জাবে ১৩৸৮, মধ্যপ্রদেশে ১০।৶১০, বিহারে ৬৶৫ আদায় হয়।

১। ভূমিরাজস্ব—প্রাদেশিক সরকারের প্রধান আয় ভূমিরাজস্ব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরাজস্ব ২ কোটি ৩ **লক্ষ** টাকা।

এই খাতে মাদ্রাজে ৫·৩ কোটি, বোম্বাইতে ৪ কোটি, উত্তর প্রদেশে ৬·৭ কোটি, মধ্যপ্রদেশে ৩·৫ কোটি টাকা আয় হয়।

২। আদালতের মোহরশুল্ক—মামলামোকদ্দমা করিতে হইলে আদালতের ফি বাবদ স্ট্যাম্প কিনিতে হয়। কিম্বা হুণ্ডী প্রভৃতি বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিলপত্রের জন্যও স্ট্যাম্প কিনিতে হয়। ইহাকে non-judicial stamps বলে। কোর্ট ফি বাবদ টাকা প্রাদেশিক সরকার আদায় করিয়া থাকেন। কোর্ট ফি হইতে বেশী টাকা আদায় হইলে বুঝিতে হইবে দেশে মামলামোকদ্দমা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা মঙ্গলসূচক চিহ্ন নহে। পশ্চিমবঙ্গে মোট রাজস্বের শতকরা ৭ ভাগ এই বাবদ আয় হইয়া থাকে—২·৪৩ কোটি টাকা।

৩। বাণিজ্যশুল্কের অংশ—কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে রপ্তানি-শুল্কের অংশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১·০৫ কোটি টাকা পাইয়া থাকেন।

৪। আবগারী—মাদকদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া প্রাদেশিক সরকার ৫·৯ কোটি টাকা আয় করিয়া থাকেন। মোট রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ এই আয় হইতে সংগৃহীত হয়। ভারত সরকার কর্তৃক মাদকদ্রব্যবর্জন নীতি গ্রহণ করায় অদূরভবিষ্যতে প্রাদেশিক সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস রুদ্ধ হইবে।

৫। **আয়কর**—ব্যক্তিগত আয়করের এক বিশেষ ভাগ প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রাপ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০-৫১ সালে আয়করের অংশ বাবদ ৬·৯২ কোটি টাকা পাইয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে বিহার ৬ কোটি, উত্তর প্রদেশ ৯·৩ কোটি, বোম্বাই ৯·২ কোটি ও মাদ্রাজ ৭·৮ কোটি টাকা পাইয়াছিল।

৬। **বিক্রয়-কর**—প্রাদেশিক রাজস্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান আয়ের পথ বিক্রয়-কর। পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয়-কর হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা বাৎসরিক আয় হয়। অন্যান্য সকল আয়ের মধ্যে ইহা ধরা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মাদ্রাজে প্রথম বিক্রয়-কর ধার্য হয়। ৩৪ লক্ষ টাকা আয় হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে বিক্রয়-কর হইতে মাদ্রাজ সরকারের ১২·৫ কোটি টাকা আয় হয়। ঐ বৎসর উত্তর প্রদেশে ৬ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশে ২·৩ কোটি টাকা, বোম্বাই ৬·৮ কোটি টাকা এই বাবদ আয় হয়।

পাটরপ্তানি-শুল্কলব্ধ অর্থের শতকরা ৬২½ ভাগ বাংলা, আসাম, বিহার, প্রভৃতি পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক সরকার ক্রমশঃ এই আয় হইতে বঞ্চিত হইবে—ভারত সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও পাঞ্জাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়া থাকে।

অন্যান্য প্রাদেশিক আয় সেচ, কৃষি-আয়কর, মোটরগাড়ী ও পেট্রোলিয়মের উপর কর, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর, জুয়াখেলার উপর কর প্রভৃতি।

খ। প্রাদেশিক ব্যয়

১। **পুলিশ**—এই বিভাগে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে মোটা টাকা ব্যয় করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয়ের মত প্রাদেশিক সরকারের পুলিশ বিভাগের ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রায়ই তীব্র সমালোচনা করা হইয়া থাকে। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। কিন্তু অযথা অর্থব্যয় হ্রাস করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ ভাগ কেবলমাত্র এই খাতেই ব্যয়িত হয়—৪·৮৪ কোটি টাকা।

১৯৪৯-৫০ সালে পুলিশ ও শাসনকার্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গে মোট ব্যয় ৮·৫৩ কোটি, মাদ্রাজে ১৪·৬ কোটি, বোম্বাই ১১·৫ কোটি, উত্তর প্রদেশ ১৪ কোটি, বিহারে ৬ কোটি, পূর্ব পাঞ্জাবে ৫ কোটি, মধ্যপ্রদেশে ৪·৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

২। **শাসনবিভাগ**—এই বিভাগেও মোটা টাকা ব্যয় হয়—২·৩৮ কোটি টাকা। শাসনপরিচালনার জন্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাবদ বহু টাকা খরচ করিতে হয়।

৩। **বিচার ও কারাগার**—আদালত ও কারাগারগুলি বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বৎসরে ১·৮ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই সকল খাতে অনাবশ্যক ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধানার্থ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা উচিত।

৪। **শিক্ষা**—জাতিগঠনে শিক্ষার স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু সরকার এখনও ইহার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা খাতে বৎসরে মাত্র ৩·০৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সম্প্রতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এই বিষয়ে ব্যয় কিছু বেশী হইবে। দেশের অধিকাংশ বিদ্যায়তন সাধারণের টাকায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। বোম্বাইতে বৎসরে ৯৷৷০ কোটি টাকা ও মাদ্রাজে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

৫। **জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা**—দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার যত্নবান হইয়াছেন। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বাবদ ৩·৭৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

অন্যান্য ব্যয়-খাতের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—কৃষি ও শিল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি পৌরকার্যাবলী, সমবায় ইত্যাদি।

১৯৪৯-৫০ সালে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কার্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭·২ কোটি, মাদ্রাজ ১২·৯ কোটি, বোম্বাই ১২·৯ কোটি, উত্তর প্রদেশ ১০·২ কোটি, বিহার ৩·১ কোটি ও মধ্যপ্রদেশ ৩·৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

৩। **ভারতে সরকারী ঋণ**—১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভারতে সরকারী ঋণের পরিমাণ ২,২৩১ কোটি টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত কারণে ভারত সরকারকে এই ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিলঃ—

(ক) ভারত, চীন, ব্রহ্মদেশ ও মিশর প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চালাইবার জন্য ঋণ গ্রহণ;

(খ) প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকারকে আর্থিক সাহায্য দান;

এবং (গ) রেলপথ নির্মাণ ও সেচকার্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি উৎপাদক কার্যে ঋণ গ্রহণ।

যুদ্ধের পূর্বে ভারত সরকারের বিলাতে প্রচুর স্টার্লিং দেনা ছিল। যুদ্ধের সময় বৃটেনের নিকট হইতে প্রাপ্য স্টার্লিং ভারত সরকার এই দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছেন। যুদ্ধাবসানে ভারতের কোনপ্রকার বৈদেশিক ঋণ নাই। সম্প্রতি দামোদর ও অন্যান্য পরিকল্পনায় বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে উৎপাদক-ঋণ হিসাবে ৪ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইস্পাত নির্মাণ ও অন্য উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আরও বৈদেশিক ঋণের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

আসাম সরকারের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (বাজেট) ১৯৪৯-৫০

আয়	কোটি টাকা	ব্যয়	কোটি টাকা
প্রধান প্রধান খাতে		**প্রধান প্রধান খাতে**	
১। বহির্বাণিজ্য শুল্কের প্রাদেশিক অংশ বাবদ	·৩৬	শাসনবিভাগ	·৬৬
		পুলিশ	·৭১
২। আয়করের প্রাদেশিক অংশ বাবদ (ব্যবসায় আয়কর বাদ)	১·৫৭	শিক্ষা	১·২৭
		কৃষি	·৫২
৩। ভূমিরাজস্ব	১·৬২	চিকিৎসা	·৪০
৪। প্রাদেশিক শুল্ক	·৬৩	জনস্বাস্থ্য	·৩১
৫। বনবিভাগ	·৪৮	পূর্তবিভাগ	২·৪৩
অন্যান্য খাতে	·৬২	জেলবিভাগ	·১১
		বিচারবিভাগ	·১১
মোট	৫·২৮		
৬। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য	·৩০		
৭। বিশেষ সাহায্য	২·৩৩		
অন্যান্য বাবদ	১·০	অন্যান্য বাবদ	৩·০
মোট রাজস্ব আয়	৮·৯১		
ঘাটতি	·৬১		
	৯·৫২	মোট ব্যয়	৯·৫২

ভারতীয় কর-নির্ধারণ নীতির সমালোচনা

কর বহনে সামর্থ্য বা সাম্যনীতি অনুসারে ভারতে কর নির্ধারিত হয় না। এই ব্যবস্থায় প্রচুর গলদ রহিয়াছে।

ভারতে ধনী অপেক্ষা দরিদ্র জনসাধারণই অধিক করভারপীড়িত। গড়ে ভারতীয় আয় ২২৮৸/০। ১৯৩৯ সালের দ্রব্যমূল্যে হিসাবে ইহা হয় ৬০৸০। অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জন কৃষক। ইহাদিগকে ভূমিরাজস্ব সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত চিনি ও দিয়াশলাইএর উপর আবগারী কর ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর এবং শিল্পসংরক্ষণের ব্যয়ের অধিকাংশই কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বহন করিতে হয়।

বিভিন্ন খাতে গড়ে প্রতিজন ভারতবাসী বৎসরে ভারত সরকারকে ১৪৷৵৫ ও প্রাদেশিক সরকারকে ২৩৸৵১১ কর বাবদ দিয়া থাকে।

১৯৪৯-৫০ সনে ভারত সরকারের মোট আয়ের হিসাব ৩৬৩·৮ কোটি টাকা; প্রাদেশিক সরকারগুলির মোট আয় ২২৩·৭ কোটি টাকা।

সংস্কার—ভারতীয় অর্থনীতিতে ভূমিরাজস্ব এবং লবণ-করের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত, গোখেল এবং রাণাডে প্রমুখ পূর্বযুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণ এবং বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণ কর-নির্ধারণ নীতির সংস্কারের জন্য বহুদিন ধরিয়া দাবী করিতেছেন। স্যার জেমস্ গ্রিগ এই নীতির আমূল সংস্কার করিয়া ইহাকে কালোপযোগী করিতে বলিয়াছিলেন। ক্রমবর্দ্ধমান হারে আয়কর, উত্তরাধিকার কর, সম্পত্তি-কর ইত্যাদি ধার্য করিয়া ধনীদিগকে অধিক কর প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য জাতীয়করণ করিয়াও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ভারতীয় ব্যয়নীতির সমালোচনা

সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্যে দেশরক্ষা ও শাসনকার্য ব্যতীত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প এবং বৃদ্ধ, বেকার, রুগ্ন ব্যক্তিদের সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা উচিত। পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি দেশ এই সকল বিষয়ে যথোচিত ব্যয় করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে ভারত সরকার আজও এই সকল বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন।

গুরু করভারের চাপে জনসাধারণের কষ্টের সীমা নাই। রাজস্বনীতির পরিবর্তন না হইলে সমাজে সাম্য স্থাপনের আশা দুরাশা মাত্র।

স্টার্লিং পাওনা—Sterling Balances.

ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারদের আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তদনুরূপ অর্থ বা সম্পদ সরকারের তহবিলে বা ব্যক্তির হাতে নাই।

দেশের জনসাধারণ অতৃপ্ত ও অধীর আকাঙ্ক্ষায় রাষ্ট্র-অনুসৃত নানাবিধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাহাদের বহু দিনের স্বপ্ন রূপায়িত দেখিতে চায়।

বৃটিশ সরকার তাহাদের যুদ্ধকালীন প্রয়োজনমত এদেশে নোট ছাপাইয়া রসদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারত সরকার সেই নোটের পরিবর্তে যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকারের এই ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। ঋণের পরিমাণ যুদ্ধশেষে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ছিল। এই ১৬০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নামে জমা ছিল। ১৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ইতিমধ্যে ৬০০ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। প্রাক্তন অর্থসচিব ষন্মুখম্ চেট্টী লণ্ডনে যাইয়া বৃটিশ কর্মচারীদের পেন্সন বাবদ ও বৃটিশ পরিত্যক্ত বাসা ও বিমানঘাঁটি এবং পরিত্যক্ত যুদ্ধোপকরণ বাবদ এই টাকা বাদ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত মূল্যের ভোগসামগ্রী ইংলণ্ড হইতে আমরা আমদানী করিয়াছি; কিন্তু এখনও ৯০০ কোটি টাকা মূল্যের স্টার্লিং বৃটেনের নিকট ভারতের পাওনা আছে।

এই দেনা বৃটেন ভারতকে কিভাবে পরিশোধ করিবে এই সম্বন্ধে এদেশে নানা আলোচনা হইয়াছে। ভারত ও বৃটেনের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার জন্য বৃটেনকে শীঘ্র এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের সঙ্গে সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুঃখ ও দারিদ্র্য লাঘব করিতে হইলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকারকে উন্নত কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা করিয়া দেশে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইবে যদি ভারত সরকার পাওনা স্টার্লিং আদায় করিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করিতে পারেন। এইভাবে দেশে অচিরে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্পের সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং কৃষির শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হইবে এবং তখনই দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, গৃহ ও পরিধেয়ের সম্যক্ ব্যবস্থা করা যাইবে।